12. Dc. 807. 5.

জীবন-প্রদীপ

(উপন্যাস)

শ্রীবিষ্ণুচরণ চট্টোপাধ্যায় প্রণীত।

"There is in man a higher than love of happiness: he can do without happiness, instead thereof find blessedness."

Thomas Carlyle.

"And I could wish my days to be
Bound each to each by natural piety."

Wordsworth.

কলিকাতা,

১৩নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট্, ব্রাহ্মমিসন্ যন্ত্রে,
শ্রীকার্ত্তিকচন্দ্র দত্ত দ্বারা মুদ্রিত ও ১০৮, কলেজ ষ্ট্রীট্ হইতে
গ্রন্থকার কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

বৈশাখ—১২৯৪

All rights reserved

মূল্য ১।৵০ মাত্র।

উৎসর্গ

শ্রীযুক্ত দেবীপ্রসন্ন রায় চৌধুরী

করকমলে।

প্রাণপ্রতিম,

আপনি চরিত্রে, ধর্ম্মে, জ্ঞানে, উদ্যম-উৎসাহে দেশের এবং সমাজের অনেক আশা ভরসার স্থল। কিন্তু আমার কাছে শুধুই প্রাণের আনন্দ-বর্দ্ধন। পরন্তু আপনি আমার জীবন-পথেরও একমাত্র সঙ্গী। আপনার শারীরিক অসুস্থতায় আমি মর্ম্মস্থানে কঠিন আঘাত পাইয়াছি। এক দিন নিরাশার সাগরে ডুবিয়া শঙ্কিতচিত্তে ভাবিতে ছিলাম, আপনি কবে যেন আমাদিগকে ফাঁকী দিয়া এ সংসার শূন্য করিয়া চলিয়া যাইবেন। তাহা হইলে, এই "জীবন-প্রদীপ" জগতের সমক্ষে প্রকাশিত হইত কি না তদ্বিষয়ে গভীর সন্দেহ ছিল। যাহা হউক্, বিধাতা প্রসন্ন হইয়াছেন। আপনার শরীর দিন দিনই ভাল হইতেছে। আশা করি, ঈশ্বর আপনাকে পূর্ব্ববৎ অনবদ্য স্বাস্থ্য প্রদান করিয়া আমাদের হৃদয়ে শান্তি বিধান করিবেন। কৃপাসিন্ধুর অপার দয়ায় আমার বহু পরিশ্রমের ঐই অকিঞ্চিৎকর ফল আজ আপনার হস্তে অর্পণ করিয়া কত যে আনন্দ পাইলাম, তাহা বলিয়া প্রকাশ করিতে সমর্থ হইতেছি না।

জীবনে দেখিয়া শুনিয়া এবং চিন্তা করিয়া যে সকল সত্য অনুভব করিয়াছি, তৎসমুদয়ের অবিকল ছায়া ব্যতীত এ যৎসামান্য উপন্যাস আর কিছুই নয়। বিশেষত জীবনের যে ভাগে আপনার জীবন আমার জীবন একসূত্রে গ্রথিত হইয়াছে, উভয়ের প্রাণ একমন্ত্রে দীক্ষিত হইয়াছে, উভয়ের চিন্তা একস্রোতে বহিতে আরম্ভ করিয়াছে, সেই বিভাগের অভিজ্ঞতাই এই সামান্য গ্রন্থের প্রাণ। আজও স্বপ্নবৎ সেই ভূ-স্বর্গ খাসিয়া-পর্ব্বতমালা এবং হিমালয়গিরিশ্রেণীর গম্ভীর, পবিত্র, নিস্তব্ধ দৃশ্যরাজির মধ্যে

আপনাকে আমি দেখিতে পাই, আপনিও আমাকে দেখিতে পান। আহা! সেই সুখপূর্ণ, সুদীর্ঘ ভ্রমণ-কাহিনী কি কখনও প্রাণ হইতে মুছিয়া যাইবে? উভয়ে এক সঙ্গে নানা প্রদেশে ভ্রমণ করিয়া জীবনে যে সকল মহোপকার প্রাপ্ত করিয়াছি, তাহা কি কখনও ভুলিতে পারিব? মনে কত আশা ছিল, দুই জনে সেইরূপ প্রাণে প্রাণ ঢালিয়া, সমস্ত ভারতবর্ষে এবং ভারতের সীমাবহির্ভূত কোন কোন দেশেও ভ্রমণ করিব। কিন্তু দারুণ অস্বাস্থ্য আপনাকে আক্রমণ করাতে সে সকল আশাই নির্জ্জীব হইয়া পড়িয়াছে। ভগবান্ দিন দেন ত আবার আশা সফল হইবার সুযোগও উপস্থিত হইতে পারে। কিন্তু সে অনিশ্চিত ভবিষ্যতের কথা ভাবিয়া আর সুখ পাইতেছি না। বিগত কালের স্মৃতিই আজ প্রাণকে আনন্দ-পূর্ণ করিতেছে। আপনাকেও সে আনন্দের কথঞ্চিৎ অংশী করিতে সেই সুখ-স্বপ্নময় গত স্মৃতির যৎসামান্য ছায়াস্বরূপ এই অকিঞ্চিৎকর উপন্যাস পুস্তকখানি আপনারই হস্তে উৎসর্গ করিলাম। ইহা আর কেহ দয়া করিয়া পড়িবে কি না, জানি না। আমার বিশ্বাস, আপনি অন্ততঃ সেই ভূত কালের স্মৃতি প্রাণে জাগাইবার আকর্ষণেও একবার পড়িবেন। আর পড়িবেন, আমাকে ভাল বাসেন বলিয়া।

আপনার স্নেহের

বিষ্ণু

জীবন-প্রদীপ।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

সুন্দরী কে?

"তন্বীশ্যামা শিখরিদশনা পক্কবিম্বাধরোষ্ঠী
মধ্যে ক্ষামা চকিত হরিণী প্রেক্ষণা——"
মেঘদূতম্।

বেলা শেষে দুইজন হীন-জাতীয় কৃষ্ণবর্ণ পুরুষ একটা জঙ্গলের আড়ালে আত্মগোপন করিয়া সতর্ক ভাবে কথা বার্ত্তা বলিতেছিল। একজন এইরূপ ভাবে কথা শেষ করিল "আজ্‌কার দিনটা আমার বৃথাই গেল। এ রকম শুধু হাতে ত কখনও ফিরি নাই! এখন আর এ সর্ব্বনেশে কাজে কিছুই সুসার নাই। শুধুই পেটের দায়ে আর অভ্যাসদোষে এ পাপ করি। আজ যাত্রাটাই ভাল ছিল না। কালী মায়ের নির্ম্মাল্যি সঙ্গে আনিতে ভুলে গিয়াছি।"

দ্বিতীয় ব্যক্তি একথায় কিছুমাত্র মনোযোগ না করিয়া শিকারী বাজপক্ষীর মত দূরের নদীর বুকের উপরে একদৃষ্টিতে কি যেন দেখিতেছিল। দেখিতে দেখিতে তাহার বড় বড় গোল গোল রক্তবর্ণ চোক দুইটী যেন জ্বলিতে লাগিল। মানুষটী আর কিছুই না বলিয়া হঠাৎ আপন মনে করতালি দি' নাচিতে নাচিতে বলিয়া উঠিল "হয়েছে, হয়েছে ভাই! ঐ দেখ ধূ ধূ কো'রে এক খানি শাদা পালের নৌকা তীরের মত এ দিকেই ছুটিয়া আসিতেছে। মা শিকার যুটাইয়াছেন।" সেই জ্বলন্ত চক্ষেই প্রথম ব্যক্তিরদিকে চাহিয়া বলিল, "দেখেছ ত?" প্রথম ব্যক্তিও আর দ্বিরুক্তি না করিয়া দ্বিতীয় ব্যক্তির সঙ্গে সঙ্গেই বগল বাজাইতে বাজাইতে ধেই ধেই করিয়া নাচিতে লাগিল। তখন কাছাকাছি বিদ্যুৎ ভরা কাল মেঘ দুইখানির মত উভয়ের চক্ষু হইতে যেন আগুন বাহির হইয়া উভয়ের চক্ষেই প্রবেশ করিতে লাগিল। মানুষ দুইটী পরস্পর মুখ-চাওয়া-চাওয়ি করিয়া উৎসাহে নাচিতে লাগি[ল।] গ্রীষ্মের উত্তাপে দস্যুদিগের উলঙ্গ প্রায় কৃষ্ণবর্ণ দেহ দুইটী ভাসাই[য়া] [স্বে]দ বহিতেছিল!

যে জঙ্গলে আত্ম গোপন করিয়া এই দ্বিপদ ব্যাঘ্র দুইটী শিকার সম্মুখীন দেখিয়া উৎসাহে নাচিতেছিল, ইহা সুবিস্তৃত হিংস্র জন্তুপূর্ণ একটী নিবিড় মহারণ্যের এক অংশ মাত্র। এই মহারণ্য বাঙ্গালার দক্ষিণ সীমা আবৃত করিয়া সমুদ্রোপকূলে সংলগ্ন হইয়াছে। অরণ্যের বুক খণ্ড বিখণ্ড করিয়া শত শত নদী প্রবাহিত। দস্যুরা ইহারই একটী নদীর তীরে দাঁড়াইয়া শিকারের জন্য সমস্ত দিন অপেক্ষা করিতেছিল। এই নদীর নাম সাধারণের নিকট অপরিচিত। এই অঞ্চলের দস্যুরা ও নৌকার মাঝীগণ এটীকে ডাকা'তে নদী বলিয়া থাকে। কিন্তু মূল ডাকা'তে নদী এটী কি না, বলিতে পারি না। বহু পূর্ব্বকাল হইতে এই নদীতে ডাকাতি হইয়া আসিতেছে বলিয়াই বোধ হয় এ নামটীর সৃষ্টি হইয়াছে। এই ব্রিটিসসিংহের দুর্দ্দমনীয় প্রতাপের দিনেও এ অঞ্চলে ডাকাতির বিরাম নাই। অরণ্যের এক পার্শ্বেই ডাকা'তে বাসদেবপুর নামক প্রসিদ্ধ দস্যু নিবাস। শাদা পালের নৌকাখানি এই বিষম সঙ্কটাপন্ন স্থানদিয়া শূন্য নদীতে অনুকূল বাতাসে অনুকূল স্রোতে ছুটিয়া আসিতেছিল। নৌকা নক্ষত্রবেগে ছুটিতেছিল!

নদীতে কাণায় কাণায় ভরা জোয়ারের জল থৈ থৈ করিতেছে। কোথায়ও স্রোতের জল তীর অতিক্রম করিয়া অরণ্যের অন্ধকার গর্ভে প্রবেশ করিয়াছে! কোথায়ও তটে তটে আঘাত করিয়া কল, কল, তর তর শব্দে তীরের বেগে ধাইতেছে। ক্ষুদ্র পালের নৌকাখানি ক্রমেই দূর হইতে নিকটে আসিয়া এই স্রোতের উপর দিয়াই ভাসিয়া যাইতে লাগিল। এ নৌকায় কোন [illegible]ল্য বাণিজ্য দ্রব্য বা ধনীর ধনরাশি নাই। কেবল ছৈয়ের মধ্য হইতে ক্ষুদ্র জানালা দিয়া মুখ বাহির করিয়া একটী রমণীরত্ন বায়ু-কম্পিত আলুলায়িত কেশরাশি, সুকোমল হস্তে,ক্ষুদ্র ললাট ও সুন্দর মুখ কান্তির উপর হইতে আস্তে আস্তে ধীরে ধীরে সরাইয়া, আরক্তিম পশ্চিমাকাশ হইতে নদীর উচ্ছ্বাসিত জলের উপরে সূর্য্যাস্তের শোভা দেখিতেছিলেন। রক্তজবাভ জ্বলন্ত সূর্য্য মণ্ডলের বৃহৎ গোলকটী যেন ধীরে ধীরে নিঃশব্দে ক্রমে ক্রমে জলের গর্ভেই ডুবিয়া যাইতেছিল। আরক্তিম জলে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র লহরীর ছলে অগণ্য অসংখ্য রাশীকৃত হীরার ফুল ফুটিয়া, জ্বলিয়া ভাসিতেছিল। [illegible] প্রকৃতির অলক্তরঞ্জিত উজ্জল ললাট হইতে একটী প্রকাণ্ড মাণিক সেই জ্বলন্ত জল রাশিতে পড়িয়া যাইতেছিল। যুবতী গম্ভীর ভাবে [illegible]মাময় প্রাকৃতিক দৃশ্য দেখিতে দেখিতেই দ্রুতগামী নৌকার

ক ছুটিতেছিলেন। নৌকা আরও কিছু দূরে চলিয়া গেলে সুন্দরী ঈষৎ ভ্রুকুঞ্চিত করিয়া চিন্তা নিমগ্নচিত্তে মেঘবক্ষস্থিত পূর্ণচন্দ্র সদৃশ বিপুল কেশ রাশির সম্মুখস্থ সুন্দর লাবণ্য জোৎস্নাভরা মুখখানি ধীরে ধীরে টানিয়া লইয়া ছৈয়ের গর্ভ আলোকিত করিয়া সরিয়া বসিলেন। নৌকার গলুইতে বসিয়া একজন অল্পবয়স্ক মাঝী গলা ছাড়িয়া মনের সুখে মধুরস্বরে ভাটিয়াল গান গাইতেছিল। আর একজন গুড়ুকে দম দিয়া ধূঁয়া উড়াইতেছিল। দস্যুদের মধ্যে একজন শিকারের পশ্চদ্ধাবিত ক্ষুধার্ত্ত ব্যাঘ্রের মত নৌকার সঙ্গে সঙ্গেই সেই নিবিড় বনের আড়ালে আড়ালে বায়ুবেগে লম্ফ দিতে দিতে ছুটিয়া চলিল। অপর ব্যক্তি কেবল নিঃশব্দে ধীর পদ সঞ্চারে গভীর হইতে গভীর অরণ্যে প্রবেশ করিয়া কোথায় যেন অদৃশ্য হইয়া গেল! নৌকার লোকেরা ভুল-ক্রমেও এ ভীষণ ব্যাপারের বিন্দু বিসর্গও জানিতে পারিল না। কেবল শুক্তির গর্ভস্থ মুক্তার মত, কৌটায় ভরা মাণিকটির মত, সুন্দরী ছৈয়ের গর্ভে বসিয়াও চিন্তাসাগরে ভাসিতে লাগিলেন। সেপ্রতিভা-বিস্ফারিত প্রফুল্ল পদ্মবৎ সৌন্দর্য্য রাশির উপরে প্রভাতের জ্যোতির মত কি যেন এক চিন্তার ছায়া পড়িয়া খেলিতেছিল। অবোধ মাঝীরাও উপস্থিত সুবিধা ও সুদিনের আনন্দে মাতিয়া সম্মুখের সম্ভাব্য বিপদের কথা একবারও ভাবিতেছিল না। সুখের বর্ত্তমানে কেইবা ভবিষ্যতের আঁধারে ডুবিতে চায়? কেইবা পারে?

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

বিপদের কোলে।

"The *Chores* and *Dacoits* of Bakergunge are as the reflections of looking glass."

H. Beveridge, B.C.S.,

মানব ভাগ্যের মত প্রকৃতির রাজ্যেও নিয়ত পরিবর্ত্তন। এক মুহূর্ত্তের সঙ্গে অপর মুহূর্ত্তের কোনই সাদৃশ্য থাকে না। অসুবিধার পরে সুবিধা, সুবিধার পরে আবার নূতন নূতন অসুবিধা, ইহাই সৃষ্টির সর্ব্বব্যাপী নিয়তি। এই অখণ্ড নিয়মের অনুরোধেই যেন সন্ধ্যা সময়ে শাদা পালভরা ক্ষুদ্র পান্সী খানি সুন্দরীকে বক্ষে করিয়া নদীর যে বাঁকে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে, সে

খানে বাতাস মন্দ মন্দ গতিতে প্রতিকূল দিক্ হইতে বহিতেছে। জোঃরেরও পূর্ণ মাত্রা হওয়াতে স্রোতের বেগ মৃদু হইয়া আসিতেছিল। মাঝীরা শাদা পাল খানি নামাইয়া রাখিয়া ক্ষুদ্র নৌকা খানিকে বিধবার মত ভূষণ-শূন্য করিয়াছে। নৌকা এখন কেবল স্রোতে বুক ভাসাইয়া ধীর গতিতে ছুটিতেছে। অল্পবয়স্ক মাঝী ভাটিয়াল গান ছাড়িয়া ধীরে ধীরে দাঁড় টানি-তেছে। যে অশীতিপর বৃদ্ধ গুড়ুকের ধূঁয়ায় চারিদিক্ আন্ধার করিতে-ছিল, সে কার্য্যান্তে পুনরায় তাম্রকুট সেবনের চেষ্টায়ই ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছে। লোক চরিত্রের এই বৈচিত্র্য দেখিয়াই মহা কবি বলিয়াছেন, "ভিন্নরুচির্হি লোকঃ।"

সুন্দরী কি করিতেছেন? সুন্দরী প্রফুল্ল কুসুমরাশির মত, জ্যোৎস্নাময় রূপ রাশি শয্যার বক্ষে ঢালিয়া, অর্দ্ধ শায়িতাবস্থায় উপাধানে হাতের ভর রাখিয়া, গালে হাত দিয়া বসিয়া, গাঢ় অন্যমনস্কতার সহিত একখানি কাগজে কি যেন লিখিতেছেন। সুন্দরীর পৃষ্ঠস্থিত আজঙ্ঘালম্বিত আলুলায়িত কেশরাশি হইতে কতকগুলি সুন্দর গুচ্ছ মুখচন্দ্রের উপরে পড়িয়া ঈষৎ আবৃত করিয়াছে। দুইটী কাঁধ এবং গণ্ডস্থিত হস্তও চুলে ঢাকা পড়িয়াছে। কিন্তু কেশবকাশ হইতে নির্ম্মল চন্দ্রালোকের মত লাবণ্যরাশি ফুটিয়া উঠিয়াছে। সুন্দরীর বাহ্য-জ্ঞানশূন্য। সুন্দরী সম্মুখের মসীপাত্র হইতে কলমে এক কলম কালি তুলিয়া কাগজখানিতে ধীরে ধীরে একটী, দুইটী, তিনটী আঁক কাটিয়াছেন। আঁকের নীচে ভাবিতে ভাবিতে "শশাঙ্কশেখর" এই নামটী লিখিয়াছেন। চিন্তার চমক ভাঙ্গিলে লিখিত নামটী পড়িয়া যুবতীর মুখের উপর যেন হঠাৎ মেঘভাঙ্গা রৌদ্র ছড়াইয়া পড়িল। কিন্তু পর মুহূর্ত্তেই আবার লজ্জায় সে মুখ পাণ্ডুবর্ণ হইয়া উঠিল। তদুপরি ধীরে, ধীরে, ধীরে এক খানি গাঢ় অন্ধকার মাখা মেঘ সাজিল। মেঘ বর্ষিল। যুবতী নীরবে কাঁদিয়া ফেলিলেন। সুন্দরীর পদ্মপলাসবিনিন্দিত আয়ত লোচন দুইটী হইতে প্রফুল্ল গোলাপ স্তবকের মত সুন্দর গণ্ড দুইটী ভাসাইয়া ফোঁটা ফোঁটা জল পড়িতে লাগিল। জলে গণ্ডস্থিত হস্ত ভিজিল, উপাধান ভিজিল, সুন্দর বঙ্কিম গ্রীবা বহিয়া জলের ধারা বক্ষস্থিত বস্ত্রে পড়িল, সম্মুখের কাগজের উপরেও মুক্তাফলের মত দুই এক ফোঁটা তপ্ত অশ্রু ঝরিয়া পড়িল। সুন্দরী অনেকক্ষণ একাকী নির্জ্জন ছৈয়ের গর্ভে বসিয়া অশ্রুতে অভিষিক্ত হইলেন। মানুষের মন এক ভাবে কতক্ষণ থাকে? সুন্দরীর প্রাণ আবার চিন্তায় আকুল হইল। এক

মুহূর্ত্তেই যেন পৃথিবী ও আকাশের সমস্ত কথা ভাবিলেন। এক মুহূর্ত্তেই যেন ভূত, বর্ত্তমান, ভবিষ্যৎ তন্ন তন্ন করিয়া দেখিলেন। কত কি স্মৃতি, স্বপ্ন, যুবতীর অন্তর্দ্দৃষ্টির সম্মুখ ঝলসিত করিয়া নিবিয়া গেল। সুন্দরী ধীরে, ধীরে, ধীরে ভাবিতে লাগিলেন "এ দুর্ব্বহ জীবনের ভার আর কত দিন বহিব? বাঁচি কেন? আছি, কেন? কোথায় যাইতেছি? কেন যাইতেছি? তুলসী গ্রামে গিয়াই বা কি করিব? সেখানে গেলেই ত শতবিষধর সাপ আমার মর্ম্মে দংশিবে। আমার কাছে যে সে স্থান অনন্ত শ্মশান পূর্ণ, জ্বলন্ত স্মৃতির মরুভূমি। সেখানে কেন যাইব? যে খানে ফু'টেছি, সেইখানেই মিলাইব, যেখানে জন্মেছি, যেখানে বে'ড়েছি, সেইখানে দেহের শেষ ভস্ম মুষ্টি রাখিয়া এ সংসার ছাড়িয়া যাইব, বিধাতা কি এই নিয়তি সাধন করিতেই আবার আমায় তুলসী গ্রামে নিতেছেন? তাঁহার ইচ্ছা পূর্ণ হউক্। দেব, তোমার মঙ্গল ইচ্ছা পূর্ণ হউক্।"

আবার ভাবিতে লাগিলেন—"দয়ালু পুরুষ কে? কেমন সৌম্যমূর্ত্তি। দেখিলেই বোধ হয় যেন পরোপকারে জীবন ঢালিয়াছেন। ইনি কে? বড় মামা? ভবানীশঙ্কর? নরকে স্বর্গ ফু'টেছে? কখনই নয়। তেমন পাপেররাশি কি এমন নির্ম্মল পুণ্যরাশিতে পরিণত হ'য়েছে? অনন্তলীলাময়ের লীলা কে জানে? বোবায় কথা কয়, পঙ্গু গিরি লঙ্ঘে, সকল অসম্ভবই দেব, তোমার প্রসাদে সম্ভবপর হয়। কিন্তু দয়ালু পুরুষ কে? আমি চিনিতে পারি নাই।

জীবনটা কি? জীবন যদি পরোপকারে উৎসর্গ করা না যায়, তবে সত্য সত্যই ভার বোঝা মাত্র। এ ধূলার পৃথিবীতে এমন কি আছে যে, শুধু তাহাই বুকের ধন করিয়া সুখে বাঁচিয়া থাকা যায়? ইষ্ট দেবতা? তিনি ত অন্তরের দেবতা। তিনি আমাতে, আমি তাঁহাতে। এ সৃষ্টির ধূলী মুষ্টি বা দেহের রক্তবিন্দু না থাকিলেও তাঁহাতে আমাতে ছাড়া ছাড়ি হইতে পারে না। অঞ্জলি অঞ্জলি করিয়া পরোপকার ফুলে তাঁহার পূজা করিতেই এ জীবন। নতুবা জীবন লাঞ্ছনা, মৃত্যুর অপেক্ষাও অন্ধকার। আমি অনাথিনী, পৃথিবীর আশ্রয়হীনা সন্ন্যাসিনী। দেব, তোমার যাহা ইচ্ছা, তাহাই কর। আমিত তোমারই হাতের খেলনা। রূপ শত্রুতা করিবে? যৌবন শত্রুতা করিবে? কি শত্রুতা করিবে? বুঝি নাই। স্বরস্বতী একদিন আয়নার ছায়া দেখাইয়া বলিয়াছিল "এ আগুন কি গেরুয়া

কাপড়ে এলোচুলে ঢাকা পড়েছে?" রূপ যৌবনই কি আমার জীবন পথের কণ্টক? আমার এমনই কি একটা রূপ আছে? জানি না। স্বরস্বতী কেবলই বলিত "রূপ রূপ"। সংসারের মানুষ কি সত্য সত্যই বনের বাঘের চেয়েও হিংস্র? ছি! এমন কথা কেন ভাবিব? ভয়বারণে এ জীবন ঢালিয়াছি, ভয় কিসের? কিসের ভয়? না হয় গায়ে ভস্ম মাখিব, ছেঁড়া কাপড় পরিব। আমি সন্ন্যাসিনী, এই সাজই আমার ভাল। দীনবন্ধু, তুমি আমায় হাতে ধো'রে নিয়ে চল।"

রূপসী গাঢ় নিবিষ্ট চিত্তে এই সকল কথা ভাবিতে ভাবিতে, শয্যাত্যাগ করিয়া,চারিদিক্ জন মানব শূন্য অরণ্য এবং জলরাশিতে ঢাকা দেখিয়া, ধীরে ধীরে ছৈয়ের বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইলেন। তাহাতে যেন ক্ষুদ্র পান্সীখানিকে বিজয়ার দিনের প্রতিমাভরা নৌকার মত দেখা যাইতে লাগিল। সুন্দরী ছৈয়ের কিনারায় অল্প অল্প ঠেস দিয়া দ্বারের সম্মুখেই দাঁড়াইলেন। লম্বমান বিপুল-কেশরাশি সমস্ত পৃষ্ঠ ঢাকিয়া জঘন ও জঙ্ঘা আবৃত করিল। যেন হঠাৎ নিবিড় মেঘের কোলে নির্ম্মল পূর্ণচন্দ্র উদিত হইল। রূপসী চিন্তা ত্যাগ করিয়া এখন সান্ধ্য প্রকৃতির অপূর্ব্ব শোভা দেখিতেই নিমগ্ন হইলেন। সুন্দরীর মস্তকোপরিস্থ আকাশের চন্দ্রাতপসদৃশ নীলিমাপুঞ্জের মধ্যে একটী মাত্র ক্ষুদ্র তারা মিটি মিটি করিয়া জ্বলিতেছে। এখনও অগণ্য অসংখ্য জ্বলন্ত হীরক খণ্ডে নভস্তল নিবিড়রূপে খচিত করিতে, স্তব্ধ প্রকৃতি যেন তারার পরে তারা সাজাইতেছেন না। দূর বনের গায়ে ধীরে ধীরে যেন একখানি আঁধারের সরু মলিন চাদর ঢাকা পড়িতেছে। ডাকা'তে নদীর উভয় তীরস্থ নিবিড় অরণ্যের গায়ে ধীর সমীরণে দুই একটী ফুল ফুটিয়া লতার আগায়, বৃক্ষ শাখার পল্লবরাশির মধ্যে মধ্যে হাসিতেছে। দূর দূরান্তর হইতে ঝাকে ঝাকে আকাশ ছাইয়া পাখী সকল বনের উপরে পড়িয়া কলরব করিতেছে। বাদুড়েরা নিঃশব্দে আকাশ দিয়া উড়িয়া যাইতেছে। পশ্চিমাকাশে এক খানি ক্ষুদ্র মেঘ সিন্দুর মাখিয়া বায়ুর উপরে ভাসিতেছে। মধ্যে মধ্যে বলকার শাদা ধবধবে মালাগুলি দূরের বিল হইতে বনান্বেষণে যেন মেঘখানি স্পর্শ করিয়াই শাঁ শাঁ করিয়া উড়িয়া গিয়া দূরস্থ আকাশে ডুবিয়া যাইতেছে। রূপসী শোভা দেখিতে দেখিতে আবার আত্মহারা হইলেন। এমন সময় সন্মুখ হইতে অশীতি পর বৃদ্ধ পক্ককেশ মাঝী ক্রমান্বয়ে পূরা দুইটী ছিলুম গুড়ুকের শ্রাদ্ধ করিয়া,কল্কের আগুন নদীর জলে ঢালিয়া ফেলিতে ফেলিতে,

কাশিয়া কাশিয়া হাঁপাইতে হাঁপাইতে, ডাকিল "মা ঠাকুরুন্।" মাঝীর ডাকের লক্ষ্য সুন্দরীই।

সন্তানের প্রাণ ভরা ডাকে মা আর স্থির থাকিতে পারিলেন না। তাড়াতাড়ি চিন্তার ঘোরেই রূপসী উত্তর দিলেন "কেন বাছা?"

বৃদ্ধ মিনিটু পাঁচ ছয়ে মুখের কাশিটা কাশিয়া ধীরে ধীরে বলিল, "আজ্ঞে কাল্কের সেই গল্পটা। বো'ল্‌ছিলুম কি বেহ্মচারী ঠাকুরই ডাকা'তে বাসদেবপুরের হত্তা কত্তা বিধাতা পুরুষ। তাঁ'রই জোরে সব বেটারছেলেরা নেচে কুঁদে বেড়ায়। আজ্ঞে শুন্তে পাই, তাঁ'র নাকি কালী সিদ্ধি হো'য়েছে।"

মা। "ব্রহ্মচারীর নাম জান?"

বৃদ্ধ। "জানি। হরানন্দ বেহ্মচারী।"

মা। "বাসদেবপুর আর কত দূরে?"

বৃদ্ধ। "আজ্ঞে আধ ক্রোশ।"

মা। 'এত কাছে!"

বৃদ্ধ। "আজ্ঞে মনে কো'রেছিলুম, বেলাটা থাক্‌তে থাক্‌তেই ছা'ড়িয়া যাব। তা জানেন, পালে কুলালে না। যা হোক্, মা তুমি সামান্যি মানুষ নও। তুমি সাক্ষাৎ দেবতার মেয়ে। তুমিই আজকার ভরসা। যা করেন মা কালী। যা করেন গাজি সাহেব।"

সুন্দরী দেখিলেন, বৃদ্ধ হিন্দু মুসলমান কাহারও দেবতাকে বেজার করিল না। আর তাঁহাকেও একটা দেবতার মধ্যেই ফেলিয়া দিয়া বেশ নির্ভাবনায় আছে। কিন্তু এই কথা আর ভাবিবার সময় হইল না। রূপসী বহু দূরে সেই সন্ধ্যার আন্ধার মাখা নদীর বুকের উপরে এক দৃষ্টে কিছুক্ষণ তাকাইয়াই একটুকু বিস্ময়বিস্ফারিতভাবে বলিলেন, "দেখেছ, ঐ একখানি ছোট ছিপ কিন্তু বড়ই জোরে জোরে বাইয়া আমাদের দিকেই তীরের মত ছুটিয়া আসিতেছে! দেখেছ ত?"

সুন্দরী যে বৃদ্ধের সঙ্গে সন্তানবাৎসল্যে গদ গদ হইয়া কথা বার্ত্তা কহিতেছিলেন, এ ব্যক্তি নাম মাত্র মাঝী। এ বয়সে আর নৌকাচালন কার্য্যে এ ব্যক্তি কোনই সাহায্য করিতে পারে না। কেবল সঙ্গে আসিয়াছে। আর ভাত রান্ধে, গুড়ুক খায়, কাশে, ঘুমায়, এবং মধ্যে মধ্যে আষাঢ়ে গল্প বলিয়া জননীর প্রীতি সম্পাদন করে। দুঃখের বিষয় জননী কিছুতেই পুত্রের আনাড়ী গল্পগুলি শুনিতে ইচ্ছুক নন। কিন্তু পুত্র কিছুতেই ছাড়ে না। মায়ে পোয়ে কথাই

ভিন্ন। কিন্তু বৃদ্ধের চোকের দৃষ্টি এখনও খুব পরিষ্কার। বৃদ্ধ সুন্দরীর কথায় চমকিয়া দূরের সেই দ্রুতগামী ছিপখানি দেখিয়া কম্পিতস্বরে একবারে পিছনের মাঝীকেই ডাকিয়া বলিল "দীনু, দেখ্‌ছিস্? বিপদ্ যে সাম্‌নেই!"

দীনু আর একটীও কথা না বলিয়া কেবল নৌকার গলুই ফিরাইয়া তীরের দিকে করিয়া আগের মাঝীকে ডাকিয়া বলিল "পেল্লাদ, ভাই, এখন একবার বিপদে মধুসূদনকে ডেকে ঝেকে দাঁড় ফেল ত! কুল ধরিতে পাই ত পালাব।" প্রহ্লাদ, এই কথার পরেই চীৎকার রবে গাজি পীরকে ডাকিয়া সত্য সত্যই গায়ে যত বল ছিল, সমস্ত ব্যয় করিয়া ঝাকিয়া দাঁড় ফেলিতে লাগিল। উজান জল হইলেও দুরন্ত ক্ষুদ্র ছিপখানি বাজপক্ষীর মত শোঁ শোঁ শব্দ করিয়া বেগে ছুটিয়া আসিতেছিল। পান্‌সী তীরের দিকে ফিরিয়া যাইতেছে দেখিয়া ছিপের সম্মুখের গলুইয়ের উপরে একজন বলবান্ পুরুষ দাঁড়াইয়া সেই দূর হইতেই বজ্রগম্ভীরস্বরে চারিদিক্ আন্দোলিত করিয়া ডাকিয়া বলিল "পান্‌সী থামা। আর এক হাত নড়ালেই বিপদ ঘটিবে। এখনই বন্দুকের গুলিতে প্রাণ হারাতে হবে। সাবধান! পান্‌সী থামা!" এই ঘটনার পরে দীনু এবং প্রহ্লাদ উভয়ই বাক্যটী মাত্র ব্যয় না করিয়া এক একটী লাফে জলে পড়িয়াই ডুবসাঁতার কাটিয়া নদীর তীরের দিকে ছুটিয়া চলিল। বৃদ্ধ এবার ফাঁপরে পড়িয়া ডাকিল "মা"।

মাঝীদিগের নড়িয়া চড়িয়া নৌকা চালাইতে অসুবিধা হইবে ভাবিয়া মা এই সকল ঘটনার সময় ধীরে ধীরে বাহির হইতে পুনরায় ছৈয়ের মধ্যে গিয়া বসিয়াছিলেন। ছৈয়ের মধ্য হইতেই দীনু আর প্রহ্লাদের জলে ঝাঁপাইয়া পড়িবার শব্দ শুনিতে পাইলেন। বৃদ্ধেরও সেই কাতর ডাক শুনিলেন। শুনিয়া আবার তাড়াতাড়ি বাহিরে আসিয়া বলিলেন "কেন বাছা! ভয় কি? ভগবান্‌কে ডাক!"

বৃদ্ধ। "দেখেছ ত মা ভয় তরাসে বেটারছেলেদের রঙ্গ। তাদের পায়ের ঠেলায় দেখ মা নৌকা আবার ফিরে মাঝগঙ্গায় এসে পড়েছে। মা ভগবান্‌কে কি ডা'কৃবো? সাহসে কিছুই কুলাচ্ছে না।"

বলিতে বলিতে বৃদ্ধ দুই হাতে চোক ঢাকিয়া তাড়াতাড়ি ছেলেমানুষের মত সুর করিয়া কাঁদিতে বসিল। সুন্দরী বৃদ্ধের কান্না দেখিয়া এই বিপদের সময়েও একটুকু হাসিয়া বলিলেন "কাঁদ কেন বাছা? আমি বরং যেমন তেমন কো'রে হালটা চাপিয়া ধরিতেছি। তুমি দাঁড় ফেলিয়া কুলের

দিকে এগুতে চেষ্টা কর।” বৃদ্ধ একথায় আরও দ্বিগুণ কাঁদিয়া বলিল, “মা আমার আর হাত পা স’র্‌ছে না। বাপের ভিটায় সাঁঝের বাতিটী দেখাতেও কেউ রো’ল না গো—!” এই বলিয়াই বৃদ্ধ আরও জোরে জোরে কাঁদিতে লাগিল। বৃদ্ধের কান্না দেখিয়া সুন্দরী ভাবিয়া ভাবিয়া বলিলেন,—“বাছা, তা না হয়, ঐ নৌকার দড়ীগাছটী ধরিয়াই কোন রকমে জলে ভাসিয়া গলুইয়ের ছায়ার আড়ালে লুকাইয়া থাক। আমি ডাকা’ত-দিগকে তোমার কথা কিছুই বলিব না।” বৃদ্ধ যুবতীর এই পরামর্শে কান্না রাখিয়া তাড়াতাড়ি বলিল,—“ভাল বুদ্ধি বো’লেছ। আচ্ছা মা, আমি বরং তাই করি। তুমি কি করিবে?”

সুন্দরী। “আমি কিছুই করিব না। এই ডাকা’তদের হাতে ধরা দেব।”

“ঐ যে ছিপ এসে প’ড়েছে! আমি তবে তোমারই কথা মত কাজ করি মা।” এই বলিয়াই, বৃদ্ধ জলে ঝাঁপ দিয়া পড়িয়া, দড়ী ধরিয়া নৌকার ছায়ায় নাকটী মাত্র জাগাইয়া ভাসিতে লাগিল। ছিপও তখনই হন্ হন্ করিয়া আসিয়া নদীর বুকে ঘূর্ণায়মান কর্ণধারহীন, বাহকহীন ক্ষুদ্র পান্‌সীখানি ধরিয়া ফেলিল। সুন্দরী তখনও নৌকার বক্ষে নিজের স্থানে দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়াই সমস্ত ঘটনা দেখিতেছিলেন। সান্ধ্য সমীরে যুবতীর পিঠ-ছাওয়া আজঙ্ঘা-লম্বিত কেশের রাশি ধীরে ধীরে উড়িতেছিল। সুন্দরীর নির্ভীক সাম্যমূর্ত্তির ছায়া লইয়া নদীর ছোট ছোট ঢেউগুলি যেন লুফালুফি করিতেছিল। যুবতী দেখিলেন, ছিপে অনেকগুলি অস্ত্র শস্ত্রের সহিত আঠার উনিশ জন ডাকা’ত আসিয়াছে। সুন্দরী নিবিষ্টচিত্তে মনে মনে জপিতেছিলেন, “ভয়বারণে এ জীবন ঢালিয়াছি আর কিসের ভয়? কি ভয়?” সুতরাং ডাকা’তের ছিপ এত কাছে দেখিয়াও সুন্দরীর যেন কোনই পরিবর্ত্তন ঘটিল না। ডাকা’তেরা ক্ষুদ্র পান্‌সীখানি ধরিলে একজন আসিয়া তৎক্ষণাৎ লম্ফ দিয়া নৌকায় চড়িয়া দাঁড়াইল। সুন্দরী এখনও অবাক্ হইয়া মন্ত্র জপিতেছি-লেন। যে ব্যক্তি নৌকায় চড়িয়া দাঁড়াইল, তাহার বয়স পঞ্চাশের বড় কম নহে। দস্যু যুবতীর কাছে আসিয়া ধীরে ধীরে সুমিষ্ট কথায় বলিল, “মা, তুমি আমাদের ছিপে চো’ড়ে বো’স।”

দস্যুর এইরূপ ব্যবহারে সুন্দরী বিস্মিত হইলেন। যুবতীর মুখে এবার কথা ফুটিল। যুবতী সম্মুখের দস্যুর মুখের উপরে সুন্দর বিশাল চক্ষু দুইটী স্থাপিত করিয়া বলিলেন “তোমরা আমায় কোথায় নিতে চাও?”

দস্যু। "ভয় নাই?"

যুবতী। "ভয় আমার নাই। ভয় করিতেছি না।"

দস্যু একটু গম্ভীর হইয়া বলিল "তবে ছিপে চো'ড়ে বো'স। মার কাছে তোমায় বলি দেওয়া হইবে।" যুবতী আর একটীও কথা না বলিয়া কেবল ধীরে ধীরে নীরবে ডাকা'তের ছিপে চড়িয়া বসিলেন। ডাকা'তেরা সুন্দরীকে নিয়া তখনই ছিপ ছাড়িয়া দিয়া পূর্ব্বের মতই হন্ হন্ করিয়া তীরের বেগে ছুটিয়া চলিল। এবার ছিপ বাসদেবপুরের দিকে ছুটিল।

প্রথম খণ্ড।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

পাপের অঙ্কুর।

একটী লোক একটা পর্ব্বতাকার বাড়ীর ছাদের উপরে অল্প অল্প সন্ধ্যার আঁধারে গা ঢাকিয়া ধীরে ধীরে পাচারি করিতে করিতে ভাবিতেছিল—"এত বড় বিষয়টার অংশ দেওয়াটা নিতান্তই ফাকা কথা। তবে ভবানীশঙ্কর আর তারাচাঁদ দুই জনেই বো'লেছে, "হরগোবিন্দ" রায়ের ঘর থেকে দলিলখানি বাহির কো'রে দিতে পারিলে আমায় পাঁচ হাজার টাকা পুরস্কার দেবে। বিষয়ের অংশের কথাটা হাসি ঠাট্টা কো'রে বো'লেছে মাত্র। যাক্ পাঁচ হাজার টাকা যদি দেয়, তবে আমি কাজটা কো'রে দেব। বোধ হয়, দলিল বাহির কো'রে নেওয়াটা আমার পক্ষে তত কঠিন কাজ হবে না। দলিল যেখানে আছে, তাও আমি জানি।

পিসীমা আমায় যে রকম ভালবাসেন, তাতে যদি ধরা পড়ি, তাতেও বড় একটা ভয় নাই, যাকিছু একটু লজ্জা পেতে হবে মাত্র। কিন্তু পিসে মহাশয় ঘরে থাকৃতে সুবিধা হবে না। গুলির আড্ডার সে মানুষটা আমায়—"

মানুষটী এতদূর ভাবিতে না ভাবিতেই বাড়ীর ভিতর দিক্ হইতে কে যেন সুমধুর বামাকণ্ঠে উচ্চৈঃস্বরে ডাকিল "দাদাঠাকুর—ও দাদাঠাকুর—।" দুই

তিনবার ডাকিয়াই যে ডাকিতেছিল, সে অপর একজন কাহাকে যেন লক্ষ্য করিয়া বলিল "না গো, দাদাঠাকুরের সাড়া পেলুম্ না। এইত এখানেই দেখেছিলুম, কোথায় গেলেন?" কথা শেষ হইতে না হইতেই ঘরের ভিতর হইতে উত্তর হইল "ও স্বরস্বতি, তুই ফিরে আয়। যাক্, ধরণীটা ব'য়ে গিয়াছে। তাকে আর ডেকে দরকার নাই।" স্বরস্বতী বাড়ীর অল্প বয়স্কা পরিচারিকা। যিনি ঘরের ভিতর হইতে স্বরস্বতীকে ডাকিলেন, তিনি বাড়ীর পরিণত বয়স্কা গৃহিণী, ধরণীধরের পিসী মা, সিদ্ধেশ্বরী ঠাকুরাণী। ডাক শুনিয়া স্বয়ং ধরণীধর শর্ম্মা পাচারি করা ভুলিয়া সেই সন্ধ্যার আঁধারে একটীও কথা না বলিয়া বা সাড়া শব্দ না করিয়া কেবল নির্জ্জন প্রকাণ্ড ছাদটার উপরে অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত নিস্তব্ধভাবে কাল পাথরের স্তম্ভটীর মত অচল হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। যখন ডাকাডাকির সব গোল থামিয়া গেল, তখন শর্ম্মা, ধীরে ধীরে একটী সিঁড়ী বহিয়া ছাদ হইতে বাড়ীর বাহিরের দিকে নামিয়া গ্রামের প্রান্তস্থিত একটী গুলির আড্ডার দিকে যাত্রা করিল।

মহাকবি কালিদাস কবিতার ছলে মেঘদূতের একস্থানে মেঘকে কামরূপ বলিয়াছেন। বলিয়াছেন "কামরূপংমঘোনঃ"। বর্ষার আকাশের ছবি মনোযোগ করিয়া দেখিলে কবির একথার মর্ম্ম সকলেই বুঝিতে পারেন। কিন্তু অচেতন মেঘের অপেক্ষা অভিসন্ধির দাস মানুষের চরিত্রে একথাটী বড়ই সুন্দর খাটে। এই জন্য সংসারে লোকের সঙ্গে ব্যবহার করিয়া করিয়া যাঁহারা পাকিয়া যান, তাঁহারা শেষটা আর যেন কাহাকেও সহজে বিশ্বাস করিতে পারেন না। কত মহৎ চরিত্রে এ দুঃখময় কলঙ্কের দাগ দেখিয়াছি। বস্তুত বিশ্বাস করিবে কাহাকে? কয়জন লোক আপনাকে আপনি বিশ্বাস করিতে পারে? পরের কথা আর কি বলিব? ফুটন্ত ফুল বলিয়া আজ যাহাকে বুকে পুরিয়া রাখিতেছ, কাল সে বিষমাখা তীক্ষ্ণ ধার ছুরি হইয়া সর্ব্বনাশ করিবে না, কে বলিবে? নেমকহারাম ধরণী একথার জীবন্ত সাক্ষী। ধরণীধর যে মন্ত্র জপিতে জপিতে গুলির আড্ডার দিকে যাত্রা করিল, এমন্ত্র প্রতিপালক হরগোবিন্দ রায়ের সম্পূর্ণ সর্ব্বনাশের মন্ত্র। কিন্তু এই সকল দুশ্চরিত্র লোকের ব্যবহার দেখিয়াই প্রেমের অঙ্কুর হৃদয়গ্রন্থি হইতে ছিঁড়িয়া ফেলিয়া মানুষকে অমানুষ হওয়া উচিত নয়। সুতরাং একথা এখন থাক্। ধরণী কি করিল, তাহাই বলি। তেইশ চব্বিশ বৎসর বয়স্ক সুদীর্ঘাকৃতি ঘন অন্ধকারের স্তূপের মত কৃষ্ণবর্ণ পুরুষ ধরণীধর শর্ম্মা

বাড়ীর বাহিরে দুই এক পা ফেলিয়াই অতি দ্রুতপদে সেই সন্ধ্যার আঁধারে-গা ঢাকিয়া গুলির আড্ডার দিকে হন্ হন্ করিয়া ছুটিয়া চলিল। দ্রুতগতির প্রতিরোধ না হয়, এই জন্য ধরণী তাড়াতাড়ি পায়ের প্রায় দেড়হস্ত পরিমিত বহুদিনের রাস্তার ধূলা মাটি জড়ান প্রকাণ্ড ফরমাইসী তালতলার বক্রচঞ্চু চটি জুতাজোড়াটী একটা ক্ষুদ্র ঝোপের আড়ালে ছুড়িয়া ফেলিয়াই ছুটিল। ধরণীর মাথায় খাট খাট চুলের উপরে একটী ক্ষুদ্র আর্কফলা নিজ গৌরবে দণ্ডায়মান। দক্ষিণ হস্তের সুদীর্ঘ বাহুর মধ্যস্থলে লাল রঙ্গের তাগায় করিয়া একটী তাঁবার মাদুলী বান্ধা। মাদুলীতে ভূত প্রেত অপদেবতার ভয় নিবারণের অবধূত দত্ত মহৌষধ ভরা আছে। গলায় সরু তারের মত [illegible]া ধব্‌ধবে একগোছা পৈতে। পৈতের উপর দিয়া এক খানি সরু উড়্‌নীতে, তৈলস্নাত, নিরবচ্ছিন্ন কৃষ্ণবর্ণ, ধনুকবৎ ঈষদ্ বক্র, বৃহৎ বপুখানি আবৃত রহিয়াছে। গতির অত্যন্ত দ্রুততাবশত শর্ম্মার গায়ের উড়নী অল্প অল্প বাতাসেই ফুর ফুর করিয়া উড়িতে লাগিল। ধরণীর উপাধি বস্তুত শর্ম্মা নয়।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

পাঠাগারে।

"মন্থরাদ্যোব ধাতুঃ"।

মেঘদূতম্।

রাত্রি দেড় প্রহরের কিছু বেশী। একটী ষোল বৎসরের বালিকা দ্বিতল গৃহের একটী প্রকোষ্ঠে বসিয়া নিবিষ্ট চিত্তে পড়িতেছে। এক জন পরিণতবয়স্ক পুরুষ, বালিকার কাছেই একটুকু দূরে, পৃথক এক খানি আসনে বসিয়া বিষণ্ণ মনে নানা কথা ভাবিতেছেন। পুরুষ গভীর চিন্তায় নিমগ্ন। পুরুষের বয়স পঁয়তাল্লিশের কম নয়; কিছু বেশী হইবে।

যে গৃহের প্রকোষ্ঠে বালিকা এবং পুরুষ বসিয়া আছেন, ইহা পল্লীগ্রামের একটী শাদা ধব্‌ধবে পর্ব্বতাকার বাড়ীর এক অংশ মাত্র। প্রকোষ্ঠটী খুব বড় এবং প্রশস্ত। চারিদিকে সবুজ রঙ্গ করা খড়খড়ি বিশিষ্ট অনেক বড় বড় জানালা দরজা আছে। প্রত্যেক জানালা দরজার ভিতরেই শাশী

লাগান। কিন্তু সমস্তগুলিই আজ খোলা। প্রকোষ্ঠের নীচের ফুলের বাগান হইতে নানা ফুলের সুরভি বহিয়া বহিয়া দক্ষিণ বাতাস ফুর ফুর করিয়া গৃহস্থিত ব্যক্তিদিগের শরীর শীতল করিতেছে। গৃহের মধ্যস্থলে দীপাধারে পরিষ্কার আলো জ্বলিতেছে। বালিকা ও পুরুষ উভয়েই দীপালোকে বসিয়া পড়িতেছেন। বালিকা মিল্‌টনের "প্যারাডাইস্ লষ্ট্" পড়িতে-ছিল। ইহা বন্ধ করিয়া "শ্রীমদ্ভাগবতম্। দশম স্কন্ধঃ"। পড়িতে লাগিল। প্রকোষ্ঠটী বালিকার পড়িবার ঘর। ঘরের চারিদিকে বড় বড় পুস্তকাধারে সংস্কৃত, বাঙ্গলা, ইংরেজি বহুসংখ্যক ভাল ভাল গ্রন্থ সাজান রহিয়াছে। সমস্তগুলিই ধর্ম্ম ও নীতি সম্বন্ধীয় সাহিত্য, জীবনচরিত, ইতি-হাস এবং ধর্ম্ম গ্রন্থ। কিন্তু সংস্কৃত সাহিত্য অধিক নাই। সংস্কৃত গ্রন্থের মধ্যে সমস্তগুলি সংহিতা, পুরাণ, উপনিষদ্ এবং শ্রীমদ্‌ভাগবদ্‌গীতা, পাণিনী, মুগ্ধবোধ, বিশ্বকোষ, অমরকোষ ও কয়েক খানি ভাল ভাল সাহিত্য ভিন্ন অপর কোন গ্রন্থই নাই। এতদ্ভিন্ন কয়েকখানি পারসী ও আরব্য ভাষার নীতি এবং ধর্ম্মোপদেশ পূর্ণ পুস্তক ও ধর্ম্ম গ্রন্থও আছে। এ সমস্ত গুলিই বালিকার অধীত গ্রন্থাবলী। পুরুষ একখানি ইংরেজি সম্বাদ পত্র পড়িতেছিলেন। পড়িতে পড়িতে সংবাদ পত্রখানি হাটুর উপরে রাখিয়া গালে হাত দিয়া বসিয়া ভাবিতেছেন—"এ পৃথিবীটা যেন বড়ই পুরাতন হইয়া পড়িয়াছে। এ বয়সে আর এ বাহিরের সৌন্দর্য্যে মন সন্তুষ্ট নয়। ইচ্ছা হয় ভিতর হইতে ভিতরে ডু'বে যাই। ভিতরেই সৌন্দর্য্য। বাহিরে শুধু তার ছায়া বৈত নয়? ভিতরে তিনি, ভিতরে আমি, অপার অনন্ত প্রেমসিন্ধুতে আমার বিন্দু প্রেম মিশিয়া অগাধ সৌন্দর্য্য ফুটিয়াছে। এজগৎ সেই প্রেমসিন্ধুর। ইহার সেবাই আমার ব্রত, স্বার্থ। জীবন ত এই জন্যই। জীবন দিয়া যদি জগতেরই উপকার না হইল, তবে এ জীবন-ভার বহিয়া দরকার কি, কিছুই বুঝি না। সুখভোগের জন্য? প্রত্যেক মানুষেরই বাঁচিয়া থাকিবার গাঢ় লালসা দেখিতে পাই। ইহার মূল কি সুখ ভোগ? পরের কথা আমি কি করিয়া বলিব? প্রত্যক্ষ কি দেখিতেছি? জীবনে কি বুঝিতেছি? প্রথম কথা সুখ কি, সে কথাটা আদবেই অমি কিছু বুঝি নাই। এজীবনে সুখ বলিয়া যেখানে গিয়াছি, দুঃখ জঙ্গলে লুক্কায়িত ব্যাঘ্রের মত আমাকে অজ্ঞাত সারে আক্রমন করিয়াছে। একটী মিষ্টান্ন জিহ্বার উপরে দিলাম, এক খানি ভাল কাপড় পরিলাম, একটী ফুলের মালা গলায় দিলাম

ইহা হইতে মনের কিছু ফূর্ত্তি হইল, এসকলকে কি সুখ বলিব? এ সকল সুখ হইলে জগতে দুঃখ থাকিত না। এ সকলত সকলেই করে। বিষাদের সাগরে ভাসিতে ভাসিতে, দুঃখের অতল কূপে ডুবিতে ডুবিতেও মানুষ এসকল করে। এসকল আয়োজন পায়ে দলিয়া, মানুষ কত সময় কাঁদিয়া কাঁদিয়া যাতনার অশ্রুতে বুক ভাসায়। যা হোক্ আমি সুখ দুঃখের দর্শন নিয়া তর্ক বিতর্ক করিয়া কি করিব? আমি কিছু একটা সর্ব্বজনীন বা সার্ব্বভৌম মূল সূত্র আবিষ্কার করিতে নাই পারিলাম, তাতে আমার কি? আমার প্রাণ এ সকল চায় না। সুখ দুঃখ ভুলিয়া কিছু করিতে চায়। ভাই হইয়া প্রাণের টানে ভাই বোনের পা মাথায় করিয়া নাচিতে চায়। ভাই বোনের চরণ সেবা করিয়া কৃতার্থ হইতে চায়। সুসন্তান হইয়া মায়ের পাদপদ্মে পড়িয়া থাকি, ইহাই এই শেষ বয়সের একমাত্র সাধ, একমাত্র আশা। আমার এ ধূলা খেলা, ছেলে খেলা আর ভাল লাগে না।"

"ঋণদায়ে আমি ডুবিয়া গিয়াছি। জন্ম মুহূর্ত্তের বহু দিন পূর্ব্ব হইতেই আমার ঋণ হইতেছিল। আজও ঋণই করিতেছি। আমার দুর্ব্বল প্রাণ জন্মাবধি ঋণে প্রতিপালিত হইয়া হইয়া এমনই হইয়াছে, যেন ঋণ করাই এখন ইহার প্রকৃতি হইয়া দাঁড়াইয়াছে। তাই একটুকু সুখ্যাতিতেই নাচিয়া উঠে, একটুকু অখ্যাতিতে মরিয়া যায়। নিজের পায়ে ভর করিয়া দাঁড়াইয়া এক বারও ঋণ শোধিতে চায় না। ভাইদের, বোনদের ভালবাসা বা বিরাগের দিকে চাহিলে তাহাদের সেবা হইবে না। এ কথা অনেক দিন হইতেই বুঝিয়াছি। ঋণ শোধিবার এ মন্ত্র নয়। পরিবারের ঋণে, মাতৃভূমির ঋণে, জগতের ঋণে আমি ডুবিয়া আছি।"

"পিতৃ দেব স্বর্গে গমন করিয়াছেন। মাতৃ দেবী অনেক পূর্ব্বেই এ জগৎ ছাড়িয়া গিয়াছেন। এত দিন আমি সংসার সম্বন্ধে নিরপেক্ষ ছিলাম। এখন পিতৃদেব তাঁহার ভার ফেলিয়া চলিয়া গিয়াছেন। এত বয়সে একটা নূতন ভার আমার কান্ধে চাপিয়াছে। মারদিকে চাহিয়া এভার বহন করিব। মা আমার প্রাণে যাহা বলিবেন, সে কথা অবহেলা করিয়া একটী পাও ফেলিব না। এখনই চারিদিকে তুমুল আন্দোলন উঠিয়াছে"।

"সৌভাগ্যের বিষয়। পিতৃদেবের বর্ত্তমানেই এই অনাথ বালিকার জন্ত প্রাণের সাধ মিটাইয়া খাটিতে পারিয়াছি। আজ অনাথিনী কুন্তলা আমার এত অল্পবয়সেই ভগবানের কৃপায় অনেকটা পড়াশুনা করিতে সমর্থ হইয়াছে।

এত দিন অন্য কোন ভার ছিল না। এ জীবনের সমস্ত উদ্যম উৎসাহ কুন্তলার পিছনেই ব্যয় করিয়াছি। কুন্তলা আমার অনেক যত্নের ধন। কিন্তু এ দুঃখের জীবনের জন্য আজও অনেক করিবার আছে। পৃথিবীর এক মুষ্টি ধূলা বা সামান্য প্রদীপের আলো, এ কাণ্ডারি-হীন অন্ধকারময় জীবনের পক্ষে প্রচুর নয়। ইহাকে নিত্য ধনে ধনী করিতে হইবে। এ প্রাণে অক্ষয় আলোকের ভাণ্ডার খুলিয়া দিতে হইবে। নতুবা সকলই ব্যর্থ হইবে। জ্ঞান শিক্ষারও শেষ হয় নাই। মনে বড় আশা হয়, ভগবৎ কৃপায়, আমার কুন্তলা একদিন আমার কাজের সহায় হইবে। ভগবান্ আমাকে যে ধূলিমুষ্টির অধিকারী করিয়াছেন, ইহাও তাঁহারই সেবার জন্য বহিতে প্রস্তুত হইয়াছি। নতুবা ইহা দূরে ঠেলিয়া ফেলিয়া পথের ভিখারী হইতে মনে একটুও কষ্ট হইত না।”

পুরুষ গম্ভীর ভাবে বসিয়া, গাঢ় নিবিষ্ট চিত্তে, এই সকল কথা ভাবিতে ছিলেন। চিন্তার চমক ভাঙ্গিবার পূর্ব্বেই, বালিকা সম্মুখের বৈখানি বন্ধ করিয়া ধীরে ধীরে বলিল—“তৈত্তিরীয় উপনিষদের একটী স্থান ভাল করিয়া বুঝিতে পারি নাই।” বালিকা এতক্ষণ অধ্যয়নে নিমগ্ন ছিল বলিয়া বুঝিতে পারে নাই; পুরুষ, পত্রিকা হাটুর উপরে রাখিয়া গম্ভীর ভাবে চিন্তা করিতেছেন। বালিকার কথায় হঠাৎ পুরুষের চিন্তার ঘোর ভাঙ্গিল। কিন্তু পুরুষ বালিকার কথার ঠিক সদুত্তর না দিয়া কেবল ফ্যাল ফ্যাল করিয়া বালিকার মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন। বালিকা বুঝিল, পুরুষ তাহার কথায় ভালরূপ মনোযোগ করেন নাই। কিন্তু বালিকা পুনরায় সে কথা না পাড়িয়া বাম পার্শ্বের স্তূপীকৃত গ্রন্থ রাশির মধ্য হইতে “ওয়ার্ডস্ওয়ার্থ” নামক প্রসিদ্ধ ধার্ম্মিক ইংরেজ কবির কবিতা গ্রন্থ বাহির করিয়া কয়েকটী মধুর ভাব পূর্ণ কবিতা ময় পংক্তি আবৃত্তি করিয়া বলিল “ওয়ার্ডস্ওয়ার্থের এই স্থানের ভাবটী ভাল করিয়া বুঝিতে পারি নাই।” বালিকা জানে, এপুস্তক পুরুষের সাতিশয় প্রিয় গ্রন্থ। ইমার্সন্, কার্লাইল্ কিম্বা ওয়ার্ডস্ওয়ার্থের নামে অথবা পারসিক কবি হাফেজের নাম করিয়া পুরুষকে ক্রমান্বয়ে সাতরাত সাতদিন বসাইয়া রাখা যাইতে পারে। উপনিষদ্ পুরুষের নিকট সর্ব্বাপেক্ষা প্রিয়তম। কিন্তু সে ঔষধে আজ প্রথমে ধরিল না দেখিয়া, বালিকা ঔষধান্তর প্রয়োগ করিল। পুরুষ বালিকার মনের ভাব বুঝিলেন। বুঝিয়া বালিকার মুখের দিকে চাহিয়া একটুকু হাসিলেন। হাসিতে হাসিতে বলিলেন “পত্রিকাখানি পড়িতে পড়িতে আমার মনে একটী চিন্তার

উদয় হইয়াছে। সেই চিন্তাটীই ভাল লাগিতেছে। তুমি হটাৎ আলাপ করাতে কিছু ক্ষতিবোধ কো'রেছি।"

পুরুষের কথা শুনিয়া বালিকার মুখখানি ঈষৎ রক্তাভ হইয়া উঠিল। পুরুষ সে দিকে না চাহিয়া, দেয়ালের দিকে চাহিয়া ঘড়ী দেখিয়া বলিলেন, "উঃ! রাত্রি প্রায় দেড়টা! চল এখন নিজের নিজের স্থানে গিয়া শোওয়া যাক্" এই বলিয়া পুরুষ উঠিয়া চলিয়া গেলেন। বালিকাও তাড়াতাড়ি আসন ছাড়িয়া সেই অধীত গ্রন্থ কয় খানি গুছাইয়া পুনর্ব্বার পূর্ব্বস্থানেই সাজাইয়া রাখিতে লাগিল। বালিকার পৃষ্ঠস্থিত রুক্ষ, সুপরিস্কৃত বিপুল কেশ রাশি জঘনদ্বয় অতিক্রম করিয়া ছড়াইয়া পড়িয়া বায়ুর সঙ্গে ধীরে ধীরে ক্রীড়া করিতে লাগিল। বালিকার অঙ্গ ভূষণ শূন্য। পরিধানে একখানি সামান্য পরিস্কৃত শাদা থানফাড়া ধূতী মাত্র। বালিকা বিধবা নয়।

ধরণীধর পল্লীর নিভৃত বক্ষস্থিত যে শাদা ধব্‌ধবে পর্ব্বতাকার প্রকাণ্ড বাড়ীর ছাদে বেড়াইয়া বেড়াইয়া সন্ধ্যার আঁধারে গা ঢাকিয়া নানা কথা ভাবিতেছিল, পুরুষ এবং বালিকা সেই বাড়ীরই একটী প্রকোষ্ঠে বসিয়া কথা বার্ত্তা বলিতেছিলেন। পুরুষ বাড়ীর অধিস্বামী হরগোবিন্দ রায়।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

ভয়ানক দৃশ্য!

তুলসী গ্রাম একটী পল্লীনামক ক্ষুদ্র সহর। গ্রামে বহুতর ধনী, জমীদার, মহাজন ও শ্রমজীবীলোকের বসতি। তুলসী গ্রামের বন্দর বাঙ্গালার একটী প্রধান বাণিজ্য স্থান। গ্রামে পল্লীর বক্ষোভূষণ উদ্যান, বৃক্ষলতা ও স্বাভাবিক বন জঙ্গলের মাঝে মাঝে পর্ব্বতাকার শুভ্র শোভাময় বড় বড় অট্টালিকার অন্ত নাই। অট্টালিকার পার্শ্বেই গরিবের কুটীর, মধ্যবিত্ ভদ্র লোক ও গৃহস্থের বড় বড় খড়ো ঘরের নিরাড়ম্বর শোভা। গ্রামের পা ধুইয়া, পাড়ের গায়ে উদ্যান রাজির মধ্যস্থিত ছোট বড় শাদা ধব্‌ধবে সোপান শ্রেণীর অলঙ্কার পরিয়া একটী খরস্রোতস্বিনী নদী দৌড়া দৌড়ি করিয়া নিত্য ব্যস্ততার সহিত ছুটিতেছে। নদীর বুকে কখনও পাল ভরা বড় বড় বোঝাই নৌকা উজান ঠেলিয়া গজেন্দ্র গমনে চলিয়া আসিতেছে। কখনও ছোট ছোট নৌকা গুলি স্রোতে গা ঢালিয়া

উল্কার মত ছুটিয়া পালাইতেছে। কোথায়ও কলসী কক্ষে কৃষকের সরলা যুবতী মেয়েটী পালভরা নৌকার মাঝীদের মুখে বারমাসী গানের মধুর তান শুনিয়া মুগ্ধ হইয়া উড়ু উড়ু প্রাণে তীরের ক্ষুদ্র জঙ্গলের পার্শ্বে বনদেবীর প্রতিমা খানির মত নিস্পন্দ ভাবে দাঁড়াইয়া চাহিয়া আছে। কোন ঘাটে বা মধ্যবিধ ভদ্রঘরের অবগুণ্ঠনবতীরা সমস্ত দেহটী ভিজা কাপড়ে মুড়িয়া নাহিয়া নাহিয়া কলসীকক্ষে বাড়ী ছুটিয়াছেন। আবার তাহারই পার্শ্বে গ্রামের প্রশস্ত পাকা রাস্তায়, নদীর ধারে ব্যবসায়ী ও বাজারের লোকেরা, নদীর স্রোতের মত, সেই নিত্য ব্যস্ততার সহিত দৌড়াদৌড়ি করিতেছে। বস্তুত গ্রাম্য শিথিলতা ও নাগরিক ব্যস্ততা এক সঙ্গে মিশিয়া এখানে যেন এক প্রকার নূতন শোভার সৃষ্টি করিয়াছে। তাই বলিতেছিলাম, তুলসী গ্রাম একটী পল্লী নামক ক্ষুদ্র সহর।

গ্রামের এক প্রান্তে বাজারের শেষ ভাগে সাধারণের, শ্মশান ক্ষেত্র। এখানে এক দিকে হিন্দুর চিতার ভস্ম, পোড়া কাঠ, কলসী, বাঁশ, দড়ী, কড়ি, ছেঁড়া কাপড়, ছেঁড়া বিছানা, বালিশের তুলা, যথেষ্ট পরিমাণে ছড়াইয়া আছে। অপর এক স্থানে মুসলমানের পুরাতন কবরগুলির উপরে ও মাঝে মাঝে শ্যাল-কাঁটা প্রভৃতির নানা হিজিবিজি বন জঙ্গল হইয়া রহিয়াছে। জঙ্গলে দলে দলে, পালে পালে শৃগালেরা বাস করে। কাছেই একটী হিন্দুর শ্মশান কালীর বাড়ী, আর একটী মুসলমানের দরগাও আছে। একটী খোলা ভাটী আছে। একটী গুলির আড্ডা আছে। সিদ্ধি বা গাঁজার দরকার হইলে, দরগার ফকির সাহেব বা শ্মশান কালীর বাড়ীর আড্ডাধারী সন্ন্যাসীদের নিকটে বসিতে হয়। আবগারি মহলের দারগার মঞ্জুরি একটী খুচরা বা খরচা বিক্রীর আফিঙ্গ, মদক, সিদ্ধি, গাঁজার দোকানও আছে। গ্রামের উঞ্ছ বেশ্যা পল্লীও পল্লীর এই অংশেই। দীর্ঘাকৃতি মসীবর্ণ পুরুষ ধরণীধর শর্ম্মা সেই গোধূলীর আঁধারে গা ঢাকিয়া দ্রুত পদসঞ্চারে আজ গ্রামের এই বিভাগেই আসিয়া উপস্থিত হইল। শর্ম্মা মহাশয় এ অঞ্চলে একজন বিশেষ পরিচিত লোক না হইলেও, গোপনে গোপনে শর্ম্মার সঙ্গে প্রায় অনেকেরই কিছু কিছু পরিচয় আছে।

ধরণীধর আজ আর কোথায়ও না গিয়া বরাবর একটী বহুদিনের জরাজীর্ণ দশাপন্ন দরজার সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইল। ধরণী দেখিল, দরজাটীর উপরের, নীচের এবং উভয়পার্শ্বের দেয়ালগুলি এত প্রাচীন হইয়াছে

যে, তাহার সমস্ত গায়ে পূর্ব্বকালের সেই ছোট ছোট লোণাধরা লাল রঙ্গের ইটগুলির অনেকটা করিয়া মাথা জাগিয়া উঠিয়াছে। দেয়ালের মাথার উপরে ও সর্ব্বাঙ্গে এক রকম ঘাসের ও ছোট ছোট গাছ পালার ক্ষুদ্র জঙ্গল হইয়া রহিয়াছে। দরজাটী এক জোড়া শত তালি-যুক্ত জীর্ণ পুরাতন কপাটের গায়ে লোহার তালা দিয়া বন্ধ করা। দরজার এক পাশেই একজন মলিন বেশধারী বৃদ্ধ মুশলমান দাঁড়াইয়া যেন কাহারও অপেক্ষা করিতেছে। দরজার সম্মুখে অনবরতই মানুষ আসিতেছে। যে আসিতেছে, বৃদ্ধ তাহাকেই কপাটের তালা খুলিয়া দিয়া ভিতরে যাইতে দিতেছে। বস্তুত বুদ্ধিমান্ ব্যক্তির চোকে বৃদ্ধের এইরূপে কপাটে একটা তালা বন্ধ করিয়া দাঁড়াইয়া থা কাটা শুধুই একটা ভান বলিয়া বোধ হইতেছে। ভিতরের দিক্ হইতেও কপাটে আঘাত পড়িবা মাত্রই পূর্ব্বের ন্যায় বৃদ্ধ কর্ত্তৃক কপাট উদ্ঘাটিত হইতেছে। কপাট খুলিবা মাত্রই ভিতর হইতেও দুই একটী করিয়া লোক বাহিরে চলিয়া যাইতেছে। যে লোকগুলি মধ্যে মধ্যে থাকিয়া থাকিয়া একটী দুইটী করিয়া এখানে অনবরতই স্রোত বহিয়া যাতায়াত করিতেছে, ইহাদিগকে দেখিয়া যেন অন্য কোন সংসারের জীব বলিয়া বোধ হইতেছে। ইহাদের প্রায় সকলেরই অত্যন্ত মলিন, খাট, ছেঁড়া কাপড় পরা। মাথায় তেল বা কালি পোছা নেতার মত এক একখানি শত ছিদ্র ভগ্নবস্ত্রখণ্ড বা নেকড়া জড়ান। শরীর কঙ্কালাবশিষ্ট। গা অত্যন্ত রুক্ষ। সর্ব্বাঙ্গে খড়ি উঠিয়াছে। গায়ে পুরু হইয়া অনেক ময়লা ও কালি জমিয়া আছে। ইহারা কখনও জলস্পর্শ করে,দেখিয়া,এমন বোধ হইতেছিল না। ইহাদের প্রত্যেকেরই চোক দুইটী ভিতরে ঢুকিতে ঢুকিতে এখন কোথায় গিয়া যে পৌঁছিয়াছে, বাস্তবিকই ঠিক করা যেন সুকঠিন হইয়া পড়িয়াছে। মুখগুলি যেন শুকাইয়া শুকাইয়া হাড় কয়খানি মাত্র অবশিষ্ট আছে। অধরোষ্ঠ ভেদ করিয়া মলা দাঁত দুই পাটি সর্ব্বদাই বাহির হইয়া থাকে। সকলেরই গায়ের শ্রী, কাচা লঙ্কা অনেক দিন গরম উননের পিঠে রাখিয়া শুকাইলে যেমন ভাব ধারণ করে, ঠিক্ যেন তেমনই। এই লোক গুলির মধ্যে আর একটী বিশেষত্ব এই যে, হাটিবার কালে প্রায় অনেকেই একটুকু একটুকু পা খুঁড়িয়া খুঁড়িয়া চলিতেছিল। শর্ম্মা দেখিল,যে বৃদ্ধ দরজার পার্শ্বে দাঁড়াইয়া লোক আসা যাওয়ার অপেক্ষা করিতেছে, তাঁহারও চেহারা এবং ভাবভঙ্গী অবিকল একই রূপ। কেবল বৃদ্ধের মুখে আধ পাকা আধ কাচা অল্প কয়েকগাছি লোহার তারের মত শক্ত শক্ত দাড়ী আছে। কিন্তু তাহাও আবার ঠোটের নীচ হইতে

দুই দিকে কাণ পর্য্যন্ত গোড়া কামান। দাড়ীর লম্বা লম্বা শাদা কাল গোড়া গুলি মাথা জাগাইয়া উঠিয়াছে এবং গোঁপ জোড়াটী খাট খাট করিয়া ছাটা। ধরণাধর দরজার সম্মুখে উপস্থিত হইয়া কি যেন বলিবামাত্রই বৃদ্ধ কপাট খুলিয়া দিয়া তাহাকেও নিরাপত্তিতে ভিতরে যাইতে অধিকার দিল।

ধরণীধর শর্ম্মা দরজার অভ্যন্তরে গিয়াই দেখিল,চারিদিকে জরাজীর্ণ পুরাতন প্রাচীরে ঘেরা ক্ষুদ্র উঠানখানি যেন একটী আস্তাকুড় বিশেষ। কালহাঁড়ীর ভাঙ্গা কাণা, ভাঙ্গা খোলা, ভাঙ্গা কল্কের গোড়া, আকের চোক্‌লা, পুরাণ কাঁটালের ভোঁতা, শুক্‌না কলার পাত, গাছের পাতা একত্র হইয়া ভিজিয়া পচিয়া ভয়ানক দুর্গন্ধময় হইয়া আছে। আস্তাকুড়ের উপরে এ রাত্রিকালেও মাচী ভন্ ভন্ করিয়া উড়িতেছে। উঠানে একটী পেয়ারা গাছ, একটী বাতাবীলেবুর গাছ,আর এক ঝার বিচেকলারও গাছ আছে। এ অঞ্চলের মাটীর প্রকৃতি সেত্‌ সেতে না হইলেও ব্যবহারের দোষে উঠানটীর মাটিগুলি ভিজা ও আলকাতরার মত আঠা চট্‌চটে। মাটী ধরণীধরের প্রকাণ্ড পা দুইখানির তলায় অনেক পরিমাণে জড়াইয়া লাগিল। ধরণী দেখিল, প্রাচীরের সঙ্গে সংলগ্ন তিনদিকে খোলা একখানি সোঝা রকমের পাশে অল্প লম্বা দোচালা ঘরে মুখমুখী হইয়া দুই সারি কিম্ভূত কিমাকার লোক বসিয়া আছে। লোকগুলি ঘরের লম্বা দিকের এক পাশ হইতে অপর পাশ পর্য্যন্ত গ্রাম্য পাঠশালার ছেলেদের মত এক এক খণ্ড ছেঁড়া মাদুর বা চেটাই বিছাইয়া সারি বান্ধিয়া বসিয়া রহিয়াছে। দুইটী সারির মধ্যস্থলে প্রত্যেকের সম্মুখেই খাট খাট নল্‌চাবিশিষ্ট এক একটী বড় ডাবাহুকা, বড় বড় লম্বা লম্বা নল মুখে করিয়া, এক একটী কল্কের ভাঙ্গা গোড়া মাথায় পরিয়া, নিজের নিজের স্বাধীনভাবে দাঁড়াইয়া আছে। প্রত্যেক মানুষেরই হাতে এক একখানি জ্বলন্ত টিকার বাতি এবং ডা'ন পার্শ্বে ছোট ছোট নারিকেলের মালায় বা কলার পাতে দুই একখানি আকের টিক্‌লি রহিয়াছে, কিম্বা গুড়ের জলে এক এক খণ্ড শোলা ভিজিতেছে। ইহাই এই স্থানে চাট নামে অভিহিত হয়। ঘরে অন্ধকারে মিশিয়া দুই একটী রেড়ীর তেলের প্রদীপ মিট্‌ মিট্‌ করিতেছে। ধরণী শর্ম্মা দেখিল, দরজার সম্মুখে যে লোকগুলি যাতয়াত করিতেছিল, সেই ভাবেরই কতকগুলি কঙ্কালবিশিষ্ট বিশ্রী মলা কাপড় চোপড় পরা মানুষ অস্পষ্ট আলোকে বসিয়া অনবরত ছোট ছোট কথায় ফিস্ ফিস্ করিয়া কত কি যেন আলাপ করিতেছে। কথার

সুরগুলি যেন নিতান্ত ঢিমা তেতালা গোছের এবং কথাগুলি যেন অতি ধীরে ধীরে, অতি সাবধানতার সহিত ফুটিতেছিল। যেন পদ্মা নদীর চড়ার উপরে অল্প অল্প আন্ধারে গা ঢাকিয়া এক দল বড় পাখী বসিয়া আস্তে আস্তে শব্দ করিতেছে। এক ধারে একটা বিশ্রী কৃষ্ণবর্ণ লোক একটা জ্বলন্ত উননে কি যেন জ্বাল দিতেছিল। এই লোকটাকে কেহ আড্ডাধারী, কেহ বা মাষ্টার বলিয়া এক এক বার ধীরে ধীরে ডাকিতেছিল। ধরণী দেখিল, ঘরে তাহার কয়েকটী পরিচিত লোকও আছে। এখানে মুশলমান, চণ্ডাল, ব্রাহ্মণ এক সঙ্গে বসিয়া গুলি খাইতেছে। এ জগন্নাথ ক্ষেত্রে হিন্দুর হিঁদুয়ানি, মুশলমানের মুশলমানত্ব কিছুরই ভেদাভেদ নাই। ধরণীধর ঘরে পেবেশ করিবামাত্রই প্রথমত সেই বড় পাখীর দলটী আপনাদের অস্পষ্ট স্বরে আলাপ ছাড়িয়া দিয়া, নিতান্ত ভয়ত্রস্ত ভাবে, যেন বিস্ময়ে বিস্ফারিত হইয়া ঘন ঘন চাহনিতে শর্ম্মার দিকে দেখিতে লাগিল। শর্ম্মা দেখিল, যেন পাখীরা উড়িতে উদ্যত হইয়াছে। এমন সময় দলের মধ্য হইতে হঠাৎ একজন বলিয়া উঠিল "কেও দাদাঠাকুর?" শর্ম্মা মহাশয়কে নিম্ন শ্রেণীর লোকদের মধ্যে অনেকেই দাদাঠাকুর বলিয়া ডাকে। "কেও দাদা ঠাকুর?" এই শব্দটা অন্তত মিনিট দশেক কাল সেই প্রকাণ্ড পাখীর দলের প্রত্যেক ব্যক্তির মুখে মুখে ঘুরিয়া ঘুরিয়া ক্রমান্বয়ে ঘন ঘন উচ্চারিত হইতে লাগিল। ধরণীধর সেদিকে কর্ণপাত না করিয়া কেবল ঘরের মধ্যে চারি দিকে চাহিয়া চাহিয়া যেন একটা লোককেই খুঁজিতে লাগিল। ইত্যবসরে প্রমাণ হাতের প্রায় সাড়ে চারি হস্ত দীর্ঘাকৃতি একটী কৃষ্ণ বর্ণ কঙ্কাল দাঁড়াইয়া ঘরের এক কোণ হইতে দীর্ঘ দীর্ঘ অস্থিসার হাতগুলি নাড়িয়া নাড়িয়া ইঙ্গিতে শর্ম্মাকেই ডাকিতে লাগিল। ধরণীও তখন দ্রুতবেগে গিয়া কঙ্কালের কাছেই দাঁড়াইল। কঙ্কালের মাথা ধরণীর মাথারও উপরে আধ হাত উচ হইয়া রহিল। কঙ্কাল ধরণীধরের হাতে একটী কাগজের মোড়ক দিয়া বলিল "এতে এক রকম শাদা গুঁড়ি আছে। দুধে বা ভাতের সঙ্গে মিশাইলে কিছুই টের পাওয়া যাবে না।" ধরণী গুঁড়ি পাইয়া হর্ষোৎফুল্ল চিত্তে শ্রীমান দন্ত দুই পাটি বাহির করিয়া একবারে এক মুখ হাসিয়া ফেলিল। সঙ্গে সঙ্গে কঙ্কালও হাসিয়া হাসিয়া বলিল "দাদাঠাকুর এ গুঁড়ি আমি কাকেও দেই না। তুমি সে দিনটা নাকি পৈতে দিয়ে দুটো হাত জড়িয়ে ধরিলে, তাই দিলাম। কাকেও বলিও না।" কঙ্কালের কথা শেষ হইতে না হইতেই

ধরণী ফিরিয়া যাইবার জন্য পা তুলিল। কিন্তু কঙ্কাল প্রায় তিন হস্তদূর হইতেই হাত বাড়াইয়া ধরণীর কাপড় ধরিয়া বলিল "দাদা ঠাকুর চাটের পয়সা?"

ধরণীর নিকট পয়সা ছিল না। ধরণী তাড়াতাড়ি গায়ের উড়ুনি খানিই কঙ্কালের হাতে ছাড়িয়া দিয়া বলিল "সঙ্গে পয়সা নাই। এই উড়ুনী বেচিলেই চাটের পয়সা হবে।" উড়ুনী পাইয়া কঙ্কাল সন্তুষ্ট চিত্তে ধরণীধরকে ছাড়িয়া দিল। ধরণী তখন অগত্যা কোচার খোঁট খানিই কাঁধে ফেলিয়া ঘর হইতে বাহিরে আসিয়া দ্বারে আঘাত করিল। আঘাত করিবা মাত্রই বাহির হইতে বৃদ্ধ পুনরায় কপাট খুলিয়া দিল। ধরণীধর গুলির আড্ডা হইতে বাহির হইয়া, এবারও আবার ঊর্দ্ধশ্বাসেই শাঁ শাঁ করিয়া ছুটিয়া চলিল। পথে ধরণীধরের সঙ্গে আর কাহারও দেখা হইল না। কেবল গ্রামের খোলা ভাটির মদের দোকানের কাছে যে কতকগুলি ইতর শ্রেণীর লোক ভিড় করিয়া গোল করিতেছিল, তাহাদেরই মধ্য হইতে একটা লোক আসিয়া "দাদা ঠাকুর কোথা যাচ্ছেন?" বলিয়াই ধরণী শর্ম্মার হাত ধরিয়া ফেলিল। ধরণী লোকটাকে দেখিবা মাত্রই চিনিল। লোকটা গ্রামে মজুরি করিয়া দিন দুই চারি আনা উপার্জ্জন করে। কিন্তু ঘরে বৃদ্ধা মা, অন্ধ বাপ, বিধবা বোন্, স্ত্রী ও চারি পাঁচটী শিশু সন্তান আছে। লোকটা খোলা ভাটিতে আসিয়া প্রত্যহই মদ খাইয়া যায়। সুতরাং প্রত্যহ খাটিয়া যাহা কিছু পয়সা পায়, তাহা ইহাতেই ব্যয় করে। স্বভাবদোষে লোকটার এখন আর কাজ কর্ম্মও ভাল যোটে না। তাই পথে ঘাটে মানুষ যাইতে দেখিলেই কাতর হইয়া পয়সা ভিক্ষা করে। দাদাঠাকুরের কাছে কিছু পয়সা ভিক্ষা করিতেই মাতালটা ঢুলিতে ঢুলিতে ছুটিয়া আসিয়াছিল। তাহার দুঃখী পরিবারবর্গের দারুণ অন্নকষ্টের কথা মনে করিয়া বা লোকটার মুখে ভুর ভুর করিয়া মদের দুর্গন্ধ ছুটিতেছিল বলিয়া, বিরক্ত হইয়া নয়, কিন্তু শর্ম্মা নিজের গরজে ছুটিয়াছিল বলিয়াই, একটা ধাক্কাতে মাতালটাকে ধূলিসাৎ করিয়া, যে বেগে চলিয়াছিল, পুনর্ব্বার সেই বেগেই ছুটিয়া চলিল।

ধরণীধরের গায়ে যেমন বল, মনে তেমনই দুঃসাহস। ধরণীধরের বুদ্ধি আছে। কিন্তু সবটুকুই দুষ্টামি মাত্র। ধরণী তুলসী গ্রামের জমিদার হরগোবিন্দ রায়ের শ্যালক পুত্র। ধরণীধর শিশু কাল হইতেই মা হারা হইয়া হরগোবিন্দের সহধর্ম্মিণী সিদ্ধেশ্বরী কর্ত্তৃক প্রতিপালিত হইয়াছে। হরগোবিন্দের অন্নেই শর্ম্মার এত বড় প্রকাণ্ড বপু বর্দ্ধিত। এখনও হরগোবিন্দের

গৃহেই সিদ্ধেশ্বরীর পুত্র স্নেহে শর্ম্মার বাস করা হয়। মহাত্মা হরগোবিন্দের যত্নে প্রথমে ধরণীর লেখা পড়ার উদ্যোগ হইয়াছিল। বর্ণসঙ্কট অতিক্রম করিয়া দুইচারি খানি বাঙ্গালা বই পড়িবার পরেই, বিদ্যালয় আর শর্ম্মারত্নকে কোন রূপেই বক্ষে ধারণ করিতে পারিলেন না। শিক্ষকগণ বাধ্য হইয়া ধরণীধরকে নাম কাটিয়া তাড়াইয়া দিলেন। তদবধি ধরণীর রাজ্য অনন্ত প্রসারিত হইল। ধরণী ধূর্ত্ত, পাষণ্ড, অকৃতজ্ঞ; হরগোবিন্দ ধার্ম্মিক জ্ঞানী ও দয়ালু। লোকে হরগোবিন্দকে মহাত্মা হরগোবিন্দ রায় বলিয়া থাকে। সুতরাং এত দুরাচারিতাতেও দয়ালু হরগোবিন্দের ঘরে ধরণীর অন্নের হানি ঘটে নাই। কিন্তু হরগোবিন্দ যত্নের পরে যত্ন করিয়া, ধরণীর চরিত্র পরিবর্ত্তন সম্বন্ধে নিরাশ হইয়াছেন। সিদ্ধেশ্বরীর মনের ভ্রম এখনও ঘুচে নাই। ধরণী বাড়ীর ছেলের মত হরগোবিন্দের বাড়ী থাকে। ধরণীধর সন্ধ্যার সময় হরগেবিন্দের পর্ব্বতাকার বাড়ীর ছাদে পা-চারি করিতে করিতেই সেই সর্ব্বনাশের মন্ত্র জপিতেছিল। এখন আবার গুলির আড্ডা হইতে হরগোবিন্দের সর্ব্বনাশ করিতেই কাগজে মোড়া শাদা গুঁড়ি নিয়া পুনরায় উর্দ্ধশ্বাসে হন্ হন্ করিয়া সেই দিকেই ছুটিয়া চলিল!

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

ধিক্ এ শিক্ষায়!

দ্বিতল গৃহের সুদীর্ঘ প্রকোষ্ঠে তানপুর, সেতার, এস্রাজ, পাখওয়াজ, মন্দিরা, এক সঙ্গে মিশিয়া সুমধুর তানে বাজিতেছে। বাজানার সঙ্গে সঙ্গে ফ্লুটে হাম্বির, ভূপালি, ছায়ানট, ইমনকল্যান প্রভৃতি রাগিণীর গান হইতেছে। প্রকোষ্ঠের সুচিত্রিত ছাদ হইতে লম্বমান স্ফটিকের ঝাড়ে, সুন্দর নীল রঙ করা, চারি কিনারায় পাতা লতা ফুল আঁকা, জম্‌কান দেয়ালের বুকে বহু সংখ্যক জোড়া দেয়ালগিরিতে কামদার শেজে মোটা মোটা শাদা ধব্‌ধবে চর্‌বির বাতির পরিষ্কার আলো জ্বলিতেছে। আলো সুসজ্জিত প্রকোষ্ঠ ভাসাইয়া চারিদিকের বড় বড় জানালা দরজার উন্মুক্ত দ্বার দিয়া সম্মুখের উদ্যানবক্ষ আলোকিত করিয়াছে। উদ্যানে দেশ বিদেশের নানা প্রকার ফুল ও লতা পাতার গাছ আছে। “অর্কেরিয়া,” “জুনিফার” ইত্যাদি

অষ্ট্রেলিয়া প্রভৃতি দ্বীপজাত নানাবিধ মূল্যবান্ মনোহর গাছ পালাও অনেক আছে। গাছপালার মধ্যে মধ্যে সুন্দর বেদীর উপরে ইটালী দেশীয় কারিকরের নির্ম্মিত অনেক পরী প্রভৃতির বড় বড় উলঙ্গ মূর্ত্তি দাঁড় করান রহিয়াছে। উদ্যানটী যেমন সুসজ্জিত, তেমনই পরিষ্কৃত।

উদ্যানের ঠিক মধ্যস্থলেই উৎকৃষ্ট মারবল পাথরের একটী বড় ফোয়ারা হইতে জল উঠিয়া উঠিয়া চারিদিকে ছড়াইয়া পরিতেছে। প্রদীপের আলোতে উৎসের উৎসারিত জলের কণাগুলি ঈষৎ সিন্দুর মাখান মাখান মুক্তাগুলির মত দেখা যাইতেছে। উদ্যানের মধ্যে এবং ধারে ধারে কৃত্রিম গ্যাসের আলোর ভাবে দীপস্তম্ভের উপরে কাচপাত্র বিশেষে দুই চারিটী "কেরোসিন্" তেলের পরিষ্কার আলো জ্বলিতেছে। প্রকোষ্ঠের অভ্যন্তরে সুচিত্রিত দেয়ালের গায়ে অনেক গুলি দামী রকমের বড় বড় ভাল ভাল "অয়েল পেণ্টিঙ্গ" বা তৈল রঙ্গের ছবি খাটান আছে। ছাদের গায়ে লম্বমান, শাটীনে মোড়া বড় বড় টানা পাখায় জোরে জোরে বাতাস করা হইতেছে। দেয়ালে একটা প্রকাণ্ড ঘড়ীতে টিক্ টিক্ করিয়া বড় বড় শব্দ হইতেছিল। হঠাৎ ঢং ঢং করিয়া আটটা বাজিয়া গেল।

কোন বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি এই স্থানে উপস্থিত মাত্রই, কেহ না বলিলেও, বাগানের মূর্ত্তি গুলি এবং দেয়ালের ছবি কয়খানি দেখিয়াই বুঝিতে পারিবেন, এ গৃহের গৃহকর্ত্তা বা উদ্যান স্বামীর রুচি বড় ভাল নয়। গৃহ মধ্যে স্বয়ং ভবানীশঙ্কর ফ্লুট্ বাজাইয়া তান লয় বিশুদ্ধ স্বরে গাইতেছিলেন। ইঁহার বা পারিষদগণ সঙ্গত করিয়া পাখওয়াজের সঙ্গে সঙ্গে তানপুরাদি বাজাইতেছিল। ভবানীশঙ্কর ফ্লুট্ বাজাইতে বিশেষ সুদক্ষ। ফ্লুট্ কখনও ধীর গম্ভীর রবে বাজিতেছিল, কখনও সুর চড়িতে চড়িতে পঞ্চম সপ্তম ছাড়াইয়া আকাশ ভাসাইয়া দূর দূরান্তরে ছড়াইয়া পড়িতেছিল। সহসা ফ্লুট থামিয়া গেল। ফ্লুট্ থামিলে, উত্তর পশ্চিমাঞ্চল নিবাসী একজন ওস্তাদ বহুক্ষণ গলা বাজি করিয়া, সমস্ত পশু পক্ষীর স্বরের সংক্ষিপ্ত অভিনয় দেখাইয়া, শেষটা সাময়িক রাগিণীতে ধ্রুপদ গাইতে লাগিল। গান গুলির ভাষা বিশুদ্ধ ব্রজবুলি বা ব্রজবুলি মিশ্রিত হিন্দী হইলেও তাহা দেব, নর, যক্ষ, রক্ষের অবোধ্য বলিয়া বোধ হইতেছিল। সুরে ভাষা আছে কি না,তাহা ওস্তাদজিই বুঝিতেছিল, আর যাহারা ওস্তাদের গলাবাজি ভালবাসে, তাহারা বুঝিতেছিল। সুর নানা ভঙ্গিতে ঘুরিয়া, ফিরিয়া, নামিয়া, উঠিয়া, গৃহ আন্দোলিত

করিয়া আকাশে নাচিতে লাগিল। সঙ্গে সঙ্গে মধুর যন্ত্রগুলিতে নানা রকম রঙ্গ বাজিতে বাজিতে মানের যায়গায় অত্যন্ত ও"াদির সহিত একই সঙ্গে মান পড়িতে লাগিল। ভাবুকেরা "হা, হা, হা," শব্দে ঘর দোর ফাটাইতেও কসুর করিল না। গান করিতে করিতে ওস্তাদজিও হাত পা মাথা নাড়িয়া নাড়িয়া, মুখের বিবিধ ভঙ্গি করিয়া, কুস্তি করিতে সাধ্যানুসারে ত্রুটি করিল না। কিন্তু আজ ওস্তাদজির গান কাহারও মনে ধরিতেছে না। ওস্তাদ ক্রমান্বয়ে ছায়ানট ছাড়িয়া নটনারায়ন, নটনারায়ন ছাড়িয়া শেষটা একটুকু বেশী রাত্রি হইতেছে দেখিয়া খাম্বাজ, বাগশ্রী, সাহানা, পাহাড়ী, প্রভৃতি রাগিণীতে বাছা বাছা গান গাইতে লাগিল। তবু কাহারও ভাল লাগিল না। ফ্লুটের গানের পরে ওস্তাদজি আজ আর গান করিয়া সুবিধা করিতে পারিল না। রাত্রি সাড়ে নয়টার পরেই আসর ভাঙ্গিয়া গেল। ঘর নিস্তব্ধ হইল। আলো নিবিল না।

ঘরে ভবানীশঙ্কর আর তারাচাঁদ আসর ভাঙ্গিলেও বসিয়া রহিল। তারাচাঁদ বাড়ুয্যে ভবানীর পিস্‌তোত ভাই। ভবানীর অন্নেই প্রতিপালিত। বাড়ী ভবানীশঙ্করের বাড়ীরই এক পার্শ্বে। ভবানী তারাচাঁদকে তারাদাদা বলিয়া ডাকে। তারা দাদা ভবানীর হিতার্থী।

তারাচাঁদ কখনও কোনরূপ নেশা করে না। ভবানী সন্ধ্যার পরেই এক গ্লাস্ "শেম্পিন্" টানিয়া আসরে বসিয়াছিল। এখন আবার হ'রে "এক্‌স্" নম্বরের এক গ্লাস্ "ব্রাণ্ডি" আনিয়া দিলে ভবানীশঙ্কর একটানে গ্লাসটী খালি করিয়া হ'রের হাতে পুনরায় ফিরাইয়া দিয়া বলিল—"হ'রে, এক বার তামাক দে ত।" হ'রে ভবানীশঙ্কর রায়ের প্রিয় ভৃত্য।

হ'রে তামাক আনিয়া আল্‌বোলার নলটী বাবুর হাতে তুলিয়া দিলে, বাবু ওরফে রাজা ভবানীশঙ্কর রায় বাহাদুর আল্‌বোলার পেচান পেচান সুদীর্ঘ নল হাতে করিয়াই এক খানি "সোফা" নামক সুকোমল সুন্দর আসনের উপরে গা ঢালিয়া শুইয়া পড়িলেন। ভবানীশঙ্কর সংপ্রতি রাজা বাহাদুর উপাধি পাইয়াছেন। তারা দাদা দোয়াত, কলম, কাগজ নিয়া ভবানীশঙ্করের মুখের দিকে তাকাইয়া ছিলেন। ভবানী তারা দাদা বলে বলিয়া, গ্রামের প্রায় লোকেই তারাচাঁদকে তারা দাদা বলিয়া ডাকে। হ'রে তামাক দিয়া সরিয়া গেলে, তারাদাদা ভবানীকে লক্ষ্য করিয়া স্মিতমুখে ধীরে ধীরে বলিলেন "রাত হয়েছে। বল কি কি জিনিসের ফর্দ্দ ধরিতে হবে।"

ভবানী।—"দেখ ত এই একটা ফৰ্দ্দ ধো'রেছি, ঠিক হয়েছে কি না?"

তারা।—"ভাই, বাইশ ডজন বড় মদের বোতল ধো'রেছ? তবে তেইশ মন চাট ধর।"

ভবানী।—"তা হ'লে তোমার কিছু সুবিধা হয় বটে। না? কিন্তু তেইশ মন চাটে কি কবর হবে?"

তারাচাঁদ একটুকু একটুকু মুখ টিপিয়া টিপিয়া হাসিতে হাসিতে বলিল "তা ভাই, বাইশ ডজন শেম্পিন্, ব্রাণ্ডি, পোর্টের বন্দোবস্তের পরে কবরের যোগাড়টা কো'রে রাখা ভাল নয় কি? এত মদ খরচের পরেও বাহিরে নিয়া কবর দেবার বা পুড়িবার লোক থাকিবে কি?"

ভবানী।—"ফুঃ—! আমিত সে দিন ভাল কো'রে মদ ধো'রেছি। এই আট নয় মাস হইল ঠাকুর দাদা মহাশয়ের গঙ্গা প্রাপ্তি হইয়াছে। তাঁকে পুড়িতে গিয়াই প্রকাশ্যে মদ খাওয়াটায় হাতে খড়ি হয়। কলেজে পড়িবার সময় আমাদের বাসায় মেডিকেল কলেজের ছেলেরা আমাকে এক দিন মদ নিয়া কত ঝুলাঝুলি। তখন আমি কতকটা ব্রহ্মজ্ঞানীর মত ছিলাম। তাদিগকে ভৎর্সনা করিয়া "টেম্পারেঞ্চ্" সম্বন্ধে একটা বড় লম্বা "লেক্চার" দিয়া ফেলিলাম। "বি, এ" দিয়া বাড়ী আসিয়া চারি পাঁচ মাস দেশে থাকার পরেই, ভাই, আমার গরম রক্ত ঠাণ্ডা হইয়া গেল। ব্রহ্মজ্ঞানীর মত সত্ সব আমার চুলয় গেল। বুঝেছ, ওসব কিছু না। কেবল চোক বুঝে হু'নে অন্ধকার দেখা বইত নয়? ওতে কিছু নাই। যা হোক্ ঐ চারি পাঁচ মাসের মধ্যেই গোপনে গোপনে হাতে খড়িটা হইয়াছিল। তার পরে আরও তিন বছর চ'লে গেল। ঠাকুর দাদার মৃত্যু টা হঠাৎ হওয়াতে খুড় মহাশয় উপস্থিত থাকিতে পারেন নাই। তিনি কি একটা কাজে পশ্চিমে গিয়াছিলেন। চিতার কাছে বো'সেই ঠেসে একটী বোতল "এক্স্" নম্বর ঠুকে দিলাম। এখন বলত, শৰ্ম্মা একাই এক ডজন তুলতে পারে।"

তারা।—"এখন খুড় মহাশয়কে ত আর ভয় কর না দেখি?"

ভবানী।—"জান, তখন হ'চ্ছিল প্রথম প্রথম। এখন খুড় বাবাই ভয় কো'রে চলেন। বাপের বৈমাত্র ভাই বইত নয়? বিষয় পৃথক্। বাড়ী পৃথক্। তাঁর সঙ্গে ত এখন আমার ভারি খাতির। আমাদের সেই ফন্দিটা খাটিলে জমিদারিটাও—; জান, তারা দাদা? ঠাকুর দাদা মহাশয় সমস্ত

বিষয়টা অর্দ্ধাঅর্দ্ধি ভাগ করিয়া শেষটা দুই গুরুপুত্রের নামে পৃথক্ পৃথক্ বিনামী করেন। এটাও ভালই হ'য়েছে। বুঝেছ ত?"

তারা।—"চুপ্, চুপ্—! আর কি ধরণী তোমার সঙ্গে দেখা কো'রেছে?"

ভবানী।—"সে যোগা'ড়ে ছেলে। যোগাড়ে আছে।"

তারা।—"তাকে যে লোভ দেখিয়াছি, ভয় নাই, কাজ নিশ্চয়ই গুছাবে। বলি এবার কে কে রাজা বাহাদুর উপাধি পাইল?"

ভবানী।—"তিন চারি জন। ঠাকুরদাদার মহারাজা বাহাদুর উপাধিটা ব্যক্তিগত ছিল। সেই টাই খুড় মহাশয়কে দিতে গভর্ণমেণ্ট ইচ্ছুক হইয়াছিলেন। তিনি উপাধির সনন্দ খানি গভর্ণমেণ্টকে ফেরত দিয়াছেন। গভর্ণমেণ্ট "মহা" টা বাদ দিয়া আমাকে শুধু "রাজা বাহাদুর" উপাধি দিয়াছেন।"

তারা।—"মহাই হও, আর রাজাই হও, ফলার নিয়া কথা। ফলারটী ত যুঠিবার যোগাড় হয়েছে। পরশু তোমার বাড়ী ফলার, আমি আজ বৈকাল থেকেই আহার বন্ধ কো'রেছি। রাজা ত হ'লে, রাণীর সাজ গোজ তৈয়ার কর।"

ভবানী।—"তুমি আচ্ছা দাদা বটে। কলির ভাদ্র বউয়ের মুখ পোড়া নৈলে, এমন লঙ্কাপোড়া ভাসুর সব যুঠিবে কেন? কিন্তু রাণীর এখনও বিয়ে হয় নাই।"

তারা।—"সেকি? যার তিন জন রাণী তার রাণীর বিয়ে হয় নাই?"

ভবানী।—"যার তিন রাণী, তারই ত একটীও রাণী না থাকিবার কথা।"

তারা।—"কেন সরমাকে ত তুমি খুব ভালবাস?"

ভবানী।—"বাসিতাম। কিন্তু এখন না।"

তারা।—"তবে কি নূতন কোন রাণী আসিবে?"

ভবানী।—"সম্বন্ধ ঠিক হইয়া গিয়াছে।"

তারা।—"কোথায়?"

ভবানী।—"বাড়ী দূরে। খুব বড় বংশের মেয়ে। ক'নের বাপ গরিব বলিয়া বিয়ে দিতে রাজি হইয়াছে। চ'লে যাওয়া হবে না। মেয়ে বাড়ী আনিয়া বিয়ে করিব।"

ভবানীর কথা শেষ হইতে না হইতে তারা দাদা হাসিতে হাসিতে বলিল, "কামারের কাছে সোণা চুরি? ব্যাপারটা কি বলত?"

ভবানী।—"ব্যাপার সবই জাল। তোমাকে আর খু'লে বলিতে ভয় কি? গোলাপ বাইজি, এখন গোপালচন্দ্র বাড়ুয্যের কন্যা সুখদা সুন্দরী দেবী। হরিধনের বাড়ী আছে।"

তারা।—"এয়ার হরিধন চাটুয্যে? গোপালটা কে?"

ভবানী।—"হরিধনের কি রকম কুটম্ব। বর্দ্ধমানের উদিকে বাড়ী। সেই বাপ সাজিয়াছে। দক্ষিণা, দুইজনকে লইয়া আড়াই হাজার। পাঁচ শত দেওয়া হইয়াছে।"

তারা।—"তোমার কি রকম প্রবৃত্তি? গোলাপ না মুসলমান?"

ভবানী।—"সোণাবাই ছোটবেলায় ওকে কিনে ছিল। ফল কথা, ও বদ্যিদের মেয়ে। একটা দুষ্ট স্ত্রী চুরি কো'রে আনিয়া বেচিয়া যায়। আর জান কি, ভালবাসাতে সবই হয়। তুমি যদি সেক্সপিয়ারের ইংরেজি নাটক পড়িতে, তবে আর একথা বলিতে না। ওথেলো স্থূলোষ্ঠ, স্থূল চর্ম্ম, কৃষ্ণবর্ণ কাফ্রি ছিল। তার রূপে শ্বেতাঙ্গ সভ্য জাতির মেয়ে, ডেস্‌ডিমনার মন ভুলিল কেন ভাই? তোমার একটা জানা কথাই বলি। বলত, ধীবরের মেয়েকে শান্তনু রাজা বিয়ে করিলেন কেন?"

তারা।—"এই বলিলে, যার তিন রাণী তার এক রাণীও নাই। চারিটী হইলে কি একটী হয়?"

ভবানী।—"জান ভাই, আমার বহু বিবাহের মত কখনও ছিল না। জানত, ছোটবেলায় বাবা আর ঠাকুর দাদা ধ'রে বেন্ধে কতকগুলি বিয়ে দিয়ে দিয়েছেন। ও বিয়াই মঞ্জুর নয়।"

তারা।—"আর একটা বিয়ে করিলে কি বহু বিবাহ খণ্ডে যাবে?"

ভবানী।—"তোমাকে যে পাঁচটা দো'ষ দিলেও বুঝাইয়া উঠা ভার। আমিত আর ক্ষেপাটের মত বহুবিবাহ বহুবিবাহ কো'রে "লেক্‌চার" দিয়ে বেড়াচ্ছি না। আমার যা ভাল লাগে, তাই করিতেছি। এত আর বাল্য বিবাহ হচ্ছে না। মেয়ে ত চেনই। খুব বড় মেয়ে। আমিত ছাই দুই দশখানা বইও প'ড়েছি। "বি, এ" টা ত আর ঘোড়ার ঘাস কে'টে পাস্ করিনি? বিজ্ঞান বল, ইতিহাস বল, দর্শন বল, সাহিত্য বল, ধর্ম্ম গ্রন্থ বল, এপেটে সকলই এক আধ টুকু আছে। ক্যাণ্ট বল, বেকন বল, গেঁটে বল, মিল্ বল, কম্‌টি বল, স্পেন্সার বল, ডারুইন বল, বেন্থিয়ান বল, হাক্সলি বল, আর টিণ্ডালই বল, ছাই যারই নাম কর না কেন, কার বই আমি আগাগোড়া পড়িয়া পড়িয়া হজম করি নাই?"

তারা।—" রাগ কো'রনা। বলি চারিদিকে শত্রু। শেষটা জাত না যায়। তোমার খুড় মহাশয় হরগোবিন্দ রায় ভাল মানুষ হইলেও তোমার প্রতি বিরক্ত।"

ভবানী।—" ফুঃ—! জাতটা যেন ভাঙ্গা কলসীর কানা খানা। আমি সলিমের রান্না "ফাউলকারি" খাই, এ কথা কে না জানে? নানা জাতির দশ জন ইয়ার নিয়া মদের চাট খাই। একি গোপনে কো'রে থাকি? আমার পেটে এই অল্পদিনে কিসের মাংস না গিয়েছে? বোধ হয়, স্থলচরের মধ্যে চেয়ার টেবিল গুলি, জলচরের মধ্যে ঘাটের বজরা খানি, আর খেচরের মধ্যে চন্দ্র সূর্য্য তারা ভিন্ন বড় কিছুর মাংস বাকী নাই। কিন্তু ঠাকুর দাদা মহাশয়ের আমলের চেয়েও পূজার বার্ষিক এবার বেশী কো'রে দিয়াছি। দেখ, সেদিন আর্য্য সম্মিলনী সভায় দেশের সমস্ত অধ্যাপক পণ্ডিত এবং সমাজপতিরা আমাকেই সভাপতি করিলেন। টাকা বাঁচিয়া থাকিলে জাত মারে কে? খুড় মহাশয় বিরক্ত থাকেন থাকুন। এদিকে তাঁর পশার নাই।"

তারা।—"যাই কর ভাই, তোমরা ধনে, মানে, জ্ঞানে সব দিকেই বড় লোক, দেশের মুখ-পাত্র, তোমাদের সবই সাজে। তবে সরমা বৌমার কথাটা মনে প'ড়ে বড়ই কষ্ট হইতেছে। আহা! বৌমা রূপে গুণে সত্য সত্যই লক্ষ্মী। তিনি তোমাকে বই জানেন না।"

তারা দাদার এ শেষ কথা আর ভবানীর কাণে গেলনা। ভবানীশঙ্কর অল্প অল্প নেশার ঘোরে নাক ডাকাইয়া ঘুমাইতে লাগিল। তারাচাঁদ ভবানীকে ঘুমাইতে দেখিয়া ভাবিতে, ভাবিতে, ঘরের বাহিরে গিয়া বাড়ীর পথে ধীরে ধীরে পা ফেলিয়া চলিল। সরমার ভাবী দুঃখ ভাবিয়া তারা দাদার দুইটী চোকের কোণে দুই ফোঁটা জল দুলিয়া দুলিয়া অন্ধকারে দুই গণ্ড বহিয়া পড়িয়া গেল। প্রকৃত দুঃখীর দুঃখে যাহার এক ফোঁটা চোকের জল গলিয়া পড়িয়াছে, এজগতে সে ঘোর অপরাধী হইলেও তাহার জীবন ধন্য, জন্ম ধন্য! কি আর বলিব? তারাচাঁদ, আজ তুমিই ধন্য!

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

গ্রামে সাধুর জীবন।

সহরের প্রায় বাড়ীগুলিই হাটের মধ্যস্থলে। দিন রাত গাড়ীর গড়-গড়ানিতে, লোকের কোলাহলে গৃহস্থের কাণ ঝালাপালা হইতে থাকে। উল্‌টিয়া পাল্‌টিয়া কেবল শুধুই পোড়া ইট, কাঠ, পথের ধুলা দেখিয়া দেখিয়া চক্ষু যেন সৌন্দর্য্য ভুলিয়া যায়। ঘরের বাহিরে এক পা ফেলিলেই হাটের গোলে হারাইয়া যাইবার ভয় হয়। চির নিস্তব্ধ শান্তিময় পল্লীর বুক, ইহার তুলনায়, স্বর্গের নন্দন বন। কাঙ্গাল দুঃখীর ভাঙ্গা কুটীর, গৃহস্থের খ'ড়ো ঘর, ছোট কোটা, বড় বড় রাজপুরীর মত পর্ব্বতাকার শাদা ধব্‌-ধবে চুণ কাজ করা ধনীর দ্বিতল ত্রিতল গৃহ, গ্রাম্য প্রকৃতির স্নিগ্ধ সৌন্দর্য্যের মধ্যে এ সকলই কেমন মনোহর দর্শন! প্রভাতে দয়েল ডাকে, ভীমরাজ ডাকে, কোকিল ডাকে, পাপিয়া ডাকে। বেলায় আকাশ রৌদ্রে ভাসিয়া গেলে, বায়ু-চালিত শাদা শাদা অভ্রের কোলে উড়িয়া উড়িয়া চাতক "ফটিক জল, ফটিক জল" বলিয়া ডাকে। দুই প্রহরে মনে উদাস ঢালিয়া ঘুঘু ডাকে। সন্ধ্যার আকাশে পাখীর মালা ভাসিয়া যায়। কাকগুলি দূর দূরান্তর হইতে বাসায় ফিরিয়া আসে। বাদুড়েরা তেঁতুলের ডাল, বাঁশের ঝাড় শূন্য করিয়া দিগ্‌দিগন্তে ছুটিয়া ধায়। পল্লীর সুন্দর বক্ষে এ সকলই কবির কবিতার মত, নিশার সুস্বপ্নের মত মধুর মধুর। এখানে মানুষের ঠেলাঠেলি, ঘেসাঘেসি, ছুটাছুটি, কলহ, কোলাহল কিছুই নাই। বাগান, ঘাট, পথ, সকলই নিস্তব্ধ, নিরাপদ। গ্রামে হাটিতে হাটিতে দেখিবে, গ্রাম্য সুন্দরীরা বনের ফুলের মত যেখানে সেখানে ফুটিয়া আছেন। সে চাহনি, সে হাসি, সে সরল প্রাণ মুহূর্ত্তে হৃদয়ে যে স্বর্গের ছবি আঁকিয়া দেয়, তাহা শত বৎসরেও মুছিয়া যায় না। গ্রাম এই দেবীদিগের পদধূলির অধিকারী বলিয়াই, পুণ্যভূমি, এবং স্বর্গ রাজ্যের সঙ্গে তুলনার জিনিষ। কিন্তু সাধুলোকই গ্রামের সর্ব্বোচ্চ ভূষণ। তুলসী গ্রামের নিভৃত বক্ষে যে প্রকোষ্ঠে বসিয়া গভীর রাত্রি পর্য্যন্ত বালিকা পড়িতেছিল, পুরুষ সংবাদপত্র কোলে করিয়া ভাবিতে-

ছিলেন, তাহার নিম্ন হইতে বাড়িটীর চারিদিক্ ঘিরিয়া বহু দূর বিস্তৃত ফুল ফলের সুন্দর প্রকাণ্ড বাগান। কি ঘর, কি বাগান সমস্তই যেন গৃহস্বামীর নিরবচ্ছিন্ন সুরুচির পরিচয় দিতেছে। বাগানে, ঘরে, পথে কোথায়ও অনাবশ্যক আড়ম্বর দেখাবার জন্য কোনই আয়োজন নাই। একজন বুদ্ধিমান মানুষ সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে কিছুক্ষণ চারিদিকের অবস্থা দেখিলেই বুঝিতে পারেন, যাহাতে হৃদয় মনের কোন না কোন প্রকার সাধুভাব বৃদ্ধি করে না, কিম্বা গূঢ় সাধু উদ্দেশ্যের সঙ্গে যাহার কোনরূপ সম্বন্ধ নাই, এখানে তেমন কিছুই নাই। বাগানে রাশি রাশি নয়ন-প্রীতিকর ফুল, পাতা, লতার গাছ আছে। সাময়িক এবং সর্ব্বসাময়িক নানাবিধ ফুলে সর্ব্বদাই বাগানের বুক ঢাকা থাকে। ফলের গাছগুলিতে সময়ে সময়ে রাশি রাশি সুমিষ্ট ফল ফলিয়া ডাল নোয়াইয়া রাখে। কিন্তু সর্ব্বস্থানেই সুন্দর সুশৃঙ্খলা রক্ষিত হইয়াছে। যেখানে যেটীর দরকার, যেখানে যেটী থাকিলে শোভা বৃদ্ধি পায়, ভাল হয়, সেটী সেখানেই রহিয়াছে। সকল জিনিষের উপরেই যেন গৃহস্বামীর আন্তরিক যত্নপূর্ণ দৃষ্টি আছে বলিয়া বোধ হয়। গৃহের সম্মুখস্থ উদ্যানের স্থানে স্থানে সুন্দর বেদীর উপরে ছোট বড় নানা আকারের কয়েকটী বুদ্ধদেবের নির্ব্বাণসমাধি-নিমগ্ন ভগ্নপ্রায় পুরাতন প্রস্তর মূর্ত্তি স্থাপিত আছে। আর বহু যত্নে সংগৃহীত, মৃত্তিকার নিম্নে প্রাপ্ত কয়েকটী পূর্ব্বকালের আর্য্যশিল্পীদের নির্ম্মিত প্রস্তর মূর্ত্তি, স্তম্ভ ও প্রস্তর ফলকের ধ্বংশাবশেষও যত্নে রক্ষিত হইয়াছে। স্তম্ভ ও ফলকের গায়ে লিখিত প্রাচীন সংস্কৃত শ্লোকগুলি পড়িবার জন্য এক সময়ে যে সিন্দুর লেপা হইয়াছিল, তাহা এখনও বৃষ্টির জলে ধুইয়া ধুইয়া নিঃশেষ হয় নাই। এতদ্ভিন্ন কতকগুলি উলঙ্গ পরীর মূর্ত্তি বা কতকগুলি চিরবন্দী পশু পক্ষী এ বাগানে মানুষের আমোদ বৃদ্ধির জন্য কোথায়ও রক্ষিত হয় নাই।

বাগানে যেমন আড়ম্বর শূন্য সুরুচির পরিচায়ক, নয়ন মনের প্রীতিকর, পরিষ্কারপরিচ্ছন্ন সৌন্দর্য্যরাশি গ্রাম্য নিস্তব্ধতার কোলে ঘুমাইতেছে, প্রকাণ্ড উদ্যানের সম্মুখের পর্ব্বতাকার শাদা ধব্ধবে বাড়ীটীর ভিতরের শোভা তদপেক্ষাও নিরাড়ম্বর। ঐশ্বর্য্যের গৌরব দেখাইতে কাচের বা স্ফটিকের চাকচিক্যময় ঝাড় কিম্বা দেয়ালগিরি এ গৃহে একটীও নাই। অনেক দামের শাটীন বা কিংখাপে মোড়া বড় বড় পাখা, "সোফা" "আমেরিকান চেয়ার" প্রভৃতি বিলাসীর মনোলোভা কিছুই এখানে রক্ষিত

হয় নাই। কেবল প্রত্যেক প্রকোষ্ঠের দেয়ালে মধ্যে মধ্যে দুই চারিখানি সুন্দর ছবি খাটান আছে। তন্মধ্যে দুইখানি গৃহস্বামীর স্বর্গগত মাতৃ-দেবী এবং পিতৃদেবের বড় বড় "অয়েল্‌পেন্টিঙ্গের" ছবি। তাহার পার্শ্বেই গৃহস্বামীর মৃত জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার আর একখানি সুন্দর ছবি। কয়েকজন দেশীয় পরলোকগত এবং জীবিত মহৎ লোকের বড় বড় সুন্দর ছবির সঙ্গে বিদেশীয় মহাত্মা ব্যক্তিদিগেরও অনেকগুলি ছবি রহিয়াছে। যে সকল ব্যক্তি জ্ঞানে, ধর্ম্মে বা হৃদয়ে জগতের পূজ্য ছিলেন, তেমন পণ্ডিত, সাধু এবং কবি বা সতী, সাধ্বীদিগের প্রায় সমস্ত ছবিই এগৃহে গৃহকর্ত্তা যত্নপূর্ব্বক রাখিয়াছেন। স্থানে স্থানে আবশ্যকমত রক্ষিত দুই একটী বড় ঘড়ীতে টিক্ টিক্ শব্দ হইতেছে। কিন্তু এ গৃহের শোভা ইহাই নয়। পর্ব্বতাকার বাড়ীটীর প্রায় আগাগোড়ার সমস্ত প্রকোষ্ঠগুলিই পুস্তকরাশিতে পরিপূর্ণ। পড়িবার ঘরে, বসিবার ঘরে, শোবার ঘরে, খাবার ঘরে, উপরের, নীচের যে ঘরে যাইবে, দেখিবে, সেই খানেই বড় বড় পুস্তকাধারে গ্রন্থরাশি সাজান রহিয়াছে। প্রত্যেক পুস্তকই সুন্দররূপে বাঁন্ধান। পুস্তকের পৃষ্ঠে পুস্তক এবং গ্রন্থকর্ত্তার নাম বড় বড় সোণালী অক্ষরে খোদা আছে। সাহিত্য কি ইতিহাস, বিজ্ঞান কি দর্শন, জ্যোতিষ কি গণিত, যে শ্রেণীর, যে ভাষার গ্রন্থ, তাহা পুস্তকাধারের সম্মুখের কাচাবরণের গায়ে লিখিত রহিয়াছে। বাড়ীটী, সংস্কৃত, বাঙ্গালা, পারসিক, আরবিক, ইংরেজি, লাটিন, গ্রীক, হিব্রু, ফরাসিস্, প্রভৃতি প্রায় আট নয়টী সুপরিচিত ভাষার গ্রন্থরাশিতে সম্পূর্ণ সজ্জিত। পুস্তকাধারের বাহিরের দেয়ালের গায়ে, তক্তার উপরেও রাশি রাশি কাঠের মলাট বিশিষ্ট হাতের লিখা তুলট কাগজের সংস্কৃত প্রাচীন গ্রন্থ অতি যত্নে রক্ষিত হইয়াছে। গৃহস্বামী সুপণ্ডিত হরগোবিন্দ রায়, এই সমস্ত পুস্তকই তন্ন তন্ন করিয়া অধ্যয়ন করিয়াছেন। এখনও যেখানে যে উৎকৃষ্ট নূতন গ্রন্থ বাহির হয়, হরগোবিন্দ তাহা জানিলেই আনাইয়া যত্নপূর্ব্বক পাঠ করেন। পড়া হইলেই আবার যথাস্থানে সাজাইয়া রাখিয়া দেন। গৃহে বা বাগানে আড়ম্বরের মধ্যে পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার একটুকু বেশী বাড়াবাড়ি। গৃহের দেয়ালে কোথায়ও একটীও দাগ বা কালির আঁচড় নাই। গৃহের ভিতরে বা বাগানের কোন স্থানে কোন-রূপ মলা বা আবর্জ্জনার চিহ্নও নাই। যেখানে যে জিনিষটী আছে, তাহাই সুপরিষ্কৃত এবং সুসজ্জিত।

পর্ব্বতাকার বাড়ীর সম্মুখেই বিস্তৃত বাগানের বাহিরে হরগোবিন্দের জমীদারির কার্য্যালয়, একটী সংস্কৃত শিক্ষার চতুষ্পাঠী, একটী বিদ্যালয়, একটী ছাত্রনিবাস,একটী অনাথ-চিকিৎসালয় এবং প্রকাণ্ড অতিথিশালার গৃহ। হরগোবিন্দ রায়ের অতিথিশালায় ক্লান্ত পথিক উপস্থিত হইলেই, জাতি, বর্ণ, মর্য্যাদা নির্ব্বিশেষে সমাদরে গৃহীত হয়। হরগোবিন্দ কখনও কোন বিদ্যালয়ের ছাত্রত্ব স্বীকার করেন নাই। নিজের যত্নে এবং পিতৃদেবের অর্থ সাহায্যে এই পঁয়তাল্লিশ বৎসরের অধিক বয়স পর্য্যন্ত সর্ব্বদাই লিখা পড়া শিখিয়াছেন। বলিতে গেলে, পিতার মৃত্যুর পরে এই অল্প দিন হইল হরগোবিন্দ রায়ের ছাত্রাবস্থা পরিসমাপ্ত হইয়াছে। কিন্তু হরগোবিন্দ এখনও অধিকাংশ সময় পড়াশুনাতেই ব্যয় করেন। সাধু হরগোবিন্দ তুলসী গ্রামের ভূষণ হইলেও সমাজে ভবানীশঙ্করই রাজা।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

গ্রাম্য বালিকা।

পাখীর প্রভাত-সঙ্গীতে এখনও গ্রাম্য স্তব্ধতার ঘুম ভাঙ্গে নাই। কেবল দুই একটী ভাবুক দয়েল গাছের আঁধার মাখা সবুজ পাতার আড়ালে থেকে থেকে, মাঝে মাঝে শীশ্ দিতেছে। অন্ধকার-ঘুমটা আধ আধ ঠেলিয়া রাখিয়া পৃথিবী কেবল মুখখানি খুলিতেছে। কিন্তু এখনও সে মুখে হাসি ফোটে নাই। ঘাসে, পাতায়, ফুলে, লতার আগে বিন্দু বিন্দু শিশির পড়িয়া শোভা পাইতেছে। দক্ষিণ বাতাস রাত্রির চেয়ে আরও একটুকু শীতল হইয়া গাছের পাতা, লতার আগা নাড়িয়া নাড়িয়া ধীরে ধীরে বহিতেছে। বাগানে গোলাপ, যুঁই, গন্ধরাজ, বেল, চামেলী, টগর, জবা, অপরাজিতা অনেক ফুটিয়াছে। দূরে একটা চাঁপা আর একটা বকুলের গাছ হইতে নিঃশব্দে ঝুপ্ ঝুপ্ করিয়া ফুল ঝরিয়া ঝরিয়া ফুলের গায়ে পড়িতেছে। গাছের নীচে এখনও অল্প অল্প অন্ধকার আছে। দুই একটা ভ্রমর ফুলের বাগানে, বকুলতলায় গুন্ গুন্ করিয়া উড়িয়া বেড়াইতেছে। এখনও গ্রাম্য লোকের ঘুম ভাঙ্গে নাই। কেবল এই স্তব্ধতার মধ্যে শাদা ধবধবে পর্ব্বতাকার বাড়ীটীর সম্মুখের বাগানে সেই

ষোল বৎসরের উন্মুক্ত-কেশী বালিকাটী একাকী ধীরে ধীরে ঘুরিতে ফিরিতেছে। বালিকার মুখে শব্দ নাই। কিন্তু অল্প অল্প আঁধারে গা ঢাকিয়া বালিকা কাজ করিতেছে।

বহুদূরবিস্তৃত প্রকাণ্ড বাগানের মধ্যে বালিকার নিজের হাতের তৈয়ারি একটী ক্ষুদ্র ফুলের বাগান আছে। এই বাগান হইতেই বালিকার দ্বিতলস্থ পড়িবার প্রকোষ্ঠে রাত্রিকালে ফুলের গন্ধ মাখিয়া মাখিয়া দক্ষিণ বাতাস ফুর ফুর করিয়া বহিতেছিল। বালিকা বাগানের পুকুর হইতে ছোট একটী ঘড়ায় করিয়া জল বহিয়া বহিয়া নিজের ক্ষুদ্র বাগানের ফুল গাছগুলিরই গোড়ায় গোড়ায় ঢালিতেছে। বাগানের মধ্যে বালিকার ফুল গাছগুলিই সর্ব্বাপেক্ষা সতেজ।

ফুলের গাছগুলিতে জল দেওয়া শেষ হইলে, উন্মুক্তকেশী বালিকা ক্ষুদ্র বাগানটীর মধ্যে ধীরে ধীরে বেড়াইয়া বেড়াইয়া সতৃষ্ণ নয়নে নিজের বহুযত্নে লালিত পালিত গাছগুলি একটী একটী করিয়া দেখিতে লাগিল। হাটিতে হাটিতে হঠাৎ বালিকার পিঠছাওয়া উন্মুক্ত কেশরাশি ও আঁচলখানি এক সঙ্গে একটী লতার নূতন নরম ডগায় জড়াইয়া গেল। বালিকা কোমল লতাটীকে সুন্দর দুই খানি হাতে ধরিয়া যত্নপূর্ব্বক সরাইয়া রাখিয়া এবার পূর্ব্বের চেয়েও সতর্ক হইয়া পা ফেলিতে লাগিল। শেষটা ছোট হাত খানিতে পদ্মফুলের মত বড় একটী সদ্য-বিকশিত বসরা গোলাপের বোঁটাটী আস্তে আস্তে ধরিয়া, বালিকা ধীরে ধীরে আদর করিয়া, তাহাতে একটী চুম খাইল। ফুলে চুম খাইতেই বালিকার মুখ ও কপালখানি ফুলদলের শিশিরে ভিজিয়া গেল। পরিণতবয়স্ক পুরুষ, অস্ফুট আলোকে দ্বিতল-গৃহের বারেণ্ডায় বসিয়া চিন্তা-নিমগ্ন চিত্তে এক এক বার মুখ তুলিয়া তুলিয়া চাহিতেছিলেন। পুরুষ দেখিলেন, গোলাপ ফুলে চুম খাইতে বালিকার মুখখানি যেন বড় গোলাপটীর সঙ্গে এক হইয়া গিয়াছে। বালিকা মুখ তুলিলে, বোধ হইল, এক বোঁটায় দুইটী বসরা গোলাপ ফুটিয়া শিশিরে ভিজিতেছিল, যেন কেহ একটীকে ছিঁড়িয়া নিবিড় কেশদামের সম্মুখে সাজাইয়া রাখিল। দেখিয়া পুরুষ একটুকু হাসিলেন। বালিকাও পুরুষকে দেখিতে পাইল।

পুরুষ, বারেণ্ডায় বসিয়া, কতকগুলি চিঠি সম্মুখে নিয়া, একখানি একখানি করিয়া খুলিতেছিলেন আর পড়িতেছিলেন। একখানি চিঠিতে জলকষ্টপীড়িত স্থানে জলাশয় খননের সাহায্য প্রার্থনা করা হইয়াছে। চিকিৎসালয়,

বিদ্যালয় ও পুস্তকালয়ের সাহায্য প্রার্থনা করিয়াও দশ বার থানি চিঠি আসিয়াছে। অবশিষ্টগুলি, কয়েকটী অনাথ দুঃখী পরিবার ও নিরাশ্রয় বিধবার ভরণ পোষণের সাহায্যের জন্য নানাস্থান হইতে লিখিত হইয়াছে। হরগোবিন্দ, শেষের চিঠিগুলি পড়িতে পড়িতে চোকের জলে বুক ভাসাইতে লাগিলেন।

চিঠিগুলি একে একে পড়া শেষ হইলে হরগোবিন্দ রায়, বিশেষরূপে প্রকৃত অবস্থা জানিবার অপেক্ষায়, কয়েক থানি ছাড়া, অবশিষ্টগুলির উপরে উপরে প্রচুর টাকার অঙ্কপাত করিয়া সহায্য মঞ্জুরের আদেশ লিখিলেন। কিন্তু সকল চিঠিরই উত্তর লিখিয়া স্বাক্ষর করাইতে কর্ম্মচারীকে অনুরোধ করিলেন। পত্রের ভাষা নিজেই লিখিয়া দিলেন।

প্রত্যুত্তরের মর্ম্ম এইরূপ হইল—

"মহাশয়!

আপনাদেরই সেবার জন্য ভগবান্ এই অনুপযুক্ত ভৃত্যের হাতে যৎকিঞ্চিৎ সম্পত্তির ভার দিয়াছেন। আপনাদের ধন আপনাদিগকে উপযুক্ত রূপে বাঁটিয়া দেওয়াই আমার নির্দ্দিষ্ট কাজ। এজন্য বিনয়ের ভাষা এবং কাতরোক্তি প্রকাশ করিয়া কেবল এই সেবককে চোকের জলে ভাসাইয়াছেন। আপনাদের প্রকৃত অভাব ভগবান্ স্বয়ং পূর্ণ করিবেন। আপনাদের সমস্ত মঙ্গলের ভার তাঁহারই উপরে। তাঁহারই আদেশে এই যৎসামান্য অর্থসাহায্য পাঠাইলাম। ইহা কোন সংবাদপত্রে বা লোকের নিকট প্রকাশ করিবেন না। এই শেষ অনুরোধটী যেন অবশ্যই প্রতিপালিত হয়। নতুবা প্রাণে অতিশয় আঘাত পাইব।

অনুগত সেবক

শ্রী——————"

যাহাদিগকে সাহায্য পাঠান হইল না, চিঠির শেষ ভাগে তাহাদিগকে লিখিলেন "যে গুরু-ভার আমার ক্ষুদ্র মস্তকে অর্পিত হইয়াছে, সময়ে সময়ে তাহার উপযুক্ত ব্যবহার করিতে আমার অদূরদর্শী অল্প বুদ্ধি সমর্থ হয় না। তখনই বিবেচনার জন্য সময়ের প্রয়োজন হয়। এজন্য যদি আপনাদের মনে কোনরূপ কষ্ট হইয়াছে, শুনিতে পাই, তবে প্রাণে অত্যন্ত ব্যথা পাইব। কর্ত্তব্যের অনুরোধে বিশেষ অবস্থা না জানিয়া কিছু সাহায্য পাঠাইবার আমার নিয়ম নাই। বিশেষ অবস্থা অবগত হইয়া সত্বরই যাহা হয়, জানাইব। ভরসা করি, এ বিলম্বের জন্য এ সেবককে দয়া করিয়া ক্ষমা করিবেন।"

প্রত্যুত্তরের ভাষা লিখিতে লিখিতে হরগোবিন্দের চোকের ফোঁটা ফোঁটা জলে কাগজ ভিজিয়া যাইতে লাগিল। এই অবসরে ষোল বৎসরের উন্মুক্তকেশী বালিকা কুন্তলা, ফুলবাগান হইতে ধীরে ধীরে উপরে উঠিয়া, পরিণতবয়স্ক পুরুষ হরগোবিন্দ রায়ের পার্শ্বের দিকেই বসিয়া, নিঃশব্দে ঠাকুরদাদার মুখের দিকে একদৃষ্টিতে চাহিয়া, যেন সেই চোকের গলিত জলধারাগুলি একে একে গণিতেছিল। বালিকার খোলা চুলগুলি পৃষ্ঠ ছাইয়া দ্বিতল-গৃহের বারেণ্ডার মে'ঝায় ছড়াইয়া পড়িয়া লুটাইতেছিল। বাতাস তাহা উড়াইয়া উড়াইয়া এক এক বার বালিকার সুন্দর মুখখানি আধ আধ ঢাকিয়া ফেলিতেছিল। কুন্তলা, নিস্পন্দ হইয়া হরগোবিন্দের মুখের দিকেইচাহিয়া রহিল।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

দুঃখিনীর ইতিহাস।

হরগোবিন্দ রায়ের রূপের বর্ণনা করিতে কবির প্রলোভনের কিছুই নাই। হরগোবিন্দ তরুণ যৌবনের শিশিরে ধোয়া প্রভাতকুসুমের সুন্দর সুষমায় বঞ্চিত হইয়া পঁয়তাল্লিশেরও উপরে পা দিয়াছেন। সুগৌরকান্তি, বিশালবক্ষ, আয়তলোচন, উন্নতনাশা অথবা "আল্‌বার্ট ফ্যাশনে" টেড়ি কাটা, "লেবেণ্ডারে" "পমেটমে" মাথা চিকুরজালমণ্ডিত দেহের অনুরূপ একটী ছোট গোল গাল মাথা, ইহার কিছু দিয়াই বিধাতা পুরুষ বেচারি হরগোবিন্দ রায়কে সাজান নাই। আবার অগ্নি দেবের মুখ থেকে কাড়িয়া আনিয়া অর্দ্ধদগ্ধ হাত পা গুলি দেহে সংলগ্ন করা হইয়াছে, কিম্বা তালগাছগুলি সচল হইয়া পথে ঘাটে হাটিয়া বেড়াইলে, কেমন তামাসা হয়, তাহা পরীক্ষা করিতেই, বিধাতা, এই জীবটীকে সৃষ্টি করিয়াছেন, ইত্যাদি ইত্যাদি নানারূপ রসিকতার বাজে খরচ করিয়াও হরগোবিন্দের রূপ বর্ণনার সুবিধা হয় না।

হরগোবিন্দের দেহের সম্পত্তির মধ্যে প্রধান সম্পত্তি একখানি খুব বড় কপালযুক্ত একটী প্রকাণ্ড মাথা। মাথার চুলগুলি খাট খাট, একটুকু খাড়া খাড়া। হরগোবিন্দ দাড়ী গোঁপ কখনও রাখেন নাই। পালানুসারে রীতিমত দাড়ী গোঁপ কামাইয়া ফেলেন। এ বয়সেও হরগোবি-

ন্দের দেহটী খুব সুস্থ, শক্ত এবং বলিষ্ঠ। আবশ্যক মত এখনও অসাধারণ পরিশ্রম করিতে পারেন। অতি শখ করিয়াও, হরগোবিন্দ রায়, জীবনে কখনও থানফাড়া ধুতি বই পরেন নাই। ধুতি খানি মোটা সোটা যাহাই হউক্, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন হইলেই, হরগোবিন্দ বড় সুখী হন। বার মাসই গায়ে বড় থানের ধোয়া ধব্‌ধবে চাদর ব্যবহার করেন। জামা জোড়ার মধ্যে আবশ্যক হইলে, নানা বন্ধন ছন্ধন দিয়া, পূর্ব্বকালের মানুষের মত একটী দেশীয় শাদা কোর্‌তা বা অঙ্গরক্ষা ব্যবহার করিয়া থাকেন। হরগোবিন্দের পায়ের পাদুকার দাম এক টাকা পাঁচ সিকার উপরে কখনও উঠে না। বস্তুত বিশেষ সূক্ষ্মদৃষ্টি না থাকিলে, হঠাৎ কেহ হরগোবিন্দকে দেখিয়া, সেই উদ্যানবেষ্টিত, নানা ভাষার বহুমূল্য গ্রন্থরাশিপূর্ণ, পর্ব্বতাকার বাড়ীর অধিস্বামী, মহাত্মা হরগোবিন্দ রায় মনে করিতে পারে না। বরং আপাতদৃষ্টিতে বাড়ীর কোন সামান্য কর্ম্মচারীই মনে করে। কিন্তু যাহার চিন্তাশক্তি প্রখর, সে, সেই বিনয় ও সৌজন্যের অবতার, প্রতিভার প্রতিমূর্ত্তি, প্রশান্ত ছবিখানি, তেমন যৎসামান্য স্থানে প্রতিষ্ঠা করিয়া, তৃপ্ত হইতে পারে না।

কুন্তলা, হরগোবিন্দের যমবরা দৌহিত্রী। হরগোবিন্দের কৌলিক উপাধি মুখোপাধ্যায়। জমিদার বলিয়াই হউক্, অথবা যে কোন কারণেই হউক্, কয়েক পুরুষ হইতে রায় উপাধি চলিয়া আসিতেছে। কুন্তলার পিতা রামদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, হরগোবিন্দের সমান ঘরের কুলীন বলিয়া, বার্ষিকের পরিমাণ কম হওয়ায়, কখনও কন্যার খোঁজ খপর নেন্ না। কুন্তলার মাতা, কুন্তলাকে একমাসের রাখিয়াই পরলোক গমন করেন। হরগোবিন্দ এবং সিদ্ধেশ্বরী, বহুযত্নে শিশু দৌহিত্রীটীকে প্রতিপালন করিয়া বড় করিয়াছেন। কুন্তলার দুঃখের জীবনের জন্য বাড়ীর সকলেই কাতর। সিদ্ধেশ্বরী, হরগোবিন্দের একমাত্র সহধর্ম্মিণী। সিদ্ধেশ্বরীর একটী কন্যা বই সন্তান হয় নাই। কন্যাকে হরগোবিন্দের পিতাই, রামদাসের সঙ্গে বিবাহ দেন। রামদাসের আরও ছত্রিশটী বিবাহ।

ভবাণীশঙ্করের পিতা, হরগোবিন্দের বৈমাত্রেয় ভাই। হরগোবিন্দের পিতার দুই বিবাহ ছিল। হরগোবিন্দ শেষ পক্ষের সন্তান। হরগোবিন্দের পিতা, দুই স্ত্রীকে, দুই বাড়ীতে পৃথক্ পৃথক্ রাখিতেন। হরগোবিন্দ মাতার বাড়ীরই অধিকারী হইয়াছেন। বাড়ীটী নিজের রুচি অনুসারে সাজাইয়াছেন। হরগোবিন্দের পৈতৃক পুরাতন বাড়ীতে ভবানী

শঙ্কর বাস করিতেছেন। কুন্তলা, যমবরা হইলেও হরগোবিন্দের ঘরের একমাত্র শোভা এবং বাড়ীর সকলের আদরের। হরগোবিন্দ, কুন্তলাকে বাল্যকাল হইতেই ভালরূপ লেখা পড়া শিখাইতে যত্ন করিয়াছেন। ইহাতে বাড়ীর কাহারও আপত্তি হয় নাই।

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

বিষাদের অশ্রু।

মধুমতী, ভবানীশঙ্করের আঠার বৎসরের বিধবা ভগ্নী। মধুর মাথাভরা, পিঠ ও কোমর ছাওয়া চুল। ফুটন্ত গোলাপ ফুলটীর মত হাসিভরা মুখখানি। মুখখানিরই মত বড় বড় লম্বাকৃতি ভাসা ভাসা দুইটী পটলচেরা চক্ষু। মধুর ক্ষুদ্র কপালখানি চুলে ঢাকা। মাঝারি রকমের দেহখানি সুন্দর সোণার প্রতিমাখানির মত সুন্দর। মধু, বেলা দুই প্রহরের পরে, একাকী, মুখ টিপিয়া টিপিয়া, অল্প অল্প হাসিতে হাসিতে বাড়ীর মধ্যের দ্বিতল-গৃহের একটী প্রকোষ্ঠ হইতে এক জোড়া কপাট ঠেলিয়া, মধ্যের খণ্ডের অপর একটী সুদীর্ঘ কুঠরীতে প্রবেশ করিল। কুঠরীতে ঢুকিয়াই, চুপি চুপি পায়ের আঙ্গুলে ভর রাখিয়া ঘর হইতে তাড়াতাড়ি পুনরায় ফিরিয়া বাহিরে আসিল। মধু, যেস্থান হইতে গিয়াছিল, পুনরায় সেই স্থানেই আসিয়া, বলিল "বৌ দিদি, দাদা খাটের উপরে শু'য়ে ঘুমাইতেছে।"

আর একটী কুড়ি একুশ বৎসরের পরম সুন্দরী যুবতী স্ত্রীলোক বিষণ্ণ মুখে প্রকোষ্ঠের বাহিরে দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া, মধুর অপেক্ষা করিতেছিলেন। মধু ফিরিয়া আসিয়া হাসিতে হাসিতে কথা শেষ করিলে, তিনি, মধুর দিকে চাহিয়া বলিলেন, "ঠাকুরঝি, তোমার প্রাণটা বড় কঠিন। আমার কি আর হাসি ভাল লাগে ভাই ?" মধু, অপ্রতিভ হইয়া, বলিল "না বৌ দিদি, হাসি আমার এ পোড়া মুখের কু-অভ্যাস। তোমার দুঃখে পাথর গলে, আর আমার প্রাণ গলে নাই ? এ কাল মুখে ত রোজই হাসি দেখিতে পাও, ভাই। আমি ছাদে বো'সে চুল শুকাইতেছিলাম, তুমি ডাকিলে আর তাড়াতাড়ি ছুটিয়া আসিয়াছি। দেখ, চুলগুলি এখনও ভিজা রো'য়েছে।" এই বলিয়া, মধু বৌ দিদীর চিবুকখানি ধরিয়া, বলিল "কিছু মনে কো'র না ভাই।"

বৌ-দিদী।—"ঘরে আর কাকেও দেখ্‌লি কি ভাই?"

মধু।—"না। দাদা একা উদিকের সবগুলি দরজা বন্ধ কো'রে ঘুমাইতেছে। ভাগগিস্, এ দিকের দরজাটী খোলা ছিল ভাই!"

বৌ।—"আবার যাওনা ভাই। তোমার দাদাকে একবার ডাক না ভাই!"

মধু।—"ভয় হচ্ছে যে।"

বৌ।—"তোমার উপরে ত আর রাগ নাই। যত রাগ আমার উপরেই ত? আমি বরং সো'রে দাঁড়াই।"

মধু।—"দাদাকে কি বলিব?"

বৌ।—"বলিবে, বৌ দিদী তোমার দুটী পায়ে প'ড়ে, তোমাকে একবার বাড়ীর ভিতরে ডাকিতেছে। আর কিছু চায় না। পায়ে প'ড়ে একটী কি কথা বলিবে। আজ তিন মাস তাকে দেখা দেও না। আজ এখানে শু'য়েছ, টের পাইয়া আমাকে পাঠাইয়া দিয়াছে। ঠাকুর ঝি, তোমার দাদা যদি এতে রাগ না করেন, তবে বলিও, অভাগী সরমা, চোকের জল সার করিয়াছে। দিন রাত কাঁদিয়াই কাটায়। সে আর বেশী দিন বাঁচিয়া তোমাকে বিরক্ত করিবে না। কিন্তু————"

এত দূর বলিয়াই, পরম সুন্দরী যুবতী আর কিছু বলিতে পারিলেন না। কেবল নীরবে চোকের জলে মুখ ও বুক ভাসাইতে লাগিলেন। মধুও, আঁচলখানি তুলিয়া চোক মুছিতে মুছিতে চলিয়া গেল। উভয়ের মুখেই আর একটী কথাও ফুটিল না।

নবম পরিচ্ছেদ।

সন্ন্যাসীর চিঠি।

হরগোবিন্দ পাঠাগারে। সিদ্ধেশ্বরী কুঠরীর মে'ঝায় আসনপিড়া করিয়া বসিয়া, অন্যমনে দেয়ালে খাটান একখানি ছবি দেখিতেছেন। ছবিতে "পূর্ণ বর্ষাকালের রাত্রির অন্ধকার ভেদ করিয়া ঝড় বৃষ্টির সময়ে ক্ষিপ্তপ্রায় জাহ্নবীর তরঙ্গের উপরে একটী শ্মশানের জলন্ত অগ্নিশিখার প্রতিবিম্ব ও আলো ছড়াইয়া পড়িয়াছে। সেই আলোকিত স্থানে একখানি বিপন্ন ক্ষুদ্র নৌকা

কয়েকটী আরোহী বুকে করিয়া ঢেউয়ের আঘাতে উঠিতে পড়িতেছে।” এই গম্ভীর দৃশ্য চিত্রিত রহিয়াছে। ছবিখানি তৈল রঙ্গে কুন্তলার হাতের আঁকা।

সিদ্ধেশ্বরী সেকেলে বৌ। এ বুড়া বয়সেও ঘুমটা টানিয়া টানিয়া বেড়ান। এখনও মানুষের সাক্ষাতে স্বামীর সঙ্গে কথা বলিতে সঙ্কোচ বোধ করেন। দৌহিত্রের পৌত্রের বয়সের ছেলেদিগকে দেখিয়াও এক হাত ঘুমটা টানিয়া সরিয়া যান। এখনকার কালের মা সরস্বতীরা যেমন বীণা (হার্ম্মনিয়ান) পুস্তকহস্তে পদ্মাসনের পরিবর্ত্তে বেত্রাসনে বসিয়া, ঝী চাকরকে হুকুম করিয়া করিয়া গৃহকার্য্য করান আর তাম্বুলরাগরঞ্জিতাধরে পার্শ্বস্থিত অপরাসনে উপবিষ্ট বাড়ীর বাবুর সঙ্গে মধুর আলাপ করিয়া সময় কাটান, সিদ্ধেশ্বরীর তেমন ভাগ্য কখনও হয় নাই। স্বামী স্ত্রী উভয়েরই অস্বাভাবিক লজ্জা, ইহার প্রধান কারণ। পিতৃদেব বর্ত্তমানে হরগোবিন্দ দিনের বেলায় কখনও স্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতেন না। বাবা দেখিবেন, এই ভয়ে। কিন্তু হরগোবিন্দের বাবা, হরগোবিন্দের সঙ্গে কখনও এক বাড়ীতে দীর্ঘ সময় বাস করেন নাই। কেবল মৃত্যুর এক বৎসর পূর্ব্বে তিনি হরগোবিন্দের বাড়ী আসিয়া, এই গৃহেই জীবনলীলা সম্বরণ করেন। সিদ্ধেশ্বরী, আজ কালিকার রমণীদিগের মত বিদুষী বা জ্ঞানবতীও নন। সিদ্ধেশ্বরী মুদী দোকানের দোকানদারদের মত অতি কষ্টে কীর্ত্তিবাসের রামায়ণ বা কাশীদাসের মহাভারত পড়িতে পারেন। ভূগোল, ইতিহাস, সাহিত্য, বিজ্ঞান কাহাকে বলে কিছুই জানেন না। কিন্তু যে ছবিখানি দেখিতেছিলেন, কিসের ছবি, তাহা সিদ্ধেশ্বরী জানেন। জাহ্নবীর কূলে জ্বলন্ত শ্মশান, ইহা বাঙ্গালীর মেয়েকে শাস্ত্র পাঠ করিয়া জানিতে হয় না। সিদ্ধেশ্বরী, যখনই লজ্জা সঙ্কোচে, ভয়ে ভয়ে চোরের মত হরগোবিন্দের নির্জ্জন নিস্তব্ধ পড়িবার কুঠরীটীতে চুপি চুপি আসিয়া যৎসামান্য সময়ের জন্য বসিয়া থাকেন, তখনই এই সুন্দর ছবিখানির দিকে এক দৃষ্টে তাকাইয়া তাকাইয়া কি যেন দেখেন। সতৃষ্ণনয়নে, ম্লানমুখে, ছবিখানি দেখেন, আর কি যেন ভাবেন। কত সময় ক্ষুদ্র নৌকার বিপন্ন লোকদের কথা ভাবিতে ভাবিতে সিদ্ধেশ্বরীর চোখে জল আসে।

হরগোবিন্দ চারি দিকে পুস্তক এবং সংবাদপত্ররাশিতে ডুবিয়া বসিয়া আছেন। অথচ পুস্তক বা পত্রিকা পড়িতেছেন না। অত্যন্ত গাঢ় মনোযোগের সহিত একখানি সুদীর্ঘ চিঠি পড়িতেছেন। চিঠিখানি এখনই ডাকে আসিয়াছে।

সিদ্ধেশ্বরী ছবির দিকে চাহিয়া, ভাবিয়া ভাবিয়া একটী সুদীর্ঘ নিশ্বাস ছাড়িয়া, অনেকক্ষণ পরে চোক নামাইলেন। চোক ফিরাইতেই দেখিলেন, হরগোবিন্দ চিঠি পড়িতেছেন। চিঠি পড়িতে পড়িতে, এক এক বার হরগোবিন্দের মুখে মেঘভাঙ্গা রৌদ্রের মত হাসি ফুটিয়া ফুটিয়া অদৃশ্য হইতেছিল। আবার ক্ষণকাল গাম্ভীর্য্যের পরে যেন অমাবস্যার অন্ধকার জমা হইতেছিল। সিদ্ধেশ্বরী আস্তে আস্তে, ধীরে ধীরে, ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞাসা করিলেন "হাগা, ও চিঠি কার গা ?"

হরগোবিন্দ সিদ্ধেশ্বরীর দিকে প্রশান্তভাবে চাহিয়া বলিলেন, " কেন ? চিঠি শুনিতে ইচ্ছা হইতেছে ? তবে গোড়া থেকেই পড়ি, শুন। চিঠি সন্ন্যাসীর।" এই বলিয়া, হরগোবিন্দ চিঠিখানি উল্টাইয়া পড়িতে লাগিলেন—

"প্রিয়দর্শন

এবার হরিদ্বার হইতে ফিরিবার সময় তুলসী গ্রামের ষ্টেশনে নামিয়াছিলাম। এক দিন তোমার রাড়ীতে কুন্তলার আতিথ্য স্বীকার করিয়া বড়ই সুখে ছিলাম। কথাটা পড়িয়া হাসিও না। তুমি বাড়ী ছিলে না। কিন্তু কুন্তলা আমাদিগকে সে অভাব বুঝিতে দেয় নাই। শিষ্যও সঙ্গে ছিল। দেখিলাম, শিষ্যের সঙ্গে কুন্তলার ভারি ভালবাসা হইয়াছে। হঠাৎ কেহ শিষ্যকে আর কুন্তলাকে এক সঙ্গে দেখিয়া পৃথক মায়ের সন্তান মনে করিতে পারে না। শিষ্যের বয়স কুড়ি, কুন্তলার বয়স ষোল। কুন্তলা শিষ্যকে দাদা বলে। শিষ্যও কুন্তলাকে দিদী বলিয়া ডাকে। এটী আমার কাছে যেমন নূতন, তেমনই মধুর বোধ হইল। শিষ্যকে তোমার ওখানে ছুইটী বৎসর মাত্র রাখিয়াছিলাম। তাহাতে শিষ্যের জীবনের অনেক পরিবর্ত্তন হইয়াছে। আবার এই ছুই তিন বৎসর পরে শিষ্য এবার তোমার ওখানে গিয়াছিল। কিন্তু বোধ হইল যেন শিষ্য তোমার পরিবারেরই একজন। সরলা কুন্তলার ব্যবহারে অনেক দিন পরে আবার নিজ গৃহের সুখের সেই অতীত স্বপ্ন আমারও মনকে যেন স্পর্শ করিতেছিল। সেই চারি বৎসর পূর্ব্বে শিষ্যকে রাখিতে তুলসী গ্রামে গিয়াছিলাম। তাহার পরে আর তোমার ওখানে যাইতে পারি নাই। ছুই প্রহরে তোমার বাড়ীর ভিতরের লম্বা ঘরটীতে আমরা আরও প্রায় ত্রিশ চল্লিশটী ভদ্রলোকের সঙ্গে একত্র আহার করিতে বসিলাম। শুনিলাম, প্রতি দিনই তোমার বাড়ীর মধ্যে সব সহিত আশী নব্বই জন লোক আহার করে। কুন্তলা আঁচলে

বুক ও কোমর জড়াইয়া একাই আমাদিগকে পরিবেশন করিল। রাত্রিতে আমরা পৃথক্ খাইলাম। এ বেলা কুন্তলা নিজে আমাদের জন্য সুমিষ্ট অন্ন ব্যঞ্জন রাঁধিয়াছিল। বৌমা পরিবেশন করিলেন। কুন্তলা পাখা নিয়া আহারের সময় আমাকে বাতাস করিতে লাগিল। আমার বোধ হইতে লাগিল, যেন এই সত্তর বৎসর বয়সের বৃদ্ধ সন্তানটীকে স্নেহ দেখাইতে মা আবার বালিকা হইয়া ফিরিয়া আসিলেন। কুন্তলার গায়ে কোনরূপ অলঙ্কার নাই। একখানি সামান্য শাদা কাপড় মাত্র পরে। রুক্ষ রুক্ষ পরিষ্কার চুলের বোঝা পিঠ ছাইয়া, কোমর ছাইয়া, সর্ব্বদাই ছড়াইয়া থাকে। এই চুলের বোঝা নিয়াই কুন্তলা অনায়াসে ছুটিয়া ছুটিয়া কাজ করিয়া বেড়ায়। জিজ্ঞাসা করিলে বলিল, "ছোট বেলা হইতে অভ্যাসের দরুণ ইহাতে আমার কিছুই কষ্ট হয় না। চুল বান্ধিতে আমার ভাল লাগে না।" আমি অনুরোধ করাতে, অসঙ্কোচে, কুন্তলা আমাদিগকে রাত্রিতে মধুরকণ্ঠে সুন্দর তানলয়বিশুদ্ধ সঙ্গীত শুনাইল। একটী সেতার বাজাইয়া আমার কাছে বসিয়া যেন অমৃত ঢালিতে লাগিল। কুন্তলার মুখের ভাব দেখিয়া এবং তাহার সরল ভাষার, সরল সুরের ভক্তিপূর্ণ গানগুলি শুনিতে শুনিতে আমার চোখের জল বন্ধ করিয়া রাখিতে পারিলাম না। কুন্তলার হাতের দুইখানি চিত্রপট উপহার পাইয়াছি। একটীতে বোধি-বৃক্ষের মূলে বসিয়া বুদ্ধদেব দিব্য-জ্ঞান লাভের জন্য সমাধিস্থ রহিয়াছেন। আর একটীতে চৈতন্যদেব প্রেমে উন্মত্ত হইয়া উচ্ছ্বসিত সমুদ্রবক্ষে ঝাঁপ দিতে ছুটিয়াছেন। সমুদ্রের নীলজলরাশি চন্দ্রকিরণে উদ্ভাসিত হইয়াছে। কুন্তলা অনেক রাত্রি পর্য্যন্ত বসিয়া পড়িতেছিল। আমি একবার ধীরে ধীরে কুন্তলার পড়িবার কুঠরীতে গিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, "মা, কি পড়িতেছ?" কুন্তলা আমাকে দেখিয়া তাড়াতাড়ি দাঁড়াইয়া মাথাটী হেট করিয়া বলিল "কঠোপনিষদ্"। কুন্তলা উপনিষদ্ রাখিয়া যোগ-বাশিষ্ঠ পড়িতে লাগিল। শিষ্য আমাদের শুইবার কুঠরীতে বসিয়া মহা-নির্ব্বাণ তন্ত্র পড়িতেছিল। আমি তাহাকে মহাভারতের শান্তি-পর্ব্ব বড় বড় করিয়া পড়িতে বলিয়া একটুকু বিশ্রাম করিতে লাগিলাম। শিষ্য, মহামুনি ব্যাস-দেবের মধুর কবিতাগুলি, অল্প অল্প সুর করিয়া পড়িতে লাগিল। বিশ্রামের পরে শিষ্যকে গ্রন্থ বন্ধ করিয়া শুইতে বলিলাম। আমিও শুইলাম। কিন্তু ভালরূপ ঘুম না হওয়াতে, অনেক রাত্রিতে আবার উঠিয়া ঋগ্বেদের ব্রাহ্মণের ভাষ্যখানি খুলিয়া মনে মনে পড়িতে আরম্ভ করিলাম। শেষ

রাত্রিতে একটুকু ঘুম হইল। পর দিন বিদায়ের কালে কুন্তলা নীরবে চোখের জল মুছিতে লাগিল। শিষ্যও বৌমাকে প্রণাম করিতে গিয়া তাঁহার পায়ে দুই এক ফোঁটা চোখের জল ফেলিল। বৌমা আর কুন্তলা আমাদের পথে খাবার জন্য কিছু জিনিষ প্রস্তত করিয়া রাখিয়াছিল। আমরা তাহা লইয়া প্রস্থান করিলাম। রেলওয়ে ষ্টেশন পর্য্যন্ত একজন দ্বারবান আমাদের সঙ্গে আসিল।

যতক্ষণ পর্য্যন্ত আমাদের চোখের দৃষ্টি চলিল, ততক্ষণ তোমার গ্রন্থ-রাশিভূষিত সুন্দর পর্ব্বতাকার শাদা ধব্‌ধবে গৃহের সিঁড়ীর উপরে ফুল-বাগানের সম্মুখে কুন্তলা দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া এক দৃষ্টে আমাদিগের দিকে চাহিয়া আছে, দেখিতে পাইলাম। সেই আধ আধ সন্ন্যাসিনীর বেশে স্বর-স্বতীর লাবণ্যময়ী প্রতিমাখানি জীবনে আর না দেখিলেও ভুলিতে পারিব না। কুন্তলা চিরদুঃখিনী। কুন্তলাকে ভগবৎকৃপার সাহায্যে যে ধনে ধনী করিতে চেষ্টা করিতেছ, যে সুখের রাজ্য কুন্তলার চক্ষুর নিকট খুলিয়া দিতে জীবন মন অর্পণ করিয়াছ, তাহাতে চিরকৌমার্য্য কুন্তলার পক্ষে কষ্টের কারণ হইবে না, ইহা আমি জানি। তবুও যখন ভাবি, মা-হারা চিরদুঃখিনী কুন্তলা আমার যমবরা, যম কুন্তলার কাম্য বর, শ্মশান কুন্তলার কুসুম শয্যা, চিতার জ্বলন্ত আগুনই ফুটন্ত ফুলরাশি, মৃত্যুই বিশ্রাম গৃহ, তখন চির উদাসী হইয়াও এ পোড়া চোখের জলে বুক না ভাসাইয়া থাকিতে পারি না।

তুলসী গ্রাম হইতে আমরা বিলাসপুরে পৌঁছিয়াছি। এখানকার আভ্যন্তরীণ অবস্থা বড় বিপজ্জনক। খুলিয়া লিখিবার হইলে, লিখিতাম। হরগোবিন্দ, আমি চিরসন্ন্যাসী। তবুও পরের ভাবনা ভাবিয়া ভাবিয়া আমার জীবনটা গেল। আমি এতেও দুঃখী নই। কিন্তু পরের কোন উপকার করিতে পারিতেছি না, এ মনের কষ্ট আর প্রাণে ধরে না। শিষ্যের ভবিষ্যৎ জীবনের আকাশ অন্ধকার এবং ঝটিকায় পূর্ণ। মনের আবেগে অনেক কথা লিখিলাম।”

তোমার শুভাকাঙ্ক্ষী
চিরদুঃখী সন্ন্যাসী

দশম পরিচ্ছেদ।

পাখী পিঞ্জরে বদ্ধ হইল !

যে ঘরে দুই প্রহরের চম্‌চমে রৌদ্রের সময়, টানাপাখার বাতাসে গা ঢালিয়া, খাটের উপরে গোলাপি গোলাপি নেশার ঘোরে ভবানীশঙ্কর ঘুমাইয়া ঘুমাইয়া নানা হিজিবিজি স্বপ্ন দেখিতেছিল, মধুমতী সরমার কাছ হইতে আঁচলের খোঁটে বড় বড় পটলচেরা চোক দুইটী মুছিতে মুছিতে, ধীরে ধীরে সেই ঘরেই পুনর্ব্বার প্রবেশ করিল। উত্তেজনার সময়ে মানুষের প্রাণ লজ্জা ভয় শূন্য হয়। পরম সুন্দরী যুবতী সরমা সুন্দরীর চাঁদমুখখানি গভীর বিষাদের জলে ভাসিতে দেখিয়া, মধুর প্রাণে গাঢ় অন্ধকারে ঝড় তুফান বহিতেছিল। ভয়াতুরা মধু, এবার সাহসের প্রতিমা। সাত চড় মারিলে যে মধুর মুখে কথা ফোটে না, এখন সে মধু মুখরা মেয়ে। মধুর ঠোঁট দুইখানি কাঁপিতেছিল। ক্ষুদ্র গ্রীবা ঈষৎ বক্র হইয়াছিল। পিঠ ছাওয়া, এ'লো মে'লো ভিজা ভিজা চুলগুলি কাঁধের উপরে ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। দুই চোকে জলের ধারা বহিতেছিল। বুক দুড়্ দুড়্ করিতেছিল। মধু ধীরে ধীরে খাটের কাছে দাঁড়াইয়া ডাকিল—"দাদা, দাদা।" প্রথম ডাকে ভবানীর ঘুমের ঘোর ভাঙ্গিল না।

মধু কিছুক্ষণ চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া থাকিয়া তর্জ্জনীতে গাল টিপিয়া, ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া কি যেন ভাবিতে লাগিল। ভাবিতে ভাবিতে আবার ডাকিল "দাদা, দাদা?" ভবানী স্বপ্নে দেখিতেছিল, সখের বাগানে নাচ হইতেছে। মধুর ডাকের উত্তরে একটা অশ্লীল কথা বলিয়া বলিল "কে রে তোর দাদা?" নেশার ঝোঁকে, ঘুমের ঘোরে ভবানী মনে করিতেছিল, নাট্য গৃহের কোন স্ত্রীলোক তাহাকে দাদা বলিয়া ডাকিল।

ভবানীর উত্তর শুনিয়া এবার মধুর মাথায় যেন বজ্রপাত হইল। "এমন দাদার মুখে আগুন" কেবল একবার মাত্র মনে মনে এই বলিয়াই মধু ঘর হইতে বাহির হইয়া চলিল। ভবানী আরক্তিম চক্ষু দুইটী খুলিয়া বলিল—"মধি, কেন এসেছিস?" মধি উত্তর না দিয় দরজার সম্মুখ পর্য্যন্ত আসিল। ভবানী মধুর চোকে জলের ধারা দেখিয়াছিল। কিন্তু মধু কথার উত্তর না দিয়া চলিয়া যাইতেছে

দেখিয়া, ভবানী মর্ম্মে মর্ম্মে চটিল। চটিয়া কর্কশস্বরে বলিল "মধি, দাঁড়া। মরণবাড় বেড়েছিস্ বুঝি? বড় তেজ হয়েছে বটে?" মধুর আর পা সরিল না। মধু দরজার সম্মুখে ভবানীর দিকে ফিরিয়া মুখ হেট করিয়া দাঁড়াইল।

ভবানী।—"তুই কেন এসেছিস্?"

মধু।—"বৌদিদীর একটা কথা বলিতে আসিয়াছিলাম।"

ভবানী চটিয়াই ছিল। বৌদিদীর কথা শুনিয়া আরও চটিল। স্বর আরও কর্কশ করিয়া বলিল "কে তোর বৌদিদী?"

মধু।—"জান না?"

ভবানী।—"জানি। সুখদা। সুখদা বই আমার স্ত্রী নাই।"

মধু, ভবানীর কথার উত্তর না দিয়া, কেবল হেট মুখখানি আরও হেট করিয়া, চোখের জলে বুক ভাসাইতে ভাসাইতে অবাক্ হইয়া রহিল। মধুর মুখে আর কথা ফুটিতেছিল না। বাহিরে যাইতেও পা উঠিতেছিল না। ভবানী মধুকে নীরব দেখিয়া, আবার বলিল "কথা বলিস্ না যে?"

মধু মনে মনে ভাবিতেছিল "আজই ছোট দাদাকে লিখিব। তিনি আমার আর সরমার সম্বন্ধে যাহা হয় একটা পথ করুন্। এ লাঞ্ছনা আর সহিতে পারি না। প্রতি মুহূর্ত্তে আত্ম হত্যা করিতে ইচ্ছা হয়। তিনিই বা কি করিবেন? তিনি লিখিয়াছেন "তোমাদের ভাবনা ভাবিয়া ভাবিয়া আমার পড়া শুনা সব বন্ধ হইয়াছে। কলেজে গিয়া দশ-জনের সঙ্গে মিশিয়া একটুকু ভাল থাকি। কিন্তু বাসায় আসিলেই তোমাদের জন্য ভাবি। কি করিব, কিছুই বুঝি না। "বি, এ," পরীক্ষা ক্রমেই নিকট হইতেছে। এবার পরীক্ষা দিতে পারিব কি না সন্দেহ।" আমরা তাঁরও ক্ষতি করিতেছি। আহা! ছোট দাদার আমার নামও নির্ম্মলচন্দ্র, তিনি কাজেও নির্ম্মলচন্দ্র।" মধু ভবানীর কথার উত্তর না দিয়া মনে মনে এই চিন্তাই উলট পালট করিতেছিল।

ভবানী দুইবার জিজ্ঞাসা করিয়া, একবারও কথার উত্তর না পাইয়া, রাগে বালিশ চাপড়াইয়া বলিল "কথা বলিস্ না যে মধি?" মধুর মুখে এবারও কথা ফুটিল না। মধু কোন কথা না বলিয়া, ফিরিয়া ঘরের বাহিরে যাইতে উদ্যত হইল। এবার ভবানীশঙ্করের ভীষণ মূর্ত্তি দেখিয়া ভয়ে মধুর প্রাণ কাঁপিয়া উঠিল। ঘর হইতে বাহির হইয়া যাওয়াই মধু উচিত মনে করিল। কিন্তু মধু বুঝিতেছিল না, শো'রের গোঁও ফিরে, মাতালের গোঁ

ফিরে না। ভবানী এবার নেশায় কাঁপিতে কাঁপিতে, খাটের উপর হইতে একটী লাফ দিয়া পড়িয়া, মধুকে ঠেলিয়া ফেলিয়া, দরজা বন্ধ করিয়া দাঁড়াইয়া বলিল "কথার উত্তর না দিয়া বড় যাচ্ছিস্ যে?" ভবানীর কথা শেষ হইতে না হইতেই জানালার কাছে মুখ বাড়াইয়া হ'রে বলিল—"আজ্ঞে ডাক হরকরা এই চিঠিগুলি দিয়া গেল।"

ভবানী তদবস্থায়ই দাঁড়াইয়া কাঁপিতে কাঁপিতে, ঢুলিতে ঢুলিতে, টলিতে টলিতে জানালার ফাক দিয়া হ'রের হাত হইতে চিঠিগুলি নিয়া একে একে জামার পকেটে ফেলিতে লাগিল। হ'রে মধুকে ঘরে দেখিয়া বলিল "আজ্ঞে দিদী বাবুর নামে একখানা রেজেষ্টারি চিঠি আছে। ডাক-হরকরা রসিদের জন্য দাঁড়াইয়া আছে।"

ভবানী।—"দেখি চিঠি দে। রসিদ দিতেছি।"

হ'রে চিঠিখানি ভবানীর হাতে দিয়া রসিদের অপেক্ষায় দাঁড়াইয়া রহিল। ভবানী রসিদ না দিয়া চিঠির উপরে নির্ম্মলের হাতের লিখা ও নাম দেখিয়া আগেই তাড়াতাড়ি চিঠি খুলিয়া পড়িতে লাগিল

"৯৩ নং কলেজ ষ্ট্রীট, কলিকাতা, ১৩ই বৈশাখ।

"প্রিয় মধু,

তোমার সুদীর্ঘ চিঠিখানি পাইয়া পড়িতে পড়িতে তাহা চোকের জলে ভিজাইয়াছি। বৌদিদীর দুঃখের কথা ভাবিয়া বুক ফাটিয়া যাইতেছে। তোমার মনেও সুখ নাই, বুঝিয়াছি। তোমাদের জন্য, কি করিব, বুঝিতেছি না। সরমা পতি-পরায়ণা। তিনি প্রাণ গেলেও বাড়ী ছাড়িয়া, দাদার মনে কষ্ট দিয়া স্থানান্তরিত হইতে সম্মত হইবেন না। তোমাকে ওখান হইতে শীঘ্রই আনিয়া, কলিকাতার কোন বন্ধুর পরিবারে রাখিয়া দিব মনে করিয়াছি। দাদা গোলাপীকে সুখদাসুন্দরী নাম দিয়া, বিয়ে করিয়া নির্ব্বিঘ্নে আছেন, একথা শুনিয়া অবধি আমি বুঝিয়াছি, তিনি দেশের মধ্যে যাহা করিবেন, তাহাই সাজিবে। দাদাকে জানাইয়া তোমাকে আনা কঠিন হইবে। তুমি প্রস্তুত থাকিবে। ২৮শে বৈশাখ রাত্রি প্রভাতের পূর্ব্বে নিশ্চয়ই তোমাকে কলিকাতায় পৌঁছাইব। আমার বুকে কেন যেন কয়েকদিন হইতে একটুকু একটুকু ব্যথা হইয়াছে। মনও বড় খারাপ।"

তোমার ছোট দাদা
শ্রীনির্ম্মলচন্দ্র রায়

বিপদের উপর বিপদ! ভবানীকে চিঠি খুলিয়া পড়িতে দেখিয়াই, মধুর গা কাঁপিতেছিল। চিঠি পড়িতে পড়িতে ভবানীর মুখ রক্তবর্ণ হইয়া উঠিল। চোক দিয়া আগুন বাহির হইতে লাগিল। মধু, তবুও দুই তিনবার মৃদুস্বরে বলিল, "আমার চিঠি তুমি পড় কেন? আমার চিঠি আমাকে দেও।" ভবানী কয়েক মিনিটের মধ্যেই চিঠি পড়া শেষ করিয়া রাগে জ্বলিতে জ্বলিতে বলিল—"মধি, তোর এত বড় আস্পর্দ্ধা? আচ্ছা দেখি এখান থেকে কে তোকে এক পা বাহির করিতে পারে।" এই বলিয়াই ভবানী হ'রের দিকে চাহিয়া বলিল "হ'রে, কতকগুলি তাল চাবি আন্ তো?" হতভাগিনী মধু বুঝিল, এবার তাহার চরম দুর্দ্দশা ঘটিবে। মধু আর নীরব থাকিতে পারিল না। মধু চীৎকার করিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে ভবানীর পায়ের উপরে পড়িয়া বলিতে লাগিল "দাদা, আমি অনাথা বিধবা। আমি তোমার ছোট বোন্। এবারটা মাপ কর।" ভবানীর রাগ যেন আরও জ্বলিয়া উঠিল। ভবানী রোরুদ্যমানা মধুমতীকে একটী পদাঘাতে দূরে ফেলিয়া হ'রের হাত হইতে তালা চাবি নিয়া একে একে সমস্তগুলি দরজার কপাটে তালা বন্ধ করিল। তালা আঁটা হইলে, চাবির থলেটী পকেটে ফেলিয়া চলিয়া গেল। ভবানীর পায়ের আঘাত বজ্রের আঘাতের মত মধুর বুকে লাগিয়াছিল। মধু মূর্চ্ছিতাবস্থায় কারাবন্দিনী হইল। দেয়ালে লাগিয়া মধুর মাথা কাটিয়া রক্ত পড়িতেছিল। সেই রক্তে এ'লো মে'লো চুলগুলি ভিজিয়া মে'ঝে ভাসিয়া যাইতে লাগিল!

দ্বিতীয় খণ্ড।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

ভীষণ প্রতিজ্ঞা!

শ্রাবণ মাসের শেষভাগে সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বেই অতি প্রত্যুষে একজন পঞ্চান্ন কি ছাপ্পান্ন বৎসর বয়সের পুরুষ একটী ক্ষুদ্র পাহাড় শ্রেণীর ধারে ধারে, জঙ্গলাকীর্ণ পথ ধরিয়া, ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া, ভাবিতে ভাবিতে একাকী হাটিয়া

আসিতেছিলেন। পুরুষের পরিচ্ছদাদি দেখিয়াই বুঝা যাইতেছিল, ইনি একজন অঘোরপন্থিদলের লোক। পুরুষ গৃহ ত্যাগী ব্রহ্মচারী সন্ন্যাসী।

ব্রহ্মচারী ক্রমান্বয়ে কয়েকটী ছোট ছোট পাহাড় ছাড়াইয়া, একটী বড় জঙ্গল পার হইয়া, এক বিস্তীর্ণ প্রান্তরে আসিয়া পড়িলেন। মাঠের প্রান্ত হইতেই পরপারে, বহুদূরে উচ্চ প্রাচীর বেষ্টিত এক প্রাচীন সৌধ শ্রেণীর চূড়া দেখা যাইতেছিল। অতি প্রাচীন সৌধমালা, আকাশের গায়ে লম্বমান মেঘরাশির মত বোধ হইতেছিল। তখন দুই একটী করিয়া প্রভাতকিরণ সৌধচূড়ায় ভাঙ্গিয়া ভাঙ্গিয়া পড়িতেছিল। ব্রহ্মচারী, প্রান্তরের মধ্যবর্ত্তী একটী প্রাচীন, উচ্চ, প্রশস্ত রাস্তা ধরিয়া, ধীরে ধীরে ভাবিতে ভাবিতে সেই পুরাতন প্রাচীরবেষ্টিত অট্টালিকারাশির দিকেই অগ্রসর হইতে লাগিলেন। অট্টালিকাগুলি ক্রমেই স্পষ্টতররূপে চোখে ভাসিতে লাগিল।

জীর্ণ শীর্ণ প্রাচীন সৌধমালার চারি দিকের ভগ্নপ্রায় উচ্চ প্রাচীরের নীচেই প্রকাণ্ড গড়খাই। অতি প্রাচীন বলিয়া, গড়খাইটীও স্থানে স্থানে শুকাইয়া গিয়া জঙ্গলে ঢাকা পড়িয়াছে। জঙ্গল প্রাচীরের গায়ের জঙ্গলে মিশিয়া এক হইয়া গিয়াছে। ব্রহ্মচারী নানা কথা ভাবিতে ভাবিতে অন্যমনে যে দিক্ হইতে এই প্রাচীন সৌধরাশির দিকে আসিতেছিলেন, তাহার সম্মুখেই একটী বহুকালের জীর্ণপ্রায় ইষ্টকনির্ম্মিত সেতু। সেতুটী গড়খাইয়ের উপরে নির্ম্মিত। সেতুর সম্মুখে ছোট ছোট, লাল লাল ইটের গায়ে প্রাচীনকালের খোদিত নানা দেব, দেবী, পরী, মানুষ ও পশু পক্ষীর ছোট ছোট মূর্ত্তি এবং লতা, পাতা, ফুলবিশিষ্ট একটী প্রকাণ্ড ফটক। অতি পুরাতন বলিয়া, ফটকের প্রকাণ্ড উচ্চ দেয়াল, স্থানে স্থানে, অল্প অল্প ফাটিয়া গিয়া, তাহা হইতে বট অশ্বত্থের চারা বাহির হইয়াছে। ফটকে, আধ সিপাহী গোছের সাজ গোজ পরিয়া, একজন গোরখপু'রে লোক, সঙ্গিনপরান বন্দুক কাঁধে ফেলিয়া, ধীরে ধীরে পা-চারি করিতেছে। ফটকের ভিতরের দিকের প্রাঙ্গনে, ঠিক ফটক বরাবর একটী বাদসাই আমলের কামান পাড়া রহিয়াছে। অযত্নে কামানটীর গায়ে ম'র্‌চে পড়িয়া আছে। শ্যালকাঁটা, বনমূলা প্রভৃতি নানা হিজিবিজি, ছোট ছোট বন জঙ্গলে ঢাকা পড়িয়া, কামানের দেহটী প্রায় অদৃশ্য হইয়া রহিয়াছে।

ব্রহ্মচারী ফটকের সম্মুখে উপস্থিত হইলে, প্রহরী তাড়াতাড়ি পথ ছাড়িয়া

দিয়া যথারীতি অভ্যর্থনা করিয়া, একপাশে সরিয়া দাঁড়াইল। প্রহরী জানে, ব্রহ্মচারী রাজশ্বশুর নন্দনগিরি। নন্দনগিরি চিন্তানিবিষ্ট মনে পূর্ব্বের মতই ভাবিতে ভাবিতে, ক্রমান্বয়ে প্রাচীন ভগ্নাবশিষ্ট প্রকাণ্ড পুরীর চারি পাঁচটী প্রহরী রক্ষিত ফটক পার হইয়া, একটী বড় মহলের মধ্যে প্রবেশ করিলেন। এ মহলের ফটকে, কয়েকটী স্ত্রীলোক পাহারা দিতেছিল। তাহারাও, রাজশ্বশুরকে সসম্ভ্রমে অভ্যর্থনা করিয়া, নিরাপত্তিতে দ্বার ছাড়িয়া দিল।

মহলের মধ্যের ঘর দরজাগুলি সুন্দর বাসের উপযোগী এবং পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। এখানে শতাধিক পরিচারিকা নানা কাজে ব্যস্ত রহিয়াছে। কেহ রান্নার কাজ করিতেছে। কেহ বাট্‌না বাটিতেছে। কেহ মৎস্য বা তরকারি কুটিয়া কুটিয়া সম্মুখস্থ পাত্র বোঝাই করিতেছে। কেহ কাপড় নিয়া দাঁড়াইয়া আছে। কেহ সুগন্ধি তৈল-পাত্র হাতে করিয়া অপেক্ষা করিতেছে। কেহ ফুলে ফুলে একত্র করিয়া ফুলের মালা, ফুলের অলঙ্কার প্রস্তুত করিতেছে। পরিচারিকাদের মধ্যে আবার দুই শ্রেণী। এক শ্রেণীর সেবিকাগণ কিছু উচ্চ দরের। ইহারা দেখিতে সুন্দরী এবং অপেক্ষাকৃত মূল্যবান সাজসজ্জায় সজ্জিত। এইরূপ বার তেরটী যুবতী, বহুমূল্য বেশভূষায় অলঙ্কৃত একটী প্রৌঢ়া সুন্দরীকে চারি দিকে ঘিরিয়া বসিয়া বহুযত্নে পরিচর্য্যা করিতেছে। সুন্দরী মণিমুক্তাজড়িত অলঙ্কাররাশির উপরে, হীরার কুচি ও খাটি সোণার জড়াও কাজ করা বেগুনী রঙ্গের একখানি বহুমূল্য বারাণসী শাড়ীতে, ফুটন্ত স্বর্ণচম্পক রাশির মত সুন্দর লাবণ্যরাশি আবৃত করিয়া, একখানি, হীরা ও সোণার পাতা লতা ফুলের কাজকরা, মুক্তার ঝালরযুক্ত, উজ্জ্বল নীলরঙ্গের মসৃণ মখমলে মোড়ান রূপার চৌকি বা ক্ষুদ্র পালঙ্কের উপরে বসিয়া সুগন্ধি তাম্বুলরাগে অধরোষ্ঠ রঞ্জিত করিতেছেন। সুসজ্জিত সেবিকাদের মধ্যে কেহ সুন্দরীর মেঘরাশির মত সুগন্ধি চুল রাশি নিয়া সোণার চিরুণীতে ধীরে ধীরে আঁচড়াইয়া, একটী একটী করিয়া চুলের জড়া ভাঙ্গিতেছে। কেহ রূপার ডাটাবিশিষ্ট ময়ুরপুচ্ছের বড় পাখা নিয়া ধীরে ধীরে বাতাস করিতেছে। সেবিকাগণ সকলেই, সুন্দরীর আজ্ঞা পালনের জন্য যেন ব্যগ্র হইয়া রহিয়াছে। নন্দনগিরি মহলের মধ্যে গিয়া, কুন্তি, বলিয়া ডাকিবামাত্র, তাড়াতাড়ি সুন্দরী আসিয়া তাঁহার পায়ে পড়িয়া প্রণাম করিয়া সম্মুখে দাঁড়াইয়া বলিলেন — "আমি পথ চাহিয়া আছি। মনে কত কথা জমা হইয়া আছে। এই মাত্র ভাবিতে ছিলাম, "বাবা কবে আসিবেন? কবে এ সব কথা বলিয়া মনের ভার কমাব?"

ব্রহ্মচারী।—"মা তোমার সঙ্গে আমারও অনেক কথা আছে। চল একটা নির্জ্জন ঘরে বসা যাক্।"

কুন্তী।—"আসুন, সম্মুখের এই ঘরেই বসি।"

কুন্তীর কথা শেষ হইলে,নন্দনগিরি সম্মুখের সুসজ্জিত প্রকোষ্ঠে প্রবেশ করিয়া, হস্তিদন্তনির্ম্মিত একখানি পালঙ্কের উপরে বসিলেন। কুন্তী সম্মুখে বসিলেন।

নন্দনগিরি।—"নূতন খপর কিছু আছে ?"

কুন্তী।—"এত দিন মুখে মুখে ত্যজ্য স্ত্রী ছিলাম। এখন লেখা পড়া ঠিক হইয়া গিয়াছে। বড় রাণী আর আমি ত্যজ্য হইলাম। ছোট রাণী পাঠরাণী হইলেন। ছোট রাণীর ছেলে যুবরাজ হইল।"

কথা বলিতে বলিতে কুন্তীর দুই চোক জলে ভাসিয়া বান বহিল। নন্দনগিরির মুখের উপরে মেঘ ভাঙ্গিয়া পড়িল। মেঘে মধ্যে মধ্যে বজ্রাগ্নি জ্বলিয়া জ্বলিয়া উঠিতে লাগিল। বর্ষণ হইল না। নন্দনগিরি, গম্ভীর ভাবে বলিলেন " মা, কাঁদ কেন ? মাতৃহীন হইয়াছ। স্বামি-হীনও হইলে। পিতৃ হীন ত হও নাই। তোমাকে আজ হইতে বিধবা মনে করিব। পিতা বিধবা মেয়ের ভার নিতে অক্ষম নয়। তবে মনের শান্তি ? তাহাতে জলাঞ্জলি দেও। তোমাকে সুখী করিতে বহু চেষ্টা করিয়াছি। এখন দেখিতেছি, সকল চেষ্টাই তোমার দুঃখের কারণ হইয়াছে। তোমার আমার মনের শান্তি আর ইহলোকে নাই। আজ হইতে এই মন্ত্রে দীক্ষিত হও "প্রতিহিংসা, প্রতিহিংসা সার !" এই মন্ত্রই দিন রাত জপ কর। দেখি, ছিন্নমস্তা অভিলাস পূর্ণ করেন কি না। কুন্তি, তুমি ঘোড়ায় চড়িতে পারিবে ত ?"

কুন্তী।—"বাবা, আপনি কি ভুলিয়া গিয়াছেন ? আপনি ত, মা মরিয়া গেলে, সোণার সংসার পায়ে ঠেলিয়ে, আমাকে পাঁচ বছরের নিয়ে ব্রহ্মচারী সন্ন্যাসী হ'য়ে অঘোরপন্থীদের দলে মিশিয়াছেন। বুড়া ব্রহ্মচারী ঠাকুর অভয়ানন্দ গিরির সঙ্গে আমাকে নিয়ে কত পাহাড়ে পর্ব্বতে বনে জঙ্গলে বেড়াইয়াছেন, তাহা কি এখন মনে নাই ? আমি বার তের বৎসর পর্য্যন্ত বেটা ছেলের সাজে সাজিয়া আপনার সঙ্গে সঙ্গে বেড়াইয়াছি। যে ঘোড়ায় আপনার জিনিষ পত্র থাকিত,প্রায়ই ত আমি সেই ঘোড়াটার পিঠে চড়িতাম। শেষটা মণিপুরে বেড়াইতে গিয়া আপনি আমাকে একটী ভাল ছোট ঘোড়া কিনিয়া দিয়াছিলেন। সেই থেকে আমি বেশ ঘোড়ায় চড়িতে শিখি।"

নন্দনগিরি। "না, মা ! ভুলি নাই। তবে আজ কুড়ি একুশ বৎসর

হইল, এই বিলাসপুরের অন্তঃপুরে আসিয়াছ। মনে আছে মা? ছোট রাণীর আর তোমার একই বৎসর বিবাহ হয়। তোমারও বয়স তের বছর ছিল, ছোট রাণীরও বয়স তের বছর ছিল। তোমরা দুইজনই সমান বয়সের। দুই মাস আগে তোমার বিবাহ হয়। বিবাহের তিন মাস মাত্র আগে আমি নানা কৌশল করিয়া তোমাকে মহারাজের খাস কামরার সেবিকা মহলে ভর্ত্তি করিয়া দিয়াছিলাম। তুমি রাজ পরিবারের দৌহিত্রী,এ কথা রাজা টের পাইয়া অবধিই তোমাকে বড় ভালবাসিতে আরম্ভ করিলেন। ছোট রাণীকে বাহির হইতে আনা হয়। সুরমা, লীলার বোন্। বড় রাণীই যোগাড় যন্ত্র করিয়া নিজের বোন্‌কে ঘরে আনিয়া তোমাকে জব্দ করিতে চাহিয়াছিলেন। এখন নিজেই জব্দ হইয়াছেন। লীলাবতীর বুদ্ধিটা বরাবরই কম। সুরমা, চিরকালই ঝানু। বিধাতা তোমাদের দুই জনকে সন্তান দিলেন না। কিন্তু বিবাহের বৎসর ফিরিতে না ফিরিতেই সুরমার পুত্র সন্তান হইল। শশাঙ্কশেখরের বয়স এই কুড়ি বৎসর। সুরমারও কিন্তু একটী বই আর সন্তান হইল না। আমি ত মা পূর্ব্বেই বলিয়াছিলাম, বিষের গাছ অঙ্কুরে মারিয়া ফেলাই ভাল। যাক্, আমি বলিতেছিলাম, এত দিন পরে কি খুব তাড়াতাড়ি ঘোড়া চালাইতে পারিবে?"

কুন্তী।—"ছেলে ছোট থাকিতে আমাদের ততটা জ্ঞান জন্মে নাই। শশাঙ্ক বড় হইলে আমাতে বড় রাণীতে এক ক্রমে সাত আটবার বিষ দিয়াছি। তিন চারি বার লোক দিয়া কাটিয়া ফেলিবার যোগাড় করিয়াছি। শেষটা পাগল হইবার ঔষধও দিয়াছি, কিছুতেই কিছু হয় নাই। আপনিও ত তলে তলে কত ষড়যন্ত্র করিয়াছেন। যমের দূতটাকে ছিন্নমস্তার দোরে বলি দিতে পারিলেই মনের ক্ষোভ মিটিত। অভাগী ছোট রাণীর উচ বুকও ভাঙ্গিয়া পড়িত। আজ এই আট বছর রাজধানী ছাড়িয়া পালাইয়া সন্ন্যাসীর সঙ্গে সঙ্গে কোথায় কোথায় যেন বেড়াইতেছিল, এতেও মরে নাই। এবার মহারাজই, হরিদ্বার হইতে সন্ন্যাসীকে ছেলে নিয়ে রাজধানীতে আসিতে চিঠি লিখিয়াছিলেন। শশাঙ্ক এখন সন্ন্যাসীর সঙ্গে কুঞ্জবাগানে আছে। তখন তলে তলে মহারাজও আমাদের পক্ষে ছিলেন। এখন মহারাজ ছোট রাণী আর শশাঙ্কের দিকে। আমরা ত মহারাজের ত্যজ্য স্ত্রী। এখন আর শশাঙ্কশেখরকে প্রাণে মারা দূরে থাক্, তাহার একটী কেশও কেহ স্পর্শ করিতে পারিবে না।"

বলিতে বলিতে আবার কুন্তী চোখের জলে ভাসিতে লাগিলেন। নন্দনগিরি ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া বলিলেন—"দেখি, ছিন্নমস্তা কি করেন। এত কাল কি তাঁহাকে বৃথাই ডাকিয়াছি। মা তুমি ত ঘোড়ায় চড়িতে পারিবে?"

কুন্তী।—"পারিব।"

নন্দনগিরি।—"একটা লোক যোগাড় করিতে পারিবে?"

কুন্তী।—"কেন?"

নন্দনগিরি।—"এই বিষটুকু ছোট রাণীর দুধের বাটীতে মিশাইয়া দিবে।"

কুন্তী।—"পারিব। কালই ভাল সুবিধার দিন। মহারাজ কাল এক দল সিপাহী নিয়ে বিলাসপুরের সীমানার পাহাড়ে যাত্রা করিবেন। গভর্ণমেণ্টের হুকুম। কাল ভারি গোলমালের দিন। মহারাজ কাল যাত্রা না করিলে রাজ্য নিয়ে টান পড়িবে, শুনিতেছি। এই নাকি বড় দেরি হইয়াছে। গবর্ণমেণ্ট হইতে তাম্বির পরে তাম্বি আসিতেছে। সিপাহী এবং গোলা, গুলি, বন্দুক, কামান যোগাড় করিতেই এত দেরি হইয়াছে। এখনও যোগাড় ভাল হয় নাই। বাবা, কালই ভাল দিন। কাল মহারাজের পাহাড়ে যাবার দিন।"

নন্দনগিরি।—"বল মা, বল "শক্তির জয়! মহাশক্তির জয়! ছিন্ন মস্তাকী জয়!"

এই বলিয়াই, ব্রহ্মচারী, হস্তস্থিত, মানুষের পায়ের নলার একখানি হাড়ের একটী ক্ষুদ্র শিঙ্গায় ফু দিয়া, শঙ্খধ্বনির মত একটী শব্দ করিলেন। কুন্তী বসিয়াছিল, গ্রীবা বক্র করিয়া দাঁড়াইল। পিঠের উপরে চুলের লম্ববান বেণীটী যেন কালী-ভুজঙ্গীর ন্যায় ফুলিয়া উঠিল। কুন্তী দন্তে অধর চাপিয়া, ব্রহ্মচারীর দিকে চাহিয়া রহিল। ব্রহ্মচারী কন্যার এই মহিষমর্দ্দিনী রূপ দেখিয়া হাসিয়া বলিলেন—"শান্ত হও মা। ছিন্নমস্তা অভিষ্টসিদ্ধ করিবেন। এই স্থানে শৃগাল ডাকাইয়া ছাড়িব। নতুবা আমার নাম নন্দনগিরি নয়। আমি বৃথাই এতকাল ছিন্নমস্তার পূজা করি নাই।" এই বলিয়া ব্রহ্মচারী ঝুলীর মধ্য হইতে একখানি শুষ্ক চুলযুক্ত মানুষের মাথার খুলী বাহির করিয়া, একটী পাত্র হইতে তাহাতে কিছু মদিরা ঢালিয়া পান করিয়া অবশিষ্ট টুকু কুন্তীকে দিলেন। কুন্তী ভক্তির সহিত প্রসাদ পাইলে, নন্দনগিরি কন্যার মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন—"এখনই ভৈরবী আসিবে। বহুমূল্য মণিমুক্তা ও অলঙ্কারাদি আজই তাহার হাতে পাঠাইয়া

দিও। লীলাকে সঙ্গে নিবার চেষ্টা করিও। উত্তরের দিকের ফটক হাত করিও। টাকায় সব কাজ সিদ্ধ হইবে, ভয় নাই। অন্যান্য কথা ভৈরবী বলিবে।" এই বলিয়াই কুন্তীর আর কোন উত্তরের অপেক্ষা না করিয়া ব্রহ্মচারী নন্দনগিরি যে পথে আসিয়াছিলেন, সেই পথেই পুনরায় বিলাসপুরের নিকটবর্ত্তী জঙ্গলাকীর্ণ পাহাড় শ্রেণীর দিকে চলিয়া গেলেন। কুঠরী হইতে বাহির হইয়া বাড়ীর বাহিরে যাইতে ব্রহ্মচারীর মুহূর্ত্ত মাত্র সময়ের দরকার হইল। নিস্তব্ধ প্রকৃতির মধ্যে এক বিষম ঝটিকার আয়োজন হইতে লাগিল!

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

ধর্ম্মহীন জীবন।

রাত্রি গভীর। শ্রাবণ মাসের আকাশে মেঘ ছুটাছুটি করিতেছে। মেঘে বিদ্যুৎ চমকিয়া চমকিয়া নিবিতেছে। বাহিরে ফোঁটা ফোঁটা বৃষ্টি পড়িয়া আঁধারে গাছের পাতা, ফুলের গাছ, ঘরের ছাদ, পুরাতন মন্দিরের চূড়া ভিজাইতেছে। প্রাচীন ভগ্নাবশিষ্ট প্রকাণ্ড পুরীর গৃহে গৃহে লোকজন সকল ঘুমাইতেছে। কোথায়ও বিন্দুমাত্র সাড়া শব্দ নাই। প্রহরীরাও ফটকে ফটকে দাঁড়াইয়া নীরবে পাহারা দিতেছে। কেবল পুঞ্জীকৃত অসংখ্য পুরাতন অট্টালিকারাশির মধ্যে এক প্রান্তে একটী ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠের গর্ভ দীপালোকে ভাসিয়া যাইতেছে। প্রকোষ্ঠের চারি দিকের কপাট বন্ধ। কপাটের ফাক দিয়া প্রদীপের দুই একটী রশ্মি বাহিরের ভিজা গাছপালার উপরে পড়িয়া চিক্ চিক্ করিতেছে। প্রকোষ্ঠে দুইটী মাত্র মানুষ বসিয়া ধীরে ধীরে আস্তে আস্তে কথাবার্ত্তা বলিতেছেন। মানুষ দুইটীর মধ্যে একজন বয়সে বৃদ্ধ আর একজনের বয়স পঞ্চাশের নীচে। বৃদ্ধ মানুষটী সন্ন্যাসী নামে অভিহিত। কিন্তু ইহাঁর পরিচ্ছদাদি সন্ন্যাসীর মত নয়। পরিধানে শুভ্র বস্ত্রাদি।

সন্ন্যাসী।—"আমি একটুকু দরকারে বাহিরে গিয়াছিলাম। কুঞ্জবাগানে ফিরিয়া আসিলে শিষ্য বলিল "আপনার জন্য মহারাজের লোক তিন চারি বার আসিয়া ফিরিয়া গিয়াছে। বাবা কাল পাহাড়ে যাবেন। বোধ হয়, আপনার সঙ্গে তাঁহার কোন কথা আছে। লোকটা বলিল "মহারাজ সন্ন্যাসী

ঠাকুরকে এখনই ডাকিয়াছেন।” লোকটা আবার ফিরিবে।” রাত্রি অনেক হইয়াছে দেখিয়া, শিষ্য এই কথা বলিবার পরে আমি আর লোকের অপেক্ষা না করিয়াই চলিয়া আসিলাম। আমার সঙ্গে কি আপনার কোন দরকারি কথা আছে?”

রাজা।—“আছে। আপনিও, এইরূপ একা কোথায়ও বাহির হইবেন না। কুঞ্জবাগানে যে সকল সিপাহী পাহারার জন্য নিযুক্ত হইয়াছে, তাহারা বিশ্বাসী লোক। কোন বিশেষ দরকারে বাহিরে যাইতে হইলে অন্তত তাহাদের মধ্য হইতে চারি জন সিপাহীকে সঙ্গে নিবেন। আপনারও জীবন এখানে নিরাপদ মনে করিবেন না। আমিও যখন, মে’ঝ রাণী আর বড় রাণীর প্ররোচনায় শশাঙ্কের জীবনরক্ষায় অমনোযোগী ছিলাম, আপনিই তখন তাহাকে নিয়ে পালাইয়া গিয়াছিলেন বলিয়া, আজও শশাঙ্ক জীবনে বাঁচিয়া আছে। সুতরাং যাহারা শশাঙ্ককে সুখ সৌভাগ্যের পথে কণ্টক মনে করে, তাহারা আপনাকে ভালবাসে না।”

সন্ন্যাসী।—“আমার ইচ্ছা ছিল, শিষ্যকে তুলসীগ্রামে হরগোবিন্দ রায়ের বাড়ী রাখিয়া আমি একা এখানে আসি। একবার কোন বিশেষ দরকারে কিছু দিনের জন্য শিষ্যকে হরগোবিন্দ রায়ের নিকটে রাখিয়া গিয়াছিলাম।”

রাজা।—“সেখানে কি শশাঙ্কশেখরের পরিচয় দিয়াছিলেন?”

সন্ন্যাসী।—“কেবল হরগোবিন্দ আর তাহার দৌহিত্রী কুন্তলা জানে, শশাঙ্ক বিলাসপুরের রাজ-পুত্র। আর কেহ জানে না।”

রাজা।—“আমি আজ যে জন্য আপনাকে ডাকিয়াছি, বলিতেছি। গভর্ণমেণ্টের অবিচারের কথা শুনুন। তাঁহারা নিরর্থক লুসাই ও কুকীদের সঙ্গে যুদ্ধ আরম্ভ করিয়াছেন। কাছাড়ের চা-বাগানের কতকগুলি সাহেব কুকীদের প্রতি সর্ব্বদা অত্যাচার করে। কুকীদের স্ত্রীলোকেরা ঠিক ভগবতীর প্রতিমার মত গৌরাঙ্গী ও সুন্দরী। তাহাদের প্রতি দুই একটা চা-করের পশু ব্যবহারের কথা শুনিলে, কাণে হাত দিতে হয়। অসহ্য হওয়াতে হিতাহিত-পরিণাম-জ্ঞানশূন্য অসভ্য লুসাই ও কুকীরা এক দিন পাহাড়ের জঙ্গল হইতে নামিয়া দুই তিনটা চা-বাগান নষ্ট করিয়া চলিয়া গিয়াছে। অনেকগুলি কুলীর ও তিন জন সাহেবের মাথা কাটিয়া ফেলিয়াছে। নিকটবর্ত্তী জেলার ডেপুটি কমিসনার কাপ্তান হেনরি, একদল পুলিস সৈন্য নিয়ে যুদ্ধযাত্রা করিয়াছেন।

গভর্ণমেণ্ট আমাকে লিখিয়াছেন "আপনার রাজ্যের সীমান্তে গোলযোগ উপস্থিত। আপনি স্বয়ং আপনার প্রধান সেনাপতির অধীনে একদল সিপাহী সহ ঘটনা স্থলে উপস্থিত হইয়া কাপ্তান হেনরির সাহায্য করিবেন। নতুবা ভারতবর্ষের ইংরেজ গভর্ণমেণ্ট আপনাকেও বিদ্রোহী মনে করিবেন। আপনার সৈন্যাদির সমস্ত খরচ আপনাকে বহন করিতে হইবে।"

সন্ন্যাসী।—"আমি শিষ্যের মুখে সব শুনিয়াছি। বিষম বিপদ্ উপস্থিত, তাহাতে সন্দেহ নাই। একে রাজ্যের অনাদায়ের দরুণ রাজসংসার ঋণে ডুবিয়া আছে। কি সিপাহী, কি রাজকর্ম্মচারী অনেক দিন পর্য্যন্ত বেতন না পাওয়াতে সকলেই মনে মনে অসন্তুষ্ট। রাজকর্ম্মচারীই রাজার হাত পা। কিন্তু আপনার একটী কর্ম্মচারীও উপযুক্ত নয়। সকলেই অবিশ্বাসী। সকলেই বিশ্বাসঘাতক। সকলেই জোঁকের মত নানা দিক্ দিয়া কেবল টাকা শোষণ করিতেই ব্যস্ত। কিসে রাজ্যের মঙ্গল হইবে, রাজসংসারের উন্নতি হইবে, তাহার দিকে কাহারও দৃষ্টি নাই। দৃষ্টি করিবার ক্ষমতাও নাই। কেহই কাজ বুঝে না। সামান্য জমিদারের সরকারে যাহারা সুখ্যাতির সহিত কাজ চালাইতে পারে না, আপনার সরকারে তাহারাই সকলের উপরের কাজে নিযুক্ত। তাহার উপরে আবার লোকগুলির মধ্যে একটীরও সাধুচরিত্র বা ধর্ম্মাধর্ম্ম বোধ নাই। অগোচরে আপনার নিন্দা করে, অহিত কামনা করে, আর সাক্ষাতে আপনাকে দেবতা বলিয়া বর্ণনা করে। আপনার বিরক্তির ভয়ে আপনার প্রকৃত ভ্রম, প্রকৃত দোষও আপনাকে কেহ বলে না। বরং ভঙ্গিক্রমে তাহা যে আপনার মহৎ গুণ, এইরূপই জানায়। এই অবস্থায় একটা স্বাধীন রাজ্য চলা অসম্ভব। আপনি এই বিপদের সময় কাহার হাতে রাজ্যের ভার দিয়া যাইবেন ?"

রাজা।—"মহাশয়, কাহাকেও বিশ্বাস করিতে পারিতেছি না। কেবল বিশ্বাস করিতে পারিতেছি না, তাহা নয়। আপনার কথাগুলি কড়া-ক্রান্তিতে ঠিক। সত্য সত্যই আমার সরকারে একটীও উপযুক্ত লোক নাই। এক দিকে চক্রীর বিষম গূঢ় সূক্ষ্ম চক্র সর্ব্বদাই ঘুরিতেছে। অপর দিকে সকলেই অন্ধ। এই বিস্তীর্ণ ভারতের সামান্য একটী প্রদেশ বাঙ্গালা দেশ। সেই বাঙ্গালার এক কোণের এক প্রান্তে এক মুষ্টি পাহাড়ের জঙ্গল নিয়ে কোন রূপে পৈত্রিক সম্মানটা আজ পর্য্যন্তও রক্ষা করিতে ছিলাম। বুঝে'ছি ইহাও শীঘ্রই হাত ছাড়া হইবে। ঘরে বাহিরে শত্রু। গৃহের স্ত্রীগণ শত্রু।

শ্বশুর নন্দনগিরি বিষম মারাত্মক শত্রু। পাহাড়ের অসভ্য লোকগুলি নন্দনগিরির অত্যন্ত বশীভূত হইয়া পড়িয়াছে। প্রথমে আমিই নন্দন-গিরিকে এত বাড়াইয়াছিলাম। তাহার সঙ্গে সঙ্গে নন্দনগিরির নানা বুজ্-রুকি আছে। অঘোর পন্থীদের বিভীষিকাপূর্ণ ব্যাপার দেখিয়া অসভ্যেরা অনেকেই তাহাদিগকে দেবানুগৃহীত মনে করে। রাজশ্বশুর ব্রহ্মচারী নন্দন-গিরিকে ত সাক্ষাৎ দেবতাই ভাবে। এখন এমন হইয়াছে যে, নন্দন-গিরির কথায় সাত আট শ লোক তীর ধনুক নিয়া আমার বিরুদ্ধে দাঁড়াইতে পারে। ভাবিয়াছিলাম, আগে ইহার কোন একটা প্রতিবিধান করিব। এমন সময়েই গভর্ণমেণ্টের এই ভয়ানক আদেশ আসিয়াছে। এবার যে কি হবে তা ভগবান্ জানেন। শুনিলাম, নন্দনগিরি আজও মে'ঝ রাণীর সঙ্গে দেখা করিতে আসিয়াছিলেন। এখন আর এ সম্বন্ধে মনোযোগ দিবার সময় নাই।”

সন্ন্যাসী।—“এখন ভগবানেরই স্মরণাপন্ন হউন। তিনিই এক মাত্র বিপদ্-ভয়বারী এবং অকূলের কাণ্ডারী।”

রাজা।—“মহাশয়, যতদিন গরম রক্তের স্রোত বর্ষার বানের মত ধম-নীতে ধমনীতে বহিতেছিল, তত দিন মনে করিয়াছিলাম, ইন্দ্রিয় চরিতার্থ করাই বুঝি এ জীবনের চরমলক্ষ্য, বিলাস সামগ্রী থাকিলেই জগতে অভাব বোধের বুঝি আর কোন কারণ থাকে না। কিন্তু যতদিন যাইতেছে, যতই শরীর মন অবসন্ন হইতেছে, পথ-শ্রান্ত বিপন্ন পথিকের সম্মুখস্থ ঝটিকাপূর্ণ অমানিশার মত যতই বিপদ্ রাশি দশ দিক্ বিষাদের আঁধারে ঢাকিয়া ঘিরিয়া ফেলিতেছে, ততই বুঝিতেছি, ইন্দ্রিয় সুখই বল আর বিলাসসাধনই বল, সকলই অসারের অসার। আমি ত কখনও ভগবান্‌কে ডাকিতে শিখি নাই। হায়! সংসার আমার নিকট শ্মশানের চেয়েও যে ভীষণ বোধ হইতেছে! সন্ন্যাসি, একবার এক মুহূর্ত্তের জন্য আপনার এই ভগবানে বিশ্বাস ভক্তি নির্ভর পূর্ণ স্বর্গতুল্য জীবন আমার সঙ্গে বিনিময় করুন। আর কি বলিব? আমি একবার দেখি, সেই প্রাণের শান্তি কি পদার্থ। এ অশান্তির ভার যে আর বহিতে পারি না!”

বলিতে বলিতে রাজার দুই চক্ষু জলে ভাসিয়া যাইতে লাগিল। সন্ন্যা-সীর মুখ গাম্ভীর্য্যে পরিপূর্ণ হইল। সন্ন্যাসী, বিনয়াবনত হইয়া বলিলেন—“আপনি আমাকে কি জন্য ডাকিয়াছিলেন?” রাজা চক্ষুর জলে

ভাসিতে ভাসিতেই বলিলেন "আর কি বলিব? রাজ্য রাজধানী সব ফেলিয়া চলিলাম। ফিরি ত পুনরায় সাক্ষাৎ হইবে। নতুবা এই শেষ বিদায়। আপনার শিষ্যকে যে আপনি দেখিবেন, সে সম্বন্ধে অনুরোধের কোনই কথা আমার এপাপ মুখে শোভা পায় না। আমি পিতা হইয়া এক দিন তাহার জীবন নাশের চক্রান্তে সংলগ্ন ছিলাম। শশাঙ্ককে বলিবেন—"পিতার পূর্ব্বকৃত দোষ স্মরণ করিয়া যেন মনে কষ্ট না পায়। গভর্ণমেণ্ট হইতে তাম্বির পরে তাম্বি আসিতেছে। আমাকে কালই পাহাড়ে যাত্রা করিতে হইবে। আশীর্ব্বাদ করুন, এ অপমানিত জীবন নিয়ে যেন আর ফিরিতে না হয়।"

দূরে প্রাচীরের উপরে একটা পেচক থাকিয়া থাকিয়া চীৎকার করিতেছিল। রাত্রি আড়াই প্রহরের সময়ে প্রকোষ্ঠ মধ্যে উপবিষ্ট ব্যক্তিদ্বয় নীরবে ধীরে ধীরে উঠিয়া স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান করিলেন। আর কেহই কিছু বলিলেন না। একজন ভৃত্য আসিয়া প্রকোষ্ঠের প্রদীপ নিবাইয়া বাহির হইতে কপাট ভেজাইয়া চলিয়া গেল। আকাশে নিস্তব্ধ মেঘের কোলে তখনও বিজলী চমকিয়া চমকিয়া নিবিতেছিল। বাহিরে অন্ধকারে ফোঁটা ফোঁটা বৃষ্টি পড়িতেছিল। চারিদিক্ পূর্ব্বেরই মত নিস্তব্ধতার কোলে ঘুমাইতেছিল। যেন প্রকৃতি গম্ভীর ভাবে বঙ্গের অতি প্রাচীন জঙ্গলাকীর্ণ পাহাড়ময় ক্ষুদ্র স্বাধীন রাজ্য বিলাসপুরের ভাগ্য-লিপি পড়িতে পড়িতে নীরবে অশ্রু ঢালিতেছিল, আর এক এক বার ক্ষোভে, দুঃখে ক্রোধাবিষ্ট প্রকৃতির চোখে বিজলীর ছলে আগুন জ্বলিয়া জ্বলিয়া উঠিতেছিল। মুখে শব্দ ফুটিতেছিল না।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

দেশের হিতকথা।

সন্ন্যাসী বিষন্ন মুখে ভাবিতে ভাবিতে পুরাতন পুরীর বাহিরে আসিলেন। সন্ন্যাসী গম্ভীরভাবে চিন্তা করিতেছিলেন—"অন্যায় এবং অত্যাচার যাহা হইতেছে ইহা না হওয়াই উচিত। সভ্যতাভিমানী গবর্ণমেণ্ট কথায় কথায় খ্রীষ্টধর্ম্মের দোহাই দেন; এদেশের লোককে অসভ্য, "নিগার" কত কি বলেন। এদেশের লোককে বিশ্বাস করেন না। ভিতরে যেপ্রকার

কুটিল রাজনীতিই থাক্, মুখে বলেন "এদেশের লোকের চরিত্রের বল নাই। এখনও এরা বিশ্বাসের যোগ্যপাত্র হয় নাই।" আচ্ছা, এসকল যেন স্বীকার করিয়াই নেওয়া গেল। এখন কথা এই, ছলে, বলে, কৌশলে দেশীয় রাজাদের রাজ্যগুলি বহু দিন হইতে ইংরেজেরা হস্তগত করিতে চেষ্টা করিতেছেন কেন? কিছুদিন হইল বাঙ্গালার এক প্রান্তের এক-জন ক্ষুদ্র হিন্দু রাজার পাহাড় কয়েকটী কাড়িয়া নিয়াছেন। আরও কত কি ঘটনার কথা শুনা যায়। যাঁহারা পরকে নিন্দা করেন, তাঁহা-দের নিজেদের চরিত্র আগে সংশোধন করা উচিত। অত্যাচারের নামে কাহার না বুকের রক্ত গরম হয়? অন্যায়কে ঘৃণা না করাই অনুচিত। মেকলেকে বাঙ্গালী-চরিত্রের প্রতি দোষারোপের কালে নিজের জাতির চরিত্র বিচার করা উচিত ছিল। ভালবাসার ফাঁদে পড়িয়া এই প্রাচীন রাজপরিবারের হিতকামনাই আমার প্রাণের মূলমন্ত্র হইয়াছে। ইঁহা-দের প্রতি অন্যায় অত্যাচার দেখিলে বুকের কলিজায় আঘাত পড়ে। কিন্তু সাধারণত আমার প্রাণের নিভৃত কাহিনী কি? "রাজক্ষমতা ঈশ্বর দত্ত নয়," খ্রীষ্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দীতেই ইহা ফরাসীর রক্তে ইতিহাসের পৃষ্ঠায় লিখিত হইয়াছে। এ ত পুরাণ কথা। একথা জগতের নিকট, ভারতের কাণে ঘোষণা করিতে আজ আর গাম্বেটা বা মিরাবোঁ-প্রমুখ ব্যক্তিদিগের গম্ভীর স্বরের প্রয়োজন হইতেছে না। মানুষের নিকট ইহা নিশ্বাস প্রশ্বাসের মত সহজ-বোধ্য হইয়া পড়িয়াছে।"

"রাজক্ষমতা মানবের উন্নতির বুকে পাথর চাপার মত কিছু কি না? রাজক্ষমতা সাধারণ ক্ষমতায় পরিণত না হইলে পৃথিবীতে শান্তির রাজ্য ফিরিবে কি না? এ সকল কথা নিয়া আন্দোলন করিতে অল্প লোকেই সাহস পাইতেছে। কিন্তু মীমাংসা কি আজও বাকী আছে? অসির অগ্নিময় তেজের কথা প্রাণে আঁকা থাকিতে কে মুখ ফুটিয়া এ মীমাংসা প্রচার করিবে? অপমৃত্যুকে যিনি ফুলের মালা মনে করিতে পারিবেন, তিনি কালে এ মন্ত্র পৃথিবীর পদদলিত লোকদের নিকট শিঙ্গায় বাজাইয়া গাইয়া যাইবেন! ফরাসী দেশে বা নূতন পৃথ্বীখণ্ডের মিলিত মহারাজ্যে সাম্যের বিদ্যালয় খোলা হইয়াছে। সাম্যের গান গাইয়া গায়কেরা জগতের মন হরণ করিতেছেন। কিন্তু এ সকল উচ্চ কথা সত্য সত্যই আমাদের পক্ষে অপকারী। আমরা সদ্যজাত শিশুর মত আজও নিজে পাশ ফিরিয়া শুইতে

শিখি নাই। সুদক্ষ ধাত্রী ব্যতীত একদিনও আমাদের জীবনরক্ষা সুকঠিন। ধাত্রী চাই, শিক্ষক চাই। যতই মন্দ বলি না কেন, ইংরেজের মত ভাল ধাত্রী বা শিক্ষক আর আমরা কোথায় পাইব? ধাত্রীর বা শিক্ষকের কাজ শেষ হইলে ইংরেজ তল্পী তল্পা নিয়ে দেশে ফিরিলেই আমরা খুসী হইব। তবে ইংরেজ, অত্যাচার, অবিচারের হাত খাট করিয়া প্রকৃত জ্ঞানী ও ধার্ম্মিকের মত আমাদিগকে আরও কিছুদিন সুপথে চালান, ইহা বুদ্ধিমান ব্যক্তি মাত্রেরই প্রার্থনা। কিন্তু দেশীয় অকর্ম্মণ্য রাজাগুলির অস্তিত্ব ভারতের বিন্দুমাত্র উপকারের সঙ্গেও গ্রথিত নয়। ভারত মাতার গায়ের এ সকল বিষফোড়া যত কমে ততই ভাল।"

"দেশীয় স্বাধীন রাজ্যগুলি বিস্তীর্ণ ভারতের প্রশস্ত বুকে ভাঙ্গা বেড়ার মত কেবল অপকারের আকর এবং উন্নতির বাধা হইয়া আছে। এই ভাঙ্গা বেড়ার আড়ালে কতকগুলি অপদার্থ মানুষের বিলাস সাধনের সুবিধা বই আর দেশের কোনই মঙ্গল নাই। এর পরিবর্ত্তে সমস্ত ভারতে ইংরেজের অখণ্ড শাসন বিস্তৃত হইলে ভাল হইবে। পঁচিশ কোটি ভারত সন্তান এক ক্ষেত্রে দাঁড়াইয়া কাঁদিতে শিখিবে। সমদুঃখের ন্যায় মানুষের লোহার পিণ্ডের মত প্রাণগুলি সহসা গলাইয়া এক করিবার দ্বিতীয় ঔষধ নাই। পঁচিশ কোটি মানুষের চোখের জল শুষিয়া শুষিয়া সমগ্র ভারতে যে মহতী উর্ব্বরতা শক্তি উৎপাদন করিবে, তাহাতে স্বর্ণভূমির বক্ষে আবার সোণা ফলিবে, বীর-প্রসবিনীর গর্ভে নব বেশধারী বীরসকল জন্মিবে।"

ভাবিতে ভাবিতে অন্ধকারে সত্তর বৎসরের বৃদ্ধ সন্ন্যাসীর চোখে এক সঙ্গে দুইটী ফোঁটা জল দেখা দিল। সে জল পৃথিবীর কেহ দেখিল না। নীরবে, আঁধারে জলের ফোঁটা দুইটী বৃদ্ধের দুইটী গণ্ড ভাসাইয়া কণ্ঠ ও বক্ষ সিক্ত করিল। হৃদয়ের আবেগে সন্ন্যাসী, তখনই মনে মনে একটী গান রচনা করিয়া, তখনই গাইতে লাগিলেন, আর চোখের জলে ভাসিতে লাগিলেন। অস্পষ্টস্বরে গুন গুন করিয়া গাইতে লাগিলেন—

"ভারত আঁধারে কিরে,
সুদিন আসিবে ফিরে,
বিমল প্রভাতে রবি
আর কি হাসিবে রে?

বসন্তে ফুটিবে ফুল
গাইবে কোকিল কুল
শরতে জোছনা রাশি
চাঁদে কি ফুটিবে রে?

ঘুমা'য়েছে গোদাবরী,
স্বরস্বতী আছে মরি,
আর কি সে মহা গানে
ভারত জাগিবে রে ?

ভারত আঁধার বুকে
ভারত-সন্তান-মুখে
হরিষে হাসির রেখা
আর কি শোভিবে রে ?"

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

পাষাণী।

কুঞ্জবাগান, একটী ক্ষুদ্র পাহাড় বা টিলার উপরে কতকগুলি প্রাচীন গাছপালা এবং বৃক্ষাদির সমষ্টি মাত্র। এখানেও বাগানের চারিদিকে প্রকাণ্ড উচ্চ পুরাতন ভগ্নপ্রায় প্রাচীর বন জঙ্গলে ঢাকা পড়িয়া রহিয়াছে। মধ্যস্থলে কতকগুলি ভাঙ্গা চুরা প্রাচীন রকমের দালান কোঠা ও দেবমন্দিরের ভগ্নাবশেষ কালের কীর্ত্তি ঘোষণা করিতেছে। বাগানের দুইদিকে দুইটী ফটক। সশস্ত্র প্রহরীগণ,ফটক দুইটী সতর্কভাবে রক্ষা করিতেছে। ভগ্ন অট্টালিকা রাশির মধ্যে তিন চারিটী গৃহ সুন্দর বাসের উপযুক্ত। এগুলি অল্পদিনের তৈয়ারি। ইহাতে মানুষ বাস করিতেছে। এত রাত্রিতে, সকল ঘরেরই প্রদীপ নির্ব্বাপিত। কেবল একটী প্রকোষ্ঠে আলো দেখা যাইতেছে। সন্ন্যাসী ভাবিতে ভাবিতে এই প্রকোষ্ঠেরই দ্বারে আসিয়া আঘাত করিলেন। ফটকের আলোতে প্রহরীগণ সন্ন্যাসীকে দেখিবামাত্রই নীরবে পথ ছাড়িয়া দিয়াছে। সন্ন্যাসী দ্বারে আঘাত করিবামাত্র ভিতর হইতে একটী দীর্ঘাকৃতি বলবান্ পুরুষ প্রকোষ্ঠের কপাট খুলিয়া দিয়া এক পার্শ্বে দাঁড়াইল। সন্ন্যাসী গৃহাভ্যন্তরে গেলে, পুরুষ আবার পূর্ব্বের মত কপাট বন্ধ করিল। প্রকোষ্ঠে আলো জ্বালিয়া একটী তরুণ-বয়স্ক যুবক পড়িতেছিল। যুবক মনোযোগের সহিত ইংরাজ-কবি কাউপারের একখানি ইংরেজি কবিতা পুস্তক পড়িতেছিল। যুবক সন্ন্যাসীকে দেখিয়া শয্যাবক্ষে দাঁড়াইয়া বলিল—"গুরুজি, আপনার একখানি চিঠি আছে।" এই বলিয়া নিকটের একটী তাকের উপর হইতে চিঠিখানি আনিয়া সন্ন্যাসীর হাতে দিল। যুবক সন্ন্যাসীর শিষ্য এবং বিলাসপুরের রাজার পুত্র শশাঙ্কশেখর। যে দীর্ঘাকৃতি বলবান্ পুরুষ ভিতর হইতে প্রকোষ্ঠের কপাট খুলিয়া দিয়া সন্ন্যাসীর প্রবেশান্তে আবার বন্ধ করিয়া

চলিয়া গেল, ইহার নাম রাজবল্লভ। রাজবল্লভ, রাজবাটীর বহুদিনের ভৃত্য, আজ কাল কুঞ্জবাগানে সন্ন্যাসী এবং শশাঙ্কের পরিচর্য্যায় নিযুক্ত আছে।

সন্ন্যাসী যুবকের হাত হইতে ধীরে ধীরে চিঠিখানি হাতে নিলেন। কিন্তু এতক্ষণ যে গম্ভীর চিন্তায় সন্ন্যাসীর মন নিমগ্ন ছিল, তাহার ঘোর এখনও ভাঙ্গে নাই। চিঠির উপরের হাতের লেখা দেখিয়াই সন্ন্যাসী বুঝিলেন, চিঠি কে লিখিয়াছে। চিঠি খানি তাড়া তাড়ি আগ্রহের সহিত খুলিলেন। কিন্তু পড়িলেন না। খোলা চিঠি হাতে করিয়াই ভাবিতে লাগিলেন "দেশীয় রাজাদের অধীনে প্রজাগুলি শিক্ষিত হইতেছে না। রাজাগুলি স্বেচ্ছাচারী বলিয়া প্রজাদের মনে স্বাধীন চিন্তা ফুটিতে পায় না। ইংরেজাধিকারে দাঁড়াইয়া ইংরেজের প্রকৃত দোষগুলি আমরা অনেকটা বলিতে পারি। ইংরেজের প্রকোপ-ভীত দেশীয় রাজার রাজ্যে ইংরেজের কোন দোষের কথাই বলিবার সুবিধা নাই। রাজার ত নিতান্ত গর্হিত কাজের কথাও কেহ মুখে আনিতে পারে না। শুধুই তোষামোদ করিয়া করিয়া মানুষগুলির যাহা-কিছু মনুষ্যত্ব ছিল, সবটুকুই চলিয়া গিয়াছে। রাজার সঙ্গে রাজ্যের সম্বন্ধ বিলাসসুখ ভোগ মাত্র। প্রজার বা রাজ্যের উন্নতি দেশীয় রাজাদের লক্ষ্য নয়। রাজ্যে সুবিচার, সুশাসনের কোনই বন্দোবস্ত নাই। গভর্ণমেণ্টের ভয়ে ভয়ে রাজ্যের মধ্যে নাম মাত্র বিদ্যালয় খোলা হয়। কিন্তু বিদ্যার জ্যোতি বিস্তার বা জ্ঞান প্রচার, রাজা কিম্বা রাজকর্ম্মচারীদিগের হৃদয়ের আগ্রহের বস্তু নয়। গভর্ণমেণ্টের ভয়ে কোন কোন দেশীয় রাজা ইংরেজ রাজ্যের মৃত অনুকরণ মাত্র করিতেছেন। কিন্তু বুদ্ধিমান মানুষের চোখে, তাহা কিছুই না। ফল কথা, বড় কাঁটা দ্বারা দেশের এ ছোট ছোট কাঁটা গুলি তুলিয়া ফেলিয়া ভারতের দেহকে নিষ্কণ্টক করিবার যুক্তিই বুদ্ধিমানের হওয়া উচিত। ইংরেজ-রাজ আমাদিগকে হাতে হাতে স্বর্গে তুলিয়া দিবেন, এমন কিছু নয়। তবে মন্দের ভাল।"

"দ্বিতীয় কথা, সাধারণ শক্তি যত প্রসারিত হইবে, যত একীভূত হইবে, প্রবল রাজ-শক্তি ততই দুর্ব্বল হইয়া পড়িবে। মধ্যে মধ্যে এই সকল ভাঙ্গা বেড়া থাকিয়া সেই শক্তি প্রসারণে অনেকটা বাধা জন্মাইতেছে। দেশের আর্থিক উন্নতিরও অন্তরায় উপস্থিত করিতেছে। এই সকল অকর্ম্মণ্য রাজা, জমিদারগণ ধার করিয়াও বিদেশীয় বিলাস দ্রব্য প্রচুর পরিমাণে কিনিয়া দেশের টাকা কড়ি বিদেশে পাঠাইতেছে। এদিকে ধার প্রকৃতপক্ষে পরিশোধ

হয় না। অনেক সময়ই ধার করিয়া ধার পরিশোধ করা হয় না। নতুবা গরিব প্রজার রক্ত শোষণ করা হয়। এই সকল রাজা ও জমিদার সম্প্রদায় হইতে নানা প্রকারে দেশ আপনার সংঘর্ষণে আপনি দুর্ব্বল হইয়া পড়িতেছে।”

“দেশে ধন ও ধনী লোক থাকিলে দেশের উন্নতি হয়। অন্তর্ব্বহির্ব্বাণিজ্য, কৃষি, শিল্প দ্বারা সেই ধন এবং ধনীর সংখ্যা বৃদ্ধি হইলেই ভাল। তাহাতে দেশের ধনের পরিমাণ দিন দিনই বাড়িতে থাকে। দেশের লোক কর্ম্মঠ, চতুর ও তেজস্বী হইয়া উঠে। এসকল রাজা জমিদার দ্বারা তাহার বিপরীত ফল-ফলিতেছে। এ সকল আবর্জ্জনাময় সাপের হাঁড়ীগুলি ভাঙ্গিয়া দিয়া ভূ-সম্পত্তিতে সাধারণের অধিকার স্থাপন করাই দেশের মঙ্গল। এ অকর্ম্মণ্য বেড়াগুলি ভাঙ্গিয়া যাক্। ভারতের জন সাধারণ ইংরেজের সুশিক্ষার ছায়ায় দাঁড়াইয়া প্রান্ত হইতে প্রান্ত পর্য্যন্ত সাধারণ শক্তির জয় পতাকা উড্ডীন করুক্। মানুষ গুলি মানুষ হইতে শিখুক্।”

“তবে এ কথা বলিতেছি না, ইংরেজ, ছলে, বলে, কৌশলে, অবিচার অত্যাচার করিয়া আজই রাজার রাজ্য, জমিদারের জমিদারী কাড়িয়া লউন্। ন্যায়-সঙ্গত, ধর্ম্মানুমোদিত উপায়ে যে কার্য্য না হয়, তাহার গর্ভে যতই মঙ্গল থাকুক্ না কেন, প্রাণ থাকিতে তাহার পক্ষপাতী হইতে পারিব না। কি রাজা, কি জমিদার, কি মধ্যবিধ, কি কৃষক বা দরিদ্র লোক, যাহারই প্রতি অবিচার অত্যাচার হইতেছে শুনিতে পাই, তাহারই জন্য কলিজা ছিঁড়িয়া যায়, বুক ফাটিয়া যায়।”

ভাবিতে ভাবিতে সন্ন্যাসী শয্যার উপরে বসিলেন, শশাঙ্কশেখর ধীরে ধীরে জিজ্ঞাসা করিল, “চিঠি কার ? চিঠি খানি মনিরামপুর বা তাহার নিকটবর্ত্তী স্থান হইতে আসিয়াছে। পোষ্টাফিসের মোহরের ছাপে “মনিরামপুর-পোষ্টাফিস” লিখা আছে। কিন্তু হাতের লেখাটী দিদীর। চিঠি কি দিদীর ?”

শশাঙ্কশেখরের কথায় সন্ন্যাসীর চমক ভাঙ্গিল। এবার সন্ন্যাসী হস্তস্থিত খোলা চিঠি খানি মনোযোগের সহিত পড়িতে বসিলেন। পড়িতে লাগিলেন—

“পূজ্যপাদ,

আপনারা তুলসীগ্রাম হইতে যাইবার পরে দাদাকে চারি পাঁচ খানি চিঠি লিখিয়াছি। এক খানিরও উত্তর পাই নাই। দাদার কি কোন অসুখ করিয়াছে ? আপনিও ঠাকুর দাদা মহাশয়কে অনেক দিন হইল একখানি চিঠি লিখিয়াছিলেন। তাহার পরে আপনারও আর কোন চিঠি পত্র পাওয়া

যায় নাই। দাদার চিঠি না পাওয়াতে আমার মন বড় খারাপ আছে। চিঠির জন্য সর্ব্বদাই পথ চাহিয়া থাকি। আপনাদের চিঠির জন্য পরিবারের সকলেই ব্যস্ত।

মণিরামপুর আমাদের জমিদারির মধ্যে একটী বড় পরগনা। সীতানগরে এই পরগনার কাছারি। আমি ঠাকুরদাদা মহাশয়ের সঙ্গে আজ দশ বার দিন হইল এখানে আসিয়াছি। দিদীমা বাড়ী আছেন। পরিচারিকার মধ্যে স্বরস্বতী আমাদের সঙ্গে আসিয়াছে। একখানি বড় বজরা ভাড়া করা হইয়াছে। আমরা তাহাতেই থাকি। এ অঞ্চলে এবার ভাল কৃষি না হওয়ায়, প্রজাদের বড় অন্ন কষ্ট উপস্থিত হইয়াছে। তাহার সঙ্গে আবার মহামারি দেখা দিয়াছে।

ঠাকুরদাদা মহাশয় এবৎসরের জন্য এপরগনার প্রজাদের খাজনা মাপ করিয়াছেন। তাহা ছাড়া বাড়ী হইতে টাকা আনাইয়া চাল, কাপড়, পয়সা ও ঔষধ দান করিতেছেন। আমি বজরার উপরে বসিয়া প্রত্যহ সকাল হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত গরিব দুঃখীদিগকে অবস্থানুসারে চাল, কাপড়, পয়সা বাঁটিয়া দেই। দূরে দূরে কয়েকটী দাতব্যশালা,অন্নছত্র ও ঔষধালয় খোলা হইয়াছে। লোক জনেরা কাজ ভাল করিবে না বলিয়া ঠাকুরদাদা মহাশয় পাগ্লা মত ঘুরিয়া ঘুরিয়া এই সকল দেখিয়া বেড়াইতেছেন। সীতানগরের সকল ভার আমার উপরেই দিয়াছেন। আমি কয়েকখানি হোমিওপ্যাথিক প্রণালীর চিকিৎসা পুস্তক পড়িয়াছি। মধ্যে মধ্যে বজরার খুব নিকটের গ্রামে গিয়া যে সকল গরিব দুঃখী লোকেরা বজরার কাছে চলিয়া আসিতে অশক্ত হইয়া পড়িয়াছে, তাহাদিগকে ঔষধ পথ্য দিয়া আসিতে হয়। লোক জনের উপরে ভার দিলে প্রায় কাজ ভাল হয় না। গ্রামে যাইবার সময়ে সঙ্গে একজন লোক আর স্বরস্বতী থাকে। অত্যন্ত কাছে হইলে একাই ঔষধের বাক্সটী হাতে করিয়া রোগীদের ঘরে গিয়া ঔষধ পথ্য দিয়া আসি। অনেককে নিজের হাতে পথ্য রাঁধিয়া দিতে হয়। তাহাদের ঘরে পথ্য দিবার অপর মানুষ নাই। অন্নকষ্ট এবং মহামারি এক সঙ্গে আক্রমণ করাতে, এ অঞ্চলের মানুষেরা নিতান্ত বিপন্ন হইয়া পড়িয়াছে। এসময়ে কোন কথা নিয়ে ইহাদের আন্দোলন বা চর্চ্চা করিবার অবসর নাই। নতুবা অন্য সময় হইলে আমি যেরূপ উন্মুক্ত ভাবে চলিতে ফিরিতেছি, ইহা নিয়া প্রজারাই কত গুজব তুলিত। কিন্তু এখন যেখানে যাই,সেখানেই

সকলে কাতরস্বরে বলে "মা আসিয়াছ? মা, তুমি আমাদের মা। তুমি কালও কি আসিবে?"

মধ্যে মধ্যে ইচ্ছা করিয়া এখানকার অন্নছত্রে গিয়া নিজ হাতে রাঁধিয়া শত শত গরিব দুঃখীকে পরিবেশন করি। এসকল করিতে বড়ই সুখ বোধ হইতেছে। কিন্তু গরিবদের কষ্ট দেখিয়া অনেক সময় চোকের জল বন্ধ করিয়া রাখা যায় না। ঠাকুরদাদা মহাশয় ত সমানভাবে রোদ বৃষ্টি মাথায় বহিয়া পায়ে হাটিয়া হাটিয়া নানা স্থানে ঘুরিতেছেন। আজ কাল তাঁহার মুখে বিষণ্ণতা ভিন্ন আর কিছুই দেখিতে পাইবেন না।

আমি দিনের বেলায় কাজ কর্ম্মে ব্যস্ত থাকি। রাত্রিতেও অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত নৌকার মধ্যে বিছানার উপরে বসিয়া পড়া শুনা করি। কিন্তু যখনই অবসর হয়, তখনই মনে দুর্ভাবনা উপস্থিত হয়। তখন এক মনে দাদার কথা ভাবি। আপনি লিখিয়াছেন "শিষ্যের ভবিষ্যৎ জীবনের আকাশ অন্ধকার এবং ঝটিকাপূর্ণ।" কথাটী মনে হইলেই বুক দুড়্ দুড়্ করে। আমার চোখে জল আসে। দাদা কেনই বা রাজপুত্র হইয়াছিলেন? দাদা যতদিন আমাদের বাড়ী ছিলেন, ততদিন তাহার পরিচয় পাই নাই। আপনি দুইবৎসর পরে শেষদিন দাদাকে আমাদের বাড়ী হইতে নিয়ে যাইবার কালে, ঠাকুরদাদা মহাশয়কে চুপি চুপি দাদার ক্ষুদ্র জীবনের সমস্ত বিপদের কাহিনী বলিয়াছিলেন। মনে আছে কি, আমিও সেখানে ছিলাম? এখন দেখিতেছি, পরিচয় না পাওয়াই ভাল ছিল। বিপদ রাশি হইতে এত দিন দূরে থাকিয়া পুনরায় ইচ্ছা করিয়া সেই বিপদের কোলেই গেলেন কেন? আজ দাদার জীবনের পূর্ব্বের কথা না জানিলে অনেকটা নিশ্চিন্ত থাকিতে পারিতাম। কিন্তু এখন যতই আপনাদের চিঠি আসিতে দেরি দেখিতেছি, ততই যেন কেন মনে হইতেছে, আপনারা বুঝি বা আর ইহ জগতে—

আমি আর লিখিতে পারিতেছি না। জলে আমার দুই চোক ভাসিয়া যাইতেছে। আজ কাল আমার মন শুধু শুধুই কেন যেন থাকিয়া থাকিয়া বিষাদের সাগরে পড়িয়া হাবু ডুবু খাইতেছে। আমি জাগিয়া জাগিয়াই এক এক বার কেবল দাদার আর আপনার অমঙ্গলের স্বপ্ন দেখিতেছি। দেখিতেছি, যেন রক্তের নদীতে আপনাদের দুইটী দেহ—

গুরুজি, ক্ষমা করিবেন। আমার চোক দুইটী এবার জলে অন্ধ হইয়াছে। আর লিখিতে পারিলাম না। কৃপা করিয়া চিঠি পাইবা মাত্রই উত্তর লিখিবেন।"

আপনার চিরদুঃখিনী—পাষাণ

সন্ন্যাসী দেখিলেন সত্য সত্যই লিখিতে লিখিতে কুন্তলার চোখের জল পড়িয়া চিঠির শেষ ভাগের অক্ষরগুলি মিশিয়া গিয়াছে!

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

বিষম ষড়যন্ত্র।

নিবিড় অন্ধকার। মেঘ ভরা আকাশ নিস্তব্ধ। প্রকৃতি স্থির। যেন একটা ভয়ঙ্কর ঝড় তুফানের আয়োজন হইতেছে। লীলাবতীর শয্যার পার্শ্বে দাঁড়াইয়া একজন লোক ডাকিল "লীলা, লীলা।" গভীর রাত্রির অখণ্ড স্তব্ধতার মধ্যে শব্দ গৃহ আন্দোলিত করিল।

বড়রাণী লীলাবতী গাঢ় নিদ্রার ঘোরে অচেতন হইয়া ঘুমাইতেছেন। হস্তিদন্ত-নির্ম্মিত সুন্দর পর্য্যঙ্কের উপরে বহুমূল্য ফুলদার, সূক্ষ্ম রেসমী মশারি খাটান রহিয়াছে। তাহার উপরে সোণালী জরির কাজ করা উজ্জ্বল চন্দ্রাতপ। মশারি ও চাঁদোয়ার রাঙ্গা ঝালরেও সাচ্চা জরির কাজ করা। মশারির নাম মাত্র আবরণের মধ্য দিয়া দুগ্ধফেণনিভ অথবা শাদা ধব্‌ধবে ফুটন্ত ফুল রাশিরমত শয্যার বক্ষে সুগন্ধ ফুলের বালিশ, ফুলের পাখা, ফুলের তোড়া, ফুলের মালা, ফুলের সাজ সজ্জা সকলই দেখা যাইতেছে। মশারির মধ্যে শূন্যভরে একখানি বহুমূল্য বিচিত্র শাটিনে মোড়া ক্ষুদ্র টানা পাখা অতি নিঃশব্দে হেলিতে দুলিতেছে। শয্যা হইতে ফুলের গন্ধের সহিত আতর ও মৃগনাভি প্রভৃতি নানা সুগন্ধি দ্রব্যের গন্ধে চারিদিক্ আমোদিত হইতেছে। পর্য্যঙ্কের নিম্নে রৌপ্যনির্ম্মিত সুন্দর পালঙ্ক, কৃত্রিম সিংহচতুষ্টয়ের কেশররঞ্জিত, শুভ্র স্কন্ধের উপরে শোভিত। পালঙ্কে সুন্দর কিংখাপের তাকিয়া ও বহুমূল্য আস্তরণ শোভা পাইতেছে। আস্তরণের মধ্যভাগে সূচিকার্য্য দ্বারা অঙ্কিত প্রকাণ্ড সহস্র দল সুবর্ণ পদ্মটী অতি সুন্দর কারু-কার্য্যের পরিচয় দিতেছে। সুসজ্জিত গৃহ দিবালোকে ভাসাইয়া প্রকাণ্ড স্ফটিকের ঝাড়ে ষোলটী মোটা মোটা সুগন্ধি বাতি জ্বলিতেছে। মধ্যে মধ্যে সুবর্ণাধারে সুগন্ধি তেলের প্রদীপ জ্বলিয়া জ্বলিয়া শোভা ও সুরভি বাড়াইতেছে।

ঘরের অভ্যন্তর ভাগ নীরব, নিস্তব্ধ, জনশূন্য। বাহিরে ঘাটিতে ঘাটিতে স্ত্রীলোক প্রহরীরা পালা ক্রমে নীরবে নিজ নিজ ঘাটি রক্ষা করিতেছে।

একজন পাখার দড়ী ধরিয়া অনবরত ধীরে ধীরে টানিতেছে। আজ আর ঘরের উন্মুক্ত জানালা দরজা দিয়া অল্প অল্প শীতল দক্ষিণ বাতাস আস্তে আস্তে ধীরে ধীরে ফুর ফুর করিয়া বহিতেছে না। প্রকৃতি যেন নিশ্বাস বন্ধ করিয়া মেঘান্ধকারে মুখ ভার করিয়া ক্রোধে ফুলিতেছেন। যেন শীঘ্রই একটা প্রলয় ঘটিবে। এক ডাকে লীলাবতীর ঘুমের ঘোর ভাঙ্গিল না। আবার সেই লোকটী ডাকিল "লীলা, লীলা।" আবার শব্দ, ঘর আন্দোলিত করিল।

এবার লীলাবতী পাশ ফিরিয়া শুইয়া ঘুমমাখা চোক দুইটী যেন বলপূর্ব্বক টানিয়া খুলিলেন। কিন্তু সেই অবস্থায়ই স্বপ্নের দৃশ্যের মত দেখিতে লাগিলেন, একজন খর্ব্বাকৃতি তরুণ-বয়স্ক নবীন সন্ন্যাসী তাঁহার পর্য্যঙ্কের নিম্নে পালঙ্কবক্ষে শয্যার পার্শ্বে দাঁড়াইয়া। তাঁহার মুখে ভ্রমরকৃষ্ণ শ্মশ্রু গোঁপ। মাথায় মেঘের মত সুদীর্ঘ জটা রাশি। কপালে ভ্রূমধ্যে রক্ত চন্দনের ফোঁটা। মাথায় জটারাশির উপরে জবা পুষ্প শোভিত। হাতে একটী ক্ষুদ্র শঙ্খ। সন্ন্যাসী হস্তস্থিত শঙ্খে মৃদুরবে একটী শব্দ করিলেন।

লীলা এবার চমকিয়া হুড় মুড় করিয়া খাটের উপরে উঠিয়া বসিলেন। ভয়ে ও বিস্ময়ে বুক দুড় দুড় করিতে লাগিল। গা কাঁপিতে লাগিল। লীলাবতী মনে করিলেন, চীৎকার করিবেন। কিন্তু মুখের শব্দ কিছুতেই বাহিরে ফুটিল না। কেবল অস্পষ্ট মৃদু রবে একটা হাউ মাউ শব্দ উঠিতে লাগিল। এমন সময় সন্ন্যাসী বলিলেন—"মাভৈ! স্থিরোভব।"

লীলা কাঁপিতে কাঁপিতে বলিলেন "ও পোড়ারমুখি তুই? ভাগ্যিস্!" এই বলিয়া লীলাবতী তাড়াতাড়ি মশারি সরাইয়া ফেলিলেন।

সন্ন্যাসী।—"আমি কে?"

"আচ্ছা,আর গলা ভার কো'রে কথা বলিতে হবে না।" এই বলিয়া লীলাবতী হাসিতে হাসিতে সন্ন্যাসীর মাথার উপর হইতে পরচুলের জটাগুলি তুলিয়া লইলেন। দাড়ী গোঁপ এক টানে খুলিয়া দূরে ফেলিয়া দিলেন। তখন খিল্ খিল্ করিয়া হাসিয়া, সন্ন্যাসী নিজেই কপালের ফোঁটা মুছিয়া ফেলিলেন। উপরের গেরুয়ামাটীর রঙ্ করা কাপড় ফেলিয়া নীচের কাপড় সমান করিয়া পরিলেন। সহসা সেই ছদ্ম বেশের মধ্য হইতে যেন মেঘ-মুক্ত চাঁদের মত সেই সুসজ্জিত-বেশা প্রৌঢ়া সুন্দরীর ফুটন্ত স্বর্ণ চম্পকরাশির মত রূপরাশি জ্বলিয়া উঠিল। মস্তকের পশ্চাতে জটাভারের পরিবর্ত্তে

কুণ্ডলিত কালভুজঙ্গের মত পত্র পুষ্প মণ্ডিত প্রকাণ্ড কবরী শোভা পাইল। কুন্তী, লোল কটাক্ষ দোলাইয়া ঈষৎ হাসিলেন। লীলা হাসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "এ আবার কি রঙ্গ ?"

কুন্তী।—"এ সর্ব্বনাশের রঙ্গ। চল ভাই,আর দেরি করিও না।"

লীলা।—"কোথায় যাব ? তোমার সঙ্গে যাব না, ঠিক করিয়াছি।"

কুন্তীর মুখে সহসা গাম্ভীর্য্যের ছায়া পড়িল। কুন্তী মুহূর্ত্তে সে ভাব গোপন করিয়া ঈষৎ হাসিতে হাসিতে বলিল—"আমি তোমায় কোথায় যাইতে বলিতেছি ?"

লীলা।—"কোথায় ?"

কুন্তী।—"বৈকুণ্ঠে।"

লীলা।—"বৈকুণ্ঠ কি এতই বাড়ীর কাছে ?"

কুন্তী।—"বড় দূরেও নয়। পথ বড় সোজা।"

লীলা।—"রেল খু'লেছে নাকি ?"

কুন্তী।—"ঠাট্টার কথা নয়। ঘরে একটা সিড়ি ছিল না ?"

লীলা।—"বৈকুণ্ঠের ?"

কুন্তী।—"না ঝাড়ে বাতি দিবার।"

লীলা।—"ঐ কোণে আছে।"

কুন্তী।—"মশারির দড়ী গুলি কি খুব শক্ত ?"

লীলা।—"ক'ড়ে আঙ্গুলের মত মোটা রেসমের দড়ীগুলি আবার শক্ত নয় ত কি ? কেন ? দড়ী দিয়ে কি করিবি ? কলসীও চাই না কি ?"

কুন্তী।—"কথাটা তাড়াতাড়ি ফিরাইয়া বলিল "ও যাঃ! একটা কথা ভু'লে গিয়েছি। তুমি রোজই মায়ের প্রসাদের কথা শু'নে বলিতে "মে'ঝ রাণি, মায়ের প্রসাদটা কি রকম লা ? আমায় এক দিন একটুকু দিস্ নে ভাই ?" বাবার কাছ থেকে কাল ভাই তোমার জন্য মায়ের প্রসাদ রাখিয়াছি। তুমি বো'স, আমি এক দৌড়ে নিয়ে আসি।" এই বলিয়াই কুন্তী ছুটিয়া ঘরের বাহিরে গেল। বড় রাণী মে'ঝ রাণীতে আজ কাল বিশেষ মিল। উভয়ের মহলেই উভয়ের অবারিত গতি। স্ত্রী প্রহরীরা নিরাপত্তিতে কুন্তীকে ঘাটি ছাড়িয়া দিতে লাগিল। কুন্তী দৌড়াইয়া মহলের বাহিরে একটী স্ত্রীলোকের কাছে আসিল। স্ত্রীলোকটী ভৈরবী। ভৈরবী আজ প্রাতঃকাল হইতেই মে'ঝ রাণীর মহলে আনা গনা করিতেছিল। ভৈরবী কাপালিক সন্ন্যা-

সিনী, বেতালের ভগ্নী। বেতাল এবং ভৈরবী উভয়ই নন্দনগিরির শিষ্য। কুন্তী ভৈরবীর কাছে আসিয়া বলিল "তোমার কাছে কি মায়ের প্রসাদ আছে?"

ভৈরবী।—"কেন?"

কুন্তী।—"লালা সঙ্গে যাবে না। কিন্তু লীলাকে ছাড়িয়া দেওয়া হবে না। আমি এই মাত্র খপর পাইলাম, ছোট রাণীকে একটুকু একটুকু বিষে ধরিয়াছে। বিষ মিশান দুধ অল্পই পেটে গিয়াছিল। যে বিষ মিশাইয়াছে, সে স্ত্রীলোকটা ধরা পড়িয়াছে। শশাঙ্ক আর সন্ন্যাসী ডাক্তার নিয়ে ছোট রাণীর মহলে আসিয়াছেন। ও দিকে মহারজ যাত্রা করিয়া বাহিরে গিয়াছেন। রাত্রিতেই রওনা হইবেন। তাঁহাকে আর একথা জানান হইবে না। জানিলেও তিনি আর অপেক্ষা করিতে পারিবেন না। এখন চারিদিকে হুলস্থূল গোলমাল পড়িয়াছে। লীলার একটা পথ করিয়া এখনই চলিয়া যাইতে হইবে। আমি একটা কৌশল বাহির করিয়াছি। মাকে ডাক। তিনি যেন আমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করেন।"

কুন্তীর কথা শেষ হইতে না হইতেই ভৈরবী একটুকু হাসিয়া ঝুলীর ভিতর হইতে একটী মদিরাপূর্ণপাত্র বাহির করিয়া কুন্তীর হাতে দিয়া বলিল,— "ছিন্নমস্তা তোমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করুন। এ যে প্রসাদ দিলাম, ইহা খাইতে মধুর মত মিষ্টি। কিন্তু বড় তীব্র। বেশী খাইলে অর্দ্ধদণ্ডে চেতনা হারাইতে হয়।"

কুন্তী মদিরাপাত্র নিয়ে বিদ্যুতের মত ছুটিয়া পুনরায় নিজের গৃহে প্রবেশ করিল। ঘরে গিয়া একটী সিন্দুক খুলিয়া তাহার মধ্য হইতে একটী সুন্দর সোণার বাটি বাহির করিয়া পুনরায় সিন্দুকটী বন্ধ করিল। বাটি এবং মদিরাপাত্র হাতে করিয়া কুন্তী আবার লীলার মহলের দিকেই ছুটিল। এ রাজার রাজরাণী, না মায়াবিনী রাক্ষসী?

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

লোমহর্ষণ ব্যাপার!

কুন্তী রাক্ষসী মদের পাত্র এবং সোণার পেয়ালা হাতে করিয়া দৌড়াইতে দৌড়াইতে, হাপাইতে হাপাইতে, হাসিতে হাসিতে পুনরায় লীলার

প্রকোষ্ঠে ঢুকিল। রাত্রিকালে রাণীর বিনা অনুমতিতে পরিচারিকারা প্রকোষ্ঠে ঢুকিতে পায় না। দরকার হইলে রাণী ডাকাইয়া আনেন। সুতরাং পরিচারিকারা নিজের নিজের ঘরে নাক ডাকাইয়া নির্ব্বিঘ্নে ঘুমাইতেছিল। প্রহরীরা রাণীদের কাজে মনোযোগ না দিয়া যাহার যাহার স্থানে একাকী দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া নিজের কাজ করিতেছিল। সুবিধামত কেহ কেহ দাঁড়াইয়াই দুই একবার তন্দ্রা দিয়া নিতে ছিল। কুন্তী ঘরে ঢুকিলে লীলা বলিল "প্রসাদ আনিয়াছ? দেখি কেমন?"

কুন্তী সহাস্যমুখে সোণার পেয়ালায় উজ্জ্বল রক্তবর্ণ মদিরা ঢালিলে, সহসা তাহার উপরে আলো পড়িয়া মদিরার রূপে যেন ঘর উজ্জ্বল করিল। মদিরাপূর্ণ সুন্দর সোণার বাটিটী লীলার কাছে নিয়ে বলিল "দেখ, মায়ের প্রসাদ কেমন সুন্দর!"

লীলা।—"পোড়ারমুখী, বিষ আনিস্ নাই ত? তোকে কো'রে কিন্তু একটুও বিশ্বাস নাই ভাই।"

কুন্তী হাসিতে হাসিতে পেয়ালা হইতে এক চুমুক খাইয়া বলিল "সব টুকু খাই?"

লীলা।—"না, না, দে আর খেতে হবে না।"

কুন্তী লীলার হাতে মদিরা-পূর্ণ বাটিটী দিলে, লীলা এক চুমুকে বাটিটী খালি করিয়া বলিল "বাঃ! বড় সুন্দর জিনিষ ত ভাই! কিন্তু বড়-একটা ঝাঁজ কেন বল ত? খাইতে বেশ মিষ্টি। কিন্তু বুকটা যেন জ্বো'লে যাচ্ছে।"

কুন্তী।—"আর একটুকু দিব? পাত্রে অল্পই আছে।"

লীলা।—"দেও, কিন্তু কোন ক্ষতি হবে না ত?"

কুন্তী।—"সে কিলো! মায়ের প্রসাদে ক্ষতি? তবে তোর ভাই ভক্তি না থাকিলে ক্ষতি হবে বই কি? ভয় হয় ত আর খাবার দরকার নাই।"

লীলা।—"দে, দে, যে টুকু আছে দে। আর নেকাম কো'রে দরকার নাই জানি কি ভাই, মায়ের প্রসাদ না খাইলে পাছে মা বিরক্ত হন। মা ছিন্নমস্তাকে আমি জোড় হাতে প্রণাম করি। তিনি আমার শরীরটা ভাল রাখুন। যেন ব্যামো পীড়া না হয়। আর এ সংসারে আমার ভাল মন্দের কি আছে, কি ই বা তাঁহাকে বলিব?"

কুন্তী, এবার এক মুখ হাসিয়া, পাত্র খালি করিয়া, পেয়ালাটী মুখে মুখে ভরিয়া আরও এক পেয়ালা লীলার হাতে দিয়া বলিল "খাস্ ত ভাই

একটানে ভক্তির সঙ্গে খাইয়া ফেল্। ফে'লে মে'লে দিস্ নে। দেবতার প্রসাদ নিয়ে হেলা ফেলা করাটা বড় ভাল কথা নয়।"

লীলা ছিন্নমস্তাকে উদ্দেশে মনে মনে প্রণিপাত করিয়া সত্য সত্যই পুনরায় একটানে পেয়ালা খালি করিয়া শূন্য বাটিটা কুন্তীর হাতে ফিরাইয়া দিল। এবার প্রসাদ খাইতে লীলার কিছু বেশী কষ্ট হইল। গলা ও বুক অনেকক্ষণ জ্বলিল। তখন রাক্ষসী কুন্তী, কিছুক্ষণ নীরব থাকিয়া, লীলার মুখের উপরে বিলোল কটাক্ষ ফেলিয়া, ঈষৎ হাসিয়া বলিল,—"কেন ? বাঁচিয়া থাকিতে এত সাধ কেন ?"

লীলা।—"কেন ? মরিব কেন ?"

কুন্তী।—"ইচ্ছায় না মর, কাল ডোমের হাতে ফাঁসী কাঠে চড়িয়া মরিবে। সদরে মরাটাতে বুঝি কিছু বেশী আমোদ আছে ? না ?"

লীলা।—"কি জানি ভাই। আমার গা কিন্তু বড় ঝিম্‌ঝিম্ করিতেছে। বুকের জ্বলনিটা এখনও থামে নাই। গলাও জ্বলিয়া যাইতেছে। উদ্গার তুলিলেই জ্বলনি আরও বেশী বোধ হইতেছে। একটুকু একটুকু কেমন কেমন গন্ধও যেন টের পাইতেছি। একি প্রসাদ দিলি ভাই ?"

কুন্তী, লীলার অন্য কথার উত্তর না দিয়া বলিল "জান না কেন ? ছোট রাণী বাঁচিবে না। সেবিকাটা তোমার আমার নাম বলিয়াছে। সে আগে দুধে বিষ মিশাইতে বা খাবার আর কিছুতে বিষ দিতে সুবিধা পায় নাই। দুধের বাটী ছোট রাণীর কাছে আনিয়া দিবার কালে তাহাতে বিষ মিশাইয়া দিয়াছিল। ছোট রাণী এক চুমুক দুধ খাইতেই ঠোঁটে একটুকু গুঁড়া লাগিয়া যেন চুল্‌কাইতে লাগিল। বিষটা দুধে ভাল মিশে ছিল না। জানই ত ছোটরাণী তোমার আমার চেয়ে অনেক ঝানু। ছোট রাণী দুধের বাটি রাখিয়াই সেবিকাটাকে কাছে ডাকিল। সে স্ত্রীলোকটা তাড়াতাড়ি পালাইবার যোগাড়ে ছিল। অর্জ্জুন সিংকে, আগেই ভৈরবীকে দিয়ে বো'লে দিয়েছিলাম, স্ত্রীলোকটাকে যেন যোগাড় করিয়া ফটকের বাহির করিয়া দেয়। সে লোকটার কাছে, তোমার যে আংটি আর আমার গলার একগাছি হার আছে, তাহাই সঙ্কেত চিহ্ন বলিয়া দেওয়া হইয়াছিল। আংটিতে তোমার নাম খোদা আছে। যা হোক সেবিকাটা পালাইতে পারে নাই। ছোট রাণী ডাকাতে অগত্যা সে কাছে না গিয়া পারিল না। কিন্তু ছোট রাণী তাহার মুখের চেহারা এবং রকম সকম দেখিয়াই

সন্দেহ করিয়া তাহাকে বন্ধ করিতে বলিল। দুধও তখনই ভাল করিয়া দেখিয়া স্পষ্টই বুঝিল, দুধের উপরে কি যেন ভাসিতেছে। সুরমার শরীরও তখন ঝিম্ ঝিম্ করিয়া উঠিল। স্ত্রীলোকটাকে তখনই গারোদে পাঠান হইয়াছে। হয় ত বা অল্পক্ষণ পরেই আমাদের উপরেও বিশেষ সতর্কতা নেওয়া হইবে। মহারাজ অন্তঃপুরের সমস্ত ভার সন্ন্যাসীর হাতে দিয়া গিয়াছেন। এবার ছোট রাণী মারা পড়িলে তোমার আমার লাঞ্ছনার শেষ থাকিবে না। প্রাণের পরিবর্ত্তে প্রাণদণ্ড হইবে। তাই বলিতেছিলাম,— "ফাঁসীকাঠে ঝুলিতে ইচ্ছা আছে কি?"

লীলা।—"এখন উপায় কি?"

কুন্তী দেখিল, কথা বলিতে লীলার জিভ জড়াইয়া যাইতেছে। চক্ষু রক্ত বর্ণ হইয়া উঠিয়াছে। গা টলিতেছে। লীলা এখন আর ঠিক অবস্থায় নাই। কুন্তী আবার লীলার মুখের উপরে সেই বিলোল বঙ্কিম কটাক্ষ নিক্ষেপ করিয়া মুচ্‌কি হাসি হাসিয়া বলিল—"উপায় জান না? উপায় মৃত্যু। মরিবে?"

লীলা দেখিতেছিল, সুপ্রশস্ত দ্বিতল প্রকোষ্ঠের ছাদটী প্রকাণ্ড আকাশ। ষোল বাতির জ্বলন্ত স্ফটিকের বড় ঝাড়টী, তাহাতে নিদাঘের মধ্যাহ্নসূর্য্য জ্বলিতেছে। বিশ্বসংসার কুম্ভকারের চক্রের মত চক্ষুর সম্মুখে ভন্ ভন্ করিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। সেই ঘূর্ণায়মান জগতে লীলা পা ফেলিতে গেলেই টলিয়া পড়িতেছে। দাঁড়াইয়া প্রতিমুহূর্ত্তে পড়িবার আশঙ্কায় ভীত হইতেছে। সম্মুখে কুন্তী যেন স্বয়ং ছিন্নমস্তা দেবী। লীলা পটে ছিন্ন-মস্তার চিত্রিত মূর্ত্তি দেখিয়াছিল। এবার দেখিল, সেই আকারে ছিন্নমস্তা সম্মুখে দাঁড়াইয়া বলিলেন, "মরিবে?" লীলা হতজ্ঞান হইয়া. ভয়ে ভয়ে উত্তর দিল "মরিব।" লীলার মস্তকের কবরী এলাইয়া সুদীর্ঘ বেণী পৃষ্ঠে পড়িয়া দুর্দ্দান্ত অজাগর সর্পের ন্যায় দুলিতেছে। বেশ, আলু থালু। সুন্দর মুখ খানি অস্তগামী সূর্য্যের মত রক্তাভ। বিশাল চক্ষুর্দ্বয় জ্বলন্ত অগ্নিকুণ্ডের মত লোহিতরাগ-রঞ্জিত। লীলা কাঁপিতে কাঁপিতে সেই অবস্থায় বলিল,— "মরিব।"

কুন্তী বুঝিল, ব্যাপারটা কি। "হতভাগিনী মরিবি? তবে দাঁড়া।" এই বলিয়া কুন্তী রাক্ষসী ছুটিয়া প্রকোষ্ঠের সমস্তগুলি জানালা দরজার কপাট ভিতর হইতে খিল দিয়া বন্ধ করিল। পরে কোণ হইতে সিঁড়িখানি তুলিয়া আনিয়া পর্য্যঙ্কের নিম্নস্থ পালঙ্কের উপরে বসাইল।

যেখানে একটী কড়ীর গায়ে তিন চারি হাত দূরে দূরে দুইটী মোটা লোহার কড়া ঝুলিতেছিল, সিড়িখানি ঠিক সেই স্থানে আনিয়া কড়া দুইটীর মধ্যস্থলেই বসাইল। একবার সিড়িতে উঠিয়া দেখিল, কড়া দুইটী বেশ হাতে লাগাইল পাওয়া যায়। তখন কুন্তী মশারির দুইগাছি দড়ী খুলিয়া, একবার পরীক্ষা করিয়াই, দড়ী দুইগাছির মাথায় ফাঁস দিয়া কড়ীর গায়ের লোহার কড়া দুইটীতে ঝুলাইয়া শক্ত করিয়া বাঁধিল। একবার গায়ের সমস্ত জোর দিয়া টানিয়া দেখিল, দড়ী খুব শক্ত হইয়াছে।

লীলা তখনও দেখিতেছিল, সমস্ত জগৎটা চক্ষুর সম্মুখে ভন্ ভন্ করিয়া ঘুরিতেছে। ঘূর্ণনের বেগ ক্রমেই বাড়িতেছে। সূর্য্য, চন্দ্র, তারাগুলি ছুটাছুটি করিয়া দৌড়াইয়া বেড়াইতেছে। সঙ্গে সঙ্গে নিজেও কুম্ভকারের ঘূর্ণায়মান চক্রস্থিত ক্ষুদ্র পিপ্‌ড়েটীর মত বেগে ঘূর্ণিত হইতেছে। এমন সময় ছিন্নমস্তা আসিয়া বলিলেন—"সিড়িতে চড়।"— কুন্তী, ফাঁসী প্রস্তত করিয়া লীলার কাছে দাঁড়াইয়া বলিল "সিড়িতে চড়।" তৎক্ষণাৎ লীলা সিড়িতে চড়িতে উদ্যোগ করিল। উদ্যোগ ব্যর্থ হইল। লীলা, সিড়ির গোড়ায়, টলিতে টলিতে হামাগুড়ি দিয়া পড়িয়া গেল। কুন্তী তখন তাড়াতাড়ি আসিয়া হাত ধরিয়া লীলাকে সিড়িতে টানিয়া তুলিয়া বলিল—"সিড়ির এই কাঠটা ধরিয়া দাঁড়াও।" লীলা কাঁপিতে কাঁপিতে টলিতে টলিতে কাঠ ধরিয়া দাঁড়াইয়া ভাবিতে লাগিল "ছিন্নমস্তা তাহাকে স্বর্গে নিয়ে যাইতে রথে চড়াইলেন। রথ যেন ঘুরিতে ঘুরিতে আকাশে দৌড়াইয়া চলিয়াছে। সে যেন রথে দাঁড়াইতে পারিতেছে না। তাই ভয়-বিহ্বল-চিত্তে আধ আধ কথায় বলিল "মা—প'—ড়ে—যা—ই—যে—! ধ—র—মা—ধ—র—!"

এদিকে কুন্তী তাড়াতাড়ি লীলার ঘর খুঁজিয়া একটী দেশলাইএর বাক্স সংগ্রহ করিয়া ঘরের সমস্তগুলি আলো নিবাইয়া ঘরটীকে নিবিড় অন্ধকারে পূর্ণ করিল। লীলা তখনও অন্ধকারে দাঁড়াইয়া বলিতেছিল "ধ—র—মা—ধ—র—!"

অতঃপর কুন্তী রাক্ষসী অন্ধকারে হাতড়াইয়া হাতড়াইয়া সিড়িতে চড়িয়া অন্ধকারে হাতড়াইয়া হাতড়াইয়াই একটী দড়ীর ফাঁস লীলার গলায় পরাইয়া ধীরে ধীরে ফাঁসীটী সরাইয়া দিল। নিজেও অপর দড়ী গাছটীতে ঝুলিয়া জোরে পায়ের ঠেলা দিয়া সিড়িটা সশব্দে ফেলিয়া দিল। কেবল একবার

একটী শব্দ হইল "মা——!" শব্দ স্তুপীকৃত অন্ধকার মন্থন করিয়া মিলাইয়া গেল! গৃহ গাঢ় স্তব্ধতায় পূর্ণ হইল!

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

আশার ছলনা।

গৃহে আবার একটী একটী করিয়া সমস্তগুলি আলো জ্বলিয়া উঠিল। আবার দিবালোকে প্রকোষ্ঠ ভাসিতে লাগিল। সে আলোকে লীলার দোদুল্যমান মৃত দেহের সম্মুখে কুন্তী রাক্ষসী দাঁড়াইয়া একদৃষ্টে সতৃষ্ণনয়নে কি যেন মনোযোগের সহিত দেখিতে লাগিল। উদ্বন্ধনের মৃত্যু অতি ভয়ানক মৃত্যু। ইহাতে মনুষ্যের মুখাকৃতি যেমন বিকৃত হয়, তেমন আর কোন মৃত্যুতে নয়। গাঢ় কালিমার মেঘে ঘনরূপে ঢাকা মুখের উপরে চোখের পুত্তল দুইটী যে ভাবে বাহির হইয়া থাকে, নীলাভ জিভটীর মূল পর্য্যন্ত বাহির হইয়া যে প্রকারে ঝুলিতে থাকে, নীলবর্ণ শিরাগুলি যেরূপ মুখ ও কপালের সর্ব্বস্থান ব্যাপিয়া ভাসিয়া উঠে, কেশাদি যে প্রকার আলু থালু হইয়া যায়, তাহা দেখিলে, মৃত্যুর ভীষণ মূর্ত্তি কত যে ভীষণ হইয়া প্রাণে অঙ্কিত হয়, সত্য সত্যই, সে ব্যাপার কথায় ব্যক্ত করা কঠিন। তবুও কুন্তী, গৃহস্থিত দিবালোকের মত আলোতে লীলার দোদুল্যমান মৃতদেহের সম্মুখে দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া সেই বিকৃত মুখের উপরে দৃষ্টি রাখিয়া ধ্যান ধরিয়া এক মনে কি যেন দেখিতে লাগিল। কুন্তীর মুখ দেখিয়া বোধ হইতেছিল, মনে কি যেন একটা ভয়ানক লোভের সহিত সংগ্রাম চলিতেছে। যুদ্ধে কুন্তী হারিয়া যায় যায় হইয়াছে। কুন্তী একাকী অস্পষ্ট স্বরে বলিতে লাগিল "লীলা, দিদি, আজ তোকে ফাঁকি দিলাম, না, তুই আমাকে ফাকি দিলি। যে আগুনে দিন রাত ভিতরে ভিতরে জ্বলিয়া জ্বলিয়া খাক্ হইয়া যাইতেছি, তাহার কাছে এ যে স্বর্গের সুখ। না জানি তুই কতই পুণ্যের ফলে আজ এ সুখ শান্তির অধিকারী হলি। সুরমাও চলিল। তবে কি দিদি, আমিই একাকী ভাজা ভাজা হইতে এই আগুনের মধ্যে ডুবিয়া রহিলাম! তবে দাঁড়া দিদি, দাঁড়া। আমিও তোর সঙ্গে যাব।" বলিতে বলিতে কুন্তী

আবার সিঁড়ির উপরে উঠিয়া দাঁড়াইল। আবার দড়ীর অগ্রভাগের ফাঁসিটী তুলিয়া ফুলের মালাটীর মত আনন্দে গলায় পড়িতে উদ্যত হইল। তখন আকাশ পাতাল ব্রহ্মাণ্ড কাঁপাইয়া শব্দ হইল "কি করিস্? অতি নির্ব্বোধের কাজ করিতেছিস্ যে। হতভাগিনি, কি করিস্? নিষ্কণ্টক রাজ্যে একা রাজত্ব কর্। এখন আর মরিবি কেন?" শব্দ মানুষে করিল না। শব্দ কুন্তীর প্রাণের অন্তস্তল হইতে ফুটিয়া উঠিল। অমনি কুন্তীর হাত শিথিল হইয়া পুষ্পমালা খসিয়া পড়িল। কুন্তী ভাবিতে ভাবিতে ভাবিতে সিঁড়ি হইতে আবার নামিয়া দাঁড়াইল। কুন্তী পূর্ব্ববারে মরিবার অনিচ্ছা-জন্য দড়ীগাছটী সাবধানে হাতে ধরিয়া অন্ধকারে ঝুলিয়া পড়িয়াছিল। এবার মরিবার ইচ্ছা সত্বেও, কুন্তী, আশার কুমন্ত্রণায় ফিরিল। আলো জ্বালিতে সিঁড়িটী পুনর্ব্বার তোলা হইয়াছিল।

কুন্তী, সিঁড়ি হইতে নামিয়া দাঁড়াইতে না দাঁড়াইতেই দূরে বহু সংখ্যক লোকের কোলাহল ও জয়ধ্বনিতে আকাশ ফাটিতে লাগিল। বাহিরের দিকে কিছু দূরে প্রায় চারি পাঁচ শত লোক কোলাহল ও চীৎকার করিয়া বলিতে লাগিল "জয় মহারাজকো জয়! জয় ছোট মহারাণী মাতাকী জয়! জয় যুবরাজকো জয়!" একজন বয়স্থা পরিচারিকা মহলে মহলে আসিয়া চীৎকার করিয়া পরিচারিকাদিগকে বলিয়া গেল "ওগো—তোমরা উঠিয়া হুলু দেও গো—! ছোট মহারাণী মা, মা কালীর কৃপায়, এবার মরিয়া বাঁচিয়া উঠিলেন। ডাক্তার যন্ত্র দিয়ে তাঁহার পেটের বিষ ধুইয়া ধুইয়া বাহির করাতে তিনি এখন বেশ সুস্থ হইয়া সজ্ঞানে কথা বার্ত্তা বলিতেছেন। মহারাজও এখনই যাত্রা করিলেন। তোমরা সকলে মিলিয়া হুলু দেও—!" পরিচারিকার চীৎকার থামিবার সঙ্গে সঙ্গেই চারিদিকের হুলুধ্বনিতে প্রাচীন পুরীটীর পুরাতন দালান কোঠাগুলি যেন কাঁপিতে লাগিল।

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

কুন্তীর সন্ন্যাস যাত্রা।

অর্দ্ধ ঘণ্টার মধ্যেই চারিদিকের সমস্ত কোলাহল যেন ধীরে ধীরে নিবিয়া গেল। গভীর রাত্রিতে আবার ক্রমে ক্রমে সকলেই ঘুমাইয়া

পড়িল। সমস্ত জগৎ যেন একবার মাত্র জাগিয়া পুনরায় ঘুমাইতে লাগিল। আবার অন্ধকারে অখণ্ড নিস্তব্ধতার রাজ্য বিস্তৃত হইল। কুন্তী, এবার ধীরে ধীরে পূর্ব্বের পরিত্যক্ত ছদ্মবেশী ব্রহ্মচারীর সাজসজ্জাগুলি কুড়াইয়া নিয়ে ঘরের সমস্ত আলোগুলি পুনরায় নিবাইয়া দিয়াছে। সূচিভেদ্য স্তুপাকার অন্ধকারে মিশিয়া এখনও চতুর্দ্দিকের জানালা দরজা বন্ধ ঘরে দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়াই কি যেন ধ্যান করিতেছে। রাক্ষসীর এ আবার কিসের ধ্যান?

আশা, তোমাকে কবিরা মায়াবিনী উপাধি দিয়া তাঁহাদের মনের আবেগ চরিতার্থ করিয়া থাকেন। আমরা তোমাকে এ চর্ম্ম চক্ষে কখনও দেখি নাই! কিন্তু এ ক্ষুদ্র জীবনে লক্ষ লক্ষ বার তোমার প্রভাব অনুভব করিয়াছি। তোমার হাত দেখি নাই, মুখ দেখিনাই, বাঁশী দেখি নাই, কিন্তু লক্ষ লক্ষ বার তোমার বাঁশীর স্বপ্ন মাখা মধুর গান শুনিয়াছি। সে গানে মায়া আছে, মোহ আছে, বিষ আছে, সুধাও আছে। গভীর নিস্তব্ধ অন্ধকারে বসিয়া তুমি দিন রাতই গান কর। কেন গাও? গান তোমার প্রকৃতি। তুমি সঙ্গীতময়। সঙ্গীতেই তোমার বিকাশ। তাই তুমি না গাইয়া থাকিতে পার না। তোমার গানে কার না মন টলে? পর্ব্বত কোটরে, নিকুঞ্জবনে মুনিজন ধ্যান-নিমগ্নচিত্তে তোমারই গান শুনেন। দস্যু, নর-রুধিরে ভাসিতে ভাসিতে তোমারই গানগুলি জপ করে। পাপী পাপের কূপে ডুবিতে ডুবিতে তোমার গান শুনিয়া করতালি দেয়! তোমার গানে মুমূর্ষুর নিবন্ত প্রাণ জ্বলিয়া উঠে। তোমার গানেই মুগ্ধ হইয়া পাপিয়সী কুন্তী উদ্বন্ধনের পুষ্প মালা গলা হইতে খুলিয়া ফেলিয়া ঐ অন্ধকারে দাঁড়াইয়া আছে। কুন্তী আজ তোমাকে গালি দিতেছে। বলিতেছে—"ছি, কি করিলি? নিবন্ত আগুনে ঘি ঢালিলি কেন? নিবন্ত প্রদীপ বাড়াইয়া দিলি কেন? এ বাদ সাধিলি কেন?"

কুন্তী কি শুধু তোমাকে গালি দিয়াই চুপ করিয়া আছে? না। কুন্তী ভাবিতেছে—"কি—! সুরমা মরিল না? হতভাগিনী পোড়ার মুখী বিষ খাইয়া বিষ হজম করিল? না, মরিব না। সুরমা থাকিতে মরিব না। মরিতে বড় সাধ হইয়াছিল। না মরিয়া মনে কষ্ট বোধ করিতেছি কেন? সুরমা না মরিলে মরিব না। কি,—আমি ফকীর হইব আর সুরমা স্বামীর সোহাগে, রাজভোগে, রাজ প্রাসাদে থাকিবে?" ভাবিতে ভাবিতে কুন্তীর

চক্ষু হইতে এবার জলের পরিবর্ত্তে আগুন বাহির হইতে লাগিল। সেই প্রথম দিনের মত আজ আবার কুন্তীর গ্রীবা বক্র হইল, দন্তে অধর চাপা পড়িল, গায়ের লোম কণ্টকিত হইল। কুন্তী রাক্ষসী এখন প্রকৃতই রাক্ষসীর আকার ধারণ করিল। রাক্ষসীরই মত অন্ধকাররাশি মন্থন করিয়া ধীর গম্ভীরস্বরে বলিল—"প্রতিহিংসা, প্রতিহিংসা সার!" সূচিভেদ্য স্তব্ধ অন্ধকারের মধ্যে শব্দায়মান প্রকোষ্ঠগর্ভে নিজের কণ্ঠ স্বরে কুন্তী নিজেই ভীত হইল। অন্ধকারের চক্ষু থাকিলে, আঁধার, রাক্ষসীর সেই জ্বলন্ত উগ্র-চণ্ডীমূর্ত্তি দেখিয়া ত্রাসে কাঁপিত। পৃথিবী—ঘুমন্ত পৃথিবী, ইহার কোনই অংশ পাইল না। কুন্তী, পৃথিবী স্তব্ধ দেখিয়া ঘরের একটী মাত্র কপাট খুলিয়া জ্বলন্ত উল্কাটীর মত ছুটিয়া এক দৌড়ে পুনরায় নিজের মহলে আসিল।

কুন্তীর ঘরে মণি মুক্তা খচিত অলঙ্কারাদি যে সকল মূল্যবান বস্তু, টাকা, মোহর, নোট, হীরা, মুক্তা, সোণা, রূপা ছিল, এই দুই দিনে কুন্তী ধীরে ধীরে ভৈরবীর হাতে তাহা ব্রহ্মচারীর নিকট পাঠাইয়াছে। অবশিষ্ট যাহা ছিল, তাহারও অধিকাংশ নিজের এবং লীলার মহলের প্রহরীদিগকে আর অর্জ্জুন সিং জমাদারকে ঘুস দিতেই শেষ হইয়াছে। যাহা দ্বারা কোনরূপ কাজ পাইবার সম্ভাবনা আছে, কুন্তী তাহাকেই বিনা বাক্যব্যয়ে অযাচিত রূপে চুপি চুপি পুরস্কারের নাম করিয়া প্রচুর পরিমাণে ঘুস দিয়া হাত করিয়া রাখিয়াছে। অথচ দরকার মত কচিৎ দুই এক জনকে ছাড়া মূল বৃত্তান্ত কাহাকেও ভাঙ্গিয়া বলে নাই। কাজেই কুন্তী আজ যাহা করিতে ইচ্ছা করিতেছিল, তাহাই সম্পন্ন হইতেছিল। কেবল মহারাণী বলিয়া নয়, ঘুসের বলে অনেক কাজ হইতেছিল।

কুন্তী ঘরে ফিরিয়া আসিয়া সিন্দুকে, বাক্সে যেখানে যাহা কিছু সহজে নিবার মত মূল্যবান্ বস্তু বাকী ছিল, সমস্তই গুছাইয়া একটা বড় পুটলী বান্ধিল। পরে রূপার ফ্রেমে চারি ধারে সোণালী কাজের মধ্যে মধ্যে মুক্তাদি বসান একখানি মানুষসমান উচ বড় আয়নার উপরের শাটিনের সুন্দর সোণার ফুল-খচিত আবরণ খানি এক পাশে সরাইয়া রাখিয়া তাহার সম্মুখে দাঁড়াইল। আজ কুন্তী প্রকোষ্ঠের ছাদে লম্বমান ঝাড়ের দিবালোকের মত আলোকে পরিষ্কার আয়নার মধ্যে আপনার রূপ আপনি দেখিয়া চমকিয়া উঠিল। দেখিল, সমস্ত মূর্ত্তিটীর উপরে যেন কি একটা উন্মাদপূর্ণ ভয়ানকত্বের ছায়া পড়িয়াছে। কুন্তীর মনে মনে যেন একটুকু লজ্জাও হইল।

কিন্তু সে লজ্জা ভয়কে তখনই পায়ে দলিয়া তাড়াতাড়ি প্রকাণ্ড কবরী খুলিয়া বেনীটী পিঠে ছাড়িয়া দিল। পরে সেই কাল সর্পাকার বেনীটী বাঁ হাতের মুষ্টি মধ্যে ধরিয়া, ডান হাতে খুলিয়া ফেলিতে লাগিল। চুল-গুলি এলাইয়া তাড়া তাড়ি মস্তকের উপরে তুলিয়া, সুদীর্ঘ চুলে সমস্ত মাথাটী জড়াইয়া বান্ধিল। কুন্তী চুল সমান করিয়া, তখন পরিত্যক্ত ব্রহ্ম-চারীর সাজ গোজগুলির প্রতি সতৃষ্ণ-নয়নে চাহিতে লাগিল। কিছুক্ষণ ভাবিয়া ভাবিয়া ব্যস্ততার সহিত ভৈরবীকে ডাকিল। ভৈরবী কাছে আসিলে, বলিল—"তুমি কাল যে ব্রহ্মচারীর সাজ গোজ আনিয়া দিয়াছ, এ সাজে বাহির হওয়াটা ভাল বোধ হইতেছে না। দৌড়াইয়া অর্জ্জুন জমা-দারের কাছে যাও। তাহাকে শীঘ্রই দুইটী সিপাহীর সাজ সজ্জা যোগাড় করিয়া দিতে বল গিয়ে। সে এখনই যোগাড় করিতে পারিবে। একটা যেন ছোট হয়। আর একটা তোমার মত তুমি চাহিয়া নিবে। তুমি সাজ না নিয়ে ফিরিও না। কিন্তু যাবে আর আসিবে। দেখিও দেরি যেন হয় না।"

ভৈরবী অর্দ্ধ দণ্ডের মধ্যেই সাজ নিয়ে ফিরিয়া আসিল। তখন কুন্তী নিজে একটা পরিয়া ভৈরবীকে অপরটী দিয়া বলিল—"নেও, তাড়াতাড়ি কোন রকমে জড়াইয়া নেও। এ নিস্তব্ধ রাত্রির ঘুট ঘুটে আঁধারে কেহ টের পাবে না। তবুও সাবধানের মার নাই। এ দিকের ফটক আমাদের হাতে। পুটু-লীটী নিয়ে এস। ফটকের বাহিরে বাবা আর বেতাল আছেন। তাঁহারা ঘোড়া নিয়ে অপেক্ষা করিতেছেন। তোমার হাতে বাবা কাল যে চিঠি দিয়া-ছিলেন, তাহাতে এই কথা লিখিয়াছেন। দুইটী ঘোড়ার যোগাড় হইয়াছে। বাবা আর আমি ঘোড়া ছাড়িয়া চলিয়া যাব। তুমি আর বেতাল জঙ্গ-লের পথে পালাবে। বাহিরে গিয়া আর একটীও কথা বলিও না। চুপি চুপি পরামর্শানুসারে কাজ করিও। ধর এই ছোট ত্রিশূলটী নেও। প্রহরীরা কিছু বলিলে কোন কথা না বলিয়া এইটী তাহাদের হাতে ঠেকাইও। পায়ে যত বল আছে, তত তাড়াতাড়ি চলিবে। দেখিও, যেন পায়ের শব্দ হয় না। আমার হাতেও ত্রিশূল আছে। ছিন্নমস্তাকে স্মরণ করিয়া এস।" এই বলিয়া, কুন্তী একবার ঘরের চারিদিকে সতৃষ্ণ-নয়নে তাকাইয়া একটীমাত্র দীর্ঘ নিশ্বাস ছাড়িয়াই বিদ্যুতের মত ছুটিয়া চলিল। ভৈরবী পিছে পিছে ছুটিল। দীর্ঘ নিশ্বাসের সঙ্গে সঙ্গে কুন্তীর

চোক হইতে দুইটী উষ্ণ জলের ধারা গলিয়া পড়িতে লাগিল। ভৈরবী তাহা দেখিল না। এই হইতে কুন্তীর মহল চিরদিনের জন্য শূন্য হইল!

নবম পরিচ্ছেদ।

গুপ্ত মন্ত্রণা।

আজ শ্রাবণ মাসের অমাবস্যার রাত্রি। ভয়ানক দুর্য্যোগ হইবার কথা। কিন্তু আশঙ্কার অনুরূপ ঝড় বৃষ্টি কিছুই নাই। অন্যান্য দিনের মত মেঘাচ্ছন্ন অন্ধকার আকাশ হইতে টিপ টিপ করিয়া ফোঁটা ফোঁটা বৃষ্টি পড়িয়া অন্ধকারে পৃথিবীর গাত্র ভিজাইতেছে। এই অন্ধকারে একজন অশ্বারোহী পুরুষ বায়ুবেগে প্রকাণ্ড মাঠ পার হইয়া চলিয়া আসিলেন। অশ্ব একটী প্রকাণ্ড ঘনীভূত অন্ধকার স্তুপের সম্মুখীন হইলে সহসা তাহার বেগ কমিয়া গেল। অশ্বারোহী সবলে প্রচণ্ড অশ্বের বল্গা টানিয়া ধরিয়া অশ্বটীকে ধীরে ধীরে চালাইতে লাগিলেন। এই অন্ধকার-স্তুপ মাঠের প্রান্তস্থিত একটী প্রাচীন বড় বকুল বৃক্ষ। অশ্ব, আরোহী পৃষ্ঠে করিয়া ধীরে ধীরে এই গাছের নীচে ঘনীভূত আঁধারে গা ঢাকিল। তখন অন্ধকারে শব্দ উঠিল "শক্তির জয়!" অশ্বারোহী বুঝিলেন, গাছের নীচে পূর্ব্বনির্দ্দেশানুসারে ব্রহ্মচারী নন্দনগিরি তাঁহার অপেক্ষায় দাঁড়াইয়া আছেন। পুরুষ তাড়াতাড়ি অশ্বের পৃষ্ঠ হইতে নামিয়া অন্ধকারে অশ্বের মুখের দড়ী ধরিয়া দাঁড়াইয়া বলিলেন,—"প্রাতঃপ্রণাম। আপনি এখানে কতক্ষণ অপেক্ষা করিতেছেন?"

নন্দনগিরি।—"বেশীক্ষণ নয়। আপনি ঠিক সময়ই আসিয়াছেন। কথাবার্ত্তা একটুকু আস্তে আস্তে বলিবেন। জানি কি, কোথা হইতে কেহ যদি শুনিতে পায়, তবে অনিষ্ট হইবে। আমি আলোর যোগাড় করি নাই।"

পুরুষ।—"আমিও সঙ্গে অপর লোক আনি নাই। আলোর যোগাড় কাজেই করি নাই। চলুন অন্ধকারেই যাইব।"

নন্দনগিরি।—"এখান হইতে এই ছোট পাহাড়টীর ধারে ধারে প্রায় এক মাইল যাইতে হইবে। পথটী খুব উচ নীচ। দুই ধারে বড় বন জঙ্গল। আপনি আমার সঙ্গে আসুন। ঘোড়াটী এই গাছের একটী নীচ ডালের সঙ্গে বাঁধিয়া রাখুন।"

যে অশ্বারোহী পুরুষটীর সঙ্গে নন্দনগিরি অন্ধকারে দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া কথা বার্ত্তা বলিতেছিলেন, ইহাঁর নাম জয়নারায়ণ চৌধুরী। জয়নারায়ণ বিলাসপুরের রাজার অধীনস্থ একজন বড় তালুকদার। চৌধুরী মহাশয় ব্রহ্মচারীর কথা মত বকুল গাছের গোড়ার একটী ডালের সঙ্গে ঘোড়ার মুখের দড়ীগাছটী শক্ত করিয়া বান্ধিয়া, ধীরে ধীরে তাঁহার পিছে পিছে চলিলেন। বিদ্যুতের আলোতে পথের সঙ্কীর্ণ রেখা ও চারি ধারের বন জঙ্গলের জলার্দ্র নিবিড় সবুজ দৃশ্য বারম্বার চোখে ভাসিয়া ভাসিয়া আঁধারে ডুবিতে লাগিল। বামদিকের জঙ্গলাকীর্ণ পাহাড় ও দক্ষিণ পার্শ্বের অতল গুহা দেখিয়া অন্ধকারে জয়নারায়ণের মনে একটুকু একটুকু ভয় হইতেছিল। এমন সময় হঠাৎ সম্মুখের বনের মধ্যে আগুনের দুই চারিটী জ্বলন্ত শিখা ও আলো দেখা যাইতে লাগিল, কিন্তু একটা বিকট দুর্গন্ধে নাক ফাটিয়া যাইতেছিল। তাহাতে স্পষ্ট বোধ হইতে লাগিল, আগুনে কিছু একটা পোড়ান বা ঝলসান হইতেছে। গন্ধ অসহ্য হওয়াতে জয়নারায়ণ নাক টিপিয়া ধরিয়া ব্রহ্মচারীকে ধীরে ধীরে নাকের সুরে জিজ্ঞাসা করিলেন—"মহাশয়, সম্মুখের জঙ্গলের মধ্যে কি আগুন জ্বালিয়া কেহ কিছু পুড়িতেছে?"

নন্দনগিরি।—"ও সকল দিকে চোক কান দিবেন না। আজ মঙ্গলবার, অমাবস্যার রাত্রি। এটী আমাদের সাধন ভজনের পক্ষে বড় প্রশস্ত রাত্রি। আজ এখানে সমস্ত রাতই ছিন্নমস্তার পূজা অর্চ্চনায় কাটিয়া যাইবে। বেতাল মায়ের পূজার আয়োজনাদি করিতেছে। উদিকে মন না দিয়া চলিয়া আসুন। দেবার্চ্চনার কাজে ঘৃণা প্রকাশ করিতে নাই। ছিন্নমস্তা এ ঘোর কলিতেও অতি জাগ্রত দেবতা।"

ব্রহ্মচারীর কথা শুনিয়া জয়নারায়ণ শিহরিয়া দুইটী হাত জোড় করিয়া উদ্দেশে ছিন্নমস্তাকে প্রণাম করিলেন। কিন্তু পুনরায় কিছুতেই নাক না টিপিয়া ধরিয়া থাকিতে পারিলেন না। কিছু দূরে আসিয়া এবার নন্দনগিরির সঙ্গে সঙ্গে একটা বহুদিনের প্রকাণ্ড প্রাচীন দীঘীর উচ পাড়ের উপর দিয়া পথ ধরিয়া চলিলেন। আগুনটা এই দীঘীর পাড়ের উপরেই জ্বলিতেছিল। চৌধুরী মহাশয় দূর থেকেই দেখিতেছিলেন, একটা ঝাপসা-চুল, মসীবর্ণ তালগাছের মত পুরুষ অদৃশ্যপ্রায় একখানি ছোট কপ্নী পরিয়া জ্বলন্ত আগুন হইতে কি যেন একটা তুলিয়া নিয়ে কতকগুলি কাঁচা লতাপাতায় জড়াইয়া কাঁধে ফেলিয়া চলিয়া গেল। যাইবার কালে আগুনটা

একটা গাছের কাঁচা ডাল দিয়া নাড়িয়া নাড়িয়া নিবাইয়া দিল। আগুন সামান্য খড় কুটা দ্বারা জ্বালিয়াছিল। ঘন ঘন বিদ্যুতের আলোতে দীঘীর চারি পাড়ের ভাঙ্গা সিঁড়ি ও কাল জলরাশির সহিত দীঘীর সমস্ত প্রসারটী চোখে ভাসিতে লাগিল। দীঘীর চারিটী পাড়ের উপরের বড় বড় প্রাচীন দেবদারু গাছের বনের দৃশ্য জলেরই মত ঘন নিবিড় মেঘের ন্যায়। গাছের চিরান্ধকারপূর্ণ ডালের ও পাতার ঝোপে বসিয়া, থাকিয়া থাকিয়া পর্ব্বতাঞ্চলের একরূপ পেচক ঘন ঘন চীৎকার করিতেছিল। আকাশে মেঘ ছুটাছুটি দৌড়াদৌড়ি করিতেছিল। জয়নারায়ণ পাহাড়ের শিখর-দেশে এত বড় একটী বহুকালের প্রাচীন প্রকাণ্ড দীঘী দেখিয়া প্রীত ও চমৎকৃত হইলেন। নন্দনগিরি জয়নারায়ণকে দীঘীর দক্ষিণ পার হইতে পশ্চিম পার ঘুরিয়া উত্তর পারের কোণে জঙ্গলাবৃত একটী মন্দিরের নিকটে আনিয়া উপস্থিত করিলেন। জয়নারায়ণ কখনও একসঙ্গে এত পথ হাটেন নাই, তাহা নয়, কিন্তু এত পথশ্রান্তি কখনও ভোগ করেন নাই। জয়নারায়ণ মন্দিরের কাছে আসিয়া ব্রহ্মচারীকে বলিলেন "মহাশয় এখানে কোথায়ও বসিয়া একটুকু বিশ্রাম করা যাক্।"

"আসুন, আমার বাড়ীতেই বসিবেন।" এই বলিয়া ব্রহ্মচারী মন্দিরের পিছনে একটুকু দূরে একটী জঙ্গলাবৃত পুরাতন দালান কোঠার ভগ্নাবশেষপূর্ণ বাড়ী ছাড়াইয়া অপর একটী বাড়ীতে উপস্থিত হইলেন। এখানে সুন্দর সুন্দর কয়েকটী একতলা ও একটী দোতলা ইষ্টক গৃহ, সুন্দর প্রাচীরে বেষ্টিত রহিয়াছে। ভিতরে বাহিরে দুইটী প্রাঙ্গন। জয়নারায়ণ বাহিরেরটীই দেখিলেন। দেখিলেন, প্রাঙ্গনটী সুন্দর পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। উঠনের কোণে কয়েক ঝাড় রক্তজবা ও একটী রক্তকরবীর গাছ আছে। মধ্যস্থলে একটী বিল্ব বৃক্ষ। বেল গাছটীতে কতকগুলি অপরাজিতা ফুলের গাছ লতিয়া লতিয়া উঠিয়াছে। জয়নারায়ণকে একটী একতলা ঘরে যত্নপূর্ব্বক বসিতে দিয়া ব্রহ্মচারী বলিলেন—"মহাশয়, মহারাজই আমাকে এই বাড়ীটী তৈয়ের কো'রে দিয়েছেন।" ঘরে পূর্ব্ব হইতেই প্রদীপ জ্বলিতেছিল। ব্রহ্মচারী, "বিজয়া, বিজয়া" বলিয়া ডাকিতে, বাড়ীর ভিতর হইতে এক জন পরিচারিকা ছুটিয়া আসিল। নন্দনগিরি বিজয়াকে তামাকু দিতে বলিয়া জয়নারায়ণের কাছে ঘেসিয়া বসিলেন। বিজয়া তাড়াতাড়ি তামাকু সাজিয়া কোন্ হুকা দিবে ভাবিয়া ইতস্তত করিতে লাগিল। বিজয়ার

মুখের দিকে চাহিয়া নন্দনগিরি "কায়স্থের হুকা দেও" বলাতে, বিজয়ার যেন দম ফিরিয়া আসিল। বিজয়া জয়নারায়ণকে তামাক দিয়া প্রস্থান করিলে, ব্রহ্মচারী জিজ্ঞাসা করিলেন—"আপনারা কত লোকের যোগাড় করিতে পারিবেন ?"

জয়নারায়ণ।—"সমস্তগুলি পরগণাতে প্রায় চারি পাঁচ শত তালুকদার আছে। সকলের উপরে হার করিয়া আমরা প্রায় সাত আট শত লাটিয়াল এবং বাজে লোকও পাঁচ ছয় শত দিতে পারিব। মোটের উপরে দেড় হাজার ধরিয়া রাখুন।"

নন্দন গিরি।—"এই সমস্তগুলি তালুকদারেরই কি এক স্বার্থ ?"

জয়।—"আমাদের কাহারও তালুকের কোন রূপ পাকা বন্দোবস্ত নাই। রাজা ইচ্ছা করিলেই খাজানা বাড়াইতে পারেন। পরে আমরা প্রত্যে-কেই একশত বিঘা বলিয়া আট শত দশ শত বিঘা পর্য্যন্ত ভোগদখল করিতেছি। রাজার অবস্থা ভাল হইলেই তিনি জরিপ দিয়া তদন্ত করিয়া খাজনা বাড়াইয়া নিবেন। এখন আমরা পাঁচ বছরে এক বছরের খাজানা দাখিল করিয়া থাকি। তখন হয়ত তাহারও সুবিধা হইবে না। এই জন্য আমাদের ইচ্ছা রাজার অবস্থা অত্যন্ত খারাপ হউক। অথচ প্রকাশ্যে আমারা কিছু করিতে পারি না। আপনি অধিনায়ক থাকিয়া রাজ-বাড়ী লুটিলে আমাদের ঘাড়ে ঝোক পড়িবে না। এ দিকে আপনারও অভিষ্ট সিদ্ধ হইবে।"

নন্দন।—" আমি বড় বেশী হয়ত তিন চারি শ কিম্বা পাঁচ শ লোক যোগাড় করিতে পারিব। পাহাড়ীরা রাজ-ভক্ত প্রজা। তবে মে'ঝ রাণীর নামে অনেকে সম্মত হইয়াছে। পাহাড়ীরা তীর ও বন্দুক দুইই চালাইতে পারে। অর্জ্জুন সিংহ জমাদার প্রায় কুড়িজন পাহারার সিপাহী নিয়ে পাহাড়ে আসিয়া পালাইয়া আছে। লুট পাটে অর্জ্জুনও দল বল নিয়ে যাইবে। তাহা-দের সকলেরই বন্দুক এবং কিছু কিছু গুলি বারুদ আছে।"

জয়।—"মহাশয়, আমার বোধ হয়, এই লোকেই যথেষ্ট হইবে। রাজ-বাড়ী এখন সর্ব্ব সমেত চল্লিশ জন সিপাহী আছে। তাহার মধ্যে দশ জন করিয়া কুঞ্জবাগানে থাকে। যাহা কিছু সিপাহী ছিল মহারাজ চারিদিক হইতে সংগ্রহ করিয়া সঙ্গে নিয়ে পাহাড়ে গিয়েছেন। গভর্ণ-মেণ্টের যে নিয়ম আছে, রাজার সৈন্য সংখ্যা তাহার অপেক্ষা কম। বেশী

সৈন্য রাখিবেন কোথা থেকে? যে সিপাহীগুলি আছে তাহাদেরই বেতন যোটে না। গভর্ণমেণ্টকে বুঝ দিতে হইলেই গোঁজামিল দিতে হয়। সামাজিক ও বৈষয়িক নানা প্রকার গোলমাল তুলিয়া তলে তলে রাজাকে চারিদিক্ হইতে জব্দ করিয়া রাখা হইয়াছে। এবার এটা হইলেই চূড়ান্ত জব্দ হইলেন। কিন্তু আমরা গভর্ণমেণ্টকে চাই না। জব্দ হইয়া রাজাই রাজ্য করুন, এই আমাদের ইচ্ছা।" আমরা অতি সংগোপনে যোগাড় করিয়া ভাদ্র মাসের দোসরা তারিখে গোপনে গোপনে অল্পে অল্পে পাহাড়ের দিকে লোক পাঠাইব। এ দিক্‌কার যোগাড় আপনি করিবেন। আমাদের আর দেখা পাইবেন না। সাবধান! আমরা ইহাতে আছি, কিছুতেই যেন ইহা প্রকাশ পায় না, মহাশয়।"

নন্দগিরি গম্ভীর ভাবে জয়নারায়ণের কথাগুলি শুনিলেন। জয়নারায়ণের কথা শেষ হইলে, বলিলেন—"চলুন, ছিন্নমস্তাকে প্রণাম করিয়া আপনাকে বকুল তলায় পৌঁছাবার যোগাড় কো'রে দেই। এবার আলো সঙ্গে দিয়ে একজন লোক দিব। আপনি নিশ্চিন্ত হইয়া পরামর্শানুযায়ী কাজ করিবেন। বিলাসপুরের রাজবাড়ীতে শৃগাল ডাকাইব, এই আমার প্রতিজ্ঞা। ছিন্নমস্তা অভিষ্ট পূরাইবেন।" এই বলিয়া ব্রহ্মচারী জয়নারায়ণকে নিয়ে ছিন্নমস্তার মন্দিরের দিকে চলিলেন। জয়নারায়ণ দেখিলেন, মন্দিরটী অতি প্রাচীন। উপরে অনেক বট ও অশ্বত্থের গাছ উঠিয়া জঙ্গল হইয়া আছে। ভিতরের অবস্থাও জীর্ণ। দ্বারে এক জোড়া ভাঙ্গা কপাট ঝুলিতেছে। মন্দিরের একটী বই দ্বার বা গবাক্ষ নাই। জয়নারায়ণ দেব মন্দিরের অভ্যন্তরে যাইতে সঙ্কোচিত হইলে, ব্রহ্মচারী বলিলেন—"মন্দিরের মধ্যে আসুন। মাকে স্পর্শ না করিলেই হইল। একটুকু দূরে দাঁড়ান।"

জয়নারায়ণ মন্দিরের অভ্যন্তরে গিয়া দেখিলেন, প্রায় সাড়ে চারি হস্ত উচ্চ, অষ্টধাতুনির্ম্মিত প্রকাণ্ড দেবীমূর্ত্তি, সম্মুখের প্রস্তর-বেদীর উপরে জীবন্তবৎ দাঁড়াইয়া আছেন। দেবী তীক্ষ্ণধার খড়্গে আপনার মস্তক আপনি ছেদন করিয়া হস্তে ধারণ করিয়াছেন। মুণ্ডের মেঘরাশির মত কেশ রাশি ছড়াইয়া মৃত্তিকায় লুটাইতেছে। প্রকাণ্ড চক্ষু তিনটী মৃতের মত তেজোহীন নয়। কিন্তু তাহা হইতে যেন তেজে অগ্নিশিখা নির্গত হইতেছে। চক্ষুর পুত্তল গুলি হীরকে নির্ম্মিত বলিয়া এইরূপ ঘটনা ঘটিয়াছে। ছিন্নমস্তার ছিন্ন কণ্ঠ হইতে সবেগে রুধিরধারা সকল উত্থিত হইয়া

বক্রভাবে নিম্নদিকে পড়িতেছে। রক্তের প্রধান ধারাটী দেবীর হস্তস্থিত ছিন্ন মুণ্ডের মুখেই আসিয়া পড়িয়াছে। অপর দুইটী ধারা, দক্ষিণে ও বামে দণ্ডায়মান জীবন্তবৎ প্রকাণ্ড ডাকিনীদ্বয়ের লোলজিহ্বাগ্রে পতিত হইয়াছে। বিন্দু বিন্দু রুধিরে দেবীর সর্ব্বাঙ্গ রুধিরাক্তবৎ প্রতীয়মান হইতেছে। দেবীর সম্মুখে দুইটী বড় পিত্তলের পিলসুজের উপরে শরার মত দুইটী বড় দীপাধারে প্রকাণ্ড মোটা সলিতা চট্ পট্ শব্দে ধূ ধূ করিয়া জ্বলিতেছে। তাহা হইতে বিকট দুর্গন্ধের সহিত গন্ধকের আলোর মত নীলবর্ণ আলো ছড়াইয়া মন্দিরগর্ভের কতকাংশ এবং দেবীর সর্ব্বাঙ্গ আলোকিত করিয়াছে। নীলবর্ণ আলোকের প্রতিফলনে সমগ্র দেবীমূর্ত্তিটী চক্ষুর ভীতিপ্রদ একরূপ অতি ভয়ানক দৃশ্য হইয়া উঠিয়াছে। জয়নারায়ণ জিজ্ঞাসা করাতে জানিলেন, মরা মানুষের গায়ের চর্‌বিতে দ্রব্যবিশেষ মিশ্রিত করিয়া প্রদীপ জ্বালা হইয়াছে। এক পার্শ্বে ধূনচিতে ধূমরাশি ছড়াইয়া ধূনা ও গুগ্‌গুল জ্বলিতেছে। দেবীর সম্মুখস্থ পূর্ণ কলস এবং বেদীর উপরে রাশি রাশি পুঞ্জ পুঞ্জ বিল্বপত্র, রক্তজবা, অপরাজিতা, দুর্ব্বাদল, আতপ তণ্ডুল রক্তচন্দনে মাখামাখি হইয়া স্তুপাকারে সজ্জিত রহিয়াছে। প্রকাণ্ড তাম্রপাত্রে দেবীর চরণামৃতস্বরূপ রক্তবর্ণ সুমিষ্ট তীব্র সুরা দীপালোকে টল্ টল্ ঢল্ ঢল্ করিতেছে। জয়নারায়ণ ভয়ে বিস্ময়ে, ভক্তিভরে মাকে প্রণিপাত করিলে, ব্রহ্মচারী তাঁহার হস্তে একখানি তাঁবার ক্ষুদ্র হাতায় করিয়া এক হাতা দেবীর চরণামৃত দিলেন। জয়নারায়ণ কপালে ও মাথায় ঠেকাইয়া ভক্তির সহিত পান করিলেন। নন্দনগিরি, নিজহস্তে জয়নারায়ণের ললাটদেশ রক্তচন্দনে মাখাইয়া, মাথায় পূর্ণ কলসের উপর হইতে একটী রক্তজবা তুলিয়া দিয়া বলিলেন—"আসুন দেবীর ওপাশে যজ্ঞ হইতেছে। যজ্ঞের প্রসাদ গ্রহণ করিলে ছিন্নমস্তা চিরদিন প্রসন্ন থাকেন।"

জয়নারায়ণ দেবীর সম্মুখ হইতে পার্শ্বের দিকে কয়েক পা ফেলিয়াই দেখিলেন, সম্মুখে মন্দিরের গর্ভস্থ ভূমি, যে স্থানে দাঁড়াইয়াছেন, তাহার অপেক্ষা প্রায় তিন হাত নীচ। সেই গর্ত্তের মত স্থানে নামিবার একটী সিঁড়িও আছে। কিন্তু সেখানে এক অদ্ভূত ব্যাপার সমাধা হইতেছে। এখানেও মানুষের মাথার খুলিতে খালি মরা মানুষের শাদা ধব্‌ধবে চর্‌বির একটী প্রদীপ জ্বলিতেছে। দীপালোকে সেই তালগাছের মত পুরুষ একটী জ্বলন্ত অগ্নি কুণ্ডের সম্মুখে বসিয়া, সেই কাঁচা লতা পাতায় জড়ান একটা মানুষের

মৃত শবের ঝলসান হাত পা গুলি কাটিয়া কাটিয়া নৈবিদ্য সাজাইতেছে। এবার পুরুষের বেশ পরিবর্ত্তিত। পরিধানে গাঢ় মসিবর্ণ কাল জঙ্ঘার উপরে তোলা একখানি খাট রক্তবস্ত্র। গলা হইতে বুকের উপর দিয়া নাভি পর্য্যন্ত এবং দুই হাতের কব্জিতে মানুষের মেরুদণ্ডের গোল গোল অস্থি খণ্ডের মালা। তাহার নিম্নে একটী শাদা পৈতের গোছাও শোভা পাইতেছে। কপালে প্রভাত কালের সূর্য্যের মত কপালজোড়া একটী তৈলাক্ত সিন্দুরের ফোঁটা। মাথায় ঝাপ্‌সা, লম্বা, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জটার মত চুলের বোঝার উপরে অর্ঘ্যের সহিত বড় একটী রক্তজবা রহিয়াছে। চক্ষু দুইটী মদিরারাগে রক্তবর্ণ। পুরুষ জয়নারায়ণকে দেখিয়া, আস্ত আস্ত মূলার মত দুই পাটি ফাক্ ফাক্ দাঁত বাহির করিয়া এক মুখ হাসিয়া ফেলিল। হাসিতে হাসিতে উৎসর্গীকৃত নৈবিদ্য হইতে এক খানি মরা মানুষের ঝল্‌সান হাত তুলিয়া, জয়নারায়ণের মুখের কাছে নাড়িয়া নাড়িয়া বলিল—"ধর, মায়ের মহা প্রসাদ খাও।" জয়নারায়ণ এবার বালকের মত ভয়ে কাঁপিতে কাঁপিতে ব্রহ্মচারীকে দুই বাহুতে জড়াইয়া ধরিয়া বলিলেন—"মাপ করুন, মাপ করুন।" ব্রহ্মচারী হাসিয়া বলিলেন—"ভয় নাই, ভয় নাই, অভ্যাস না থাকে দরকার নাই।" বেতাল আস্তে জয়নারায়ণের হাতখানি ধরিয়াছিল। ব্রহ্মচারীর কথায় হাত ছাড়িয়া হাসিতে হাসিতে আবার সেই অগ্নিকুণ্ডের নিকটেই বসিল। জয়নারায়ণ দেখিলেন, ধৃত হস্তের হাড় খানি, আর একটুকু জোর পড়িলেই চূর্ণ হইয়া যাইত। জয়নারায়ণের এবার সুস্পষ্ট প্রতীতি হইল, ব্রহ্মচারী এই সকল দৈত্যের সাহায্যে অনায়াসেই বিলাসপুরের রাজবাড়ীতে শৃগাল ডাকাইতে পারিবেন। ব্রহ্মচারীর অনুরোধে জয়নারায়ণ পুনরায় মাকে প্রণিপাত করিয়া মন্দিরের বাহিরে আসিলে, একজন লোক জ্বলন্ত লণ্টন নিয়ে জয়নারায়ণের অগ্রে অগ্রে চলিল।

দশম পরিচ্ছেদ।

বিপদ্ ঘিরিল!

ভাদ্র মাসের বেলা শেষ হইয়া আসিয়াছে। অস্তগামী সূর্য্য দূরপল্লির ধূম্র বর্ণ রেখার পশ্চাতে হেলিয়া পড়িয়াছে। একজন পাগলিনী বিলাস-

পুরের প্রাচীন পুরীর ফটকে আসিয়া হাতে তালি দিয়া নাচিয়া নাচিয়া পূরবীতে একটী গান গাইতে লাগিল। পাগ্‌লীর সুর মিষ্ট। তাল, মান, রাগ, রাগিনী সবই ঠিক। তবে পদগুলি এ'লো মে'লো। একটা গানের আগায়, অন্যটার গোড়ায়, অন্য একটার মাঝ খান যুড়িয়া গাইতে লাগিল। প্রহরী পাগ্‌লীকে পুরীর মধ্যে ঢুকিতে বারম্বার নিষেধ করিলেও, পাগ্‌লী সে কথায় কাণ না দিয়া সপ্তমে গলা ছাড়িয়া আপনার মনেই গাইতে লাগিল। পাগলিনী একটী হিন্দী গান গাইতেছিল। পাগ্‌লীর গান শুনিয়া পুরীর মধ্য হইতে একটী একটী করিয়া ক্রমে দশ পনর জন সিপাহী আসিয়া দ্বারদেশে ভিড় করিয়া দাঁড়াইল। পাগলিনীর মধুর গান শুনিয়া সকলেরই ইচ্ছা হইল, পাগ্‌লীকে পুরীর মধ্যে আসিতে দেওয়া যাক্। পাগ্‌লীর পরিধানে ফকীরের গুদ্‌ড়ির মত শত সহস্র গ্রন্থি যুক্ত এক খানি বহুকালের ধূলা মলা জড়ান কাপড় ঝল্ মল্ করিতেছে। গায়ে, মুখে, হাতে, পায়ে বহুদিনের মলা, ছাই, মাটি, কালি যেন জমাট বাঁধিয়া গিয়াছে। মাথার চুলে জটা পড়িয়াছে। কাণে রাস্তা হইতে কুড়াইয়া একখানি কাকের পালক গুজিয়া রাখিয়াছে। পাগ্‌লী গাইতে গাইতে সিপাহীদের সঙ্গে ফটক পার হইয়া পুরীর ভিতরে প্রবেশ করিল। সূর্য্য তখনই অস্ত পাট ছাড়িয়া অদৃশ্য হওয়াতে গোধূলীর আঁধারে ভগ্নাবশিষ্ট প্রাচীন পুরীর মুখ যেন মলিন হইয়া উঠিল।

পাগ্‌লী, একটী, দুইটী, তিনটী, চারিটী এইরূপে অনেকগুলি গান করিল। একজন সিপাহী একটা ভাঙ্গা শারঙ্গ এবং একগাছি ছড় আনিয়া বাঙ্গলা করিয়া বলিল—"পাগ্‌লী বাজা'তে পারিস্?" পাগ্‌লী খিল্ খিল্ করিয়া হাসিয়া বলিল—"পারিও নাও পারি। পারি ত পারি, না পারি ত পারিই না।"

সিপাহী।—"ধর্, এটা তোকে হামি দিলে। আর ফের্ মাঙ্গি না।"

বাঙ্গালা বলিতে পারে বলিয়া এ সিপাহীর কিছু অভিমান আছে। এই জন্য সিপাহী জি পাগ্‌লীর সঙ্গে হিন্দী না বলিয়া বাঙ্গালা বলিল। পাগ্‌লী সিপাহীর হাত হইতে শারঙ্গ কাড়িয়া নিয়ে, কোলে ফেলিয়া, স্কুলের দুষ্ট ছেলেটার মত কয়েকটা কাণমলা দিয়া, সুন্দর বোল বাহির করিয়া গাইতে লাগিল—

"সেই ভোরে ফু'টেছে ফুল, এ'ল সন্ধ্যা বেলা।
কেউ না তুলিল ফুল ভ'রে ফুলের ডালা।

কেউ না গাঁথিল মালা পরিতে গলায়।
কেউ না ঢালিয়া দিল দেবতার পায়।
সইরে—,সেই সে মনের দুখে আঁখি ঝরে তিন বেলা।
কি দোষে যমবরা আমি অভাগী কুলীন বালা!"

শারঙ্গের সঙ্গে পাগ্লীর স্বর যেন এক হইয়া অন্ধকার পুরীর মধ্যে নাচিতে লাগিল। ক্রমে ক্রমে চারিদিকের ফটকের কপাট বন্ধ হইল। তবুও পাগ্লীকে কেহ বাহির করিয়া দিল না। এক প্রহর রাত্রি পর্য্যন্ত পাগ্লী সিপাহীদের ঘরের দ্বারে দ্বারে গান করিল। গভীর রাত্রিতে পাগ্লী সমুদ্র তুল্য প্রকাণ্ড অন্ধকার পুরীর কোথায় পড়িয়া রহিল কেহই মনোযোগ দিল না। জগতে সামান্য মনোযোগ এবং বিবেচনার অভাবে সময় সময় তুচ্ছ ঘটনা অবলম্বন করিয়া কত মহাবিপদ্ উপস্থিত হইয়া থাকে। এরূপ স্থলে প্রায়ই ধ্বংস স্বয়ং উপস্থিত হইয়া, সমস্ত শ্মশানের আগুনে বা পৃথিবীর ধূলায় মিশাইয়া গম্ভীর স্বরে উপদেশ দিয়া চলিয়া যায়। পাগ্লী ভৈরবী। ভৈরবী বহুকাল হইতে চুপ চাপ করিয়া রাজবাড়ীতে রাণীদের মহলে আনাগনা করিত। আজ ভৈরবী যে সাজে সাজিয়া আসিয়াছে, তাহা দেখিয়া কেহই চিনিতে পারিল না। ভৈরবী, গভীর রাত্রিতে চারিদিক্ নিস্তব্ধ হইলে, ধীরে ধীরে পুরীর প্রাচীরের গায়ের একটী জীর্ণপ্রায় গুপ্ত দ্বার খুলিয়া, হাতে মুখ সংলগ্ন করিয়া বাঁশীর মত একটী শব্দ করিল। ভৈরবী শব্দ করিবামাত্র, তৎক্ষণাৎ প্রাচীরের গায়ে সংলগ্ন জঙ্গল হইতে পিপ্ড়ের সারির মত বহুসংখ্যক লোক আসিয়া নিঃশব্দে পুরীর গর্ভ পূর্ণ করিয়া ফেলিল। জঙ্গলে যত লোক ছিল সমস্তগুলিই নিঃশেষ রূপে পুরীর মধ্যে প্রবেশ করিলে, তখন সর্ব্বপ্রথমেই অর্জ্জুনসিং জমাদার দলবল সহ আসিয়া অতর্কিত ভাবে দুই কোবে দুইজন প্রহরীকে কাটিয়া অস্ত্রাগারটী দখল করিল এবং তৎক্ষণাৎ মৃত সিপাহীদের বন্দুকাদি কাড়িয়া লইল।

অস্ত্রাগার দখল হইলে, বেতাল, পূর্ব্ব পরামর্শানুসারে অনেক লোক নিয়ে বাহির হইতে রাশি রাশি শুষ্ক কাষ্ঠাদি আনিয়া পুরীর মধ্যে স্তুপাকার করিতে লাগিল। অর্জ্জুন বেতালকে ডাকিয়া বলিল—"যত কাঠ পারেন সংগ্রহ করুন। পুরীর মধ্যে অনেক খ'ড়ো ঘর আছে। আপনি আর্মান সরদারকে তাহার দলের লাঠিয়াল নিয়ে লুঠ করিতে বলিবেন। পাহাড়ীরা তীর ধনুক বন্দুক নিয়ে আমাদের দুই পাশে থাকিবে। আমরা মাঝে থাকিয়া বন্দুক

চালাইব। যে দুইটী ব্যবহারের মত ভাল কামান ছিল, তাহা আমাদের দখলে আসিয়াছে। গোলা, গুলি, বন্দুক এখন সবই আমাদের দখলে। রাজার সিপাহীদের প্রত্যেকের হাতে বন্দুক আছে বটে কিন্তু তাহাদের নিকট অল্প মাত্রই গুলি বারুদ আছে। তাহা দিয়া বহুক্ষণ লড়িতে পারিবে না। সিপাহীরা হটিয়া গেলে, আপনি বাজে লোকগুলিকে নিয়ে, আমরা লুট পাট করিতে করিতে সরিয়া গেলেই, পরিত্যক্ত দিকে আগুন লাগাইয়া দিতে থাকিবেন।" নীরবে কার্য্য চলিতে লাগিল।

একাদশ পরিচ্ছেদ।

"কেহ না রহিল হায় বংশে দিতে বাতি!"

যন্ত্র দিয়া সুরমার পাকস্থলী ধুইয়া ফেলাতে তখন তখন বিষের প্রবল প্রকোপ দমন হইয়াছিল বটে কিন্তু সময়ে আবার তাহা ক্রমে ক্রমে বাড়িয়া উঠিল। বিষম বিষের ঝাঁজে ধীরে ধীরে তিল তিল করিয়া কৃষ্ণপক্ষের চাঁদের মত সুরমা সুন্দরীর সুন্দর দেহ ক্ষীণ হইতে লাগিল। আজ প্রদীপ নির্ব্বাণোন্মুখ। সুরমাকে চিকিৎসকেরা বিদায় দিয়াছেন। সুরমার কথা এ'লো মে'লো হইয়া গিয়াছে। দৃষ্টি যাতনাপূর্ণ এবং অস্বাভাবিক। শশাঙ্ক-শেখর বহুদিনের অনাহারে, অনিদ্রায়, অস্নানে, শীর্ণ দেহে, বিবর্ণমুখে, কোচার খোঁট তুলিয়া তুলিয়া এক একবার চোখের জল মুছিতেছে আর মায়ের মুমুর্ষু মুখে, তাঁহারই পূর্ব্বের আজ্ঞানুসারে একটী সোণার ঝিনুকে করিয়া মধ্যে মধ্যে ফোঁটা ফোঁটা গঙ্গাজল ঢালিয়া দিতেছে। চিকিৎসক-দের অনুমতি ক্রমে রোগীর যাতনা এবং কষ্ট বৃদ্ধি হইবে বলিয়া ঘরে অপর লোক আসিতে দেওয়া হইতেছে না। কেবল রাজবল্লভ, এতক্ষণ চুপ করিয়া ঘরের এক কোণে বসিয়াছিল। সুরমার অবস্থা অত্যন্ত মন্দ দেখিয়া শশাঙ্ক তাহাকেও তাড়াতাড়ি সন্ন্যাসীকে ডাকিয়া আনিতে পাঠাইয়াছে। রাজ-বল্লভ একটী সংক্ষিপ্ত গুপ্ত পথে পুরীর বাহিরে গিয়া কুঞ্জবাগানের দিকে ছুটিয়া গিয়াছে। গৃহ নীরব নিস্তব্ধ। স্ফটিকের ঝাড়ে পরিষ্কার দিবালোক ছড়াইয়া আলো জ্বলিতেছে। শশাঙ্কশেখর মায়ের মুখের কাছে মুখ রাখিয়া ধীরে ধীরে ডাকিল—"মা—, মা—, মা—।" মা, জ্ঞান হারা চেতনা-

শূন্য। মা, সন্তানের ডাকে একবার চোক মেলিয়া চাহিলেন। কিন্তু কথা কহিতে পারিলেন না। নিঃশব্দে সুরমার চোক দিয়া জলের ধারা গলিয়া পড়িতে লাগিল। শশাঙ্ক নিজের চোখের জলের ধারায় সে ধারার পরিমাণ বাড়াইয়া রুদ্ধ কণ্ঠে আবার বলিল—"মা—,তোমার বড় যাতনা হইতেছে ?" মা আর চক্ষু মেলিয়া থাকিতে পারিলেন না। চোখের পাতা দুইটী যেন অবশ হইয়া ধীরে ধীরে পড়িয়া গেল। শশাঙ্ক মনের আবেগে আবার ডাকিল—"মা—, মা—!" এবার মার আর চোক খুলিল না। শশাঙ্ক দেখিল মার শেষ নিশ্বাস রুদ্ধ হইয়া আসিতেছে। মায়ের চিরদুঃখী সন্তান বুঝিল, যে দেখা হইল, মায়ের সঙ্গে এই শেষ দেখা। শশাঙ্কশেখরের প্রাণের যত্নে রুদ্ধ শোকের বান এবার বেগে উথলিয়া উঠিল। মায়ের সন্তান, মায়ের মুমুর্ষু মুখের উপরে মুখ রাখিয়া অধীর হইয়া কান্দিতে বসিল। এ কি—! এমন সময় আকাশ পাতাল কাঁপাইয়া দুইটী কামান হইতে যুগপৎ "গুরুম্ গুম্—" করিয়া দুইটী শব্দ উঠিয়া নৈশ নিস্তব্ধতার মধ্যে দূর দূরান্তরে চলিয়া গিয়া মিশিয়া গেল! সঙ্গে সঙ্গে বহু সঙ্খ্যক বন্দুকও গর্জ্জিল! আবার কামান গর্জ্জিল! আবার বন্দুক গর্জ্জিল! মুহূর্ত্তের মধ্যে, কামানের, বন্দুকের, মানুষের কোলাহলের শব্দে হঠাৎ যেন নিদ্রিত পৃথিবী জাগিয়া গর্জ্জিতে লাগিল! যেন মহাপ্রলয়ে ধরা টলমল হইল! একজন স্ত্রীলোক এ'লো চুলে, এ'লো বেশে, পাগলের মত কাঁদিতে কাঁদিতে শশাঙ্কের কাছে আসিয়া বলিল—"তুমি কি করিতেছ ? পালাও। বাড়ীতে ডাকা'ত পড়িয়া সিপাহীদিগকে হটাইয়া দিয়াছে। ঐ যে তাহারা লুটপাট করিতে করিতে এ দিকেই ছুটিয়া আসিতেছে!"

শশাঙ্ক।—"তুমি তোমার প্রাণ বাঁচাও। আমি মাকে ফেলিয়া কোথায় যাব ?"

স্ত্রীলোকটী সুরমার প্রিয় পরিচারিকা পুষ্পমালা। পুষ্পমালাই ছোট বেলায় শশাঙ্কশেখরকে প্রতিপালন করিয়াছে। শশাঙ্ক পুষ্পীকে ধাযী মা বলে। পুষ্পী শশাঙ্কের কথা শুনিয়া বলিল—"উনি ত আর বাঁচিবেনই না। তুমি এক বংশের এক সন্তান, ওঁর জন্য আর প্রাণটা দিবে কেন ?"

শশাঙ্ক।—"তা হবে না। তুমি পালাও।"

পুষ্পী।—"তবে বরং ওঁকে পাজাকোলা কো'রে নিয়ে চল।"

শশাঙ্ক।—"এখন তেমন অবস্থা নয়।"

পুষ্পী।—"তবে কি করিবে?"

শশাঙ্ক।—"মাকে কোলে করিয়া ঐ ডাকা'তের হাতে প্রাণ দিব। মায়ের সন্তান মায়ের কোলে এক সঙ্গে ঐ গৃহ দাহের আগুনে পুড়িয়া মরিব। মাকে ফেলিয়া এক পাও নড়িব না।"

পুষ্পী।—"তুমি পালাবেনা?"

শশাঙ্ক।—"কিছুতেই পালাইব না। মায়ের এ অবস্থা না হইলেও পালাইতাম না। আজ মায়ের সন্তান মাকে কোলে করিয়া মায়ের কোলে মরিব।"

পুষ্পী।—"তবে আর কি করিব?"

শশাঙ্ক।—"আমাদের মঙ্গলের জন্য ভগবানকে ডাক আর নিজে পালাও।"

পুষ্পী।—"এই যে গো—! ডাকাতেরা এই মহলেই ঢু'কেছে! ঐ যে আগুন ছোট রাণীর ঘরের উপরেই আসিয়া পাড়িয়াছে! আমি সত্যি সত্যিই পালাইলাম।"

এই বলিয়াই পুষ্পী প্রাণের দায়ে ছুটিয়া পালাইল। শশাঙ্ক ভক্তিভরে জলার্দ্র নয়নে উর্দ্ধ দিকে তাকাইয়া ভগবান্‌কে স্মরণ করিয়া কাতর কণ্ঠে বলিল—"প্রভু, কাঙ্গালের মা বাপ, তবে তুমি একবার সহায় হও। এ দুর্ব্বল প্রাণে বল দেও।" এই বলিতে বলিতে শশাঙ্ক মায়ের চেতনাশূন্য অবশ মুমুর্ষু মস্তকটী কোলে করিয়া তাহা এবার চক্ষুজলে সিক্ত করিতে বসিল।

এদিকে পুষ্পী ছুটিয়া পালাইবার মুহূর্ত্ত পরেই যে প্রকোষ্ঠে শশাঙ্ক পর্য্যঙ্কের উপরে শয্যার বক্ষে মায়ের মুমুর্ষু মস্তক কোলে করিয়া চক্ষুর জলে সিক্ত করিতে করিতে ভগবানে প্রাণ মন সমর্পণ করিতে লাগিল, হঠাৎ এক সঙ্গে চারি পাঁচ জন দস্যু লুণ্ঠন পিপাসু হইয়া সেই ঘরেই আসিয়া ঢুকিয়া পড়িল। দস্যুরা ঘরে ঢুকিয়াই শশাঙ্ক এবং তাহার কোলে মুমুর্ষু সুরমাকে দেখিতে পাইল। কয়েকজন দস্যু দেখিয়াও, সুসজ্জিত গৃহের বহুমূল্য দ্রব্যাদি লুণ্ঠনেই ব্যস্ত হইয়া পড়িল। ইহারা কেবল লুটপাট করিতেই আসিয়াছে। কিন্তু একজন দস্যু তরবারি নিয়ে সিংহের মত গর্জ্জিয়া পর্য্যঙ্কের নীচে গিয়া দাঁড়াইয়াই বলিল—"উতার—। আগারি তেরা শির লেয়ঙ্গে—।"

শশাঙ্ক দস্যুকে দেখিয়াই চিনিল, এ একজন বিশ্বাসঘাতক রাজ-ভৃত্য

অর্জ্জুন সিং জমাদারের দলের লোক। দস্যুর কথাতে শশাঙ্কের সমস্ত শরীরের রক্ত উষ্ণ হইয়া উঠিলেও, শশাঙ্ক ধীরভাবে সিপাহীর দেশের ভাষাতেই বলিল—“ভাই, তুমি এই রাজসংসারের অন্নে চিরদিন প্রতিপালিত হইয়াছ। দেখ, আমার মা আর মুহূর্ত্ত পরেই এ সংসার ছাড়িয়া যাইবেন। আর একটী নিশ্বাসের সময়ের জন্য তোমার কাছে আমি জীবন ভিক্ষা করিতেছি। আমার মাকে শান্তির সহিত শেষ নিঃশ্বাসটী, আমার এই কোলের উপরেই ছাড়িতে দেও। পরে আমি নিজেই শির পাতিয়া দিব। তুমি আমার মাথা কাটিয়া নির্ব্বিঘ্নে চলিয়া যাইতে পারিবে। তুমি জান, বাঙ্গালী হইলেও আমি রাজবংশের সন্তান। শির বা প্রাণ দিতে তিলেকের জন্যও ভয় করি না। আমি প্রাণান্তেও প্রতিজ্ঞা ভাঙ্গিব না।”

“সব ঝুট্ বাত। আভি তেরা শির লেয়ঙ্গে—।” এই বলিয়াই দস্যু তলোয়ার তুলিয়া শশাঙ্ককে লক্ষ্য করিয়া বিদ্যুদ্বেগে ছাড়িয়া দিল। তলোয়ার খাটের উপরের মশারিতে ঠেকিয়া হঠাৎ বেঁকিয়া আসিয়া মুমূর্ষু সুরমার বক্ষে আঘাত করিল। তীক্ষ্ণধার তরবারির আঘাতে সুরমার বক্ষ বিদীর্ণ হইয়া রক্তে শশাঙ্কের মস্তক সিক্ত করিল। কিন্তু মশারিতে ঠেকাতে তরবারি দস্যুর হাত হইতে খসিয়া পড়িল। তরবারি ঘাতকের হস্ত হইতে স্খলিত হইয়া মাতৃবক্ষে বিদ্ধ হইয়াছে দেখিয়া, শশাঙ্ক চীৎকার করিয়া তৎক্ষণাৎ তরবারি ধরিয়া ফেলিল। তখন শশাঙ্কশেখরের দুই চক্ষু দিয়া এক দিকে মাতৃশোকে উষ্ণ জলধারা বহিতে লাগিল, আর এক দিকে ক্রোধাগ্নি ধক্ ধক্ করিয়া জ্বলিয়া উঠিল। যেন প্রলয় কালে বর্ষণের সঙ্গে সঙ্গে বজ্রাগ্নি জ্বলিতে লাগিল। যেন ধৈর্য্যেরও সীমা আছে, ইহা প্রমাণ করিতেই, ধীর প্রকৃতি মাতৃ-ভক্ত যুবক মুষ্টিবদ্ধ তরবারি তুলিয়া বজ্রবেগে মাতৃহন্তা পাষণ্ড দস্যুর মস্তক কাটিয়া, তখনই ভূমিসাৎ করিল।

শশাঙ্কশেখর তরবারি চালাইতে সুপটু। তবুও মাতৃহন্তার মাথা কাটিয়া আর মানুষ খুন করিতে ইচ্ছুক হইল না। কেবল তলোয়ার খানি ধীরে ধীরে শয্যার উপরে রাখিয়া দিল। এমন সময় মাথা তুলিতেই দেখিল, দেশীয় রকমের মা’র ডাক ছাড়িয়া, এক জন মুসলমান লাঠিয়াল তলোয়ার ভাজাইতে ভাজাইতে বেগে চলিয়া আসিতেছে। শশাঙ্ক বুঝিল, লাঠিয়ালের লক্ষ্য সে নিজেই। ইচ্ছা করিলে শশাঙ্কশেখর তৎক্ষণাৎ লাঠিয়ালের মাথা কাটিয়া মাতৃঘাতকের রক্তে তাহার রক্তের স্রোত মিশাইতে পারিত। কিন্তু শশাঙ্ক নিজের তুচ্ছ

জীবনের জন্য অন্য একটা মানুষের জীবন নিতে প্রস্তুত হইল না। লাঠিয়াল তরবারি আস্ফালন করিয়া "চ'লে এ'স—" বলিয়া সম্মুখীন হইলে, শশাঙ্ক বলিল,—"আমি আর তোমার সঙ্গে লড়িতে যাইতেছি না। এই দেখ, তলোয়ার রাখিয়া দিয়াছি। ইচ্ছা হয় আমার মাথা কাটিয়া ফেল। এই মানুষটা আমার মাকে খুন করিয়াছে। তাই ইহার মাথা না কাটিয়া থাকিতে পারি নাই। আমার এ তুচ্ছ প্রাণের জন্য তোমার প্রাণ নিতে আমার ইচ্ছা নাই।"

লাঠিয়াল, দেশীয় লাঠিয়ালদের সরদার স্বয়ং আরমান খাঁ। হাত হইতে কেহ তলোয়ার বা লাঠি নামাইয়া রাখিলে, তাহাকে আঘাত করিতে দেশীয় লাঠিয়ালদের নিয়ম নাই। আরমান শশাঙ্কশেখরের কথা শুনিয়া, যে কোবটী তুলিয়াছিল, তাহা ফিরাইতে চেষ্টা করিল। কিন্তু তবুও তলোয়ার টানিয়া আনিতে শশাঙ্কের বাহুমূলে, বুকে এবং উরতে ভয়ানক জখম হইল। তৎক্ষণাৎ ক্ষত স্থানগুলি হইতে এক বারে হুড় হুড় করিয়া বেগে রক্ত পড়িতে লাগিল। ক্রমান্বয়ে অনেক দিনের অনাহারে, অস্নানে, অনিদ্রায়, মনের কষ্টে, মায়ের শোকে শশাঙ্কের শরীর আপনা হইতেই জীর্ণ শীর্ণ এবং দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছিল। তাহার উপরে তলোয়ারের আঘাতে ভয়ানক তিনটী ক্ষত স্থান হইতে অনবরত রক্ত ঝরিয়া পড়াতে, এবার শশাঙ্কশেখরের মাথা ঘুরিতে লাগিল, চোখের দৃষ্টি অন্ধকার হইয়া আসিল। এমন সময় সহসা শশাঙ্ক শুনিল, একজন স্ত্রীলোক প্রকোষ্ঠের মধ্যে দাঁড়াইয়া বলিতেছে—"কি করিতেছিস্—? এখনই উহার মাথা কাট্। আমি উহার কলিজার রক্ত মাংস আজ ছিন্নমস্তার ভোগে দিব।" স্ত্রীলোকের কথার লক্ষ্য আরমান সরদার। আরমানের হাতে তবুও উত্তোলিত তরবারি চুলমাত্রও নড়িল না। শশাঙ্ক, নির্ব্বাণপ্রায় দৃষ্টিতে স্বপ্নের দৃশ্যের মত দেখিল, স্ত্রীলোক বিমাতা কুন্তী! তাহার পরে আর শশাঙ্কের চোখে দৃষ্টি ফুটিল না। কিন্তু কুন্তীর পার্শ্ব হইতে তখনই কে যেন শশাঙ্কশেখরের বক্ষস্থল লক্ষ করিয়া অব্যর্থ সন্ধানে বন্দুক ছুড়িল। আরমান সরদারের হস্তস্থিত উত্তোলিত তরবারিতে ঠেকিয়া বন্দুকের গুলিটী শশাঙ্কশেখরের বক্ষের পরিবর্ত্তে জানু ভেদ করিয়া চলিয়া গেল। শশাঙ্কের দেহ আপনা হইতেই টলিয়া পড়িতেছিল। গুলির আঘাতের সঙ্গে সঙ্গেই তাহা ঘরের মে'ঝেতে পড়িয়া রক্তে মাখা মাখি হইতে লাগিল। গুলি অর্জ্জুন সিং জমাদারের দলের অপর একজন সিপাহী ছুড়িল। এমন সময় বাহিরে হাজার হাজার লোক চীৎকার করিয়া বলিল,—

"জয়—ছিন্নমস্তা কী জয়—! জয়—ছিন্নমস্তা কী জয়—!" অমনি তৎক্ষণাৎ গৃহ মনুষ্য শূন্য হইল। দস্যুরা এক এক মহলে লুটপাট শেষ করিয়া আগুন লাগাইয়া চলিয়া যাইবার সময় এইরূপ জয়ধ্বনি করিতেছিল। দস্যুগণ তখনই একটী অবধি করিয়া ছোটরাণীর মহল ছাড়িয়া চলিয়া গেল। বাহিরের আগুনে তিনটী রক্তাক্ত-শবদেহপূর্ণ ছোটরাণীর নির্জ্জন নিস্তব্ধ ঘরের কড়ি ও বরগা সকল জ্বলিতে লাগিল। নৈশ আকাশে অগ্নি শিখা সকল ভয়ানক দৃশ্য ছড়াইয়া নাচিতেছিল। মহাখাণ্ডব দাহের মত প্রকাণ্ড প্রাচীন পুরীটী এক সঙ্গে প্রচণ্ড শব্দে দশ দিক্ পূর্ণ করিয়া জ্বলিতেছিল। এইরূপ ভয়ানক দৃশ্য কেহ কখনও দেখিয়াছে কি না সন্দেহ। এইরূপ ভয়ানক ঘটনা কেহ কখনও শুনিয়াছে কি ?

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ।

আশ্চর্য্য বীরত্ব !

রাজবল্লভের, কুঞ্জবাগানে পৌছিবার পূর্ব্বেই রাজবাড়ীর দিকে বন্দুক ও কামানের শব্দে, হাজার হাজার লোকের ভয়ানক চীৎকার কোলাহলে আকাশ ফাটিয়া যাইতে লাগিল, পৃথিবী যেন কাঁপিয়া উঠিল ! রাজবল্লভ তাড়াতাড়ি কুঞ্জবাগানের ফটকের কাছে একটা ছোট উচ টিলার উপরে চড়িয়া দাঁড়াইয়া দেখিল, আকাশ ভয়ানক রক্তবর্ণ হইয়া উঠিয়াছে। আলোকিত আকাশে ধূমরাশি ভাসিয়া যাইতেছে। দেখিতে দেখিতে একটী, দুইটী করিয়া বহুসংখ্যক আগুনের শিখা ধূম রাশির মধ্যে ধক্ ধক্ করিতে লাগিল। অন্যান্য শব্দে মিশিয়া দগ্ধ বংশাদির ভয়ানক চট্ পট্ ফট্ ফট্ শব্দে দশ দিক্ পূর্ণ হইল। হঠাৎ যেন সম্মুখের অন্ধকারাবৃত অভেদ্য বৃক্ষ প্রাচীরের উপরে একটা সহস্র সহস্র চূড়াবিশিষ্ট বিস্তীর্ণ উচ্চ অগ্নি-প্রাচীর খাড়া হইল ! ইহা দেখিয়া, রাজবল্লভ মুহূর্ত্তে চীৎকার করিয়া উচ স্থানটী হইতে লাফ দিয়া তখনই নামিয়া পাড়ল। নামিয়া, বাগানের ফটকেই দেখিল, সন্ন্যাসী কুঞ্জবাগানের সমস্ত প্রহরীদিগকে অস্ত্র শস্ত্র নিয়ে রাজবাড়ীর দিকে দৌড়াইতে বলিয়া, আপনিও সেই দিকেই ছুটিয়াছেন। সন্ন্যাসী প্রহরীদিগকে কেবলমাত্র বলিলেন—"যাও—এত দিন যাঁহার নুন

খেয়েছ, আজ প্রাণ দিয়ে তাঁহার গুণ গাও। শশাঙ্কশেখর ছোটরাণীর মহলে আছে। আগে তাহাকেই রক্ষা করিতে চেষ্টা করিও।" সন্ন্যাসী আর একটীও কথা বলিলেন না। রাজবল্লভ, সন্ন্যাসীকে দৌড়াইতে দেখিয়া তাঁহারই পিছে পিছে ছুটিল।

রাজবল্লভ দেখিল, সত্তর বৎসরের বৃদ্ধ সন্ন্যাসীঠাকুর আজ চটিজুতা পায়ে দিয়া, যেরূপ দৌড়াইতেছেন, তাহার নাগরা জুতা দিয়েও, সে ততটা পারিতেছে না। রাজবল্লভের সুদীর্ঘ দ্রঢ়িষ্ঠ দেহে প্রচুর বল। রাজবল্লভ পরিশ্রমে অক্লান্ত। কিন্তু সন্ন্যাসীকে দৌড়াইয়া ধরিতে রাজবল্লভের বহু পরিশ্রম হইল। সন্ন্যাসী অক্লান্ত দেহে ছুটিতেছিলেন।

পথে পলাতক লোকেরা প্রাণের দায়ে ভিড় করিয়া বিপরীত মুখে ছুটিতেছিল। যাহারা এ সংসারে লক্ষ্মীর বরযাত্রী মাত্র, তাহারা বিপদের আঁধারে ঝটিকা পশ্চাৎ করিয়া এইরূপই ছুটিয়া পালায়। সন্ন্যাসী এবং রাজবল্লভ উভয়েই এই বরযাত্রীর দলের প্রতিকূল স্রোত ভেদ করিয়া দৌড়াইতে ছিলেন। পথে কুঞ্জবাগানের একজন প্রহরীও সন্ন্যাসীর সম্মুখে পড়িল। সন্ন্যাসী তাহার দিকে চাহিয়া ভ্রূকুঞ্চিত করিলে, সে বলিল—"মহাশয়, কোথায় যাইতেছেন? ঢুকিবার পথ পাইলাম না। আগুনের দাপটে আমরা দূর থেকেই ফিরিয়াছি। আপনারাও ফিরুন। দুঃখের কথা কি বলিব? আপনাদের বড় বড় আমলা বাবুরা পর্য্যন্ত রাজ বাড়ীর তহবিলের টাকা কড়ি নিয়ে পালাইতেছেন। মাঝারি ও ছোট ছোট বাবুরা অনেকে লুট পাটে যোগ দিয়াছেন। আমি ডাকা'ত পড়িবার আগে থেকেই ছিলাম। কিছুক্ষণ লড়িয়া হটিতে বাধ্য হইয়াছি। এখন আর আগুনের ঝাঁজে কাছে দাঁড়াইতে পারিলাম না।" সিপাহী এই কথাগুলি একরূপ ভোজপুরী অপভ্রংশ হিন্দীভাষাতে অতি ব্যস্ততার সহিত বলিল। সন্ন্যাসী, সিপাহীর কথা শুনিতে মুহূর্ত্ত মাত্র দাঁড়াইয়া ছিলেন। সিপাহীর শেষ কথা মুখ হইতে ভালরূপে ফুটিতে না ফুটিতেই আর একবার নীরবে ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া, পুনরায় ছুটিলেন। এই ভ্রূকুঞ্চনে কেবল নিরবচ্ছিন্ন ঘৃণার ভাব প্রকাশ হইল। সিপাহী এ নীরব তিরস্কার বুঝিল। বুঝিয়া, ফিরিয়া সন্ন্যাসীর পিছে পিছে পুনর্ব্বার গতির বিপরীত দিকে ছুটিল না। দাঁড়াইয়া কি যেন ভাবিয়া আবার পলায়নই ঠিক করিল। আজ, সম্মুখের ঐ মহা খাণ্ডব দাহের মত অগ্নির বিশ্বগ্রাসী জিহ্বাতে আত্ম সমর্পণ করিতে কে সাহস করিবে? এখান হইতেই অগ্নির

উত্তাপ রাজবল্লভ এবং সন্ন্যাসীর গাত্রস্পর্শ করিতেছিল। বিকট আলোকে শরীর আলোকিত হইতেছিল।

এবার রাজবল্লভ সন্ন্যাসীর খুব নিকটে নিকটে চলিতে লাগিল। সন্ন্যাসী পায়ের সাড়া পাইয়া ফিরিয়া চাহিয়া, বলিলেন—"কে রাজবল্লভ? সাহস পাই-তেছ?" সন্ন্যাসী সেই দৌড়ের উপরেই কথা বলিলেন, রাজবল্লভও দৌড়া-ইতে দৌড়াইতে উত্তর দিল—"এ শরীরটা এত বড় হইয়াছে যে পুরীতে,আজ আগুনও জ্বলিতেছে সেই পুরীর মধ্যেই। আমি রাজবাড়ীর দাসীপুত্র। এ ছাই মাটির দেহটা ঐ পুরীর সঙ্গে সঙ্গে আগুনে ঢালিতে না পারিলে মানুষ হইয়াছি কেন?" রাজবল্লভের কথা শুনিয়া সন্ন্যাসীর নিস্তব্ধ মুখের উপরে সহসা যেন চাঁদের জ্যোৎস্না ফুটিল। সন্ন্যাসী গম্ভীর স্বরে কেবল আর একটী বার কথা বলিলেন। বলিলেন—"তবে তোমার ইষ্টদেবতার নাম স্মরণ কর।" এই বলিয়াই, সন্ন্যাসী লম্ফে লম্ফে প্রচণ্ড অগ্নিরাশির সম্মুখীন হইলেন। তখন প্রাণের ভয়ে যাহারা দৌড়াইয়া পালাইতেছিল, তাহারা সকলেই সন্ন্যাসী এবং রাজবল্লভকে দেখিয়া চীৎকার করিয়া বলিল—"ওগো—যেও না—! যেও না—! কেন মরিতে যাও—? ফের—!" সন্ন্যাসী কাহারও চীৎকারে বিন্দুমাত্রও কর্ণ-পাত না করিয়া, যেন উল্লাসের সহিত লম্ফে লম্ফে বিদ্যুদ্বেগে ছুটিয়া জ্বলন্ত উল্কার মত সেই আকাশস্পর্শী জ্বলন্ত আগুনে প্রবেশ করিলেন। রাজবল্লভও সেই মুহূর্ত্তেই সন্ন্যাসীর পশ্চাৎ পশ্চাৎ আগুনের মধ্যে অদৃশ্য হইয়া পড়িল। প্রাণভয়ে ভীত মানুষেরা দূর হইতে দৌড়াইয়া পালাইতে পালাইতে ফিরিয়া চাহিয়া দুই এক বার মাত্র হাহাকার করিয়াই, আরও বেগে ছুটিল। স্বার্থপর লক্ষ্মীর বরযাত্রী আর প্রকৃত হিতৈষী সাধুতে চিরদিনই এই প্রভেদ।

——:o:——

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ।

"সাধু ইচ্ছার সহায় ঈশ্বর।"

ভীরু, তুমি কি ভাবিতেছ? জলের ঢেউয়ের মাথায় ঘর বান্ধিয়া ভাবি-তেছ, অনন্তকাল বাস করিবে? দক্ষিণ বাতাসের একটী মৃদুহিল্লোলের ভর যাহাতে সয়না, এ নিত্য ঝড় তুফানের সংসারে তাহার আশা ছাড়িয়া দেও। এস—দেশ উদ্ধার করিতে চাও, নিজের উদ্ধার চাও, পৃথিবীর

মঙ্গল চাও—এস, আমরা ভীরুর দল মিলিয়া মিশিয়া, ভেদাভেদ ভুলিয়া প্রাণে লিখিয়া রাখি "সাধু ইচ্ছার সহায় ঈশ্বর।" ভয় যাবে। ভাবনা যাবে। দাসীপুত্র রাজবল্লভ আর পথের ফকীর সন্ন্যাসী আজ যে আগুনে হাসিতে হাসিতে লম্ফ দিতে দিতে অদৃশ্য হইল, এস, আমরা এইরূপে আগুনে অদৃশ্য হইতে শিখি। মরিব না। অমর মানুষ কখনও মরে না। বলিতেছি, এই পৃথিবীর ধূলা খেলার জীবনেও বঞ্চিত হইব না। "সাধু ইচ্ছার সহায় ঈশ্বর।" তবে সাধু উদ্দেশ্যে, সাধু কাজে মানুষ মরিবে কেন? রাজবল্লভ মরিল না। সন্ন্যাসী মরিলেন না।

রাজবল্লভ আর সন্ন্যাসী যে পথে জ্বলন্ত পুরীর মধ্যে ঢুকিয়া পড়িলেন, এখানে দুই পাশে ভয়ানক বেগে আগুন জ্বলিতে থাকিলেও, মাঝখানে—ফটকের ঠিক মধ্যস্থল দিয়া কিছু ফাঁক ছিল। সন্ন্যাসী ফটকের সম্মুখে আসিয়াই, হঠাৎ বিদ্যুৎস্ফুরণবৎ চকিত দৃষ্টিতে আগুনে ঢুকিবার এই পথটা দেখিতে পাইলেন। এই ফাকটুকু দেখিবামাত্র, তাহারই মধ্য দিয়া ঢুকিয়া পড়িলেন। রাজবল্লভ অবিচারে সন্ন্যাসীর পিছে পিছে ছুটিতেছিল।

সন্ন্যাসী, সম্মুখের একটী জ্বলন্ত আগুনের প্রকাণ্ড প্রাচীর পার হইয়াই দেখিলেন, ভিতরের দিকে আগুন অপেক্ষাকৃত কিছু কম। অত্যন্ত দ্রুত বেগে চলাতে, পায়ে আগুনের আঁচ খুব ভাল করিয়া লাগিতে পারিতেছিল না। রাশি রাশি জ্বলন্ত ইট কাঠের উপর দিয়া সামান্য চটি জুতার সাহায্যে সন্ন্যাসী তাড়িত প্রবাহের মত ছুটিতেছিলেন। চলিতে চলিতে রাজবল্লভ কিছু কাতর হইল। রাজবল্লভের নাগরা জুতার মধ্যে দুই একখানি জ্বলন্ত অঙ্গার ঢুকিয়াছিল এবং গায়েও কিছু বেশী আঁচ লাগিয়াছিল। তবুও রাজবল্লভ নিজের ইষ্টদেবতাকে ডাকিতে ডাকিতে ছুটিতে ক্ষান্ত হইল না। এখন যেখানে আসা হইল, এখানে আগুনের তেজ অত্যন্ত কম। প্রথম উদ্যমে প্রথমাংশেই কাষ্ঠাদি ফুরাইয়া যাওয়াতে, পুরীর শেষাংশে দস্যুরা ভয়ানক অগ্নিকাণ্ড করিতে তত সুবিধা পায় নাই এবং লুট পাট করিয়া পালাইবার সময় সময় কালে আগুন লাগাইবার তাহাদের তত দরকারও বোধ হয় নাই। যে কারণেই হউক্, ছোট রাণীর মহলে এখনও আগুনের তেজ কম ছিল। কিন্তু ছোটরাণীর ঘরের প্রায় সমস্তগুলি কড়ি বরগাতেই আগুন জ্বলিতেছে। রাজবল্লভ আর সন্ন্যাসী যে বেগে আসিলেন, সেই বেগেই নিঃশব্দে ছুটিয়া পুনরায় সেই জ্বলন্ত

কক্ষার মধ্যেই প্রবেশ করিলেন। কিন্তু উভয়েই চমকিয়া দেখিলেন, কক্ষার মধ্যে তিনটী মৃত শব রক্তাক্ত হইয়া রক্তে ভাসিতেছে! যেটী খাটের উপরে পড়িয়া আছে, সেটী জ্বলন্ত খাট ও বিছানার সহিত জ্বলিতেছে। সন্ন্যাসী তাড়াতাড়ি প্রথমেই জ্বলন্ত খাটের সম্মুখে গিয়া দেখিলেন, জ্বলন্ত প্রায় শব-দেহটী দ্বিখণ্ডিত হইয়াছে। পাশ ফিরিয়া কক্ষাতলে চাহিতেই দেখিলেন, অপর দুইটী শবের মধ্যে একটী মস্তক শূন্য! ছিন্ন মস্তক, দেহ হইতে পৃথক্ হইয়া দূরে পড়িয়া আছে। এ শবটী কাহার সন্ন্যাসী চিনিলেন না। দ্বিতীয় রক্তাক্ত দেহটী দেখিয়াই চিনিলেন। চিনিয়া, ক্ষিপ্তপ্রায় হইয়া, রুদ্ধ নিঃশ্বাসে শব দেহের বক্ষে হাত দিয়াই যেন চমকিয়া উঠিলেন। চোখের পলক ফেলিতে, সন্ন্যাসী, দেহের হৃদ্‌পিণ্ডে, নাকে এবং ডান হাতের কব্জিতে বারম্বার হাত রাখিয়া, অঙ্গুলী স্থাপন করিয়া, কি যেন পরীক্ষা করিয়া, এবার ঈষৎ প্রফুল্ল মুখে রাজাবল্লভের দিকে তাকাইলেন। আগুনের আঁচে রাজ-বল্লভের শরীর ঝলসিয়া গিয়া লাল হইয়া উঠিয়াছে। গায়ের এবং ভ্রু ও চোখের লোম পুড়িয়া গিয়াছে। তবুও রাজবল্লভ সকল কষ্ট যাতনা ভুলিয়া সন্ন্যাসীর দিকেই উৎসুক নয়নে চাহিয়াছিল। সন্ন্যাসী মুখপানে তাকাইবামাত্র, রাজবল্লভ নীরবে সন্ন্যাসীর কাছে সরিয়া আসিল। সন্ন্যাসী রাজবল্লভের মুখের উপরে দৃষ্টি স্থাপন করিয়া বলিলেন—"এই শবদেহটী এখান হইতে তুলিয়া নিয়ে কুল-লক্ষ্মীর মন্দিরে যাইতে হইবে। কুঞ্জবাগানের দিকেও একদল ডাকা'ত গিয়াছে। আমি কুঞ্জবাগান হইতে বাহিরে আসিয়া টের পাইয়াছি। সেই জঙ্গলের মধ্যে কুল-লক্ষ্মীর ভাঙ্গা মন্দিরে কেহ আমাদের খোঁজ করিবে না।" সন্ন্যাসীরও শরীর যেন জ্বলিয়া যাইতেছিল। ভিতরে ভিতরে অত্যন্ত যাতনা হইতেছিল। সন্ন্যাসী রাজবল্লভের দিকে চাহিয়া দেখিলেন, রাজবল্লভের চোক দুইটী যেন যাতনা সহ্য করিতে অসমর্থ হইয়াই ছুটিয়া পালাইতে চেষ্টা করিতেছে। মুখ দিয়া যেন যাতনা ফুটিয়া বাহির হইতেছে। কিন্তু এ সকল যাতনার বিষয় চিন্তা বা অনুভব করিবার কাহারও সময় নাই। প্রাণে ইষ্টদেবের নাম। হাতে তাঁহারই আদিষ্ট কাজ। মন কখন্ ভাবিবে "বড় যাতনা হই-তেছে?" সন্ন্যাসীর কথা শেষ হইবা মাত্র, রাজবল্লভ দুই হাত, দুই বাহু প্রসা-রিত করিয়া শবদেহ তুলিয়া কোলে করিতে উদ্যত হইল। সন্ন্যাসী রাজ-বল্লভকে নিবারণ করিয়া দুইটী লোহার সিন্দুক দেখাইয়া বলিলেন—"ডাকা'-তেরা কেন যেন এই দুইটী সিন্দুকে হাতও দেয় নাই। এই ছোট সিন্দুকটী

চেষ্টা করিলে বোধ হয় একজনেই বহিয়া নিতে পারে।” এবার রাজবল্লভের মুখে কথা ফুটিল। রাজবল্লভ ভ্রু কুঞ্চিত করিয়া বলিল—“সিন্দুকের দরকার কি মহাশয়?”

সন্ন্যাসী।—“আমাদের দরকারে না লাগে, পৃথিবীতে অনেক গরিব দুঃখীর দরকারে আসিবে। আগুনে পুড়িয়া ছাই হইবার চেয়ে কি সেটা ভাল হইবে না? আমি জানি, এ সিন্দুকে অনেক বহুমূল্য জিনিষ আছে। ডাকা'তেরা ঠ'কেছে।”

রাজবল্লভ।—“শব কে নিবে?”

সন্ন্যাসী।—“আমি পাজা কোলা করিয়া নিতেছি।”

রাজ।—“পারিবেন?”

সন্ন্যাসী ভ্রু কুঞ্চিত করিলেন। রাজবল্লভ নীরবে সিন্দুকটী ধরিয়া বুক পর্য্যন্ত তুলিল। সন্ন্যাসী তাড়াতাড়ি ধরিয়া মাথায় তুলিয়া দিলেন। রাজবল্লভ সোজা হইয়া দাঁড়াইবার কালে সম্মুখের খাটের এক পাশ থেকে শশাঙ্কশেখরের পরিত্যক্ত তলোয়ারখানিও তুলিয়া নিল। পথে চলিতে চলিতে মধ্যে মধ্যে দরকার মত ভর দিবার জন্য লাঠির কাজে আসিবে মনে করিয়াই রাজবল্লভ সুদীর্ঘ তলোয়ার থানি হাতে করিয়া নিয়ে চলিল। রাজবল্লভ মাথায় বোঝা ঠিক করিয়া পা ফেলিবার পূর্ব্বেই সন্ন্যাসী প্রকোষ্ঠ-তল হইতে শশাঙ্কশেখরের রক্তাক্ত দেহটী পাজা কোলা করিয়া তুলিয়া নিয়েই প্রস্থান করিলেন। উত্তর দিকের ফটকে সামান্যমাত্র আগুন জ্বলিতে-ছিল। সুতরাং এবার রাজবল্লভ এবং সন্ন্যাসীর পুরীর বাহিরে যাইতে কিছু-মাত্র কষ্টই হইল না। এখনও দূরের আকাশে রক্তবর্ণ আভা ছড়াইয়া দস্যুদের মশালের আলো জ্বলিতেছিল। দস্যুদের যে দিকে যাওয়া উচিত ছিল, তাহারা তাহার বিপরীত দিকে মশাল জ্বালাইয়া যাইতে যাইতে, মশালগুলি হাত হইতে গাছের ডালে, জঙ্গলের মাথায় বা উচ্চ স্থানে বাঁধিয়া কিম্বা পুঁতিয়া রাখিয়া, যাহার যে দিকে ইচ্ছা আঁধারে আঁধারে সে সেই দিকেই ছুটিয়া পালাইয়াছে। রাজবল্লভ এবং সন্ন্যাসী ডাকা'তদের এই সকল পরিত্যক্ত মশালের আলোই দেখিতে পাইলেন। মাঠের ঠাণ্ডা বাতাসে সন্ন্যাসী এবং রাজবল্লভের গায়ের জ্বালা যেন আরও দ্বিগুণ হইয়া উঠিল। রাজবল্লভ, এখন কেবল মনের বশে চেতনাশূন্য জড় পুতুলের মত সন্ন্যাসীর পিছে পিছে গৃহ দাহের আগুনেই পথ দেখিয়া

হাটিতে ছিল। আজ শুক্ল পক্ষের চতুর্থী তিথি। আকাশ মেঘশূন্য। মেঘশূন্য আকাশে অগণ্য অসঙ্খ্য তারা জ্বলিতেছে। অপ্রগাঢ় অন্ধকারে বিনা আলোতেও পথ চলিতে কষ্ট হইতেছিল না। রাজবল্লভ এবং সন্ন্যাসী, সিন্দুক ও শশাঙ্কের রক্তাক্ত দেহ নিয়ে, গৃহত্যাগ করিয়া বাহিরে আসিলে, মুহূর্ত্ত পরেই ছোটরাণীর গৃহের ছাদ জ্বলিয়া পড়িয়া গেল। বেশী নয়, একটী মাত্র মুহূর্ত্তের জন্য রাজবল্লভ এবং সন্ন্যাসী সেই ভয়ানক সশব্দ জ্বলন্ত আগুনের রাশিতে চাপা পড়িলেন না।

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ।

চেষ্টার ফল।

বিজন অরণ্যের মধ্যে একটী ভগ্ন, জীর্ণপ্রায়, বহুকালের পুরাতন মন্দির। মন্দিরের চারি দিক্ খোলা। দুই দিকের দুইটী দরজায় এক সময়ে চন্দন কাঠের দুই জোড়া ভাল কপাট ছিল। কপাট দুই জোড়া অযত্নে ভাঙ্গিয়া মাটিতে মিশিয়া গিয়াছে। মন্দিরের অপর দুই দিকেরও দেয়ালের ইট পড়িয়া গিয়া সেখানে এখন দরজার চেয়েও বড় বড় দুইটী ছিদ্র হইয়াছে। মন্দিরের নিকটেই একটী ছোট পার্ব্বত্য নদী নিকটবর্ত্তী পাহাড় হইতে বাহির হইয়া কুল কুল তর তর শব্দে সুদূরে একটী বড় নদীতে গিয়া মিশিয়াছে। বর্ষার দিনে এক এক দিন নদীর জল ফুলিয়া উঠিয়া, দুই পাড়ের বন, জঙ্গল, মাঠ, গ্রাম ভাসাইয়া প্রবল স্রোতে আবর্ত্ত ফেলিয়া, বেগে ছুটিতে থাকে। কিন্তু দুঃখীর ঘরে ভিক্ষা-সংগৃহীত অর্থে শুভ কর্ম্মের উৎসবের মত এক দিন কিম্বা দুই দিনেই সে আহ্লাদ আমোদ শেষ হইয়া যায়। নদীতে সচরাচর অল্পই জল থাকে। কিন্তু সে জলে ছোট ছোট নৌকা প্রায় সর্ব্বদাই কষ্টে যাতায়াত করিতে পারে। ভগ্ন মন্দিরে এক সময়ে স্বর্ণনির্ম্মিত কুললক্ষ্মীর প্রতিমা প্রতিষ্ঠিত ছিল। এখন মন্দিরের গর্ভশূন্য। তথাপি নবাবী বা বাদশাহী আমলের উপাধি-গ্রস্ত দেশীয় গরিব রাজপরিবারের মত জরাজীর্ণ পুরাতন ভগ্ন মন্দিরটী এখনও নামে মাত্র পূর্ব্ব গৌরবের অধিকারী রহিয়াছে। কিন্তু চর্ম্মচটিকা এবং ছুছুন্দরীদিগের সর্ব্বদা অযাচিত পদার্পণে বর্ত্তমানে বাস্তবপক্ষে মন্দিরটী কুল-অলক্ষ্মীর মন্দিরেই

পরিণত হইয়াছে। জঙ্গলের মধ্য দিয়া কুললক্ষ্মীর মন্দিরে যাইবার ছোট ছোট গাছ পালায় ঢাকা একটী ক্ষুদ্র পথ আছে। পথে মানুষের পদচিহ্ন নাই। বাঘ ভল্লুক আছে সন্দেহ করিয়া, এ জঙ্গলে এখন আর কেহ যাতায়াত করে না।

আজ চারি দিন হইল, এই জনমানবশূন্য অরণ্যের মধ্যে ভগ্ন মন্দিরের গর্ভে দুইটী মানুষ বাস করিতেছেন। একজন, জঙ্গলের কাঁচা পাতা লতার বিছানার উপরে একখানি কাপড় পাড়িয়া, তাহার উপরে শুইয়া আছেন। ইনি রোগী। গায়ে মশা মাছী বসিয়া বিরক্ত করিতে না পারে এই জন্য রোগীর প্রায় আপাদ মস্তক একখানি পাতলা উড়ুনীতে ঢাকা রহিয়াছে। মুখখানি মাত্র বাহিরে আছে। অপর ব্যক্তি বৃদ্ধ। ইনি মাথার কাছে বসিয়া রোগীর রুধিরশূন্য পাণ্ডুবর্ণ মুখের দিকে একদৃষ্টে তাকাইয়া আছেন। রোগী ঘুমাইতেছেন। রোগী একজন তরুণ বয়স্ক যুবক।

রোগী ঘুমাইয়া ঘুমাইয়া স্বপ্নে কত কি বলিতেছিলেন। একবার বলিলেন,—"দিদি, এসেছ? এত দিন কোথায় ছিলে? আমি যে মরিতে বসিয়াছি। এসেছ ত একবার আমার কাছে বো'স। তোমার হাতখানি একবার আমার গায়ে দেও। এ পাপদেহ পবিত্র হউক্, শীতল হউক্।" আবার বলিলেন—"আহা! সত্যি সত্যিই শেষ নিঃশ্বাসটী মনের শান্তির সহিত ছাড়িতে দিলি না? হায়! হায়! এ তলোয়ার আমার বুকে মারিলি না কেন? দাঁড়া! এ অপরাধের ক্ষমা নাই।" বলিতে বলিতে যুবকের শুষ্ক, মলিন, রক্তশূন্য মুখে বিষম তেজ ও জ্যোতি দেখা দিল। বৃদ্ধ তাড়াতাড়ি যুবকের বস্ত্রাবৃত বক্ষের উপরে আস্তে হাতখানি রাখিলেন। ধীরে ধীরে রোগীর মুখের ছবি আবার পরিবর্ত্তিত হইয়া শান্তভাব ধারণ করিল। বৃদ্ধ পুনরায় আস্তে আস্তে হাতখানি তুলিয়া নিলেন। যুবকের নিদ্রা ভাল হইতেছিল না, তাই এত ঘন ঘন স্বপ্ন দেখিতেছিলেন। কয়েক মুহূর্ত্ত পরেই রোগীর মুখের ভাব আবার অন্যরূপ ধারণ করিল। এবার মলিন মুখ আরও মলিন হইল। চোখের কোণে এক বিন্দু জলও দেখা দিল। যুবক কাতরস্বরে বলিলেন—"এ অপরাধ কি মাপ করিবে না? আমি ইচ্ছা করিয়া মানুষের রক্তে হাত ও চরিত্র কলঙ্কিত করি নাই। মাতৃঘাতককে প্রতিশোধ না দিয়া ধৈর্য্য ধরিয়া থাকিতে পারিলাম না। তুমি কি ঘৃণা করিয়া আমাকে ছাড়িয়া চলিলে?" কিছুক্ষণ নীরব থাকিয়া আবার বলিলেন—"ও দিদি, দাঁড়াও। তুমি ত কখনও আমার উপরে রাগ কর না। যাও ত বলিব—"তোমার

নামও পাষাণী; দিন দিন কাজেও পাষাণীই হইতেছ।" তুমি ত বল, "মানুষ যতই পাপ করুক্ না কেন, আমরা তাহাদিগকে ঘৃণা না করিয়া ক্ষমা করিব। কুষ্ঠরোগীর মত তাহাদিগকে ঔষধ দিয়া, পথ্য দিয়া, সুস্থ করিতে চেষ্টা করিব। রোগীর উপরে দয়া হয়, পাপীর উপরে দয়া হবে না কেন?" অতঃপর কিছু বেশী সময় নীরব থাকাতে রোগীর মুখশ্রী এবার কিঞ্চিৎ স্বাভাবিক হইতেছিল, কিন্তু আবার প্রলাপ আরম্ভ হইল। পুনরায় বলিতে লাগিলেন —"তবে আমায় ঘৃণা করিয়া চলিয়া যাবে কেন? বো'স। তোমার পবিত্র জ্যোতি পড়িয়া আমার পাপদেহ পবিত্র হউক্। তুমি দেবকন্যা। তুমি পুণ্য পবিত্রতার প্রতিমা। তোমাকে দিদী বলিয়া সমস্ত স্ত্রীজাতির প্রতি আমার শ্রদ্ধা বাড়িয়াছে। তুমি আমার দিদী, তাই যেন জগৎ আমার কাছে দিদীময়। একটী রূপে গুণে ভূষিতা স্ত্রীলোককে দেখিলেই, মনে মনে তাঁহাকে দিদী না বলিলে, প্রাণের তৃপ্তি হয় না।" সন্ন্যাসী দেখিলেন, শশাঙ্কশেখর থাকিয়া থাকিয়া স্বপ্নে অতি দীর্ঘ দীর্ঘ প্রলাপ বকিতেছে। অথচ ভালরূপ চেতনা ফুটিতেছে না। এ কথা ভাবিতে সন্ন্যাসীর মুখ কিছু বিষণ্ণ হইল। সন্ন্যাসী, এবার ধীরে ধীরে উঠিয়া বাহিরে আসিলেন।

কুললক্ষ্মীর মন্দিরে আজ চারি দিন হইল, সন্ন্যাসী,মৃতকল্প শশাঙ্কশেখরকে নিয়ে বাস করিতেছেন। সেই গভীর রাত্রিতে অগ্নিবেষ্টিত প্রাচীন পুরী হইতে শশাঙ্ককে নিয়ে, সন্ন্যাসী, কুললক্ষ্মীর মন্দিরে আসিয়াই শরীরের যাতনা ও গ্লানিতে চলচ্ছক্তিহীন হইয়া, শশাঙ্কের পার্শ্বেই মন্দিরগর্ভের অপরিষ্কৃত ভূমি শয্যাতে অচেতনবৎ পড়িয়া রহিলেন। শশাঙ্কশেখরের মৃতবৎ দেহও, সেই ধূলা, মাটি, ছুঁচা ও চর্ম্মচটিকার বহুকালের সঞ্চিত পুরীষরাশির মধ্যেই সে রাত্রির জন্য পড়িয়া রহিল। পর দিন বেলা এক প্রহরের পূর্ব্বেই সন্ন্যাসীর চৈতন্য হইল। সন্ন্যাসী উঠিয়াই দেখিলেন, রাজবল্লভের মৃত শব মন্দিরের বাহিরে পড়িয়া আছে। শব দেখিয়া, রাজবল্লভের দেহ কিনা চিনা কঠিন হইল। আগুনের আঁচে রাজবল্লভের শরীর পুড়িয়া আকৃতি অতি ভয়ঙ্কর হইয়াছিল। ছোট লোহার সিন্দুকটী এবং তলোয়ারখানি রাজবল্লভের শবের পার্শ্বে জঙ্গলের মধ্যেই পাওয়া গেল। চারি দিকে খোলা ভগ্ন মন্দিরের মধ্যে সমস্ত রাত্রির শীতল বাতাসে শশাঙ্কশেখরের মৃতবৎ দেহে ধীরে ধীরে চেতনা ফুটিতেছিল। সন্ন্যাসী নিজের শরীরেরও খানাতল্লাসি করিয়া দেখিলেন, স্থানে স্থানে বড় বড় ফোস্কা পড়িয়া গলিয়া গিয়াছে। কোন কোনটা বা

এখনও গলে নাই। কেবল ফুলিয়া রহিয়াছে। অনেক স্থানে ফোস্কা পড়ে নাই। কিন্তু স্থানগুলি লাল হইয়া উঠিয়াছে। গায়ে, চোখে বা ভ্রূতে একগাছি লোমও নাই। পরিধেয় কাপড়েরও নানাস্থান পুড়িয়া গিয়াছে, এবং কাপড়ের জ্বলন্ত স্থানগুলি বারম্বার হাত দিয়া তাড়াতাড়ি নিবাইতে গিয়া হাতে ফোস্কা ও ঘা হইয়াছে। চটি জুতার প্রসাদে পায়ে সামান্য সামান্য ঘা এবং ফোস্কা হইয়াছে মাত্র। মোটের উপরে বলিতে গেলে, রাজবল্লভের চেয়ে সন্ন্যাসীর শরীর আগুনে কম পুড়িয়াছে। শশাঙ্কশেখরের দেহে আগুনে পোড়ার বিশেষ কোন চিহ্ন দেখা গেল না। কিন্তু ক্ষতগুলি হইতে তখনও অজস্রধারে রক্ত ঝরিতেছিল।

সন্ন্যাসী নিজে একজন সুচিকিৎসক। দেশে দেশে পাহাড়ে পর্ব্বতে বেড়াইতে বেড়াইতে অনেক সময়, অনেক উদাসীন প্রভৃতির সহিত সাক্ষাৎ এবং মধ্যে মধ্যে সহবাস হওয়াতে, বহুবিধ আশ্চর্য্য আশ্চর্য্য বনজ ঔষধ শিক্ষা করিয়াছিলেন। সন্ন্যাসীর আশ্চর্য্য ঔষধের গুণে অনেক সময়, অনেক গরিব দুঃখী লোক ভয়ঙ্কর দুশ্চিকিৎস্য সঙ্কটাপন্ন রোগ হইতে মুক্তি পাইয়াছে। সন্ন্যাসী, আজ শশাঙ্ককে তদবস্থায় দেখিয়া, ব্যস্ততার সহিত তাড়াতাড়ি বনের মধ্যে গিয়া, অনেক অনুসন্ধানের পরে কতকগুলি গাছের শিকড়, পাতা এবং লতা নিয়ে পুনরায় মন্দিরে ফিরিয়া আসিলেন। শিকড়গুলি ইটের উপরে থেঁৎলাইয়া আহৃত লতা পাতা দিয়া শশাঙ্কের ক্ষত স্থানগুলিতে যত্নপূর্ব্বক বাঁধিয়া দিলেন। পরে একরকম পাতার রস রোগীর সমস্ত গায়ে মাখিয়া, সেই রসের প্রায় অর্দ্ধপোয়া আন্দাজ রোগীকে সেবন করাইলেন। সন্ন্যাসী নিজের গায়েও, একরকম পাতা হাতে রগড়াইয়া, তাহার রস সর্ব্বস্থানে মাখিলেন। অবশেষে বন হইতে বাহির হইয়া, নিকটের একটা গ্রামে গিয়া, একটী মাটীর পাত্রে করিয়া কতকটা দুধ, একগাছি বেত এবং কিছু আগুনের যোগাড় করিয়া পুনরায় বনের মধ্যে ফিরিয়া আসিলেন। সন্ন্যাসীকে গ্রামের লোকেরা চিনিতে পারিয়া যথেষ্ট খাতির করিল। সন্ন্যাসী তাহাদিগকে কোনও কথা খুলিয়া বলিলেন না। কোথায় আছেন, তাহাও বলিলেন না। এই চারিদিনের মধ্যে দরকার মত সন্ন্যাসীকে অনেকবার গ্রামে যাইতে হইয়াছে। সন্ন্যাসী বুঝিয়াছেন, এইরূপ বারম্বার আনাগনা করিলে পল্লির লোকেরা সবই টের পাইবে এবং সকল কথাই

প্রচারিত হইবে। কিন্তু তাহা হইলে এই নিঃসহায় অবস্থায় নানা বিপদ্ ঘটিবার সম্ভাবনা। অথচ রোগীর অবস্থা একটুকু ভাল না হইলে পালাইতেও পারেন না। নানা কারণে সন্ন্যাসীর মনে উৎকণ্ঠা থাকিলেও, সর্ব্বদা ইষ্টদেবের চরণে নির্ভর করিয়াই কাজ করিতেছিলেন। গ্রামের লোকেরা বিশেষ পীড়াপীড়ি করিয়া সন্ন্যাসীকে কোনই কথা জিজ্ঞাসা করিতে সাহস পায় নাই। পরন্তু গ্রাম্য নিম্ন শ্রেণীর কৃষকদিগের প্রকৃতিসুলভ শিশুর মত সরলতাই তাহাদিগকে এবিষয়ে গাঢ় অনুসন্ধিৎসু হইতে দেয় নাই—কোন বিষয়েই দেয় না। নূতন ঘটনার মর্ম্ম অবগত হইতে গিয়া, একবার নিস্ফল হইলেই, তাহারা সকল ভুলিয়া যায়। সন্ন্যাসী গভীর নিশাকালে একাকীই মন্দিরের উঠানে কাষ্ঠাদি সংগ্রহ করিয়া রাজবল্লভের মৃত দেহের সৎকার করিয়াছেন এবং রেত দিয়া সিন্দুকের তালা কাটিয়া, তাহার মধ্যে প্রায় লক্ষাধিক টাকার সম্পত্তি পাইয়াছেন। তলোয়ারখানি কিছু কাটিবার জন্য বিশেষ উপকারে আসিতেছে। আজ প্রভাতের কিছু পরে শশাঙ্কশেখরকে স্বপ্নাবস্থায় ঘন ঘন দীর্ঘ দীর্ঘ প্রলাপ বকিতে দেখিয়া, সন্ন্যাসী কিঞ্চিৎ চিন্তান্বিত হইয়া বাহিরে আসিলেন। বাহিরে আসিয়া,তদবস্থায় ভাবিতে ভাবিতেই একটী বনে গিয়া, আর একটী নূতন ঔষধ সংগ্রহ করিতে ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন। বিস্তীর্ণ অরণ্যের মধ্যে অনেক কাঁটার আচড়, লতামণ্ডলীর সস্নেহ আলিঙ্গন, ডালের আঘাত সহ্য করিয়া, কিছুক্ষণ খুঁজিতেই ঔষধটী পাইলেন। এই ঔষধের রস পুনঃ পুনঃ প্রচুর পরিমাণে রোগীকে সেবন করাইলে এবং উত্তপ্ত করিয়া রোগীর সর্ব্বাঙ্গে মাখাতে, দ্বিপ্রহরের কিছু পরেই রোগীর বেশ চৈতন্য হইল। শশাঙ্কশেখর এই চারিদিন পরে এবার প্রকৃত সজ্ঞানে চোক মেলিয়া পুনরায় পৃথিবীর মুখ দেখিলেন। শেষ বেলায় রোগীর অবস্থা খুব ভাল দেখিয়া, সন্ন্যাসী বন হইতে বাহির হইয়া, একখানি ভাড়া'টে নৌকা যোগাড় করিয়া একবারে কুললক্ষ্মীর মন্দিরের ঘাটেই আনিয়া উপস্থিত করিলেন। নৌকা সন্ধ্যার অল্প পরেই ঘাটে আসিল। পথে সঙ্গে নিবার মত প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদিও সন্ন্যাসী, এই সঙ্গেই সংগ্রহ করিয়া আনিয়াছিলেন। নৌকা ঘাটে বাঁধিলে, মন্দিরের সমস্ত জিনিষপত্র এবং শয্যার সহিত ধরাধরি করিয়া রোগীকে তখনই নৌকায় তোলা হইল। মাঝীদিগকে প্রচুর পুরস্কার স্বীকার করা হইয়াছিল। মাঝীরা প্রাণপণে নৌকা চালাইতে লাগিল। চারি দিন পরে রোগীর সহিত সন্ন্যাসীর নৌকা নির্ব্বিঘ্নে একটী'রেলওয়ে ষ্টেশনে পৌঁছিল।

তৃতীয় খণ্ড।

—:০:—

প্রথম পরিচ্ছেদ।

বুড়াকর্ত্তার জীবন-রহস্য।

কুন্তলা যমবরা হইলেও, হরগোবিন্দ মনে করেন, কুন্তলা তাঁহার আশার সুনীল সান্ধ্য গগণে একটী তারা, গৃহকাননে একটী ফুল। কুন্তলা হরগোবিন্দের মৃত কন্যার স্মৃতিময়ী ছবি, বালক বালিকা শূন্য গৃহে আনন্দের প্রস্রবণ। হরগোবিন্দ কুন্তলার নামকরণের সময়ে, বাছিয়া দুইটী নাম রাখিয়াছিলেন। নাম দুইটী "আনন্দময়ী" আর "কুন্তলা"। "কুন্তলা" নামের প্রদীপ বেশী জ্বলাতে "কুন্তলাই" সিদ্ধ নাম হইল। ইহার উপরেও হরগোবিন্দ ছোটবেলায় কুন্তলাকে, কখনও কখনও "আশাকলিকা," কখনও কখনও বা "লাবণ্য লতা,"—বড় মনের আবেগ হইলে—"দুখহরা" বলিয়া আদর করিতেন। বস্তুত পাকে প্রকারে কুন্তলার প্রায় এক্‌ঝুড়ি নাম হইয়াছিল। মুক্তকেশী বলিয়া কুন্তলার "কুন্তলা" নামই শেষটা সুন্দর মানাইয়াছিল।

কিন্তু বাড়ীর বুড়াকর্ত্তা হরগোবিন্দের বৃদ্ধ পিতাঠাকুর ৺ মহারাজা কৃষ্ণগোপাল রায় মুখোপাধ্যায় বাহাদুর হরগোবিন্দের আদরের যমবরা দৌহিত্রীটীকে এই এক ঝুড়ি নামের কোন নামেই না ডাকিয়া, "পাষাণী" বলিয়া ডাকিতেন। কখনও কখনও আদর করিয়া শুধু "পাষাণ"ও বলিতেন। আবার ৺ বুড়াকর্ত্তা, কখনও কখনও তাঁহার সেই অদন্ত মুখে হাসিয়া হাসিয়া, ভাবশূন্য, অর্থশূন্য, রুচিশূন্য শুধু ভাষার আদ্যশ্রাদ্ধ, সপিণ্ডকরণ করিয়া, পাষাণের নামে এক আধটা কবিতা তৈয়ার করিয়াও যথেষ্ট রসিকতার বাজেখরচ করিতেন। পাষাণকে মধ্যে মধ্যে হাত ধরিয়া কাছে দাঁড় করিয়া অপর হাতে পাষাণের কচি কচি চিবুকখানি টিপিয়া ধরিয়া বলিতেন,—

"পাষাণে গড়িলে বিধি কঠিন করিয়া,
তবুও সোঁপেছি প্রাণ জানিয়া শুনিয়া!

পাষাণ আমার বড়ই কঠিন!
কঠিন! কঠিন! কঠিন!"

পাষাণী কিন্তু শুধুই বৃদ্ধের দন্তহীন মুখগহ্বরের একটা প্রকাণ্ড আন্দোলন দেখিয়াই, খিল খিল করিয়া হাসিতে হাসিতে ছুটিয়া পালাইত। তখন বৃদ্ধও হাসিতেন।

মহারাজা কৃষ্ণগোপাল, ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির অধিকারকালে বাঙ্গালার কয়েকটী বড় বড় জেলার উপরে সর্ব্বপ্রধান দেওয়ান ছিলেন। কৃষ্ণগোপাল সময়ে বিপুল অর্থরাশি সঞ্চয় করেন এবং পৈত্রিক সামান্য জমিদারির পরিবর্ত্তে বহুবিস্তৃত জমিদারি ক্রয় করেন। বঙ্গদেশের মধ্যে তৎকালে কৃষ্ণগোপাল, কুলে, মানে, ধনে, সম্পত্তিতে সর্ব্বপ্রধান শ্রেণীর লোক ছিলেন। কৃষ্ণগোপালের চরিত্র নানা দোষে গুণে জড়িত ছিল। পাকে প্রকারে কাহারও কার্য্য সিদ্ধি করিয়া দিয়া প্রচুর অর্থরাশি ঘুষ নেওয়া, এটুকু জাল বা এক আধটুকু মিথ্যা প্রবঞ্চনা করা প্রভৃতিকে কৃষ্ণগোপাল বিশেষ দোষের কাজ মনে করিতেন না। কৃষ্ণগোপাল মৃত্যুর অল্প কয়েকদিন পূর্ব্বেও একজন মাড়োয়ারীর সর্ব্বনাশ করিতে উদ্যত হইয়াছিলেন। কৃষ্ণগোপাল অনেকদিন পূর্ব্বেই দুই সংসারের দুই পুত্রকে বাড়ী ঘর ও স্থাবর অস্থাবর সমস্ত সম্পত্তি সমান দুই ভাগ করিয়া দিয়াছিলেন। পরমানন্দ মাড়োয়ারী নামক একজন ধনীলোক, দেওয়ানিপদে থাকিবার সময়ে কৃষ্ণগোপালকে ষাইট হাজার টাকা ঘুষ স্বীকার করিয়া ফাকি দিয়া একটী কাজ করাইয়া নেয়। পরমানন্দ, শেষটা দেওয়ানজিকে এক পয়সাও দিতে চাহিল না। কৃষ্ণগোপাল সে কথা মনে করিয়া রাখিয়াছিলেন। অথচ পরমানন্দের সঙ্গে ভাল ভাব রাখিতে কখনও ভুলিতেন না। এখন দুই গুরু পুত্রের নামে দুই পুত্রের সমস্ত বিষয় সম্পত্তি বিনামী করিয়া, উড়িষ্যাঞ্চলে জমিদারি কিনিবার নাম করিয়া প্রচুর সুদে কৃষ্ণগোপাল সমস্ত সম্পত্তি রাখিয়া পরমানন্দের নিকট এক কোটি পঁচিশলক্ষ টাকা ধার চাহিলেন। পরমানন্দ কৃষ্ণগোপালের অনবরত সদ্ব্যবহারে আপনার বহু দিন পূর্ব্বের তঞ্চকতার কথা এক রকম মন হইতে দূর করিয়াছিল। তাহার উপরে এত লম্বা সুদের লোভ মাড়োয়ারীর অর্থলোলুপ প্রাণের নিকট বড় বেশী প্রলোভনের হইল। পরমানন্দ এ লোভ সম্বরণ করিতে না পারিয়া কৃষ্ণগোপালকে টাকা ধার দিতে স্বীকৃত হইল। কৃষ্ণগোপা-

লের সমস্ত সম্পত্তি বন্ধক রাখিয়া টাকা দিতে পরমানন্দের মনে কোনই দ্বিধা ছিল না। সকল কথা ঠিক হইলে, কৃষ্ণগোপাল তৎক্ষণাৎ উপযুক্ত মূল্যের কাগজ আনাইয়া লিখা পড়া করিয়া সমস্ত ঠিক করিলেন। দলিলে কৃষ্ণগোপালের স্বাক্ষর হইল। দলিল রেজেষ্টারি করাও হইল। রেজেষ্টারি আফিস হইতে দলিলখানি ফিরিবার পূর্ব্বেই কৃষ্ণগোপালের শরীর হঠাৎ অসুস্থ হইয়া পড়িল। সে দিন আর পরমানন্দের নিকট হইতে দলিল দিয়া টাকা নেওয়া হইল না। পরদিন দুই প্রহরের মধ্যেই মহারাজা কৃষ্ণগোপাল রায় মুখোপাধ্যায় বাহাদুর আকস্মিক সাংঘাতিক পীড়ায় ইহলোক ত্যাগ করিলেন। এক কোটি পঁচিশ লক্ষ টাকার খতখানি কৃষ্ণগোপালের হাত বাক্সেই বন্ধ রহিল। হরগোবিন্দের বাড়ীতে বসিয়াই দলিল লিখা পড়া হইয়াছিল। হরগোবিন্দের বাড়ীতেই কৃষ্ণগোপালের মৃত্যু হয়। মৃত্যু সময়ে হরগোবিন্দ বাড়ী ছিলেন না। কৃষ্ণগোপাল দলিলের বাক্সটী সিদ্ধেশ্বরীকে মারিয়া রাখিতে দিয়াছিলেন। সিদ্ধেশ্বরী বাক্সটী সিন্দুকে রাখিয়াদিলেন। সিদ্ধেশ্বরী জানিতেন না, বুড়াকর্ত্তার হাতবাক্সে দলিল আছে। হরগোবিন্দও বাড়ী আসিলে কেহ আর সে কথা তাঁহাকে বলিল না অথবা হরগোবিন্দ কখনও পিতাঠাকুরের হাতবাক্স খুলিয়া দেখিলেন না, তাহাতে কি আছে। সিদ্ধেশ্বরী কেবল যত্নপূর্ব্বক বাক্সটী সিন্দুকে পুরিয়া রাখিলেন। ভবানীশঙ্কর এ সকল কথাই জানিতেন। ভবানী তখন বাড়ী ছিলেন।

যাহাহউক্, কৃষ্ণগোপালের দোষও যেমন ছিল, গুণও তেমনই ছিল। কৃষ্ণগোপাল বিখ্যাত দাতা লোক ছিলেন। কৃষ্ণগোপাল কত মানুষের যে কত উপকার করিয়াছেন, তাহারও সংখ্যা নাই। কৃষ্ণগোপাল ছেলেদের লিখাপড়ার জন্য অকাতরে অর্থ ব্যয় করিতেন। হরগোবিন্দের প্রকাণ্ড পুস্তকাগার, কৃষ্ণগোপালের অজস্র প্রদত্ত অর্থবলেই নানা ভাষার উত্তম উত্তম গ্রন্থে সজ্জিত হইয়াছিল। পুত্রেরা বিদ্যাশিক্ষা বা কোন সদুদ্দিশ্যে টাকা চাহিলেই, কৃষ্ণগোপাল মুক্তহস্তে তাহা প্রদান করিতেন। ঘরে বাহিরে কৃষ্ণগোপালের অতুল সম্মান ও প্রতিপত্তি ছিল। কৃষ্ণগোপাল জীবিত থাকিতে পরিবারের কোন লোকেই ইচ্ছাপূর্ব্বক তাঁহার বিরুদ্ধে কোন কাজ করিত না। বেদ বাক্যের মত সকলে তাঁহার কথা মানিয়া চলিত। সুতরাং কুন্তলার বুড়া কর্ত্তার প্রদত্ত পাষাণী নামই বাড়ীতে এবং প্রতিবাসীদের নিকট প্রচলিত। কুন্তলার মূল নাম—"কুন্তলা" নাম,

কেবল সন্ন্যাসীপ্রভৃতি বাহিরের অল্প সংখ্যক লোকের নিকটেই পরিচিত। কুন্তলা, চিঠি পত্রে ও বুড়াকর্ত্তার আদরের নামটীই ব্যবহার করে। কৃষ্ণগোপালের বিশ্বাস ছিল, যমবরা কুন্তলাকে এ জগতে অনেক দুঃখ কষ্ট সহ্য করিতে হইবে, পাষাণের মত শক্ত হইতে হইবে, নতুবা মঙ্গল নাই। তাই বাছিয়া নাম রাখিয়াছিলেন "পাষাণী"। যাহা হউক, "পাষাণী" নামটী লোক জগতে "ললিত-লবঙ্গলতা-পরিশীলন-কোমল-মলয়সমীরে, মধুকরনিকর-করম্বিত-কোকিল-কূজিত-কুঞ্জকুটীরে ;" ইত্যাদি জয়দেবের সুমিষ্ট পদাবলীর মত সুমধুর না হইলেও, কুন্তলার ঘটনাপূর্ণ—ঝটিকা-পূর্ণ ভাবী জীবনের সঙ্গে বিশেষ সম্বন্ধ থাকায় এখন হইতে বুড়া কর্ত্তার প্রদত্ত এই নামটীই ব্যবহৃত হইবে।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

"চোরের মন বোচ্‌কারদিকে।"

মণিরামপুর অঞ্চলের দুর্ভিক্ষ এবং মহামারি প্রশমিত হওয়াতে স্বরস্বতী প্রভৃতিকে সঙ্গে দিয়া, হরগোবিন্দ, পাষাণীকে সীতানগর হইতে বাড়ী পাঠাইয়াছেন। অপরিমিত পরিশ্রমে পাষাণীর শরীর কিছু অসুস্থ হইয়াছিল। এখন পাষাণী সুস্থ শরীরে পুনরায় পড়া শুনায় এবং গৃহ কার্য্যে মন দিয়াছে। হরগোবিন্দ রায়ের গৃহকার্য্যাদির সহিত নিত্য অতিথিসেবা প্রভৃতি চিরদিনের মতই নিয়মিতরূপে চলিতেছে। হরগোবিন্দ আজও সীতানগর হইতে ফিরিয়া আসেন নাই। বাড়ী ঘর যেন শূন্য শূন্য। ধরণী ভাল আছে।

এত দিন পরে ধরণীর বহু চেষ্টার ফল আজ ফলিয়াছে। ধরণী সন্ধ্যার পরে হঠাৎ রান্না ঘরে গিয়াই তাড়াতাড়ি ভাতে, ডালে, ঝোলে, অম্বলে, দুধের কড়ায়, যাহা সম্মুখে পড়িল তাহাতেই গুলির আড্ডার সেই কঙ্কালাবশিষ্ট পুরুষের নিকট হইতে আনীত শাদা গুঁড়া টুকু ঢালিয়া দিয়া, অদৃশ্যে বাহির হইয়া গেল। ধরণীকে কেহই দেখিতে পাইল না।

ধরণী রান্না ঘর হইতে বাহিরে আসিয়াই, একবার পিসীমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে ছুটিল। সিদ্ধেশ্বরী তখন সাঁজের বাতির সঙ্গে সঙ্গে ধুনচিতে করিয়া ঘরে ঘরে ধূনার ধূঁয়া দিতেছিলেন। ধরণী সিদ্ধেশ্বরীর কাছে আসিয়া কাতরস্বরে বলিল, "পিসীমা, আমার বড় পেটব্যথা করিতেছে। মাথাটাও ধরিয়াছে।

আজ আর রাত্রিতে থাব না। আমায় ডাকিতে লোক পাঠাইও না। আমি বাহিরে গিয়া আমার ঘরে শু'য়ে থাকি।''এই কথা বলিয়া ধরণী যাইতে উদ্যত হইলে, সিদ্ধেশ্বরী ধরণীকে হাতে ধরিয়া কাছে টানিয়া, মাথায় গায়ে এবং পেটে বারম্বার হাত দিয়া পরীক্ষা করিতে লাগিলেন। মাথা ধরটা যেমন তেমন হউক্, পেটের ব্যথা এ মানবজগতে এক অপূর্ব্ব ব্যাধি। ইহার সাহায্যে দুষ্ট ছেলে সম্পূর্ণ সুস্থ দেহে দেড় পোয়া সরু বালাম চাউলের অন্ন, দুগ্ধ ও মৎস্যের সহিত ধ্বংস করিয়াও স্কুল কামাই করিতে পারে। গৃহস্থের কার্য্য-ভীরু কুড়ে বৌ ঝী মহাশয়ারাও, সময় সময় এই মহাপীড়ার ভাণ করিয়া, গৃহ কার্য্যের জ্বালা যন্ত্রণাময় দুর্দ্ধর্ষ হস্ত এড়াইয়া, মৃত্তিকা-শয্যায় অসহায়ের সহায় অঞ্চলোপরি বেশ এক চোট ঘুম সেবা করিয়া থাকেন। অথচ এই মহৎ রোগ নির্ণয় করিতে পারেন, বোধ হয় এ বিধাতার জগতে অদ্যাবধি এমন ডাক্তার কিম্বা কবিরাজ জন্মেন নাই। এ রোগের একটী মাত্র মহৌষধি আছে। কিন্তু সর্ব্বত্র ব্যবহার করিবার সুবিধা হয় না। অনেকে জানেও না। ভাষাকথায় ঔষধটী, মুষ্ট্যাঘাত বা বেত্রাঘাত। যাহা হউক্, সিদ্ধেশ্বরীর পরীক্ষার পরিশ্রমই সার হইল। ভ্রাতুষ্পুত্রের রোগ নির্ণয় করিতে পারিলেন না। সুতরাং দ্বিরুক্তি না করিয়া উপযুক্ত ভ্রাতৃ-নন্দনের প্রস্তাবেই সায় দিয়া কার্য্যান্তরে চলিয়া গেলেন। পিসীমাকে কাজে ব্যস্ত দেখিয়া, ধরণী শর্ম্মা বাহিরে না গিয়া, বরাবর সিদ্ধেশ্বরীর ঘরে গিয়া, ছাদের সিঁড়ি দিয়া ছাদে উঠিয়া, বাহির হইতে সিঁড়িঘরের কপাট জোড়াটি আস্তে আস্তে বন্ধ করিয়া বসিয়া রহিল। বাহিরের কোন ছাদ হইতে সিদ্ধেশ্বরীর ঘরের ছাদে আসা যায় না বলিয়াই, শর্ম্মাকে এই সুবিধা দেখিতে হইল। শর্ম্মা, এক দিন সন্ধ্যার আঁধারে গা ঢাকিয়া যে ছাদে পায়চারী করিতে করিতে ভাবিতেছিল, সেটী হরগোবিন্দের বসিবার ঘরের বাহিরের দিকের ছাদ। অন্য দিনের মতই রাত্রি এক প্রহরের পরে সকলের থাওয়া দাওয়া এক রকম চুকিয়া গেল। পাষাণী আর সিদ্ধেশ্বরী প্রত্যহই বাহিরের অতিথি, কুটুম্ব ও কর্ম্মচারীদিগের আহারাদির পরে আহার করেন। সিদ্ধেশ্বরী আজও প্রায় দেড় প্রহর রাত্রির পরে কাজকর্ম্ম সারিয়া, শয্যাগৃহে একাকী কপাট বন্ধ করিয়া শুইলেন। কিন্তু ঘুমে সিদ্ধেশ্বরীর চোক বুজিয়া আসিতেছিল, গা টলিতেছিল। সিদ্ধেশ্বরী তাড়াতাড়ি প্রদীপ নিবাইয়া যাই শুইলেন, অমনি যেন ঘুম তাঁহাকে পাথর চাপা দিয়া অচেতন করিয়া

ফেলিল। আজ বাড়ীর প্রায় সকলেরই এই রূপ ঘটিল। অনেকে বিছানার জন্য দেরি না করিয়া মাটীতেই আঁচল পাতিয়া শুইয়া পড়িল। হরগোবিন্দ বাড়ী না থাকিলে পাষাণী বাড়ীর মধ্যে শোবার ঘরে বসিয়াই রাত্রিতে পড়া শুনা করে। আজ পাষাণী বৈ খুলিবামাত্রই বৈয়ের উপরে মাথা রাখিয়া ঘুমাইয়া পড়িল। ক্রমে ক্রমে প্রদীপের তেল পুড়িয়া, সলিতা গুলিও পুড়িয়া পুড়িয়া ছাঁই হইল। তবুও আজ পাষাণীর ঘুম ভাঙ্গিল না। স্বরস্বতী আজ আর পেঁচোর মার দেশের গল্প, বয়স কালের কাহিনী শুনিতে অবসর পাইল না। পেঁচোর মাও আগেই ঘুমাইয়া পড়িল। দ্বিপ্রহর রাত্রির পূর্ব্বেই বাড়ীর সকলে যেন মরিয়া ঘুমাইতে লাগিল। গভীর স্তব্ধতায় চারিদিক্ পরিপূর্ণ হইল। সেই স্তব্ধতার মধ্যে ধীরে ধীরে চুপি চুপি ধরণীধর ছাদ হইতে পুনরায় সিদ্ধেশ্বরীর ঘরে নামিয়া আসিল।

ধরণী এক জন ব্যবসায়ী চোর না হইলেও, অনেক চোরের সঙ্গে ধরণীর বহুদিনের আলাপ আছে। ধরণীধর কয়েক দিন আগেই ছাদে একটা নর্দ্দমার মধ্যে এক গাছি দড়ী, কিছু তেল, সিঁদুর, আর একখানি ছোট লেঙটি এবং একটী দেশলাইয়ের বাক্‌স যোগাড় করিয়া রাখিয়াছিল। সিঁড়ি হইতে ধরণী শর্ম্মা সিদ্ধেশ্বরীর ঘরে আসিয়া প্রথমেই কিছুক্ষণ চুপ করিয়া কাণ পাতিয়া রহিল। পরে হঠাৎ একটী দেশলাইয়ের কাঠি জ্বালাইয়াই এক রকম কৌশলে জ্বলন্ত কাঠিটী মুখের মধ্যে রাখিয়া দিয়া, বারম্বার মুখ মেলিয়া মেলিয়া সেই আলোতে ঘরের সমস্ত অবস্থা দেখিতে লাগিল। ধরণী ঘরের মানুষ, ঘরের অবস্থা সকলই জানে। সুতরাং এজন্য বহুক্ষণ তাহাকে পরিশ্রম করিতে হইল না। ধরণী আলোতে দেখিল, চাবির থ'লেটী সিদ্ধেশ্বরীর আঁচলেই ঝুলিতেছে। আঁচল খাটের নীচে পড়িয়াছে। ধরণী মুখে এবং সমস্ত কপালে সিঁদুর লেপিয়া, গায়ে খুব করিয়া তৈল মাখিয়া, কোমর বেড়া এক গাছি সরু সূতায় এক-খানি অদৃশ্য প্রায় কপ্‌নী পরিয়া, ছাদ হইতেই একটা বিকটাকারে সাজিয়া আসিয়াছিল। এখন সিদ্ধেশ্বরীর নিদ্রা পরীক্ষার জন্য নিজের সেই বিকৃত ছবির কাছে নিজেই একটী দেশলাইয়ের কাঠি জ্বালাইয়া ধরিয়া, বারম্বার পায়ের বুড়া আঙ্গুলে ভর রাখিয়া, উঁচু হইয়া দাঁড়াইয়া, জিভ বাহির করিয়া, মুখটার না না প্রকার ভঙ্গি করিতে লাগিল। এই পরীক্ষা শেষ হইলে, ধরণীধর ছোট শব্দ করিয়া হাতে একটী করতালি দিল। ইহাতেও নিদ্রিত ব্যক্তির চেতনার কোন পরিচয় না পাইয়া, চুপি চুপি পা ফেলিয়া শয্যার কাছে গিয়া,

আবার নিশ্বাস পরীক্ষা করিতে কিছুক্ষণ দাঁড়াইয়া রহিল। এইরূপে ধরণী মাছি-মারা কেরাণীর মত চোরের নিকট গল্পে শুনা সমস্ত নকলই সমাধা করিল। না না পরীক্ষায় ধরণী বুঝিল, পিসীমা মড়ার মত ঘুমাইতেছেন। তখন সাহসের সহিত ধরণীধর সিদ্ধেশ্বরীর আঁচল হইতে চাবির থ'লেটী খুলিয়া নিয়ে দেশলাইয়ের আলোতেই সিন্দুকের চাবি দিয়া ধীরে একটী সিন্দুক খুলিল। কিন্তু সিন্দুক খুলিবা মাত্র, সিন্দুকের সম্মুখেই বুড়া কর্ত্তার হাতবাক্সটা পাওয়া গেল। এই সকল করিতে ধরণীর হাত ঘন ঘন কাঁপিতেছিল। ধরণী বাক্স পাইয়া একে একে তিন চারিটী চাবি পরীক্ষার পরে একটা চাবি দিয়া হঠাৎ হাতবাক্সটীও খুলিতে সমর্থ হইল। তখন ধরণীধরের মুখে আর প্রফুল্লতা ধরিতেছিল না। ধরণী, বাক্স হইতে ভবানীশঙ্করের কথিত পরমানন্দ মাড়োয়ারীর সেই দলিলখানি নিয়ে তাড়াতাড়ি পুনরায় হাতবাক্সটীতে চাবি ঘুরাইল। হাত বাক্স বন্ধ হইলে, আবার তাহা পূর্ব্ব মত সিন্দুকে রাখিয়া, সিন্দুকও বন্ধ করিল। ধরণী, সিদ্ধেশ্বরীর ঘর হইতে দলিল নিয়ে, মা কালীকে ডাকিতে ডাকিতে পুনরায় ছাদে আসিল। ছাদে আসিয়া, ছাদের জল পড়িবার একটী নর্দ্দমার ছিদ্রের সঙ্গে পূর্ব্ব-সংগৃহীত সেই সুদীর্ঘ দড়ী গাছি ঝুলাইয়া বাঁধিয়া, তখনই সেই দড়ী ধরিয়া, শর্ম্মা, দ্বিতল গৃহের ছাদ হইতে নীচে নামিয়া পড়িল। নীচে নামিয়া, গায়ের অসাধারণ বলের সহিত বারম্বার দড়ী গাছটী ধরিয়া টানা টানি করিতে অবশেষে নর্দ্দমার একখানি ইটের সহিত দড়ী গাছি সশব্দে নীচে পড়িয়া গেল। ইট খানি শর্ম্মার পায়ে লাগাতে, শর্ম্মা অত্যন্ত ব্যথা পাইল। কিন্তু শব্দ হইল বলিয়া ভয়ে ধরণীর গা কাঁপিতেছিল। ধরণী পা খোঁড়িয়ে খোঁড়িয়ে তখনই ছুটিয়া একটা জঙ্গলে ঢুকিয়া পড়িল।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

নৌকা ঠেকিল।

আজ উঠিতে সকলেরই বেলা হইল। সিদ্ধেশ্বরী উঠিয়া কাপড় সমান করিতে চাবির থ'লেটী আঁচলে না দেখিয়া চমকিয়া উঠিলেন। পরে চোক মুছিয়া ভাল করিয়া চাহিতে দেখিলেন, চাবির থ'লে ঘরের মে'ঝেতে পড়িয়া

আছে! চারিদিকে অনেক পোড়া দেশলাইয়ের কাঠি ছড়াইয়া রহিয়াছে! অথচ ঘরের সবই ঠিক আছে। চারিদিকের জানালা দরজাগুলি সমস্তই বন্ধ আছে। সিদ্ধেশ্বরী চমকিয়া দেখিলেন, ঘরময় কাহার যেন তেল মাখা পায়ের দাগ পড়িয়াছে! দাগগুলি সিঁড়ির দিক্ হইতে ঘরের মধ্যে স্পষ্ট-রূপে পড়িতে পড়িতে আসিয়াছে। শেষটা ক্রমেই অস্পষ্ট হইয়া সমস্ত ঘরে পায়ের দাগ পড়িয়াছে। যাইবার কালের পায়ের কোন চিহ্ন ঠিক করা গেল না। সিদ্ধেশ্বরী এ ঘটনাতে আরও চমকিয়া এ'লো মে'লো হইয়া তাড়াতাড়ি সিঁড়িতে উঠিলেন। দেখিলেন, সিঁড়িতেও সিঁড়িঘরের কপাট খোলা পড়িয়া আছে এবং দরজাটা যেন হাঁ হাঁ করিতেছে! ছাদে একটা নারিকেলের মালায় কতকটা সিঁদূর গোলা রহিয়াছে! আর একটা তেলের খালি মালা পড়িয়া গড়াইতেছে! বোধ হইল, তাহাতে এক মালা তেল ছিল। সিদ্ধেশ্বরী কাঁপিতে কাঁপিতে চারিদিকে তদারক করিয়া দেখিলেন, একটা নর্দ্দমার ইটও ভাঙ্গিয়া পড়িয়া গিয়াছে। চোর ঘরে আসিয়াছিল, ইহা এখন স্পষ্টই ঠিক হইল। কিন্তু ঘরের কি যে চুরি গিয়াছে, সিদ্ধেশ্বরী অনেক অনুসন্ধানেও তাহা বুঝিতে পারিলেন না। সিদ্ধেশ্বরী ঘরের বাহিরে আসিয়া, কাল রাত্রিতে বাড়ীতে চোর ঢুকিয়াছিল, একথা সর্ব্বত্র প্রচার করিয়া দিলেন। বাহিরের দ্বারবান ও চৌকীদারের প্রতি বিশেষ তাম্বি চলিল। কিন্তু কিছু চুরি যায় নাই বলিয়া, তুলসীগ্রামের থানায় কেবল ঘটনাটার খপর মাত্র দিয়া রাখা হইল। পাষাণী তখনই এই ঘটনা লিখিয়া, ঠাকুরদাদাকে চিঠি লিখিল। বেলা অর্দ্ধ প্রহরের মধ্যেই যেন তাড়িত যোগে গ্রামময় এ সংবাদ ছড়াইয়া পড়িয়া নানা আকার ধারণ করিল। গ্রামের মেয়ে মহলে বৃথা বকাম করিয়া যথেষ্ট সময় নষ্ট করিবার বেশ একটী সুযোগ উপস্থিত হইল। কেহ বলিতে লাগিল—"আহা! বেচারিদের ঘরে একটী কাণা কড়িও রাখিয়া যায় নাই গা! দেশে এ কি হো'ল?" কোন বৃদ্ধা শিবের মাথায় বিল্বপত্র দিতে দিতে ঘাটে যে আসিতেছে, তাহাকেই বলিতেছেন—"ওগো বড়ই চোরের ভয় হ'য়েছে। রে'তে কেউ বাইরে যেওনা। আমি এই মাত্র দেখে এলুম্, ওপাড়ার হরগোবিন্দ রায়ের বাড়ীর বেচারিরা নারিকেলের মালায় জল খেতেছে। দেখে, চোখে জল এলো। ওমা দেশে কি হো'ল গা!" পাড়ার অল্পবয়স্কা যুবতী বৌ ঝীয়েরা ভিজা কাপড়ে, ভিজা-চুলে অবাক্ হইয়া বৃদ্ধার কথা শুনিতে লাগিল। অপর বৃদ্ধা তখনই

প্রথমার কথায় ফোঁড়ন দিয়া বলিলেন—"দেখ কি গো মা, ঘোর কলি উপস্থিত। গ্রাম্য দেবতা গ্রাম ছেড়ে অন্তর্দ্ধান কো'রেছেন। নৈলে কি এ সকল ঘট্‌তে পারে ?"

এদিকে পাড়ার অলকা, উজ্জ্বলা, বিমলা, শ্যামা, বামা, লাবণ্য, মোহিনী, মতির পিসী, দামোদরের ঠাকুর মা, হীরালালের মাসী, চুণিলালের বিধবা পিস্‌তুত বোন্‌, গৌরমণি ঠাক্‌রুণ, চাটুয্যেদের গিন্নী, দত্তদের বুড়া ঝী প্রভৃতি যুবতী, প্রৌঢ়া, অর্দ্ধবয়স্কা, বৃদ্ধা, সধবা, বিধবা, বৌ, ঝী, গিন্নী, চাকরাণী সকলে দলে দলে আসিয়া হরগোবিন্দ রায়ের বাড়ীর মধ্যের উঠান, ছাদ ও রান্না বাড়ী ভরিয়া ফেলিল। ইঁহারা প্রত্যেকেই থানার দারগা জমাদারের উপরে এক কাঠি বাড়িয়া ঘটনা স্থল তন্ন তন্ন করিয়া তদন্ত পূর্ব্বক সিদ্ধেশ্বরীকে জেরা করিতে লাগিলেন। শেষটা ফৌজদারি, সেশন প্রভৃতির বিচারকার্য্যও বাকী রাখিলেন না। কেহ কেহ আঙ্গুল মট্‌কাইয়া গরিব বেচারি চোরকে তখন তখনই বারম্বার যমের বাড়ী পাঠাইয়া, মনের ক্ষোভ নিবারণ করিতে লাগিলেন। গৌরমণি বলিলেন—"ওগো চোরে এ দিগ্‌কে কাল নিদে'লি দিয়েছিল। তাই সব ভাই প'ড়ে সমস্ত রাতটা মড়ার মত ঘুমচ্ছিল।" অমনি চাটুয্যেদের গিন্নী সিদ্ধেশ্বরীর দিকে চোক দুইটা বড় বড় করিয়া চাহিয়া বলিলেন—"হাগা বৌমা, সাঁজের বেলা ঘর ঝা'ট্‌ দিয়ে ওঁচ্‌লা বাইরে ফেলে ছিলে কি ?" সিদ্ধেশ্বরী বলিলেন—"কি জানি মা মনে নাই।" অমনি দামোদরের ঠাকুরমা বলিয়া উঠিলেন—"রেখে দেও ভাই, এখনকার বৌ ঝীদের কথা আর বো'ল না। এদের কাণ্ডাকাণ্ড জ্ঞান কমই আছে। এরা কেবল বোঝে, খাওয়া আর—" এত দুর বলিতে না বলিতেই মতির পিসী, দামোদরের ঠাকুরমাকে বাধা দিয়া বলিলেন,—"ওগো এঁকে সে কথাটী ব'ল্‌বার যো নাই। ইনি তেম্‌নি ধারার বৌ নন্‌। গ্রামের লক্ষ্মী বৌ।" ইহাতে দামোদরের ঠাকুরমা চটিয়া মতির পিসীকে বেশ দশ কথা শুনাইয়া, রাগে গর্‌গর্‌ করিয়া চলিয়া গেলেন। এই উপলক্ষে সমাগত মহিলাগণের মধ্যে তিনটী দল হইয়া, দুই দলে বেশ এক চোট্‌ বাগ্‌বিতণ্ডা চলিল। এক দল মধ্যস্থ হইয়া, দুই পক্ষেরই বিচার করিয়া, নগদ নগদ মতামত দিতে লাগিলেন। কিন্তু কোন পক্ষের বিরুদ্ধে কিছু বলিবা মাত্রই তাঁহাদিগকেও অপর পক্ষের সঙ্গে সমানাংশে ভৎর্সনা ভোগ করিতে হইল। এই ঘটনাতে অল্পক্ষণের মধ্যেই মহিলা-

দের হাট ভাঙ্গিয়া গেল। নিতান্ত বিনা অপরাধে গরিব বেচারি গৃহকর্ত্রীও এই গোলে পড়িয়া বেশ এক হাত ভৎর্সনা ও নিন্দার ভাগী হইলেন।

সকলে গেলেও, সংলগ্ন প্রতিবাসীদের বাড়ীর অলকা এবং উজ্জ্বলা রান্না বাড়ীতে দাঁড়াইয়া, বাড়ীর লোকদের সঙ্গেই গত রাত্রির ঘটনার নানা প্রকার সমালোচনা করিতে লাগিলেন। হরগোবিন্দ রায়ের রান্না বাড়ীর চত্তরটীও নিতান্ত মন্দ নয়। আজ উঠিতে সকলেরই অত্যন্ত বেলা হইয়াছে বলিয়া, উঠানে ও রান্না ঘরের বারেণ্ডায় পরিচারিকারা প্রত্যেকেই ব্যস্ততার সহিত কাজ করিতেছে। হরগোবিন্দ রায়ের পরিবারে সিদ্ধেশ্বরী এবং পাষাণী ছাড়া আরও নয় দশটী আত্মীয়া স্ত্রীলোক থাকেন। ইহাঁদের মধ্যে কেহ হরগোবিন্দের পিসীর বিধবা ননদ, কেহ মামার মাস্‌তুতো বোন্‌, কেহ হরগোবিন্দের নিজের পিস্‌তুতো বোন্‌। ইত্যাদি রকমে সকলেই কোন না কোন প্রকারে সম্পর্কিত। যাহাদের সঙ্গে কুটুম্বিতার সম্পর্ক নাই, তাঁহাদের সঙ্গেও কোন এক রকম সম্পর্ক দাঁড়াইয়া গিয়াছে। মোট কথা, কেহ অনাথা বা অনাথ বলিয়া আশ্রয় চাহিলে হরগোবিন্দ, বাড়ীতে একটুকু স্থান দিতে বা ভরণ পোষণের ভার নিতে কদাচ কুন্ঠিত হন না। তাহাতে সম্পর্কিত, নিসম্পর্কিত কিছুই দেখেন না। হরগোবিন্দের বাড়ীতে প্রত্যহই বড় নিমন্ত্রণের মত আহারাদির আয়োজন হয়। অতিথিশালাতে যে সকল পথিক বা গরিব দুঃখী লোক আতিথ্য স্বীকার করে, তাহা ছাড়া বাড়ীর মধ্যেও পরিচিতের মধ্যে অনেক অতিথি ভোজন করেন। তদ্ভিন্ন অনেক নিরাশ্রয় বা অসমর্থ পুরুষ, বিদ্যালয়ের ছাত্র এবং নিজের অল্প বেতনের কর্ম্মচারীদিগের মধ্যে অনেকেই বাড়ীর মধ্যেই আহার করেন। সুতরাং প্রতি দিনই রান্নার বৃহৎ আয়োজন করিতে হয়। পরিবারস্থ স্ত্রীলোকেরা সকলেই ইচ্ছামত এই বৃহদ্ব্যাপারের কাজ কর্ম্মে যোগ দিয়া থাকেন। আজ বেলাতে উঠিয়া সকলেই ব্যস্ততার সহিত কাজ করিতেছেন। পরিচারিকাদের ত আর ব্যস্ততার কথাই নাই। কেহ প্রকাণ্ড শীল নোড়া সম্মুখে নিয়ে রাশি রাশি বাটনা বাটিতেছে। কেহ তরকারির চেঙ্গারি কাছে রাখিয়া আলু, বেগুন, পটল, অলাবু, কাঁচকলা প্রভৃতি বিবিধ প্রকার তরকারি কুটিয়া কুটিয়া স্তূপাকার করিতেছে। কেহ মাছ কুটিতেছে। মাছ কোটার স্থানে শাদা, কাল, নানা রঙ বিশিষ্ট, মে'টে প্রভৃতি নানাবিধ বর্ণের ষষ্ঠীর চেলাগণ মৎস্য ও মৎস্যের পরিত্যক্ত পোঁটা কাঁটার লোভে চারি দিক্ ঘিরিয়া বসিয়া যেন তপস্যায় নিমগ্ন

রহিয়াছে। যাই এক টুকরা কাঁটা পোঁটা মাটিতে পড়িতেছে, আর দ্বন্দ্বযুদ্ধে জয়লাভ করিয়া যে পারিতেছে,সে-ই মুখে করিয়া দূরে গর্জ্জন করিতে করিতে উদরসাৎ করিতেছে। যে স্ত্রীলোকেরা মাছ কুটিতেছে, তাহারা এক দিকে মাছের গলায় বঁটি বাধাইতেছে, আর অপরদিকে আড়চোখে আড়চোখে সতর্কতার সহিত বিড়ালের প্রতি দৃষ্টি রাখিতেছে। তথাপি দুষ্ট বিড়ালগুলি কোটা মাছ নিয়ে ছুটিয়া পালাইতেছে। কাহারও বা মুখে বিড়ালদের বাপান্ত, চৌদ্দপুরুষান্ত করিতে যেন ঝড় তুফান বহিতেছে। সে স্ত্রীলোকটা এ'লো মে'লো হইয়া কেবল রাগিয়াই মরিতেছে। এই অবসরে ঘৃণা পিত্তিশূন্য নির্লজ্জ বিড়ালগণ তাহারই কোলের কাছ হইতে বেশীর ভাগ মাছ নিয়ে পরম পরিতোষের সঙ্গে ভোজন করিতেছে।

পাষাণী এক দিকে মাছের ঝোল এবং ভাল করিয়া ডাল্না প্রভৃতি রাঁধিয়া রাঁধিয়া পাত্রে ঢালিয়া রাখিতেছে, আর এক এক বার চুপি চুপি আসিয়া স্বরস্বতীর চুলের খোপাটী এ'লিয়ে দিয়া সরিয়া যাইতেছে, কখনও পেঁচোর মা বুড়ীর মাথার একহাত ঘুম্‌টা টানিয়া দিয়া বলিতেছে—"আহা! আমাদের কচি বৌটীর কি লজ্জা গা? ওগো বৌয়ের মুখ দেখ্‌বে?" পেঁচোর মা কালা এবং চটা মানুষ,সে একটুকু একটুকু চটিয়া চটিয়া উঠিতেছে। পাষাণী খিল খিল করিয়া হাসিতে হাসিতে ছুটিয়া গিয়া প্রফুল্ল নাম্নী কুড়ি একুশ বৎসর বয়স্কা কুটুম্বিনীর গলা ধরিয়া কোলে বসিয়া বলিতেছে—"দেখ গো আমি কেমন কচি খুকীটী হ'য়েছি। প্রফুল্ল আমার মা।" প্রফুল্ল, প্রফুল্লমুখে হাসিয়া বলিতেছে—"তোমার মা হো'তে আপত্তি নাই। কিন্তু তোমার বাপের বুড়াকালের অন্ধের নড়ী হইতে রাজি নই।" পাষাণী হাসিতে হাসিতে উঠিয়া গিয়া উনানের জ্বাল ঠেলিয়া দিয়া পুনরায় রান্নায় মনোযোগ দিতেছে। পাষাণী বসন্তের অনিলের মত একটুকু ধীর, একটুকু চঞ্চল, একটুকু রসিকা, একটুকু মধুর মধুর, কিন্তু সম্পূর্ণ নির্দ্দোষ চরিত্র এবং সরলা। পাষাণীকে বাড়ীর এবং পাড়ার সকলেই অন্তরের সহিত ভালবাসে। পাষাণী লেখা পড়া শিখিয়াছে কিন্তু বিপুল জেঠাম শিখে নাই। কখনও পাদরী সাহেব বা শ্রীযুক্ত কেশব বাবু সাজিয়া অহঙ্কারে বেঁকিয়া বৈ হাতে করিয়া পাড়ার মায়ের বয়সী, পিতামহী মাতামহীর বয়সী স্ত্রীলোকদিগকে গম্ভীরভাবে বক্তৃতা দিতে কিম্বা "রিফরম্‌" করিতে যায় না। পাষাণী পাড়ার কোন স্ত্রীলোককেই আপনার অপেক্ষা অজ্ঞানান্ধকার-নিমজ্জিতা মনে করে না। যাঁহারা বয়োধিকা তাঁহাদিগকে অন্তরের সহিত

মান্য করে, ভয় করে। আর যাহারা সমবয়সী, তাহাদিগকে ভালবাসে, তাহাদের সঙ্গে অমায়িক ব্যবহার ও নির্দ্দোষ আমোদ করে। বাড়ীর পরিচারিকারাও পাষাণীর সুমিষ্ট অমায়িক ব্যবহারে সর্ব্বদা আপ্যায়িত। যাহা হউক্, আজ এক দিকে পাষাণা রাঁধিতেছে, অন্য দিকে অপরেরা কেহ ভাজা, ডাল, অম্বল রাঁধিতেছেন। কেহ বা হাঁড়ী হাঁড়ী ভাত রাঁধিয়া ঢালিয়া ঢালিয়া স্তূপাকার করিতেছেন। সিদ্ধেশ্বরী আজ উদিক্ হইতে রান্নার জিনিষ পত্র যোগাইতেছেন,আর একজন বুড়া ঝীর সহকারীরূপে পান সাজিতেছেন। অধিকাংশ সময়ে সিদ্ধেশ্বরীই রান্নার দিকে থাকিয়া পাষাণীকে পড়া শুনা করিতে অবসর দিয়া থাকেন। রাঁধিতে বা পরিবেশন করিতে পাষাণীর বড়ই আমোদ। বাড়ীতে কাজ করিবার লোকের অন্ত নাই, তবুও পাষাণী এবং সিদ্ধেশ্বরী নিজ হাতে ঘরের অনেক কাজ করেন। বস্তুত গৃহিণীরা নিজে গৃহকার্য্য না দেখিলে, গৃহের কোন কাজেরই সুশৃঙ্খলা থাকে না। হরগোবিন্দও বাড়ী থাকিলে বাহিরের অনেক কাজ নিজ হাতেই সমাধা করেন। পড়া শুনায় বিজ্ঞ এবং এত বড় ঘরের ছেলে হইয়াও, হরগোবিন্দ সংসারের কাজ কর্ম্ম শিখিতে কখনও অবহেলা বা অপমান বোধ করেন নাই। প্রয়োজন হইলে, সুতরের কাজ হইতে রাজমিস্ত্রীর কাজ এবং এ দিকে ঘরের ভাঙ্গা জলা কুলা বাঁধা পর্য্যন্ত নানা কাজই দক্ষতার সহিত করিতে পারেন।

যাহা হউক্, রান্না বাড়ী ছাড়িয়া এখন বাহিরের কথা বলা অবান্তর হইবে। উঠানে রান্নাঘরের ছায়ায় বসিয়া পেঁচোর মা বুড়ী রাশি রাশি তরকারি কুটিয়া থালা ও চেঙ্গারি পূরিতেছে। পেঁচোর মা সত্য সত্যই বুড়ী নয়, অর্দ্ধবয়স্কা। কিন্তু তবুও লোকে বলে "পেঁচোরমা বুড়ী।" পেঁচোর মার পার্শ্বেই আর একটী আঠার উনিশ বৎসরের বিধবা সুচিক্কন কৃষ্ণাঙ্গী যুবতী পরিচারিকা,মুখভরা হাসি হাসিতে হাসিতে আলু,বেগুন, পটল কুটিতেছিল। ইহারই নাম স্বরস্বতী। পেঁচোর মার মুখে তরকারি কুটিতে কুটিতে যেন খৈ ফুটিতেছিল। পেঁচোর মা কল্য রাত্রিকালের ঘটনা উপলক্ষ করিয়া অনবরত তাহাদের দেশের চোরের গল্প বলিতেছিল। পেঁচোর মা যে কাণে কিছু কম শুনে, একথা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। সুতরাং গল্পগুলি স্বভাবতই একটু বড় বড় কথায় বর্ণিত হইতেছিল। অলকা, উজ্জ্বলা, স্বরস্বতী এবং অপরাপর স্ত্রীলোকদের মধ্যে অনেকেই মড়া কাঠ হইয়া, নীরবে দাঁড়াইয়া, বসিয়া, পেঁচোর মার গল্প শুনিতেছিলেন।

পাষাণীও দূর হইতেই এক এক বার পেঁচোর মা বুড়ীর ভ্রু টানা, হাত নাড়া, মুখ নাড়া দেখিয়া, কি বলিতেছে জানিবার জন্য আসিয়া আসিয়া গল্পের অল্প অল্প অংশ নিতেছিল, আর মুখ টিপিয়া টিপিয়া হাসিয়া হাসিয়া বলিতেছিল—"ও পেঁচোর মা, তোমার সো'রাণী দো'রাণীর গল্পটী বল। তোমার বেঙ্গমা বেঙ্গমীর গল্পটীও বেশ।" এমন সময় এই পূরা আসরের মধ্যে স্বরস্বতী এক মুখ হাসিয়া জিজ্ঞাসা করিল—"হাগা টোলে যে প'ড়োরা পড়ে, পড়া শেষ হইলে তারা না কি একটা পায়?" অলকা কিছু নিরীহ ভাল মানুষ। অলকা কোন কথা না বলিয়া চুপ করিয়া শুধু কথাটা শুনিল। উজ্জ্বলা সুন্দরী বিশেষ মুখরা। তাঁহার কিছু পাণ্ডিত্যাভিমানও আছে। অর্থাৎ তিনি ছোট বেলায় ক, খ আঁকা পাতের উপরে বিনা কালিতেই হস্ত ঘূর্ণায়মান করিয়াছিলেন। সুতরাং তিনি আপনাকে সর্ব্বতত্ত্বাভিজ্ঞ মনে করেন। স্বরস্বতীর ঠোঁট থেকে কথাটী ফুটিতে না ফুটিতেই, উজ্জ্বলা উত্তর দিলেন—"লে লঙ্কার, বিদ্যেভূষণ, এই সব পায়, এই ত আমরা জানি।"

স্বরস্বতী।—"ঐ ত বটে। ওগুলিকে কি একটা বলে না?"

উজ্জ্বলা।—"নেকী আমার, আবার কি বোল্‌বে?"

এমন সময় ঘর হইতে বামন ঠাক্‌রুন্ নাসিকা ঊর্দ্ধে তুলিয়া, মুখ ভঙ্গি করিয়া, গরম ভাতের হাঁড়ী নামাইতে নামাইতে বলিলেন—"উপাধি পায়।" বামন ঠাক্‌রুণের কথায় উজ্জ্বলার শরীরের সমস্ত রক্তগরম হইল। তবে কি না সে সামান্য লোক। পরের বাড়ী রাঁধিয়া খায়। ইত্যাদি ইত্যাদি কারণে উজ্জ্বলা গায়ের আগুন গায়েই মজাইয়া, এবারটী কোন রকমে চুপ্‌টী করিয়া, দাঁড়াইয়া রহিলেন। স্বরস্বতী বামন ঠাক্‌রুণের কথায় হো—হো—করিয়া হাসিয়া বলিল—"আমি পেঁচোর মাকে একটী উপাধি দিব। হাগা—,বিধ্‌বের বিয়ে দেন ও ঠাকুরকে কি বলে না?"

উজ্জ্বলা।—"বিদ্যেসাগর। জান কি ভাই, ওঁর মায়ের ছেলে হ'য়ে মোটেই বাঁ'চত না। হারা মরা ছেলে ব'লে মা বাপ এমনি ধারা একটা ছিষ্টিছাড়া বিশ্রী নাম রেখেছিলেন।"

স্বরস্বতী,উজ্জ্বলার টিপ্পনী শুনিয়া হাসিতে হাসিতে বলিল—"ওটা ওঁর নাম কি?" উজ্জ্বলা এবার আর ধৈর্য্য ধরিয়া থাকা কোন মতেই উচিত বোধ করিতেছিলেন না। দেখিতে লাগিলেন, বিলম্বে কেবল অপমানের পরে অপমানই

হইতেছে। আবার দেখিলেন,বামন ঠাকুরুণের কথায় যবাব দেওয়াটাই উচিত ছিল। তাহা হইলে অল্পেই "ইস্পার ওস্পার" যাহা হইবার এতক্ষণে একটা হইয়া দাঁড়াইত। এ আবার তার চেয়েও ছোট লোক। সুতরাং রাগে ফুলিয়া ফুলিয়া উজ্জ্বলা, কি করা উচিত, ভাবিয়া ইতস্ততঃ করিতে লাগিলেন। ইতি-মধ্যে একজন বলিয়া উঠিল—"কেন গা? পেঁচোর মার বিয়ে দিবি নাকি?"

পেঁচোর মা কাহাকেও মুখ নাড়িতে দেখিলেই হাঁ করিয়া তাকাইয়া থাকে। এবারও পেঁচোর মা, সকলকেই কথা বলিতে দেখিয়া, তরকারি কোটা রাখিয়া ফ্যাল ফ্যাল করিয়া, সব ভাইয়ের মুখের দিকে বারম্বার তাকাইতেছিল। এখন তাঁহারই নাম হইতেছে, ইহা অল্প মাত্রায় একটুকু শুনিতে পাইয়াই মনে করিল, তাহার গল্পেরই প্রশংসা হইতেছে। পেঁচোর মার গল্পকে কেহ ভাল বলিলে পেঁচোর মা বড় খুষী হয়। সুতরাং পেঁচোর মা এবার একগাল হাসিয়া বলিল—"রেখে দেও। আমি একটা মানুষ, আমি আবার জানি গপ্প বো'ল্‌তে। গপ্প জান্‌তেন তিনি বড় ভাল। তানার কাছেইত, মুই এত গপ্প শেখালাম।" পেঁচোর মা জাতিতে গয়লা বা সদ্গোপ। পেঁচোর মা কথাটা বলিতে একটী দীর্ঘ নিশ্বাসও ছাড়িল, আবার একটুকু মুচ্‌কে হাসিও হাসিল। কিন্তু হঠাৎ পেঁচোর মার এই অসংলগ্ন কথা শুনিয়া,সকলেই মনে মনে একটা অট্ট হাস্যের প্রবল ঢেউ সম্বরণ করিয়া,কিছু ক্ষণের জন্য মুখ দেখাদেখি করিতে লাগিল।এদিকে উজ্জ্বলা সুন্দরী রাগে গর গর করিতেছিলেন। এ সকল হাসি ঠাট্টায় তিনি মনে করিতেছিলেন, এ সব কেবল প্রকারান্তরে তাঁহাকেই উপহাস করা হইতেছে। সুতরাং তিনি ক্ষণবিলম্ব না করিয়া প্রকাশ্যে বলিলেন—"তোদের ঠেকার রেখে দে গো—রেখে দে—। আমি যেন ওদের চেয়েও মুখ্‌খু এলুম্!!! আমি সাড়ে তিনটা বছর ভো'রে দাদার কাছে এক নাগাড়ে কত হ, ব,ঘ,প,লিখ্‌লুম্, শুধু যেন ছাইয়ে জল ঢা'ল্‌তে!!! আমি আর যেন কিছু জানি না!!! তাই বোল্‌ছেন, ওটা ওঁর নাম নয়। নাম নয় তবে কি লা,আঁটকুড়ী পোড়ারমুখীরা—? তোদের মাথা মুণ্ডু পিণ্ডী—?"

পেঁচোর মা উজ্জ্বলা সুন্দরীর ঢাক-বিনিন্দিত গলার চ্যাটাং চ্যাটাং কথাগুলি স্পষ্ট রূপেই বুঝিতে পারিল। পেঁ'চোর মা বুঝিল, উজ্জ্বলা ঠাকুরুন্ শুধু তাহা-কেই এত তিরস্কার করিতেছেন। রাগিলে পেঁ'চোর মারও হিতাহিত জ্ঞান থাকে না। পেঁ'চোর মা উজ্জ্বলাকে গালি দিতে শুনিয়া, সেও তাঁহার গলার উপরে গলা তুলিয়া বলিতে লাগিল—"কি ঠাকুরুন্—? তোমার গায়ে বড় লা'গল যে—? তোমায় আমি কি বো'লেছি গা—?"

অলকা অনেক ক্ষণ থেকেই উজ্জ্বলার আঁচল ধরিয়া টানিতেছিল, আর বলিতেছিল,—"চল না ভাই, চল বাড়ী যাই।" এবার অত্যন্ত বেগোছ দেখিয়া, অলকা বলপূর্ব্বক উজ্জ্বলার হাত ধরিয়া টানিয়া নিয়ে বাড়ীর দিকেই পালাইল। পেঁচোর মাও কুটনা রাখিয়া, ঝড় তুফানের মত গালি দিতে দিতে, উজ্জ্বলার মায়ের কাছে সব কথা বলিয়া নালিশ করিতে, তাঁহাদেরই পিছে পিছে ছুটিয়া চলিল। এ আকস্মিক রহস্যে স্বরস্বতী হাসিতে হাসিতে ধুলা মাটির মধ্যেই পড়িয়া গড়াগড়ি করিতে লাগিল। উপস্থিত স্ত্রীলোকদের মধ্যে সকলেই হাসিয়া হাসিয়া বুকে ব্যথা করিল। পাষাণীও আসিয়া কাজ কর্ম্ম ফেলিয়া হাসিতে যোগ দিল। স্বরস্বতী পাষাণীকে দেখিয়া, "ওগো—দিদী বাবু গো—দিদী বাবু,কি হোল গো—?"বলিতে বলিতে হাসিতে লাগিল।

এইরূপে হরগোবিন্দের বিস্তীর্ণ পরিবারের সকলেই কাজে কর্ম্মে হাসিয়া খেলিয়া গত রাত্রির ব্যাপার ভুলিয়া গেল। সকলেই সময়ের প্রতি তরঙ্গের সঙ্গে সঙ্গে চিরদিনেরই মত নিজের নিজের জীবনতরি পুনরায় ভাসাইয়া দিল। কেবল একজনের নৌকা ঠেকিল। চারিদিকে আন্দোলন দেখিয়া, বিশেষত থানায় খপর দেওয়া হইয়াছে শুনিয়া, ধরণী আজ সকাল বেলা হইতেই হর-গোবিন্দের বাড়ী ছাড়িয়াছে। সকাল হইতে সিদ্ধেশ্বরী তিন চারিবার খপর নিয়েছেন, সকলেই ফিরিয়া আসিয়া সিদ্ধেশ্বরীকে বলিয়াছে—"ধরণী কোথায় গিয়াছে, কেহই বলিতে পারে না। ধরণী তাহার ঘরে বা পাড়ার কোথায়ও নাই।" সমস্ত দিন গেল, পরদিনও বেলা দ্বিপ্রহর চলিয়া গেল, তথাপি ধরণী ফিরিল না। ধরণী, কখনও এত দীর্ঘকাল বাড়ী হইতে অদৃশ্য থাকে না। সিদ্ধেশ্বরী পূর্ব্ব দিনের রাত্রির ঘটনার সঙ্গে ধরণীধরের এই অদৃশ্যের কোন গূঢ় সম্বন্ধ আছে কি না, ভাবিতে লাগিলেন। ভাবিয়া নিশ্চিত কিছু স্থির করিতে পারিলেন না। কিন্তু মনে গভীর সন্দেহ হইল। ভাবিলেন, কাল রাত্রিতে বোধ হয়, উপযুক্ত ভাইপোই চোর সাজিয়াছিল। কিন্তু তাহা হইলে ধরণী হয়ত ভয়ে আর এবাড়ীতে ফিরিয়া আসিবে না।" ভাবিতে সিদ্ধেশ্বরীর চোক জলে ভাসিয়া উঠিল। সিদ্ধেশ্বরী ধরণীকে বড় ভাল-বাসেন। ধরণীর তল্লাসে বারম্বার লোক পাঠাইয়া কেবল নিরাশের পরে নিরাশ হইতে লাগিলেন। শেষটা ধরণী তুলসী গ্রামে আছে কি না, তাহাতেই সন্দেহ হইল, এ ঘটনাতে অনেকেই অনুমান করিল, ধরণীধর পূর্ব্ব-দিনের রাত্রির ঘটনায় নিশ্চয়ই সংলগ্ন ছিল।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

"আশা বৈতরণী নদী।"

ধরণীধর সিদ্ধেশ্বরীর ঘর হইতে পরমানন্দের নামের এক কোটি পঁচিশ লক্ষ টাকার দলিল খানি বাহির করিয়া নিয়ে, সেই রাত্রিতেই তুলসীগ্রামের উত্তরদিকের একটা বড় জঙ্গলের মধ্যে প্রবেশ করিল। জঙ্গলে একটী বহু প্রাচীন কালের প্রকাণ্ড তেঁতুল গাছ আছে। গাছের গায়ে, আগার দিকে একটী প্রকাণ্ড গর্ত্তও আছে। ধরণীধর আঁধারে আঁধারে হাতড়াইয়া হাতড়াইয়াই গাছে উঠিয়া আপনার থানফাড়া কাপড়ের এক অংশ ছিঁড়িয়া সেই বহুমুল্য দলিলখানি বেশ করিয়া জড়াইয়া যত্নপূর্ব্বক সেই গর্ত্তের মধ্যে রাখিয়া দিল। ধরণী ছোটবেলায় পাখীর ছানা পাড়িতে গ্রামের দুষ্ট রাখালদের সঙ্গে সঙ্গে, কখনও বা একাকীই, এই সকল জঙ্গলে জঙ্গলে বেড়াইয়া সর্ব্বদাই এই সকল বড় বড় গাছ তন্ন তন্ন করিত। সুতরাং তুলসী গ্রামের নিকটের কোন জঙ্গলে বা বাগানে এমন কোনই গাছ ছিল না, ধরণী, যাহার সমস্ত সন্ধানই জানে না। ধরণী শর্ম্মা নেওটি পরিয়া কাপড় হাতে করিয়াই জঙ্গলে ঢুকিয়াছিল। এখন ধরণী-ধর গাছ হইতে নামিয়া জঙ্গলের মধ্যেই একটী পচা পুকুরে পড়িয়া সমস্ত গা মাটি ও গাছের পাতা দিয়া রগ্ড়াইয়া রগ্ড়াইয়া ধুইয়া পুনরায় সেই কাপড়ই পরিল। এখনও রাত্রি অনেক ছিল। সুতরাং ধরণী জঙ্গল হইতে বাহির হইয়া, অনেকটা পথ হাটিয়া পুনর্ব্বার আপনার বিছানায় আসিয়া শুইয়া রহিল। কিন্তু নানা ভাবনায়, চিন্তায় ধরণীর আর ঘুম হইল না। অব্যবসায়ী চোর ধরণী শর্ম্মার চুরিতে যে সকল কাঁচাম ও ক্রটি হইয়াছিল, শুইয়া শুইয়া এখন তাহা একে একে মনে জাগিতে লাগিল। প্রথম মনে পড়িল—"ও যাঃ—! পিসীমার চাবির থ'লে কোথায় ফেলেছি? কিছু ক্ষণ পরে "আহা! সিঁদূরের আর তেলের মালা ছাদেই রয়েছে যে?" আবার মনে হইল "পোড়া দেশলাইয়ের কাঠিগুলি কিন্তু ঘরময় ছড়া-ইয়া আছে!" ইত্যাদি ইত্যাদি প্রকারে ধরণী শর্ম্মার মনে নানা চিন্তার ঢেউ উঠিতে পড়িতেই রাত্রি প্রভাত হইল। দূরে রাত্রি বাসের বৃক্ষের ডালে

বসিয়াই দুই একটা কাক, কা,—কা—করিয়া ডাকিয়া উঠিল। রাত্রির আঁধার ভাল করিয়া ফরসা হইতে না হইতেই ধরণীধর কণ্টকময় শয্যা ত্যাগ করিয়া বাহিরে আসিল। একজন লোক, ধরণীকে সেই অল্প অল্প ফরসা আঁধারে দেখিয়াই বলিল—"ও দাদা ঠাকুর, তোমার কপালে ও রক্ত কিসের?" দাদা ঠাকুর, লোকটীর কথায় চমকিয়া তাড়াতাড়ি অমনি কপালে হাত দিলেন। হাত পুনরায় সম্মুখে আনিয়া দেখিলেন, রক্ত নয় সিঁদুর! ধরণী লোকটীরদিকে আর না তাকাইয়া, তাড়াতাড়ি বাগানের পুকুরে গিয়া, বারম্বার কপাল ও মুখ ধুইতে লাগিল, আর এক এক বার জলের ছায়ায় মুখ দেখিয়া, এখনও কপালে বা মুখে সিঁদুর আছে কি না পরীক্ষা করিতে লাগিল। মুখ ধুইয়া ধরণী পুনরায় পুকুর হইতে ফিরিল বটে, কিন্তু ধরণীর মনে আর নিঃসন্দিগ্ধ স্থির ভাব ফিরিয়া আসিল না। দুইজন লোক একস্থানে দাঁড়াইয়া কথা বলিতেছে বা কেহ ধরণীর দিকে একদৃষ্টে তাকাইয়া আছে, ইহা দেখিলেই, ধরণী চমকিয়া উঠে। তখন ধরণীধরের মুখ শুকাইয়া গিয়া বুক দুড় দুড় করিতে থাকে। সুতরাং প্রভাতের রৌদ্র চারি দিকে ছড়াইয়া পড়িবার পূর্ব্বেই ধরণীধর বাড়ী হইতে অন্তর্দ্ধ্যান হইল। আবার দূরে দূরে থাকিয়া ধরণী শর্ম্মা যখন শুনিল, রাত্রির ঘটনা নিয়ে চারিদিকে ঘোর আন্দোলন চলিতেছে, থানায় খপর দেওয়া হইয়াছে, তখন ধরণী মনে মনে ঠিক করিল "পুনরায় আর কিছুতেই হরগোবিন্দ রায়ের বাড়ী ফিরিয়া যাওয়া হইবে না। একথা ছাপা থাকিবার নয়। এখন ভবানীর কাছে কিছু টাকা পাইলেই, এ দেশ ছাড়িয়া কোথাও চলিয়া যাইব।"

এ সকল গেল ঘটনার দিনের কথা। কিন্তু ধরণী আজ তাহার পরে তিন চারি দিন হইল, ভবানীর বাড়ী আসা যাওয়া করিতেছে। ধরণী প্রায় সর্ব্বদাই এদিকে ওদিকে পালাইয়া থাকে, আর চুপি চুপি এক এক বার ভবানীর বাড়ী আসে যায়। তারাচাঁদ ধরণীকে বলিয়াছেন—"তুমি এখানে আসা যাওয়া কর, ইহা কাহাকেও টের পাইতে দিব না। তুমি শীঘ্র শীঘ্র কাগজ আনিয়া দিলেই, তোমাকে টাকা দেওয়া হইবে।" ধরণী তারাচাঁদের কথার উত্তরে বলিয়াছে—"অন্তত অর্দ্ধেক টাকা আগে দিন্? কাগজ হাত হইলেও একটুকু গোল আছে। তাই টাকাটা চাহিতেছি।" তারাচাঁদ এ কথার উত্তরে আর কিছুই বলেন নাই। ধরণী ভবানীর সঙ্গেও দেখা করি-

য়াছে। আজ কাল আর ভবানীর দেখা পাওয়া সহজ ব্যাপার নয়। ভবানী শঙ্কর এখন সুখদার খণ্ডেই দিন রাত পড়িয়া থাকেন। সেখানেই দুই চারিটী বিশ্বস্ত ইয়ার নিয়ে মদ খান আর আমোদ করেন। পড়া শুনার মধ্যে ইচ্ছা হইলে কখনও কদাচিৎ দুই এক খানি চুট্‌কি রকমের ইংরেজি "নভেল" পড়িয়া থাকেন। ধরণী, চারিদিনের চেষ্টাতে এক দিনমাত্র ভবানীশঙ্করের সাক্ষাৎ পাইয়া, পাঁচশত টাকার নোট আদায় করিয়াছে। ভবানী তখনও অর্দ্ধমাতালাবস্থায় ছিলেন। ভবানীও, ধরণীকে কাগজ আনিয়া দিতে বলাতে, ধরণী, তারাচাঁদকেও যাহা বলিয়াছিল, ভবানীকেও তাহাই বলিয়াছে। ধরণী, পাঁচশত টাকায় খুশী না হইয়া, মনে করিয়াছে, অন্তত অর্দ্ধেক টাকা আদায় করিব। এইরূপ দুরাশাই মানুষের সর্ব্বনাশের মূল। ধরণী নোট গুলিও, দলিলের সঙ্গেই, সেই প্রাচীন গাছের কোটরে রাখিয়া দিয়াছে।

——:০:——

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

শঠে শঠে।

ধরণীধর ক্রমান্বয়ে চারি পাঁচ দিন ভবানীশঙ্করের বাড়ী যাতায়াত করাতে, পাড়ার কেহ কেহ গিয়া সিদ্ধেশ্বরীকে বলিয়াছে—"ধরণী এখনও তুলসীগ্রামে আছে। আমরা মধ্যে মধ্যে তাহাকে দেখিতে পাই।" বস্তুত সিদ্ধেশ্বরী ধরণীর তল্লাসে যে সকল লোক পাঠান, তাহারা সকলেই এদিকে উদিকে একটুকু গিয়াই ফিরিয়া আসিয়া বলে—"ধরণীধরের দেখা পাইলাম না।" তাহারা মনে মনে ভাবে "এ বিট্‌লে বামনটা চো'লে যেতে হয় যাক্। মাঠাকুরুন্, এ স্বর্য্যের ষাঁড়টীর জন্য মিছে মিছি এত কাঁদেন কেন?" ধরণীকে বাড়ীর লোক জনেরা কেহই ভাল বাসে না। কারণ, যণ্ডামার্ক ধরণী শর্ম্মা যাঁক পাইলেই তাহাদের উপরে বিধিমতে নানা প্রকার অত্যাচার করে। তাহারা কেবল মা ঠাকুরুণের ভয়ে ভয়ে কিছু বলে না। আর সে গুণ্ডাটীকে সহজে কেহ কিছু বলিতে সাহসও পায় না। কারণ ধরণীর গায়ে যেমন জোর, কুস্তি করিতে এবং লাঠি খেলিতেও শর্ম্মা তেমনই সুপটু। ধরণী কখন কাহাকে ঘুষি বা লাঠি মারিয়া ভূতলশায়ী করিবে, কে জানে? নানা ভয়ে ধরণীকে কেহ কিছু বলে না। কিন্তু ধরণীর অন্তর্দ্ধানে আজ কাল সকলেই

খুসী। কাজেই সিদ্ধেশ্বরী ধরণীকে আর ধরিতে পারিলেন না। ধরণী দিনের প্রায় অধিকাংশ সময়ই বনে জঙ্গলে লুকাইয়া লুকাইয়া বেড়াইয়া বেড়ায়। দরকার মত কখনও কখনও রাত্রি কালে বাজারের কোন কোন দোকানেও যায়। কিন্তু দিনে প্রায় তিন চারিবার তেঁতুলগাছে চড়িয়া, কাগজ এবং নোট যেভাবে রাখিয়াছে ঠিক্ সেইভাবেই আছে কি না, ইহা বারম্বার পরীক্ষা করিয়া দেখে। রাত্রিতেও ধরণীধর সেই প্রকাণ্ড তেঁতুল-গাছের ডালের উপরেই শুইয়া থাকে। কিন্তু টাকা পাইতে দেরি দেখিয়া, ধরণী মনে মনে বড়ই উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিল। ভাবনায় চিন্তায় এবং স্নান আহা-রের কষ্টে ধরণীর শরীরও দিন দিন কাতর হইতে লাগিল।

এদিকে ধূর্ত্ত শিরোমণি তারাচাঁদ কাগজ আনিয়া দিতে ধরণীকে ওজর আপত্তি এবং দেরি করিতে দেখিয়া, কিছু ভীত হইলেন। মনে করিলেন, কাগজখানি যদি ধরণীধর পরমানন্দের হাতে দেয়, তাহা হইলে বড়ই বিষম বিপদ ঘটিবে। অথচ টাকাগুলি ধরণীকে আগের ভাগে দিলে, ধূর্ত্ত ধরণীধর টাকা এবং দলিল দুই নিয়েই চম্পট দিতে পারে। তখন কাগজও যাবে, টাকাও যাবে। দুইদিকেই শঙ্কট। তারা দাদা ভবানীর হিতার্থী। তারাচাঁদ ভাবিয়া ভাবিয়া অবশেষে ধরণীর সর্ব্বনাশের এক বিষম ফাঁদ পাতিলেন। তারাচাঁদ তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে, ধরণী কোথায় যায়, কি করে ইত্যাদি বিষয়গুলির উপরে বিশেষরূপে চোক রাখিতে লাগিলেন।

এই ঘটনার পরেও একদিন গেল, দুই দিন গেল, তৃতীয় দিন ধরণীধর চুপি চুপি সকাল বেলা ভবানীশঙ্করের বাড়ী আসিল। ধরণী আসিবামাত্রই, তারাচাঁদ মিষ্ট কথায় ধরণীকে অভ্যর্থনা করিয়া, কথায় কথায় কাজ কর্ম্মের ছল করিয়া, একটী অন্ধকূপের মত প্রকাণ্ড গুদাম ঘরে নিয়ে উপস্থিত করিলেন। তারাচাঁদ ঘরের মধ্যে গিয়াই, ধরণীকে ডাকিয়া বলিলেন—"আসুন, এই ঘরে আসিয়া বসুন। আজই আপনার টাকা পরিশোধ করিয়া দিতেছি। কিন্তু দলিল আজই আনিয়া দিতে হইবে। ধরণী বাবু, আপানাকে আর কি বলিব? পরমানন্দের সঙ্গে লিখা পড়া সব ঠিক্ হইয়াছে। সে দলিল খানির সমস্ত সত্ব আমাদের নিকট বিক্রয় করিতেছে। বিক্রয় পত্র রেজেষ্টারি পর্য্যন্ত করা হইয়াছে। কিন্তু দলিল এখনও আপ-নার হাতে রহিল। এটা কি ভাল দেখায়?"

ধরণী।—"কেন মহাশয়, দলিল ত আমি আপনাদিগকে দিতেই প্রস্তুত"

আমার উচিত পাওনা টাকা দিলেই দলিল পাইতে পারেন। দেরি হইলে আমি মূল দলিলই পরমানন্দকে দিয়া ফেলিব। সে আমায় বেশী টাকা দিবে। আমি আর এক দিনের বেশী দেরি করিব না।”

তারা।—“ততও দেরি করিতে হইবে না। মিনিট দশেক দেরি করুন। আপনি এখানেই বসুন, আমি টাকা আনিতেছি।”

ধরণী।—“এখানে কেন?”

তারা।—“এটাই খুব গোপনীয় স্থান।”

ধরণীধর আর দ্বিরুক্তি না করিয়া বসিবামাত্রই, তারাচাঁদ ধীরে ধীরে ঘরের বাহিরে আসিলেন। বাহিরে পূর্ব্বেই একটী তালা চাবি যোগাড় করা ছিল। তারাচাঁদ বাহিরে আসিয়া পুনরায় ধরণীর দিকে তাকাইয়া বলিলেন—“মহাশয়, আপনি এখানে বসিয়া আছেন, ইহা কেহ দেখিলে ভাল হইবে না। কপাটটা ভেজাইয়া দেই?”

ধরণী।—“দিন্ আপত্তি কি? আমিও তাই চাই।”

তারা।—“আমিও তাই চাই।”

এই বলিয়াই মুহূর্ত্তের মধ্যে তারাচাঁদ, দ্বিতীয় জানালা দরজা শূন্য, আলো এবং বাতাসের গতিবিধি রহিত, অন্ধকূপ সদৃশ প্রকাণ্ড গুদামটীর কপাট বন্ধ করিয়া, একটী প্রকাণ্ড তালা আঁটিয়া হাসিতে হাসিতে প্রস্থান করিলেন। ধরণী গুদামে বন্ধ হইল!

—:০:—

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

“কাটা ঘায়ে নুণের ছিটা।”

একদিন গেল। এক রাত্রি গেল। দ্বিতীয় দিনেরও সমস্ত দিন চলিয়া গেল। শেষদিন রাত্রি দ্বিপ্রহরের সময় আবার গুদামের দ্বার খোলা হইল। ঘরে দুইদিনের অনাহারে, অস্নানে, দারুণ পিপাসায় এবং মনের কষ্টে ধরণী কাঁদিতে কাঁদিতে মাটিতে পড়িয়া সাতিশয় ক্লান্ত দেহে তন্দ্রা দিতে ছিল। সেই হস্তীর মত বলবান দেহ নিয়ে, আজ ধরণীধর ক্ষীণ-জীবের মত মাটিতে মিশিয়া রহিয়াছে। ধরণী ঘুমের ঘোরে নানা হিজি বিজি স্বপ্ন দেখিতেছিল। কখনও দেখিতেছিল, যেন একটা বড় পাহাড়

পাহাড়ের উপরে, নীচে ভয়ানক বন জঙ্গল। জঙ্গলে একটা বাঘ ধরণীকে দেখিয়া হাঁ করিয়া খাইতে আসিল! ধরণী ছুটিয়া পালাইতে উদ্যত হইল, কিন্তু এক পাও নড়িতে পারিল না। কষ্টে হামাগুড়ি দিয়া, মাটিতে বুক ঠেকাইয়া এক আধ পা এগু'তে গিয়া যেন পাঁচ পা পিছে হটিতে লাগিল। তখন আবার দেখিল, জঙ্গলের কিনারাতেই সমুদ্র! সমুদ্রে বিনা ঝড়ে বড় বড় ঢেউ উঠিতেছে! ধরণী গড়াইয়া গড়াইয়া সমুদ্রে পড়িবামাত্র, একটা ঢেউ আসিয়া তাহাকে অনেক দূরে একটা চড়ার উপরে নিয়ে ফেলিয়া দিল। চড়ায় ভয়ানক ঘাসের জঙ্গল। সেই জঙ্গল হইতে একটা বড় ময়াল সাপ আসিয়া ধরণীধরকে ধরিয়াই গ্রাস করিতে লাগিল। এ ভয়ঙ্কর ব্যাপারে এবার ধরণী একবারে অস্পষ্ট স্বরে চীৎকার করিয়া উঠিল। চীৎকার অল্প অল্প ফুটিতেছিল, এমন সময় সেই খোলা দ্বার দিয়া আলো নিয়ে দুই জন লোক ঘরে প্রবেশ করিল। ধরণীর চোখে আলো পড়িবামাত্রই, ধরণী চমকিয়া চোক মেলিয়া চাহিল। চোক চাহিতেই ধরণীধর সম্মুখে তারাচাঁদ আর ভবানীকে দেখিয়া, ভয়ে বিস্ময়ে কাঁপিতে কাঁপিতে টলিতে টলিতে উঠিয়া বসিল। ধরণী দেখিল, তারাচাঁদ, ডান হাতে একখানি তলোয়ার এবং বাঁ হাতে দোয়াত, কলম আর একখানি "ষ্ট্যাম্প্" কাগজ নিয়ে দাঁড়াইয়া আছেন। ভবানীশঙ্কর নিজে, এক হাতে একটী চর্‌বির মোটা জ্বলন্ত বাতি আর অপর হাতে একটী পিস্তল নিয়ে আসিয়াছেন। ধরণী, তারাচাঁদ আর ভবানীকে, এই বেশে এত রাত্রিতে ঘরের মধ্যে দেখিয়াই, কাঁদিয়া পড়িল। ধরণীধর কাঁদিতে কাঁদিতে এবার তারাচাঁদ আর ভবানী উভয়েরই পায়ে পড়িয়া বলিতে লাগিল—"তারাচাঁদ বাবু, ভবানী বাবু, দোহাই আপনাদের—, দোহাই আপনাদের —, আমায় খুন করিবেন না। আমি আপনাদের গোলাম হইয়া থাকিব। যা বলিবেন তাই করিব। কাগজ এখনই আনিয়া দিতেছি। এবারটা মাপ করুন। এবারটা প্রাণ দান দিন্। দোহাই আপনাদের। আমি আপনাদের পায়ে পড়িতেছি, আমায় খুন করিবেন না।"

তারাচাঁদ।—"চুপ্—, বিট্‌লে চুপ্ কর্—। নৈলে এখনই এক কোবে মাথাটা কাটিয়া ফেলিব। চুপ্ কোরে, যা বলি, শোন্।"

ধরণী।—"আজ্ঞে—, কি হুকুম হয়, আজ্ঞা করুন্। এই আমি চুপ্ কো'রেছি।"

তারা।—"হুকুম হইতেছে যে, এই শাদা "ষ্ট্যাম্প্" খানিতে তুমি দস্তখত কর।

ধরণী।—"কেন ?"

তারা।—"তোমাকে একটী ভাল কাজ দিয়া একটী সুন্দর স্থানে পাঠাই-তেছি। যায়গাটা একটুকু দূরে হইলেও কাজ ভাল। নৌকা তৈয়ার। এখ-নই তোমাকে নিয়ে আমি হরিপুর ষ্টেশনে যাইব। তুলসী গ্রামের ষ্টেশনে গেলে তোমাকে সকলে দেখিবে। পুলিষের লোক তোমাকে খুঁজিতেছে। পাইলেই ধরিয়া নিবে। এই ষ্ট্যাম্পে দস্তখত করিতে বলিতেছি এইজন্য যে, আমি তোমার জামিন হইব। যদি তুমি কোন রকম গোল কর, তবে তখনই এই শাদা কাগজে যাহা খুষি লিখিয়া, তোমাকে জব্দ করিব।"

ধরণী।—"কাগজ, কালি, কলম দিন্, এখনই নাম দস্তখত করিতেছি।"

ধরণী ষ্ট্যাম্পে নাম দস্তখত করিলে, তারাচাঁদ, ধরণীরই গায়ের উড়ুণী দিয়া ধরণীধরের হাত দুইখানি বাঁধিয়া বলিলেন—"চল, আমার সঙ্গে এস। তুমি যদি না বুঝিয়া বাহিরে গিয়া ভয় পাইয়া পালাও,এইজন্য হাত বাঁধিলাম। কিন্তু আমার কথা মত চলিলে তোমার কোনই অনিষ্ট হইবে না। বরং ভবিষ্যতে মঙ্গল হইবে।" এই বলিয়া তারাচাঁদ ধরণীর কাপড়ে বাঁধা হাত ধরিয়া টানিয়া তুলিয়া ধরণীকে নিয়ে ঘর হইতে বাহিরে আসিলেন। পূর্ব্বের নানা কষ্টে এবং এই দুই দিনের অনাহারে হাটিতে ধরণীর পা চলিতে ছিল না। তবুও ভয়ে ভয়ে ধরণী হাটিয়া নদীর ঘাটে এক খানি ছোট পান্সীতে আসিয়া চড়িল। চারি দাঁড়ের পান্সী খানি তখনই স্রোতের অনুকূল দিকে পাখীর মত ছুটিয়া চলিল। সঙ্গে তারাচাঁদ একাই গেলেন।

পর দিবসও সমস্ত দিনের মধ্যে গাড়ীতে ধরণীর আহার হইল না। পাছে বল পাইয়া পালাইয়া যায়, এই ভয়ে তারাচাঁদ ধরণীকে কিছুই খাইতে দিলেন না। কিন্তু সেই দিনই সন্ধ্যার সময় তারাচাঁদ বাড়ুয্যে, ধরণীধরকে নিয়ে কলিকাতা নগরে একটী কুলিআফিসে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। কুলি-আফিসের কর্ম্মচারীদের সঙ্গে কিছুক্ষণ কথাবার্ত্তার পরেই, তারাচাঁদ, ষাইট টাকা পারিতোষিক এবং পথখরচ সমেত প্রায় এক শত টাকা আদায় করিয়া ধরণীকে তাঁহাদের হস্তে সমর্পণ পূর্ব্বক দুই তিন দিন পরেই প্রস্থান করিলেন। যে কুলি-আফিসে ধরণীকে প্রায় এক প্রকার বিক্রয় করা হইল, তাহারা মরিসস্ দ্বীপে কুলিচালানাদি করে। সুতরাং কুলি-আফিসের লোকদের জটিল চক্রে পড়িয়া, ধরণীকে চারি পাঁচ দিন পরেই ভারতবর্ষ ছাড়িয়া মরিস্ সহরে যাত্রা করিতে হইল।

এই উপলক্ষে এবার তারাচাঁদের বেশ দশ টাকা উপার্জ্জন হইল। তারাচাঁদ তেঁতুল গাছ হইতে ধরণীর রক্ষিত দলিল এবং নোট আনিয়া, দলিল খানি মাত্র ভবানীকে দিয়া, পাঁচ শত টাকার নোট নিজেই আত্মসাৎ করিয়াছিলেন। তাহার পরে দলিল পাইয়া ভবানীও খুসী হইয়া তারাদাদাকে নগদ একহাজার টাকার নোট পারিতোষিক দিয়াছেন। আবার ধরণীকে নিয়ে কলিকাতা আসা যাওয়ার সমস্ত খরচই তারাদাদা ভবানীর নিকট হইতে আদায় করিয়াছেন। সুতরাং এখন কুলি আফিসের এই একশত টাকা সমস্তই তারাচাঁদের লাভ হইল। সর্ব্বনাশ কেবল ধরণীরই হইল। হতভাগ্যের এক রকম দ্বীপান্তর দণ্ড হইল। ত্রিশ হাজার টাকা ঘুষ নিয়ে পরমানন্দও ভবানীকে দলিলের বিক্রয় পত্র লিখিয়া দিয়াছে। বিক্রয় পত্রে লিখা হইয়াছে "আপনার নিকট খতের লিখিত টাকার অর্দ্ধেক পাইয়া, অপরার্দ্ধের জন্য আপনাকেই এই দলিলের সত্ত্ব বিক্রয় করিলাম" ইত্যাদিইত্যাদি।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

বড় ঘরের কথা।

একদিকে আমোদের ষোলকলা হাসি—শরতের জ্যোৎস্না—বসন্তের প্রভাত। আর একদিকে বিষাদের কান্না—ঝড় তুফান অন্ধকার—বর্ষাকালের দুর্য্যোগের মধ্যে অমাবস্যার রাত্রি। এক গৃহে দুই চিত্র। এক দিকে সুখদা ক্ষুদ্র "ষ্টিমারের" সঙ্গে ভবানী রূপ প্রকাণ্ড "ফ্লাট্" বা খুব বড় গাধা বোট্খানি মদিরা জলরাশি পূর্ণ পাপের তরঙ্গশূন্য গভীর সমুদ্রে বুক রাখিয়া ভাসিতেছে। আর এক দিকে সরমা ও মধু দুই খানি ক্ষুদ্র নৌকা ভরা গঙ্গায় অন্ধকারে গলা ধরাধরি করিয়া ডুবিয়া যাইতেছে। বঙ্গ গৃহের এ গূঢ় রহস্যের খপর কে জানে? একে বড় ঘর, তাহাতে অন্তঃপুর, সে নিগূঢ় রাজ্যের ইতিহাস জানিবার অধিকারই বা কয়জনের আছে?

অভাগিনী মধু আজও সেই বন্দিদশায়, তেল শূন্য সামান্য ক্ষুদ্র সলিতায় নিবু নিবু প্রদীপটীরমত দুঃখের জীবন অতি দুঃখে কাটাইতেছে। মধু ভাত, জল, স্নান, নিদ্রা সমস্ত ছাড়িয়া, মলিন বেশে মলিন বিছানায় মিশিয়া চোখের জল সার করিয়াছে। আহা! এমন অবস্থায় মৃত্যু কি

সুখের, কি উপাদেয়, কি মধুরজিনিষ! ভগবান্ এইরূপ দুঃখীর সন্তপ্ত প্রাণ শীতল করিতেই কি মৃত্যুকে জগতে সৃষ্টি করিয়াছেন? কিন্তু মধুর চক্ষে মৃত্যু আজ বড় ধীরে ধীরে কাছে আসিতেছে। দুঃখিনী মৃত্যুর প্রার্থী, অথচ মৃত্যু শীঘ্র শীঘ্র আসিয়া আপনার শান্তিসুধা মাখা নিস্তব্ধ কোলে স্থান দিতেছে না। অনাথিনী মধু, তাই কি কাঁদিয়া কাঁদিয়া দিন রাতই বুক ভাসাইতেছে? বামন ঠাক্রুন্, রোজই জানালা গলাইয়া, থালে করিয়া মধুর ভাত ডাল এবং গ্লাসে জল রাখিয়া আসে। এক দিন দ্বিপ্রহরে রাখিয়া আসে, পরদিন পরিচারিকা গিয়া, বাশি ভাত, ডাল, জল সেই অবস্থায়ই পায়। কোন কোন দিন কেবল জলের গ্লাসটী মাত্র শূন্য দেখে কিন্তু ভাতের থালায় কখনও হাত পড়ে না। বিধবা হইবার পর হইতে মধু এক বেলা মাত্র নিরামিষ খাইতেছিল। আজ কাল মনের কষ্টেই দিন রাত মধুর প্রাণ ভরা থাকে। মধু আহার, নিদ্রা একেবারেই পরিত্যাগ করিয়াছে।

এই অল্প কয়টী দিনের মধ্যেই মধু ও সরমার নামের নির্ম্মল চন্দ্রের চারি পাঁচ খানি চিঠি ধরা পড়িয়াছে। প্রত্যেক চিঠিই ভবানীশঙ্কর নিজে খুলিয়া পড়িয়াছেন। একখানি চিঠিতে স্পষ্ট লিখা আছে "আজ আমি ভক্তি-ভাজন বিদ্যাসাগর মহাশয়ের কাছে গিয়াছিলাম। তোমাকে এখানে আনিতে পারিলে, যখন যেরূপ সাহায্যের দরকার হইবে, তিনি তাহাই করিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছেন। আমি এখন ছাত্র। তোমাকে এখানে আনার পরে দাদা নিশ্চয়ই খরচ বন্ধ করিবেন। সম্প্রতিও এক রকম বন্ধই করিয়াছেন। সুতরাং তখন ভিন্ন বাসা করিয়া থাকা সম্ভবপর হইবে না। আর ভিন্ন বাসায় তোমাকে একাকী রাখিয়া আমার কলেজে যাইবারও সুবিধা হইবে না। তোমাকে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের আশ্রয়েই রাখিয়া দিব। মধু, যদি তোমার ইচ্ছা হয়, তবে তোমাকে বিদ্যাসাগর মহাশয় একটী সৎপাত্রের সঙ্গে বিবাহ দিতেও প্রস্তুত আছেন। যা হোক্, সে সব পরের কথা। ইচ্ছা হইলে করিবে। তোমার চিঠি পাইলেই আমি এখান হইতে তোমাকে আনিতে যাইব। তোমাকে দুই তিন খানা চিঠি লিখিয়াছি। তুমি এক খানিরও উত্তর দিতেছ না কেন?"

ভবানী এই চিঠি পড়িয়া, তেলে বেগুনে জ্বলিয়া উঠিয়াছেন। সুতরাং ঘর হইতে ছাড়িয়া দেওয়া দূরে থাক্,মধু পাছে কোনরূপে ঘর হইতে পালায়, এই ভয়ে ভবানীশঙ্কর আরও সতর্ক হইয়াছেন। সঙ্গে সঙ্গে সরমা সুন্দরীর

প্রতিও ভবানীর মনে দিন দিনই অজাত ক্রোধ সঞ্চিত হইতেছে। ভবানী তারা দাদার কাছে স্পষ্টই বলিয়াছেন "এমন স্ত্রীকে কাটিয়া না ফেলিলে গায়ের এবং মনের ঝাল মিটে না।" উত্তরে তারাচাঁদ বলিয়াছেন—"সরমা বৌমায়ের উপরে আমিও চটিয়াছি। কিন্তু ভাই, মাতালাবস্থায় তোমার যে গোঁ চড়ে, তাই কর। সাবধান যেন বাড়ীর উপরে একটা স্ত্রীহত্যা না হয়।"

ভবানী।—"হবে না, বিশ্বাস নাই।"

তারা।—"চুপ্ কর। যা হবার হবে। কিন্তু একজনকে প্রাণে মারাটা ভাল নয়।"

এসকল তিন চারিদিন পূর্ব্বের কথা।

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

নির্দ্দোষীর সর্ব্বনাশ।

পাড়ায় মধুর কথা আর সুখদার বিয়ের কথা নিয়ে মেয়ে মহলে অতি অপ্রকাশ্যে অল্প অল্প আন্দোলন চলিতেছে। ভবানীশঙ্করের বাড়ীর রাঁধুনী বামন ঠাকরুন্ রোজই রান্নার পরে রাত্রিকালে নিজের বাড়ীর ছোট কুঁড়ে ঘরখানিতে গিয়া শুইয়া থাকেন। দুপুর বেলায়ও নিজের ঘরেই তাড়া তাড়ি চারিটী ভাতে ভাত রাঁধিয়া হবিষ্য করেন। বাড়ীর উঠানে বামন-ঠাক্রুণের দুই চারিটী লাউ, কুমড়া, সিমের গাছ আছে। বর্ষার দিনে উঠানে শশা, ঝিঙ্গে প্রভৃতির গাছগুলি বামনঠাক্রুণের নিজের হাতে তৈয়ারি একখানি বাঁশের মাচার উপরের লতিয়া লতিয়া ফল ফুলে ভূষিত হইয়া থাকে। মাচার নীচে ডেঙ্গো ও নটে ডাঁটার গাছ হয়। শীত কালে মূলা হয়। এতদ্ভিন্ন বামনঠাক্রুণের একটা বার মেসে পুঁইয়ের মাচা আর কয়েকটী বেগুন এবং লঙ্কার গাছও আছে। কয়েকটী গেঁদা ফুলের গাছ আর একটী তুলসীর গাছ আছে। বাড়ীর কোণে একটী স'জ্নে এবং একটী আমড়ার গাছ আছে। বামনঠাক্রুন্ এই সকল বহুমূল্য সম্পত্তি ফেলিয়া কখনও কোথায়ও রাত্রি বাস করেন না। বামনঠাক্রুন্ ঘরে না থাকিলে পাশের বাড়ীর বা অন্য লোকদের গরু, বাছুর ও ছাগল, ভাঙ্গা প্রাচীরের কঞ্চির বেড়া ভাঙ্গিয়া কিম্বা ফাক্ করিয়া আসিয়া গাছগুলি

খাইয়া যায়, উঠান মাড়াইয়া চলিয়া যায়। গাছগুলিতে যাহা উৎপন্ন হয়, বামনঠাক্‌রুন্ তাহা পাড়ার সকলকে না দিয়া কখনও একাকী খান না। বামনঠাক্‌রুণের ঘরে আলকাতরার রঙ করা একটী আম্রকাষ্ঠের কাল ছোট সিন্দুকে, একটী তেল ধূনায় শত জোড়া তালিযুক্ত পিতলের ঘটি, একটী বোগ্‌না, একখানি হাতা, এক গাছি বেড়ী এবং একখানি কাণাভাঙ্গা বালেশ্বরী পাথর আছে। ইহা চোরে না নিতে পারে, এজন্য বামনঠাক্‌রুন্ ঘরের দরজায় এবং প্রাচীরের গায়ের কপাটে ক্রমান্বয়ে দুইটী তালা আঁটিয়া রাখিয়া বাহিরে যাতায়াত করেন। কিন্তু বামনঠাক্‌রুন্‌ই ভবানীর গৃহ ছিদ্রের কথা দুইটী তারাচাঁদের স্ত্রী প্রভৃতি দুই একজন খাতিরা স্ত্রীলোককে চুপি চুপি বলিয়া প্রকাশ করিতে বারম্বার নিষেধ করিয়া দিয়াছেন। তারা-দাদার স্ত্রী কথাটা ধীরে ধীরে এক কাণ, দুই কাণ করিয়া ছড়াইয়া ফেলিয়াছেন। কথা ভবানী এবং সুখদার কাণেও গিয়াছে। মুখয্যেদের বাড়ীর অনুজার ঠাকুর মা, একদিন সাজি ভরিয়া ভবানীর বাগানের ফুল তুলিতে আসিয়া, চুপি চুপি কথাটা নূতন বৌ মা আর ভবানীকে বলিয়া গিয়াছেন। তিনিই বলিয়াছেন "কথাটা তারাচাঁদের বৌ তুলিয়াছে।"

ভবানীশঙ্কর এজন্য একদিন তারাচাঁদকে ডাকিয়া আনিয়া বিশেষ শাসন করিয়া দিয়াছেন। তারাদাদা বাড়ী আসিয়া ব্রাহ্মণীকে শাসন করিবামাত্র, তিনি তৎক্ষণাৎই রাগ করিয়া প্রতিবাসীদের বাড়ী গিয়া দুই দিন বসিয়া ছিলেন। এই দুই দিন তারাচাঁদের বাড়ীর উননে আগুন জ্বলে নাই। বাড়ীর বিড়ালটা ডাকিয়া ডাকিয়া অন্য বাড়ী গিয়া হাঁড়ীর শরা ঠেলিয়া তাঁহাদের সাঁতলান মাছ খাইয়া ফেলাতে, সে বাড়ীর গিন্নী তেলেবেগুনে জ্বলিয়া ঝগড়ার্থ তারাচাঁদের বাড়ী আসিয়াছিলেন। কিন্তু বাড়ী খালি দেখিয়া অগত্যা তাঁহাকে রণে ভঙ্গ দিয়া যাইতে হইল। যে ঝেঁটা দিয়া বিড়াল তাড়াইতে ছুটিয়াছিলেন, গিন্নী সেই ঝেঁটা হস্তেই যুদ্ধ-ক্ষেত্রে আসিয়াছিলেন। যুদ্ধ না হওয়াতে কাজেই বাড়ী গিয়া ঝেঁটা সম্বরণ করিলেন। তারাচাঁদ দুইদিন এবাড়ী, ওবাড়ী খাইয়া বেড়াইলেন। ছেলে মেয়েগুলি বধুঠাকুরাণীর সঙ্গেই গিয়াছিল। তারাচাঁদ সন্ন্যাসী হইয়া দেশ ত্যাগ করিয়া কোথায়ও চলিয়া যাইবেন, ইহাও বৌয়ের কাণে তুলিতে ত্রুটি করিলেন না। তবুও বৌঠাকুরাণীর দুর্জ্জয় মান টুটিল না। পরে শেষ দিন সন্ধ্যার সময় তারাচাঁদ স্বয়ংই প্রতিবাসীদের বাড়ী গিয়া, কি

কৌশলে জানি না, বৌয়ের মান ভাঙ্গিয়া বাড়ী নিয়ে আসিলেন। মেঘ ভাঙ্গা রৌদ্রের মত বিচ্ছেদের পরে প্রণয় বড় গাঢ় হয়। সুতরাং তারা-দাদারা স্বামী স্ত্রী পুনরায় গাঢ় অনুরাগে সংসার গৃহস্থলী আরম্ভ করিলেন। পরদিন প্রভাতে পাড়ার তিন চারিজন বৃদ্ধা স্ত্রীলোককে সাক্ষী নিয়ে, তারাচাঁদ সস্ত্রীক সুখদার খণ্ডে উপস্থিত হইলেন। প্রথমেই বৌ, সুখদাকে সব কথা খুলিয়া বলিলেন। সুখদাসুন্দরী তাহাতে বিশেষ সায় দিয়া, রসান দিয়া, তখনই বাদীর পক্ষের উকিল স্বরূপে মোকদ্দমা ভবানীশঙ্করের কাছে উপস্থিত করিলেন। সামান্য মোকদ্দমায় এবার "প্রিভিকাউন্‌সিলের" "বারিষ্টার" উপস্থিত। সুতরাং মোকদ্দমা যে তখনই তারাদাদার বৌ জিতিয়া নিলেন, এসম্বন্ধে আর দ্বিরুক্তি করা বাহুল্যমাত্র। ফলকথা, এখন ঠিক হইল "কথাটা সরমা সুন্দরীই তুলিয়াছেন। সরমার বাপের বাড়ীর বুড়া ঝীকে দিয়া, তিনিই পাড়ায় কথাটা ছড়াইয়া দিয়াছেন। তাঁহার ইচ্ছা সুখদার সর্ব্বনাশ হয়, ভবানীর সর্ব্বনাশ হয়।" ইত্যাদি ইত্যাদি। সাক্ষীরাও সকলেই সমস্বরে বলিলেন—"তাঁহাদেরই নিকটে চারি চক্ষু মিলাইয়া বুড়া ঝী এই কথা বলিয়া আসিয়াছে।" তারাদাদার সহধর্ম্মিনী কাঁদিয়া কাঁদিয়া দুই চোক ফুলাইয়া ছেলের মাথায় হাত দিয়া শপথ করিলেন। তারাচাঁদ উপস্থিত থাকিয়া এ সকল কাজে ও কথায় বিশেষ রূপে ফোড়ণ এবং রসান দিলেন। অতঃপর সুখদা সুন্দরী ভবানীর দিকে একবারটীমাত্র কট মট করিয়া চাহিয়াই সজল নেত্রে বিদ্যুতের মত ছুটিয়া সরিয়া গেলেন। তারা-চাঁদ সভাস্থলে উপস্থিত মহিলাবৃন্দকে বুঝাইয়া বলিলেন—"সুখদা বৌমার নামে যে সকল অপবাদ তোলা হইয়াছে, সবই মিথ্যা। ইনি বর্দ্ধমানাঞ্চলের বড় কুলীনের মেয়ে। এ বিষয়ে বিন্দু মাত্রও সংশয় নাই। ইহাঁর বাপ গোপাল চন্দ্র বাড়ুর্য্যেকে সকলেই দেখিয়াছ। তিনি হরিধন চাটুর্য্যের ঘনিষ্ট কুটুম্ব। আর নির্ম্মল বিগ্‌ড়ে গিয়ে মধুকে কলিকাতায় নিয়ে খারাপ করিতে চায়। তাই মধুকে তাহার ইচ্ছামতই ঘরে চাবি দিয়া রাখা হইয়াছে। মধু এত বড় ঘরের মেয়ে। মধুর কি আর সাধ যে কলিকাতা গিয়ে খারাপ হয়?"

এই সকল কথার পরে ভবানীশঙ্কর চক্ষুর্দ্দ্বয় রক্তবর্ণ করিয়া তারাদাদার দিকে কট মট করিয়া চাহিয়া বলিলেন—"বলত তারাদাদা, একি প্রাণে সয়?"

তারা।—"ঠিক বো'লেছ ভাই, তুমি সোণার মানুষ বো'লে এত সয়ে আছ। আমরা হো'লে কি করিতাম জানিনা।"

এই সকল কথার পরে ভবানীশঙ্কর আর ক্ষণমাত্রও বিলম্ব না করিয়া তৎক্ষণাৎ অগ্নি মূর্ত্তিতে সে স্থান হইতে উঠিয়া, বেগে চলিয়া গেলেন। আর একটী কথাও বলিলেন না। মুহূর্ত্ত মধ্যেই আসর জনশূন্য এবং নিস্তব্ধ হইল।

নবম পরিচ্ছেদ।

পাপের পূর্ণ মাত্রা।

ভবানীশঙ্কর মধুকে ঘরে বন্ধ করিবার পর হইতে সরমার বুক যেন এক বারে ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে। সরমা সুন্দরীর প্রফুল্ল রূপরাশির উপরে কে যেন এক বারে এক হাঁড়ী কালি ঢালিয়া দিয়াছে। সরমার স্বর্ণকান্তি শরীর ক্ষীণ এবং জীর্ণ শীর্ণ হইয়া যাইতেছে। ভাদ্রমাসের ভরা গঙ্গার বুকে শরতের নির্ম্মল নির্দ্দোষ জ্যোৎস্না রাশি ঘুমাইতেছিল, বসন্তের ফুল ভরা ফুল বাগানের উপরে প্রভাতের তরুণ অরুণ আভা ছড়াইয়া পড়িয়া হাসিতেছিল; কে যেন হঠাৎ এমন শোভা, এমন মাধুর্য্য, একবারে অদৃশ্য করিয়া ফেলিয়াছে। সরমার মনের সুখ,মুখের হাসি এ ঘটনার অনেকদিন পূর্ব্বেই চলিয়া গিয়াছে; সরমা, বেশ বিন্যাস, আমোদ প্রমোদ অনেক দিন হইতেই ছাড়িয়া দিয়াছেন; তবুও পরম সুন্দরী সরমার মুখের লাবণ্য, দেহের রূপ একবারে অদৃশ্য হয় নাই। এবার আর কিন্তু কিছুই বাকী নাই। এবার সরমার সব গিয়াছে, কেবল অবশিষ্ট আছে—দুইটী চোখে দুইটী জলের ধারা। দিন যায়, রাত যায়, সরমা শুধুই চোখের জলে বালীশ আর আঁচল ভিজান। মধুকে ঘরে চাবি দেওয়াতে মধু বন্ধ আছে, সরমা বিনা চাবিতেই নিজের বিছানা ছাড়িয়া একবারও মাথা তোলেন না। এক দিনের ভাত, জল, দুই দিন পড়িয়া, ঘরের মে'ঝেতেই পচিতে থাকে, তবুও সরমা উঠিয়া খান না। সরমা কাহারও সঙ্গে আর একটীও কথা বলেন না। ঘরে মানুষ আসিবে, এই ভয়ে প্রায় সর্ব্বদাই সরমাসুন্দরী ঘরের কপাটে খিল্ আঁটিয়া শুইয়া থাকেন।

আজ চারি দিন হইল, এক কৌটা আফিঙ্গ সরমার তাকের উপরে পড়িয়া রহিয়াছে। অনেক যোগাড়ের পরে সরমা সুন্দরী বামনঠাকুরুণের হাতে চুপি চুপি আফিঙ্গের কৌটাটী কিনিয়া আনিয়াছেন। আফিঙ্গে তৈল

মিশাইয়া একবারে প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছেন। ভাবিতেছেন—"এই বিষ খাইয়া, এই নিবু নিবু প্রদীপ নিবাইবেন কি না ; না আর দুই দিন পরে আপনি নিবিয়া গেলেই ভাল হইবে।" মীমাংসা করিতে করিতে চারি দিন চলিয়া গিয়াছে। সরমা আজও সাহস করিয়া বিষ খাইতে পারেন নাই।

সরমা বিষ খাইতেছেন না আরও তিনটী কারণে। প্রথম কথা, "আমি যেন বিষ খাইয়া পার পাইলাম, অভাগী ঠাকুরঝীর কি হবে? ঠাকুরঝীর একটা পথ না দেখিয়া মরিব না।" দ্বিতীয় কথা, "আমি বিষ খাইলে বাবুকে কোন গোলে পড়িতে হবে কি? আমিত তাঁরই মনের কষ্ট দূর করিতে মরিতে বসিয়াছি। তিনি নিষ্কণ্টক হইবেন, সুখে থাকিবেন, আমি তাই মরিতে চাই।" ভাবিতে সরমার দুই চোক জলে ভাসিয়া যায়, বুক ভাঙ্গিয়া যায়, তবুও সরমা ভাবেন "আমি বিষ খাইয়া মরিলে যদি তাঁহাকে গোলে পড়িতে হয়, তবেত আমার মরার উদ্দেশ্যই বিফল হইবে।" সরমার প্রাণের শেষ নিবেদন—"সে পা দুখানি কি এ পৃথিবীতে আর একবার দেখিতে পাইব না? তিনি যেমনই হউন, আমিত তাঁহারই দাসী, তিনি ত আমারই দেবতা, তিনি আমাকে ভুলিয়াছেন, আমি ত তাঁহার চরণেই মন প্রাণ সমর্পণ করিয়া এ সংসারের কাছে বিদায় নিতেছি। হা! বিধাতঃ,আমি কি অনন্ত অপরাধ করিয়াছি?" এই তিন প্রশ্নের মীমাংসা করিতে অসমর্থ হইয়াই, সরমা বিষ খাইতে সাহস পান নাই। শেষ কথাটী ভাবিতে ভাবিতে সরমা অনেক সময় কাঁদিয়া কাঁদিয়া মূর্চ্ছিত হইয়া পড়েন। কিন্তু এ অবস্থায় স্ত্রীলোকের দুর্ব্বল হৃদয়ের পক্ষে মৃত্যুর প্রলোভন বড় ভয়ানক প্রলোভন। সরমা এই প্রলোভনের সঙ্গে চারিদিন যুঝিয়া যুঝিয়া এক এক বার যেন হারি মানিতেছিলেন। আজ ভাবিতে ভাবিতে সরমার চোখে একটু তন্দ্রা আসিল। তন্দ্রা আসিবামাত্রই সরমা দেখিতেছিলেন—"যেন একটী সৌম্য-মূর্ত্তি, গৌরবর্ণ, প্রবীণ পুরুষ, অদূরে দাঁড়াইয়া, তাঁহারই দিকে প্রশান্ত দৃষ্টি নিক্ষেপপূর্ব্বক, কিছু বলিতে উদ্যত। আরও দেখিলেন, পুরুষের পরিধানে সুন্দর শুভ্র ক্ষৌম বস্ত্র। বিশাল অংশোরি নামাবলী লেখা উত্তরীয় বাস, কক্ষতল দিয়া দেহ বেষ্টন করিয়া রক্ষিত। বক্ষোপরি দোদুল্যমান ক্ষুদ্রাকার রুদ্রাক্ষের মালা, তাহাতে স্বর্ণ নির্ম্মিত ক্ষুদ্র মাদুলীমধ্যে ইষ্টকবচ নিবদ্ধ। তন্নিম্নে সুশুভ্র উপবীত গুচ্ছ। ললাট-কণ্ঠমূল-বাহু-বক্ষাদি দ্বাদশ অঙ্গে ঘৃত-ম্রক্ষিত যজ্ঞ-ভস্মের ফোঁটা শোভিত। সুগঠিত বিশাল ললাট-

যুক্ত মস্তকোপরি শিখাগ্রে পূজাবশিষ্ট নির্ম্মাল্য পুষ্প সুনিবদ্ধ। আর তাঁহার মুখমণ্ডলে গভীর সাত্ত্বিক ভাবের সহিত যেন মূর্ত্তিমতী নির্ম্মল প্রশান্ততা বিরাজ করিতেছে। সর্ব্বাঙ্গে যেন একরূপ স্নিগ্ধ ব্রহ্মতেজের আভা স্বতই স্ফুরিত হইতেছে। দৃষ্টি সুধাময়। সেই সুধা মাখা দৃষ্টিতে, স্ফুরিতাধারে, সুরমার পানে চাহিয়া, পুরুষ, কি যেন বলিতে উদ্যত। সুরমা প্রথমদর্শনেই চিনিলেন, পুরুষ, তাঁহার বহুকাল-মৃত পিতাঠাকুর! স্বপ্নে মৃত্যুর কথা বিস্মৃত হইলেন। পিতা, দুঃখিনী কন্যাকে লক্ষ্য করিয়া, স্নেহপূর্ণ, সকরুণ স্বরে বলিতে লাগিলেন,—"সর, মা, তোমার এমন দশা হইয়াছে? তোমার ভাগ্যে এত দুঃখ ছিল? তবে প্রাণের সর, মা, তুমি এস। এস মা, এ জগতে আর তোমার সুখ নাই। পর জগতে চল। সে রাজ্যে ভগবান্ তোমার মত নির্ব্বান্ধব দুঃখিনী সতী রমণীদের জন্য অপূর্ব্ব শান্তি ও আনন্দধাম নির্ম্মাণ করিয়া রাখিয়াছেন। এস মা, সেখানে শান্তিময়ী—আনন্দময়ী বিশ্বজননীর কোলে, তোমার এ তাপিত প্রাণ আশ্রয় পাইয়া সকল দুঃখ যন্ত্রণা ভুলিয়া যাইবে। সেখানে তোমার বহুদিন-মৃতা পার্থিব মাতারও সাক্ষাৎ পাইবে।" এই বলিয়াই সেই প্রশান্ত-মূর্ত্তি পুরুষ, অঙ্গুলী সঙ্কেত করিলেন। সরমাসুন্দরী চকিতের মত পিতার অঙ্গুলী নির্দ্দিষ্ট দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন। চাহিবামাত্রই, সবিস্ময়ে দেখিলেন, পুরুষের পদ-প্রান্ত হইতে এক অপূর্ব্ব আলোকময়, নক্ষত্র-খচিত, সুপ্রশস্ত বর্ত্ম প্রকাশিত হইয়া, সুনীল গগনসীমা অতিক্রম করিয়া অন্তরীক্ষের পরপারাভিমুখে ধাবিত হইয়াছে। পথের সীমা ধারণার অতীত বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। কিন্তু পথ ক্রমেই যেন মানব দৃষ্টির অপূর্ণতা-হেতু সরমা সুন্দরীর চক্ষে অপ্রশস্ত হইয়া অবশেষে গগন-পরপারে মিটি মিটি জ্বলিতে লাগিল। পথের আলো বড়ই মনোহর, বড়ই স্নিগ্ধ, বড়ই সুখকর। দেখিলেই যেন আপনা হইতে ইচ্ছা হয়, এই পথের পথিক হইয়া, হাঁটিতে হাঁটিতে, ধীরে ধীরে এ জ্বালা যন্ত্রনাময় সংসারের পরপারে চলিয়া যাই। সরমা একবার পথের দিকে চাহিলেন, আবার পিতার মুখের দিকে তাকাইয়া বলিলেন—"কি করিব?" পিতা অমনি সস্নেহে উত্তর দিলেন—"আমি চলিলাম। মা তুমি এই পথে এস। পথ নির্ব্বিঘ্ন। আবার সেই জগতে আমার সাক্ষাৎ পাইবে।" পুরুষ কথা শেষ করিয়াই অন্তর্দ্ধান হইলেন। পথের চিহ্নটীও যেন সেই সঙ্গে সঙ্গেই বিলুপ্ত হইল! তখন আকাশে অদৃশ্যে হঠাৎ কোথা হইতে যেন মধুর বীণার ঝঙ্কার উঠিল! সেই

ঝঙ্কারে কণ্ঠ মিলাইয়া কে যেন এক অপূর্ব্ব দেব ভাষায় সঙ্গীত করিতে লাগিলেন। তাহার মর্ম্ম যেন এইরূপ—

"এই অমৃত ধামে চলিয়া এস। এখানে মানবাত্যাচারের বিষপূর্ণ সাগর নাই। এ নিরাপদ শান্তিধামে কেবলই শান্তি, কেবলই আনন্দ আর পবিত্রতা। ঐ আলোক পথে চলিয়া এস।" ইত্যাদি ইত্যাদি—

এই গান শুনিতে শুনিতেই হঠাৎ সরমার ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। তন্দ্রাবসানে সরমা সুন্দরী যেন ক্ষিপ্তপ্রায় হইলেন। এবার তাড়া তাড়ি উঠিয়াই, উন্মত্তের মত তাকের উপর হইতে সেই বিষের কৌটাটী পাড়িয়া আনিয়া, আকণ্ঠ পূরিয়া বিষ খাইবেন বলিয়া, কৌটার ঢাকাটী খুলিতে চেষ্টা করিতে লাগিলেন। কিন্তু কেন যেন আফিঙ্গের আটায় অত্যন্ত জোরে আঁটিয়া যাওয়াতে, সরমা দুর্ব্বল হস্তে কিছুতেই তাহা শীঘ্র শীঘ্র খুলিতে সমর্থ হইলেন না। এমন সময় একি হইল? সহসা ভয়ানক চীৎকার স্বরে সরমার খণ্ডের উঠান পরিপূর্ণ হইল কেন! সরমা সুন্দরী হঠাৎ থমকিয়া, শুনিয়াই বুঝিলেন, কণ্ঠ তাঁহার দেবতার—তাঁহার স্বামী ভবানীশঙ্করের! কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে একটী স্ত্রীলোকেরও চীৎকার শুনা যাইতেছে!

এইরূপ আকস্মিক চীৎকার ও গোলমালে সরমা যেন একবারে হতজ্ঞান হইয়া,বিষের কৌটাটী হাতে করিয়াই,ঘরের কপাট খুলিয়া তাড়াতাড়ি বাহিরে আসিয়া, দ্বিতল গৃহের বারেণ্ডায় দাঁড়াইলেন। কিন্তু বাহিরে দাঁড়াইয়াই সরমা সুন্দরী দেখিলেন, তাঁহার স্বামী উন্মত্ত বেশে সম্মুখে উপস্থিত! ভবানীশঙ্কর ঘোরতর নেশার ঝোঁকে দাঁড়াইতে যেন টলিয়া পড়িতেছেন। কিন্তু চক্ষু দিয়া ক্রোধে ধক্ ধক্ করিয়া আগুন ছুটিয়া বাহির হইতেছে। দন্তে ভীষণ ভাবে অধর চাপা পড়িয়াছে। ঘাড় বক্র হইয়া গিয়াছে। হাতে তীক্ষ্ণধার কিরিচ্ খোলা অবস্থায় ঝল মল করিতেছে। পিছে পিছে সুখদা চীৎকার করিয়া বলিতেছে—"কাট্—! ওর মাথা কাট্—! সত্যি কোরেছিস্—। বাপের বেটা হো'স্ ত ওর মাথা কাট্—! ওর রক্ত খাব—! ওর কল্‌জে খাব—!" সুখদার এ'লো চুল, এ'লো বেশ, রাগে ও নেশার ঘোরে থর থর করিয়া গা কাঁপিতেছে, মুখ লাল হইয়া গিয়াছে, চোক দুইটা রক্ত জবা ফুলের মত লাল হইয়াছে, আর পাগলের মত মুখে কেবল জড়ান জড়ান কথায় ঐ সব বলিতে বলিতে চীৎকার করিতেছে। ভবানী হঠাৎ আসিয়া সরমার পথ আগুলিয়া দাঁড়াইলেন। সরমা কেবল একবার মাত্র ভবানীর মুখের দিকে

তাকাইলেন। সরমার বড় আশায় ছাই পড়িল। সরমা ভাবিয়াছিলেন, যা থাকে ভাগ্যে মুখ খানি ত একবার দেখিয়া নেই। কিন্তু সে দিকে তাকাইয়াই দেখিলেন, যেন মানুষের এমন ভয়ঙ্কর ভাব তিনি আর কখনও দেখেন নাই। সরমা একবারের অধিক আর সে মুখের দিকে তাকাইতে পারিলেন না। কেবল অধোমুখে অবাক্ হইয়া প্রাণের ভয়ে থর থর করিয়া কাঁপিতে লাগিলেন। ভবানী চীৎকার করিয়া বলিল—"কি—তোর এত বড় আস্পর্দ্ধা—?" সরমা তখন সংজ্ঞাশূন্য। সরমাসুন্দরী তখন ইহলোক ভুলিয়া মুদ্রিত নয়নে, সেই সুনীল আকাশে মধুর আলোকবর্ত্ম দেখিতেছিলেন। ভবানীর কথা আর সরমার কাণে গেল না। সরমা কেবল নিজের মনে অস্পষ্ট স্বরে, কাতর কণ্ঠে বলিলেন—"মা বিশ্বজননি!" ভবানী আবার গর্জ্জিয়া বলিল—"কি, তোর এত বড় আস্পর্দ্ধা—? জানিস্ না—আমি বিশ্বজননী টননী কিছুই মানিনা—?" এই বলিয়াই ভবানী যাহা করিল, তাহা আর লিখিবার বা বলিবার নয়। সাধ্বীর রক্তে ধরা কলঙ্কিত হইল। স্বৈরিণী, পিশাচী, ডাকিনী সুখদা তখন সরমার ছিন্ন মুণ্ড হস্তে তুলিয়া, উন্মত্তের মত কেবল ধেই ধেই করিয়া নাচিতে লাগিল। মধু উঠানের গোল শুনিয়াই, সেই ক্ষীণ দুর্ব্বল শরীরে তাড়াতাড়ি ছুটিয়া জানালায় গিয়া কাঁপিতে কাঁপিতে দেয়াল ধরিয়া দাঁড়াইয়া ছিল। দাঁড়াইয়াই ভবানী আর সুখদার সেই ভয়ঙ্কর উন্মত্ত বেশ দেখিয়া, মাথা ঘুরিয়া পড়িয়া যাইতে লাগিল। এমন সময় ভবানীশঙ্করও পলকে বিদ্যুতের মত হাতের কিরিচ্ তুলিয়া সবলে সরমাকে আঘাত করিল। আঘাত করিবামাত্রই মধু চেঁচিয়া বলিতে লাগিল—"দাদা কি করিলে—? দাদা কি করিলে—? হায় কি হবে রে—! হায় কি হবে রে—! মাগো—কি হবে গো—! মা কি হবে গো—!" বলিতে বলিতে যেন মধু সংজ্ঞা হারা হইয়া কাঁদিয়া কাঁদিয়া অতি ক্ষীণস্বরে চেঁচিয়া চেঁচিয়া কেবল ঐ একই কথা বলিতে বলিতে ঘরময় ছুটিতে লাগিল। ভবানী মধুর চীৎকার শুনিয়া এবং মধুকে ঘরময় উন্মত্তের মত ছুটিতে দেখিয়া, সেই রক্তাক্ত কিরিচ্ নিয়েই পুনরায় মধুর ঘরের দিকে ছুটিয়া চলিল। ভবানী চলিতে চলিতে দুই তিন বার টলিয়া মাটিতে পড়িয়া গেল, একবার দেয়ালে পড়িয়া বিষম আঘাত পাইল, তবুও ছুটিতে ক্ষান্ত হইল না। তারাচাঁদ দূর হইতে হঠাৎ ভবানীর চীৎকার শুনিয়া, তাড়াতাড়ি বাড়ীর মধ্যে ঢুকিয়া, দরজার প্রকাণ্ড কপাট বন্ধ করিয়া দেওয়াতে, গোল একটুকুও বাহিরে যাইতে ছিল না।

খিড়কীর দিকের দোরও পূর্ব্ব হইতেই বন্ধ ছিল। সুতরাং বাহির হইতে আর খণ্ডের মধ্যে কোন লোকেরই প্রবেশের সুবিধা ছিল না। ভবানী সরমাকে আঘাত করিয়া, সমস্ত শরীর ও কাপড় রক্তে মাখা মাখি করিয়া, রক্তাক্ত কিরিচ্ হাতে পুনরায় মধুর ঘরের দিকে ছুটিতেছে, তারাচাঁদ নীচের উঠান হইতে ইহা দেখিয়াই, দৌড়াইয়া ভবানীকে ধরিতে গেল। কিন্তু ভবানী তখন বাহিরের সংজ্ঞাহারা। উন্মত্ত ভবানী তারাদাদাকে দেখিয়া, কিরিচ্ তুলিয়া কাটিতে আসিল। ভবানীর গায়ে অসাধারণ বল। তারাচাঁদ নিতান্ত ক্ষীণকায় ফলা'রে বামন। ভবানী মাতাল হইলেও, দশজন তারাচাঁদ তাহার কাছে ঘনাইতে পারে না। ভবানী কিরিচ্ তুলিয়া কাটিতে আসিতেছে দেখিয়াই, তারা দাদা, "ওমা—! একে এখন খুন চ'ড়েছেরে—!" এই বলিয়া ঊর্দ্ধশ্বাসে দৌড়াইয়া ছাদে গিয়া সিঁড়ির কপাট বন্ধ করিয়া দিল। ভবানী তারা দাদাকে পালাইতে দেখিয়া, ছুটিয়া আবার মধুর ঘরের দিকেই চলিল। তখন সুখদাও সরমার রক্তাক্ত ছিন্নমুণ্ড হাতে করিয়া পুনরায় ভবানীর পিছে পিছে ছুটিল। ছুটিতে ছুটিতে দুই তিন হাত অন্তরে গিয়া গিয়াই টলিয়া টলিয়া পড়িতে লাগিল। এদিকে ভবানী মধুর কুঠরীর কপাটে বাহির হইতে বারম্বার সজোরে লাথী মারাতে কপাটের কব্জা ভাঙ্গিয়া কপাট ফাঁক হইয়া পড়িল। ভবানী তৎক্ষণাৎ রুধির পিপাসু রাক্ষসের মত সেই ফাঁক দিয়াই ঘরে ঢুকিয়া পড়িল। সুখদাও সেই বেশে "রক্ত খাব, কল্‌জে খাব" বলিতে বলিতে তখনই ভবানীর পিছে পিছে কুঠরীর মধ্যে প্রবেশ করিল। হতভাগিনী মধু সেই সাক্ষাৎ অপমৃত্যু এবং তাহার সহচারিণীকে সম্মুখে দেখিয়া, সেই সংজ্ঞাশূন্য অবস্থায়ই, ঘরময় ছুটিয়া ছুটিয়া কাঁদিয়া কাঁদিয়া ক্ষীণ ও কাতর স্বরে চীৎকার করিয়া বলিতে লাগিল—"দেখ দাদা, আমি তোমার ছোট বোন্—,এ ভূভারতে আর আমার কেহ নাই—। আমি জন্মদুঃখিনী। আমায় কেটে ফে'লো না—, আমায় কেট না দাদা—।" ভবানী যেন আর এ পৃথিবীর সে ভবানী নয়। ভবানী এখন সংজ্ঞা হারা, রক্ত পিপাসু, নারী ঘাতক রাক্ষস। ভবানীর কাণে মধুর কোনই কাতর কথা প্রবেশ করিল না। কেবল ভবানী কাঁপিতে কাঁপিতে আপনার মনে সেই ভীষণ চীৎকারের সঙ্গে জড়ান জড়ান কথায় গর্জ্জিয়া বলিল—"কি—এতবড় আস্পর্দ্ধা—?" এই বলিয়াই হাতের দৃঢ় মুষ্টিবদ্ধ সেই রক্তাক্ত কিরিচ্ তুলিয়া [পলকে] বিদ্যুতের মত মধুকে আঘাত

করিল। অমনি তথনই কোমল লতিকার মত মধুর দেহ দুই খণ্ড হইয়া ঘরের মে'ঝেতে পড়িয়া রক্ত নদীতে ভাসিতে লাগিল। এবার ভবানীও সেই রক্তের মধ্যেই হত চৈতন্য হইয়া পড়িয়া লুণ্ঠিত হইল। সুখদা তখনও সরমার ছিন্নমুণ্ড হাতে করিয়া ধেই ধেই করিয়া নাচিতেছিল। তারাচাঁদ ভবানীর চীৎকার না শুনিয়া, ছাদের উপর হইতে আবার চুপি চুপি ধীরে ধীরে নামিয়া আসিয়া দূর হইতেই উঁকি মারিয়া ভবানীকে মূচ্ছিতাবস্থায় দেখিয়া, দৌড়াইয়া, মধুর রক্তে যে ঘরের মে'ঝে ভাসিয়া যাইতেছিল, সেই কুঠরীতেই ব্যস্ততার সঙ্গে ঢুকিয়া পড়িল। তখন ঘরের মে'ঝেতে মধুমতীর রক্তাক্ত দ্বিখণ্ডিত শব দেহ পতিত দেখিয়া, তারাচাঁদের চোক দিয়া ফোঁটা ফোঁটা জল পড়িতে লাগিল। কিন্তু তারাচাঁদ আগে তাড়া তাড়ি জল আনিয়া, তথনই ভবানীর মূর্চ্ছা ভাঙ্গিতে ব্যস্ত হইয়া পড়িল।

দশম পরিচ্ছেদ।

মহানগরীর ছাত্র-নিবাস।

কলিকাতায় নির্ম্মল চন্দ্রদের একটী সুন্দর উদ্যান-বেষ্টিত প্রকাণ্ড বাড়ী আছে। বাড়ীটী কাশীপুরের ওদিকে অতি নির্জ্জন স্থানে গঙ্গার তীরের উপরে। বাড়ীর নিম্নেই সুন্দর চুণ কাম করা শাদা ধব্ ধবে একটী বিস্তীর্ণ বান্ধা ঘাট যেন উচ্ছ্বসিত ভাগিরথীর তরঙ্গের সঙ্গে ক্রীড়া করিতেছে। বাড়ীটীর ছাদে বসিয়া বহুদূর দূরান্তর পর্য্যন্ত গঙ্গা-বক্ষে লহরীর খেলা, তরণীর চলা চল দেখিতে পাওয়া যায়। নির্ম্মলচন্দ্র বালককাল হইতে এই বাড়ীতে থাকিয়াই পড়িতেছিলেন। কিন্তু এখানে থাকিলে, পড়া শুনার সাহায্যের জন্য সর্ব্বদা অনেক টাকা বেতন দিয়া একজন উপযুক্ত শিক্ষক না রাখিলে চলে না। তদ্ভিন্ন গাড়ী, ঘোড়া ও লোক জনের জন্যও অনেক টাকা খরচ পড়ে। বিশেষত এবাড়ীতে যে মোক্তার ও কর্ম্মচারীরা থাকে, তাহারা এক গুণ বাসা খরচ করিয়া দশ গুণ খরচ লিখে। এই সকল কারণে এক নির্ম্মলচন্দ্রের জন্যই মাসে প্রায় এক হাজারেরও অধিক টাকা ব্যয় হইতেছিল। এতদিন পিতামহ ঠাকুর মুক্তহস্তে পৌত্রের এই খরচ বহন করিতে-ছিলেন। ভবানীও কিছুদিন এই খরচ চালাইয়া ছিলেন। এখন নানা

কারণে বিরক্ত হইয়া, ভবানী আর মাসে মাসে নিয়মিত রূপে নির্ম্মলের খরচ পাঠাইতেছেন না। তদ্ভিন্ন ভবানীশঙ্কর যখন কলিকাতায় আসেন, তখন এবাড়ীতে দিন রাত এমন বীভৎস ব্যাপার ও গোলমাল হয় যে, তাহাতে কোন প্রকারেই এখানে থাকিয়া মনোযোগের সহিত পড়া শুনা করিবার সুবিধা হইতে পারে না। এই সকল কারণে নির্ম্মলচন্দ্র আজ কাল সহরের উপরেই একটী ছাত্র-নিবাসের একটী পৃথক্ ঘর নিয়ে বাসা করিয়া আছেন। এই ঘটনাতে নির্ম্মলের দাদা অত্যন্ত অপমানিত হইয়া, আরও চটিয়া, এখন আর একবারেই খরচ পাঠাইতেছেন না।

নির্ম্মলচন্দ্রের বি, এ, পরীক্ষার ফল বাহির হইয়াছে। এত অসুখ এবং বাড়ীর গোলমালেও নির্ম্মল বিশ্ববিদ্যালয়ের উত্তীর্ণ ছাত্রদের মধ্যে তৃতীয় স্থান অধিকার করিয়াছেন। কিন্তু নির্ম্মলের বুকের ব্যথা দিন দিনই অত্যন্ত বাড়িয়া উঠিতেছে। এখন নির্ম্মলচন্দ্র একরূপ শয্যাশায়ী। চিকিৎসকেরা বলিয়াছেন, দুর্ব্বলতা এবং মনের কষ্টই এ রোগের প্রধান কারণ। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত নির্ম্মলচন্দ্রের এই মনের নিদারুণ কষ্ট দিন দিনই গভীর হইতে গভীরতর হইয়া উঠিয়াছে। অনেক দিন হইতে নির্ম্মল মধু বা সরমার চিঠি পাইতেছেন না। তাঁহাদিগকে বারম্বার চিঠি লিখিয়াও, উত্তর পান না। পরীক্ষার পরে নির্ম্মলচন্দ্র বাড়ী যাইবেন মনে করিয়াছিলেন। কিন্তু পীড়া হঠাৎ অনেকটা বাড়িয়া উঠিয়াছে। জন্মাবধি নির্ম্মলচন্দ্রের শরীর দুর্ব্বল ও অসুস্থ। তাহার পরে দাদার ব্যবহারে নির্ম্মলের মন দিন রাত ব্যথিত থাকে। খরচপত্রের অভাবে বাসা খরচ ও বাড়ীভাড়ার টাকা অনেক বাকী পড়িয়াছে। নির্ম্মলচন্দ্র বৈকালে জলখাবার পর্য্যন্ত ছাড়িয়া দিয়াছেন। চিরদিন সুখের কোলে প্রতিপালিত হইয়া হঠাৎ এই সকল কষ্টে নির্ম্মলের শরীর একবারে ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। নির্ম্মল ভবানীর বিষয় সম্পত্তির অর্দ্ধেক অংশী। কিন্তু নির্ম্মলচন্দ্র বিষয় সম্পত্তি নিয়ে দাদার সঙ্গে ঝগড়া করিবেন, একথা একবারও স্বপ্নেও মনে স্থান দিতে পারেন নাই। নির্ম্মলচন্দ্র মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন, নিজে উপার্জ্জন করিয়া যাহা পাইবেন তদ্দারাই সামান্যভাবে জীবন কাটাইবেন। নির্ম্মলের বিবাহের জন্য অনেক দিন হইতে পীড়াপীড়ি হইতেছিল। নির্ম্মল শরীরের কাতরতা এবং পড়া শুনার বিঘ্নের কথা উল্লেখ করিয়া বিনয়ের সহিত বন্ধুদের দ্বারা নিজের অসম্মতি জানাইয়াছেন। নির্ম্মলের পীড়া অত্যন্ত

বাড়িয়া উঠিয়াছে। বাসার ছাত্রেরা অনেকে স্কুল কলেজ কামাই করিয়া, রাত্রি জাগিয়া, আপনাদের সহোদরের মত নির্ম্মলের সেবা শুশ্রূষা করিতেছেন। আহা! ছাত্রজীবনে বাঙ্গালীর প্রাণে যে সকল স্বর্গীয় ভাবের মুকুল অঙ্কুরিত হয়, সংসার মরুভূমির উত্তাপে তাহার একটীও ফোটে না কেন? অনেক সময় মনে হয়, ভারতের নরনারী শত শত বর্ষ এইরূপ ছাত্র ছাত্রী হইয়া থাকুক্, তবুও যেন সংসারের গরল পিয়ে আর মনুষ্যত্ব হারায় না!

বেলা দ্বিপ্রহরের সময়ে নির্ম্মলচন্দ্র আপনার প্রকোষ্ঠের বিছানায় শুইয়া আছেন। ঘরে একটী ছাত্র নীরবে বসিয়া পড়িতেছেন। নির্ম্মল কয়েক দিন থেকে একখানি চিঠি পাইবার আশা করিতেছিলেন। কিন্তু চিঠিখানি আসিতেছে না বলিয়া মনে একটু চিন্তা হইয়াছে। দ্বিপ্রহরের সময়ে যে ডাক আসে, তাহার চিঠি নিয়ে ডাক হরকরা বিলি করিতে বাহির হইয়াছে। সাড়ে বারটার সময় নির্ম্মলচন্দ্রদের বাসাবাড়ীর দরজায় আসিয়া কপাটের শিকল নাড়িয়া নাড়িয়া উচ্চৈঃস্বরে হাঁকিল—"চিঠি আছে গো—।" ডাকহরকরার সাড়া পাইয়াই, নির্ম্মলের ঘরে যে ছাত্রটী বসিয়া পড়িতেছিলেন, তিনি নীচে গিয়া তাড়াতাড়ি হরকরার হাত হইতে সমস্তগুলি চিঠি নিয়ে, নিজেদের বাসার চিঠিগুলি বাছিয়া বাছিয়া রাখিয়া অবশিষ্ঠগুলি ফেরত দিলেন। মোটের উপরে বাছিয়া বাসার তিন খানি চিঠি পাইলেন। তাহার মধ্যে একখানি নির্ম্মলচন্দ্রের। ছাত্র ঘরে ফিরিয়া আসিয়াই অপর চিঠি দুইখানি একখানি বইয়ের মধ্যে রাখিয়া, নির্ম্মলের চিঠিখানি নির্ম্মলের হাতে দিলেন। এখানি রেজেষ্টারি চিঠি। ডাকপিয়ন রসিদের জন্য নীচে দাঁড়াইয়াছিল। নির্ম্মল রসিদ দিয়া চিঠি খুলিলেন। নির্ম্মলচন্দ্র এই চিঠির জন্যই পথ চাহিয়াছিলেন। নির্ম্মলচন্দ্র আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া দেখিলেন, চিঠির মধ্যে এক হাজার টাকার একখানি পূর্ণ নোট আছে! নির্ম্মল নোটখানি খুলিয়া রাখিয়া চিঠি পড়িতে লাগিলেন। চিঠিতে লিখা হইয়াছে—

"স্নেহের নির্ম্মল,

আমি সীতানগরের কাছারিতে ছিলাম। দুই দিন হইল বাড়ী আসিয়াছি। পূর্ব্বেই তোমার চিঠি এখানে আসিয়াছিল। কাল প্রথম দিন, নানা গোলমালে কাটিয়া গিয়াছে। আজ প্রাতে ঘটনাক্রমে সর্ব্বপ্রথমেই তোমার চিঠিখানি খুলিয়া পড়িয়াছি। পড়িয়াই উত্তর দিতে সমর্থ হই নাই। কিছু অনুসন্ধান করিবার ছিল। অনুসন্ধানে যাহা জানিলাম, পরে তাহা যথাযথ-

রূপে খুলিয়া লিখিতেছি। তোমার বুকে অত্যন্ত ব্যথা হইয়াছে। মুখ দিয়া কাশির সঙ্গে তাজা রক্ত পড়ে। তাহার উপরে জ্বর ও পেটের অসুখও আছে। শরীর অত্যন্ত দুর্ব্বল। দিন রাত বিছানায়ই পড়িয়া থাক। তোমার ইত্যাদি প্রকার ভয়ানক পীড়ার খপর পাইয়া অবধি আমার প্রাণ বড় উচাটন ও ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছে। তোমার চিকিৎসা এবং শুশ্রূষার জন্য কিছু খরচ পাঠাইলাম। এ কথা অপর কাহাকেও জানান নিষ্প্রয়োজন। তাহাতে তোমার দাদা প্রভৃতি মনে ব্যথা পাইবেন। লিখিয়াছ "খোরাকি ও বাসা ভাড়ার টাকাও অনেক বাকী পড়িয়াছে।" দ্বিতীয় পত্রে বাকী টাকার একটা হিসাব পাঠাইবে। পীড়া বৃদ্ধির সম্ভাবনা হইলেই, আমাকে "টেলিগ্রাফ" করিবে। যেন অন্যথা না হয়।

যে সঙ্কটাপন্ন পীড়া তোমাকে আক্রমণ করিয়াছে, এ অবস্থায় দুশ্চিন্তা বা শোক দুঃখে হঠাৎ বিপদ ঘটিতে পারে। অথচ সত্যের অনুরোধে এবং কঠোর কর্ত্তব্যের প্ররোচনায় তোমাকে কতকগুলি বিষম দুঃখ ও শোকাবহ সংবাদ লিখিতে বাধ্য হইতেছি। উপরের দিকে চাহিয়া, সকল সহ্য করিতে চেষ্টা করিবে। ভাবিয়া কি করিবে? ভগবানের ইচ্ছা পূর্ণ হউক্। তাঁহার ইচ্ছাই পূর্ণ হইবে।

তোমার দাদা শেষে যে বিবাহ করিয়াছেন, তাহা নিয়ে এখনও সমাজে গোলমাল চলিতেছে। শুনিলাম, এই সামাজিক গোল নিবারণের জন্য এ পর্য্যন্ত প্রায় লক্ষাধিক টাকা ব্যয় হইয়াছে। কয়েক দিন হইল, এক দিন সকালবেলা হইতে সমস্ত দিন এবং রাত্রি দ্বিপ্রহর পর্য্যন্ত তোমাদের বাড়ীর মাঝের খণ্ড হইতে অন্দর মহলের সমস্ত দরজা বন্ধ ছিল। সেই দিনই গভীর রাত্রিতে এক সঙ্গে সরমা বৌমা এবং মধুমতীর মৃত দেহ মাঠের মধ্যে নদীতীরে নিয়ে পোড়ান হইয়াছে। চারিদিকে প্রচার, আকস্মিক সংক্রামক পীড়ায় মধু ও সরমা উভয়েরই একদিনে মৃত্যু হইয়াছে। কিন্তু এ ব্যাপার তুলসী গ্রামের থানা হইয়া মাজেষ্ট্রেটের কাণে পর্য্যন্ত পৌঁছিয়াছে। আন্দোলন ও তৎপরে পুলিসের এবং মাজেষ্ট্রেটের তদন্তও হইয়া গিয়াছে। অনেকে বলিতেছে, "এই ঘটনায় ভবানীশঙ্করের প্রায় দেড় লক্ষ টাকার গায়ে হাত পড়িবে।" স্থূল কথা, কতকগুলি টাকা ব্যয় ব্যতীত আর কিছুই হইবে না। কিন্তু তোমার দাদার সম্বন্ধে যতগুলি কথা এ চিঠিতে লিখিলাম, সমস্ত গুলিই পরের মুখে শুনা কথা মাত্র। পিতা ঠাকুরের

মৃত্যুর পর হইতে তোমার দাদা আর আমাদের বাড়ী আসেন না। আমার পরিবারের সকলকেও তোমাদের বাড়ী যাইতে পর্য্যন্ত নিষেধ করিয়া দেওয়া হইয়াছে। তোমাদের সঙ্গে আমার যে মধুর সম্বন্ধ, আমি তাহা কিছুতেই ভুলিতে পারি না। বোধ হয়, মানুষ হৃদয় থাকিতে ইহা ভুলিতে পারে না। এই জন্য তোমার দাদার অনিচ্ছা সত্ত্বেও আমি অনেকবার তাঁহার সঙ্গে দেখা করিয়াছি। অনেক দিন অনেকগুলি কথা বলিব বলিয়াও প্রস্তুত হইয়া গিয়াছি। কিন্তু একদিনও তাঁহাকে প্রকৃতিস্থ দেখিতে পাই নাই। অনেকে সময় সময় তাঁহার দুর্ব্ব্যবহার সম্বন্ধে অনেক কথা বলিয়া, আমাকে তাহার প্রতিবিধান করিতে অনুরোধ করেন। শুধু প্রতিহিংসা সাধনে আমার প্রবৃত্তি হয় না। প্রকৃত অন্যায় কাজের সঠীক কোন প্রমাণ না পাইলে, তাহার প্রতিবিধানের জন্য অন্যের কোন ক্ষতি করা শ্রেয় বোধ হয় না। কেহ আমাকে কোনই খাটি প্রমাণ দিতেছে না। এই জন্য আমি তোমার দাদার সম্বন্ধে সম্পূর্ণ নির্লিপ্ত রহিয়াছি। তথাপি শুনিতে পাই, ভবানী আমাকে ঘোর শত্রু মনে করেন। কোন মানুষের শত্রুতা বা মিত্রতা,মনুষ্যের কোন প্রকার লক্ষ্যের মধ্যেই গণ্য হইতে পারে না। ন্যায়ানুমোদিত এবং কর্ত্তব্য মনে করিয়া ভগবানের আজ্ঞা শিরোধার্য্য করাই মানুষের কার্য্য। তখন পৃথিবী বিরুদ্ধে দাঁড়াইলেও, ভীত হওয়া উচিত নয়। যাহা হউক্, বাড়ী আসিয়া শুনিলাম, কয়েক দিন হইল, বহু সমারোহে সরমা বৌমায়ের শ্রাদ্ধাদি হইয়া গিয়াছে। আর নূতন কিছু নাই। আজ অপরাহ্নে সরমা ও মধুর শ্মশান দেখিতে গিয়াছিলাম। দেখিলাম, সেই ধূ ধূ প্রান্তরসীমায়—নদীতীরে দুইটী চিতা যেন পাশাপাশি হইয়া ঘুমাইতেছে। উঃ! অনেক লিখিয়াছি! আর না।”

শুভাকাঙ্ক্ষী
শ্রীহরগোবিন্দ শর্ম্মা।

একাদশ পরিচ্ছেদ।

নিরাশার সম্বাদ।

আজ এক মাস হইল, সন্ন্যাসী পীড়িত শশাঙ্কশেখরকে নিয়ে তুলসীগ্রামে আসিয়া পৌঁছিয়াছেন। এই এক মাস আর পাষাণীর চোখে ঘুম নাই।

পাষাণী সময়ে আহার বা স্নান করিতে পায় না। দিন রাত দাদার রোগ-শয্যার পার্শ্বে বসিয়া শুশ্রূষা করিতেছে। পথে ক্রমান্বয়ে নৌকা ও গাড়ীর কষ্টে শশাঙ্কের পীড়া বাড়িয়াছে। হরগোবিন্দ রায়ের চেষ্টায় ও অর্থ ব্যয়ে চিকিৎসার জন্য কলিকাতা হইতে প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ চিকিৎসকদিগকে আনা হইয়াছে। চিকিৎসকেরা প্রথমে কিছু ভয় পাইয়াছিলেন। এখন রোগীর অবস্থা ভাল। কয়েকদিন যেন হরগোবিন্দ রায়ের পরিবারের উপর দিয়া, বর্ষাকালের মেঘ, অন্ধকার, শিলাবৃষ্টি, বান, ঝড় তুফান চলিয়া গিয়াছে। সে কয় দিন পাষাণী মুহূর্ত্তের জন্যও দাদাকে ছাড়িয়া অন্যত্র যায় নাই। কোন কোন দিন, দিন রাত্রির মধ্যেও জলবিন্দু খাইবার অবসর পায় নাই। পাষাণী দিন রাত চোখের জলে নিজে ভাসিয়া ভাসিয়া, দাদার প্রভাত কালের অস্তোন্মুখ-শারদ পূর্ণ-চাঁদের মত পাণ্ডুবর্ণ রুগ্ন মুখ খানিও অজস্র ধারায় ভাসাইতেছিল। সিদ্ধেশ্বরী বারম্বার সাধিয়াও পাষাণীর মুখে এক বিন্দু জল দিতে পারেন নাই। সিদ্ধেশ্বরীও দিন রাত আঁচলে মুছিয়া মুছিয়া চোক ফুলাইয়াছিলেন। গম্ভীর প্রকৃতি হরগোবিন্দের এবং সন্ন্যাসীর সাগর তুল্য গভীর হৃদয়ের উচ্ছ্বাস বাহিরে প্রকাশ না পাইলেও, সে কয়দিন ভিতরে ভিতরে ভয়ানক আলোড়িত হইতেছিল। সিদ্ধেশ্বরী সময়ে সময়ে কাঁদিয়া একেবারে আকুল হইতেছিলেন। শশাঙ্কশেখরকে পরিবারের সকলেই ভালবাসেন।

আজ কাল শশাঙ্কশেখরের অবস্থা খুব ভাল। গায়ের ক্ষত সকল নির্দ্দোষ-রূপে সারিয়া গিয়াছে। শরীরে সামান্য দুর্ব্বলতা ভিন্ন আর অন্য কোন গ্লানি নাই। শশাঙ্ক এখন মধ্যে মধ্যে বিছানার উপরে উঠিয়া বসিতে পারেন। কখনও কখনও উঠিয়া ধীরে ধীরে দুই চারি পা হাঁটিয়া বেড়ান। কিন্তু সামান্য পরিশ্রমে বা একটুকু মানসিক আন্দোলনেই মাথা ঘুরিয়া পড়ে। তবে এখন আর রোগীর পক্ষে কোন আশঙ্কার কারণ নাই। শশাঙ্কশেখরের আরোগ্য-লাভের সঙ্গে সঙ্গে পরিবারে যেন আবার বসন্ত ঋতু ফিরিয়া আসিয়াছে। আবার পাষাণীর সদানন্দ প্রাণে আনন্দের জ্যোৎস্না ফুটিয়াছে। আবার সেই প্রভাতের বাগানে বড় গোলাপ ফুলের মত সুন্দর মুখ খানিতে সদা সর্ব্বদাই এক মুখ মৃদু মধুর হাসি খেলিতেছে। নিত্য স্নানে আবার অধিকাংশ সময়েই সেই পিঠ ছাওয়া, কোমর ছাওয়া, আজঘনলম্বিত রুক্ষ রুক্ষ চুলের বোঝাটী সুপরিষ্কৃত হইয়া, পিঠময় ছড়াইয়া বাতাসের সঙ্গে ক্রীড়া করিতেছে। পাষাণী এখন আবার পূর্ব্বের মত ঘরের কাজে এবং পড়া শুনায়

ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছে। কেবল মধ্যে মধ্যে এক একবার আসিয়া দাদাকে দেখিয়া যায় এবং অবসর পাইলেই দাদার কাছে বসিয়া দুই এক দণ্ড কথা বার্ত্তা বলিয়া দাদাকে অন্যমনস্ক রাখে। হরগোবিন্দ বা সন্ন্যাসী প্রায় সর্ব্বদাই ঘরে থাকেন। কেহ কাছে না থাকিলেই, শশাঙ্ক শুইয়া শুইয়া নানা কথা ভাবেন এবং কি যেন ভাবিতে ভাবিতে অনেক সময় কাতর হইয়া পড়েন। এই জন্য পাষাণী শশাঙ্কের কাছে এখনও ঘন ঘন আসে। কিন্তু পূর্ণিমার জ্যোৎস্না রাশি যেমন রাত্রি শেষে বসন্তের আকাশে সুদিনের আগমন দেখিয়া, ধীরে ধীরে সরিয়া যায়, শশাঙ্কের পীড়া-উপশমের সঙ্গে সঙ্গে পাষাণীও যেন ধীরে ধীরে ক্রমে ক্রমে তেমনই দূরে দূরে সরিয়া পড়িতেছে। শশাঙ্কশেখর আজ অপরাহ্নে বিছানায় নিমীলিত নেত্রে শুইয়া শুইয়া কত কি ভাবিতেছিলেন। ভাবনার ঘোরে, কখনও শরার মত ধরাখানি যেন অনন্ত আনন্দময় ব্রহ্মাণ্ডে পরিণত হইয়া, সেই রুগ্ন, ক্লান্ত, আবিলতামাখা চক্ষুর নিকট কত কি আশার চিত্র আঁকিতেছিল। যুবক তখন ভাবিতেছিলেন, এ প্রেম মাখা, নবোৎসাহমাখা, আনন্দ মাখা, প্রাণের শান্তিভরা কার্য্যক্ষেত্র কেমন মধুর—কেমন মনোহর! এই মনোহর আনন্দময় ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যস্থলে, বসন্তের প্রভাত কালের প্রফুল্ল পুষ্পোদ্যানের মধ্যস্থিত স্বর্ণপ্রতিমা খানির মত দাঁড়াইয়া, আজ ও কে বাঁশী বাজাইয়া মধুর গান গাইতেছে? ও আড়ম্বর শূন্য নবীন সন্ন্যাসিনী কে? দিদি, তুমি? আহা! ঐ মধুর সঙ্গীতই যেন আমার এই বর্ত্তমান জীবনের লক্ষ্য পথ বর্ণনা করিতেছে। কত আশা, কত উৎসাহ, কত আনন্দ ভরা ও গান! দিদি তোমার পবিত্র স্নেহ ভালবাসার ছায়ায় চিরদিন থাকিয়া প্রাণের সাধ মিটাইয়া এ জগতে খাটিয়া বেড়াইব, এই বাসনা মনটাকে দিন রাত্তই যেন ব্যাকুল করিতেছে। কিন্তু এ আশা পূর্ণ হইবে কি? যুবক মনশ্চক্ষুতে স্বপ্নবৎ দেখিতেছিলেন, যেন "হঠাৎ একটা বাতাস আসিয়া, এক দিকে দিদিকে আর অন্য দিকে তাঁহাকে উড়াইয়া নিয়ে চলিল। অমনি অনন্ত বিশ্বে সেই আনন্দের বাজার ভাঙ্গিয়া গেল। নিবিড়, নিরাশার আঁধারে দশদিক্ তমসাচ্ছন্ন হইল। তখন আর কিছুই দেখা গেল না!" এবার চিন্তা করিতে করিতে রুগ্ন শশাঙ্কশেখরের বুকে ঝড় বহিতেছিল, চোখে জল আসিতেছিল, এমন সময় কোথাথেকে যেন হাসিতে হাসিতে আসিয়া, শিওরে বসিয়া, পাষাণী ধীরে ধীরে ডাকিল—"দাদা, দাদা কি ভাবিতেছ? একটুকু একা থাকিলেই শু'য়ে

শু'য়ে কেবল কি ভাব? ছি! এতে যে তোমার পীড়ার পক্ষে ভারিক্ষতি হয়। এস, গল্প করি। ও ছাই মাটি কিছু ভাবিও না। এখন কেমন আছ দাদা? ভাল বোধ হইতেছে না? মুখ খানি এমন বিষণ্ণ কেন? কি ভাব?"

শশাঙ্ক।—"দিদি তোমাদের কাছ ছাড়িয়া এবার আর যেন যাইতে ইচ্ছা হইতেছে না।"

পাষাণী।—"যাবে কেন দাদা? থাকনা? আমি ত ভাবিতেছি, তুমি এখন বরাবরই আমাদের কাছে থাকিবে। তবে এ কথা বলিতেছ কেন?"

শশাঙ্ক।—"সন্ন্যাসী,আমাদের এখান হইতে যাইবার বন্দোবস্ত করিয়াছেন। আমি এখানে আত্মগোপন করিয়া আছি। এ ভাবে আর কত দিন থাকিব?"

কথাটা শুনিয়া পাষাণীর হাসি ভরা চাঁদ মুখ খানির উপরে হঠাৎ যেন এক খণ্ড মেঘ ঢাকা পড়িল। মুখের ভাবান্তর হইল। পাষাণী অন্যমনস্ক হইয়া বলিল—"কেন দাদা?"

শশাঙ্ক।—"তুমি কি কিছুই শোন নাই?"

পাষাণী।—"সে দিন ঠাকুরদাদা মহাশয়তে আর সন্ন্যাসীতে এই ঘরে বসিয়াই কি যেন কথা বার্ত্তা হইতেছিল। আমি যেন তাড়াতাড়ি কি একটা কাজে চলিয়া গেলাম। কথাটায় ভাল মনোযোগ দেই নাই। তবে বিলাস-পুরের দুর্ঘটনার কথা ত সবই শুনিয়াছি। নূতন কিছু শুনিয়াছ?"

শশাঙ্ক।—"বাবার কোন খোঁজ খপর পাওয়া যাইতেছে না। ইংরাজ-দের সঙ্গে পাহাড়ীদের মিটমাট হইয়া গিয়াছে। গোলমালের সময়েই একদিন রাত্রি শেষে বাবার তাঁবু খালি দেখিয়া সকলে চমকিয়া উঠিল। তাঁবুর পাহারায় যাহারা ছিল,তাহারা বলিল—"মহারাজ গভীর রাত্রিতে মধ্যে মধ্যে ছদ্মবেশে বাহির হইয়া চারিদিক্ পরীক্ষা করিয়া বেড়াইতেন। কালও তাঁবুর বাহিরে গিয়াছিলেন। কিন্তু আর ফিরিয়া আসিতে দেখি নাই।"

শশাঙ্কের কথা শুনিয়া পাষাণীর মুখ আরও শুকাইয়া গেল, পাষাণী বিস্ময়বিস্ফারিত ভাবে বলিল—"সে কি গা! কোথায় গেলেন?"

কথা বলিতে বলিতে শশাঙ্কশেখরের দুইটী চোক জলে ভরিয়া উঠিতে-ছিল। শশাঙ্ক পাষাণীর অদৃশ্যে কাপড়ে চোক মুছিয়া বলিলেন—"বোধ হয় পাহাড়ীদের হাতে তাঁহার অপমৃত্যু হইয়াছে। তবে সেই দিনই বিলাসপুরের সমস্ত দুর্ঘটনার খপরও তাঁহার নিকটে পৌঁছিয়াছিল। আমি যে বাঁচিয়া আছি,এ খপর তিনি পান নাই। সন্ন্যাসী, পরে গোপনে গোপনে এক

জন লোক পাঠাইয়া ছিলেন।" সে লোক গিয়া আর তাঁহার দেখা পায় নাই। বিলাসপুরের দুর্ঘটনার সম্বাদের সঙ্গে সঙ্গে তিনি, ইহাও জানিতে পারিয়াছিলেন যে, চক্রী ইংরেজরা, বিলাসপুর আপনাদের রাজ্যভুক্ত করিয়া, হয়ত তাঁহাকে বন্দীভাবে সাক্ষীগোপাল করিয়া রাখিবেন। এই সকল কারণে অনেকে অনুমান করেন, মহারাজ পালাইয়াছেন। কাপ্তেন হেন্‌রি বিলাসপুরের সীমান্ত পাহাড়ের যুদ্ধ-বিবরণে লিখিয়াছেন, "বিলাসপুরের মহারাজ,বিদ্রোহী পাহাড়ীদের সঙ্গে যোগ দিয়া ছদ্মবেশে লুকাইয়া আছেন।" বস্তুত এটা সম্পূর্ণ মিথ্যা চক্রান্ত বলিয়াই বোধ হইতেছে। গবর্ণমেণ্ট এই মিথ্যা সূত্রে ছলের উপরে ছল পাইয়াছেন। সংপ্রতি কলিকাতা গেজেটে গবর্ণমেণ্টের আদেশ বাহির হইয়াছে। তাহাতে লিখা হইয়াছে—"বিলাসপুরের মহারাজ রাজ্যশাসনে অনুপযুক্ত এবং তিনি বিদ্রোহী পাহাড়ীদের সঙ্গে যোগ দিয়াছেন বলিয়া সন্দেহ হয়। এই কারণে এখন হইতে দেশীয় স্বাধীন রাজার অধীনস্থ বিলাসপুর রাজ্য সম্পূর্ণরূপে ইংরেজ গবর্ণমেণ্টের রাজ্যভুক্ত করা হইল। পলাতক রাজা ধৃত হইলে, বিদ্রোহী বলিয়া তাঁহাকে বন্দী করা হইবে। তাঁহার ঘনিষ্ট উত্তরাধিকারীদের প্রতি কিরূপ ব্যবহার করিবেন, গবর্ণমেণ্ট তাহা এখনও ঠিক করেন নাই। সম্ভবত তাঁহাদিগকেও পাইলে বন্দী করা উচিত বোধ করিবেন। বিলাসপুর রাজ্যের ভার আর কোন দেশীয় রাজার হাতে দেওয়া হইবে না।" ইত্যাদি ইত্যাদি।

পাষাণী।—"বিলাসপুর এখন তবে ইংরেজ রাজ্য ভুক্ত হইয়াছে?"

শশাঙ্ক।—"কাপ্তান হেন্‌রি একবারে কর্ণেল হেন্‌রি হইয়াছেন। বিলাসপুর রাজ্যটীকে অনিয়মিত শাসনাধীন প্রদেশের মধ্যে গণ্য করিয়া কয়েকটী ক্ষুদ্র জেলায় বিভক্ত করা হইবে। প্রত্যেক জেলায় এক একজন সৈনিক বিভাগের লোক, ডেপুটি কমিসনার থাকিবেন। সর্ব্বোপরি কর্ণেল হেন্‌রির পদ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। ইনি বিলাসপুর বিভাগের কমিসনার হইবেন। সম্প্রতি গভর্ণমেণ্ট ইঁহার হাতেই এই সমস্ত বন্দোবস্তের ভার দিয়াছেন। হেন্‌রি সাহেব বিলাসপুরে গিয়াই নন্দনগিরি ও অর্জ্জুন সিংহের দলকে বিদ্রোহী মনে করিয়া,অনেক অনুসন্ধান এবং চেষ্টার পরে ধরিয়া আনিয়া ফাঁসী দিয়াছেন। ইংরেজসিংহের আগমনে সমস্ত প্রজারা শান্ত ভাব অবলম্বন করিয়াছে।"

পাষাণী।—"সে দিন এক খানি ইংরেজি পত্রিকায় আমি এ সমস্ত কথাই কিছু কিছু পড়িয়াছি। দাদা, ইংরেজ গভর্ণমেণ্টের অনেক দোষ থাকিলেও,

আমি এই গভর্ণমেণ্টকে বড় শ্রদ্ধা করি। ভারতবর্ষীয় ইংরেজ গভর্ণমেণ্টের এবং বিলাতস্থ মহাসভার অধিকাংশ উদ্দেশ্যই অতি উদার এবং মহৎ। তবে জান কি, কর্ম্মচারীদের দোষে ও পক্ষপাতিতায় ইংরেজের নির্ম্মল চরিত্রে নানা কলঙ্কের দাগ পড়িতেছে। জেলায় জেলায় যে সকল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শাসন কর্ত্তারা নিযুক্ত হন, ইহাঁদের অধিকাংশই, পদের অনুপযুক্ত, ধর্ম্মাধর্ম্ম জ্ঞান-শূন্য, সুশিক্ষা বিহীন এবং বিলাতের এক রূপ নিম্নশ্রেণীর লোক। এদেশে, ইংরেজকুলভূষণ, পৃথিবীর গৌরব স্বরূপ দেব ইংরেজদের মধ্যে প্রায় কচিৎ দুই এক জনও আসেন কিনা সন্দেহ। আবার অনিয়মিত শাসনাধীন প্রদেশে সৈন্য বিভাগের অতি অশিক্ষিত লোকদিগের হাতে প্রধান প্রধান ভার পর্য্যন্ত অর্পিত হয়। তাহাতে বড়ই অপকার হইতেছে। শুনিলাম, হেন্‌রি সাহেব নাকি অবিবাহিত। তাঁহার চরিত্রে অনেক দোষ আছে। বাহিরের কোন অত্যাচার না থাকিলেও, তাঁহার এবং তাঁহার সঙ্গের সৈন্যদিগের অত্যাচারে লোকের বড় কষ্ট হইতেছে। সে যা-হোক্‌, তোমার বিমাতা ঠাকুরুণ্‌ এখন কোথায় আছেন?”

শশাঙ্ক।—“এই পর্য্যন্ত জানিয়াছি, তিনি ধরা পড়েন নাই। কিন্তু কোথায় আছেন, কিছুই জানিনা।”

শশাঙ্কশেখর কথা শেষ করিয়া পাষাণীর মুখের দিকে চাহিবামাত্রই দেখিলেন, পাষাণীর দুই চোক হইতে দুইটী জলের ধারা বহিয়া প্রভাতের ফুটন্ত গোলাপ ফুলের মত দুটী গণ্ড ভাসাইতেছে, আর পাষাণী, দুইটী পদ্মপলাশায়ত লোচন উৰ্দ্ধে স্থাপিত করিয়া, গম্ভীর ভাবে কি যেন ভাবিতেছে। শশাঙ্কশেখর হঠাৎ এই দৃশ্য দেখিয়া, চমকিয়া, শিহরিয়া সেই রুগ্ন শয্যার উপরে কাঁপিতে কাঁপিতে উঠিয়া বসিলেন। তখন যুবকের তরল হৃদয়ের আবেগ যেন আর থামিল না। সে হৃদয়ের উচ্ছ্বাস যেন সাগরের বানের মত হু হু করিয়া ফুলিয়া উঠিল। শশাঙ্ক জল ভরা চোখে তাড়াতাড়ি নিজ হাতে পাষাণীর হাত ধরিয়া গদ গদ ভাবে বলিলেন—“দিদি, দিদি, কাঁদ কেন?” দিদীর মুখে তথাপি কথা ফুটিল না। শশাঙ্কশেখর তখন ধীরে ধীরে দিদীর হাত ছাড়িয়া কোচার খোঁটে মুখ ঢাকিয়া নিজেও নীরবে দুই চোখের জলে বুক ভাসাইতে লাগিলেন। কান্নার শব্দ অতি যত্নেও চাপিয়া রাখিতে পারিলেন না। সে শব্দে সহসা পাষাণীর চমক ভাঙ্গিল। পাষাণী শশাঙ্ককে কাঁদিতে দেখিয়া,

তাড়াতাড়ি চোক মুছিয়া, শশাঙ্কের হাত ধরিয়া বলপূর্ব্বক তাঁহার চোখের ঢাকা খুলিয়া বলিল—"ছি, দাদা, তুমি কেঁ'দ না। তোমার অসুখ বাড়িবে।" বলিতে বলিতে আঁচল তুলিয়া পাষাণী দাদার চোক মুছিতে লাগিল। তখন কিঞ্চিৎদূরোপবিষ্ট পঠননিরতচিত্ত সন্ন্যাসী মুখ তুলিয়া পাষাণীকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন—"কি হইয়াছে মা ?"

পাষাণী।—"দেখুন, দাদা ছেলে মানুষের মত কাঁদিতে বসিয়াছেন।"

পাষাণীর কথা শুনিয়া এত কষ্টের সময়েও শশাঙ্ক না হাসিয়া থাকিতে পারিলেন না। শশাঙ্ক ঈষৎ হাসিতে হাসিতে বলিলেন—"উনি এই একটুকু আগে ঠিক বুড়া মানুষের মত কাঁদিতেছিলেন।"

পাষাণী।—"তোমার সত্যি সত্যিই যাওয়া হইবে ভাবিয়া আমার কান্না পাইতেছিল। তাই হঠাৎ কাঁদিয়াছি।"

সন্ন্যাসী একটুকু মুখ আঁধার করিয়া গম্ভীর ভাবে বলিলেন—"এই কতক্ষণ হইল, যাইবার সব ঠিক করিয়া আসিয়াছি। কাল সকালেই যাত্রা করিতে হইবে। এখান থেকে রেলে গিয়া, পথে নৌকা করিব।"

সন্ন্যাসীর কথা শেষ হইলে, পাষাণী আর এক মুহূর্ত্তও না বসিয়া চলিয়া গেল। সন্ন্যাসী দেখিলেন, পাষাণীর চোখে আবার ধারা বহিয়া জল আসিয়াছে। শশাঙ্কেরও রুগ্ন মুখশ্রী পুনরায় গাঢ় চিন্তার মেঘে ঢাকা পড়িল। সন্ন্যাসী আরও গম্ভীর হইলেন।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ।

নৈশপ্রান্তর।

শুক্ল পক্ষের সপ্তমী কি অষ্টমীর চাঁদ সন্ধ্যার প্রাক্কালেই আকাশে জ্যোৎস্না ছড়াইয়া নীরবে হাসিতেছে। সুদূর-গ্রামরেখাঙ্কিত বিস্তীর্ণ মাঠের বুকে বসন্তের বাতাস ফুর ফুর করিয়া বহিতেছে। মাঠের একখানি জমিতেও কৃষকের লাঙ্গলের দাগ বা শস্যের গাছ নাই। কেবল চারিদিকে ছোট ছোট দূর্ব্বা ও ঘাসে মোড়ান "কারপেটের" বিছানার মত সুবিস্তৃত সবুজ প্রান্তর ধূ ধূ করিতেছে। প্রান্তরের উপরে স্থানে স্থানে দুই চারটী ছায়াপ্রদ গাছ চাঁদের আলোতে নাহিয়া ধীরে ধীরে ডাল পাতা নাড়িয়া

নাড়িয়া যেন বাতাসের সঙ্গে খেলা করিতেছে। বসন্ত ঋতু বলিয়া, অনেক গাছেই নূতন পাতার মাঝে মাঝে থোকা থোকা ফুল ফুটিয়া হেলিতে দুলিতেছে। থাকিয়া থাকিয়া এক এক বার ফুলের গন্ধে যেন প্রাণ আমোদিত হইয়া উঠিতেছে। একটা ফুলভরা গাছের পাতার ঝোপে লুকাইয়া একটা কোকিল অবিরল ধারায় কুহু—কুহু—রবে ডাকিতেছে। একটী সুন্দরী স্ত্রীলোক, এই নিশামুখে সেই গাছটীরই কাছে একাকী দাঁড়াইয়া উৎকণ্ঠিত চিত্তে কাহার জন্য যেন অপেক্ষা করিতেছিল।

সুন্দরীর সম্মুখে অল্প দূরেই সিপাহীদিগের শত শত শাদা ধব্‌ধবে ছোট ছোট তাঁবুর ঠিক মধ্যস্থলে কর্ণেল হেন্‌রির শুভ্রবর্ণ প্রকাণ্ড তাঁবু জ্যোৎস্নার আলোতে হাসিতেছে : যেন জ্যোৎস্নার সাগরে শাবকশ্রেণী-বেষ্টিত একটী অপূর্ব্ব দৃশ্য রাজ-হংস স্থিরভাবে ভাসিতেছে। সুন্দরীর চক্ষু দুইটী যেন সেই তাঁবু হইতে আগত একগাছি ক্ষুদ্র পথের রেখার উপরেই পলকশূন্য হইয়া পড়িয়া আছে। এ সুন্দরী কে? সুন্দরী, ছদ্মবেশধারী কুন্তী!

সর্ব্বনাশি, আজ আবার এ তোর কোন্ সাজ? এ কিসের সাজ? কুন্তীর পরিধানে হীরাকুচি ও মুক্তার কাজ করা সোণার ফুলদার একখানি বেগুনীরঙের বহু মূল্য বস্ত্র, চাঁদের আলোর সঙ্গে চিক্ চিক্ করিতেছে। গায়ে হীরা ও মুক্তা-খচিত অপূর্ব্ব স্বর্ণালঙ্কার রাশি ঝল মল করিতেছে। পায়ে হীরার কাজকরা সোণার জলতরঙ্গ মল, কদাচিৎ ধীরপদ-সঞ্চালনবশত রুণু রুণু শব্দে দশদিক্ আমোদিত করিতেছে। মাথায়ও প্রকাণ্ড কবরীর উপরে সোণার ফুল, হীরার ফুল, তাহার সঙ্গে বসন্তের বাগানের রাশি রাশি সুগন্ধি বেল, গোলাপ, চামেলী ও যুঁই ফুল সুবিন্যস্ত হইয়াছে। সর্ব্বাঙ্গ বহুমূল্য আতর ও গোলাপজলে অবগাহিত হইয়াছে। মৃগনাভিপ্রভৃতি মিশ্রিত সুগন্ধি তাম্বুলরাগে অধরোষ্ঠ সুরঞ্জিত হইয়াছে। তাহার সঙ্গে বর্ষাকালের জ্যোৎস্না-উদ্ভাসিত নদীর শোভার মত স্বর্ণচম্পকরাশিতুল্য অঙ্গলাবণ্য ও চাঁদমুখের জ্যোতি মিশিয়া এক অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্যের জগৎ সংরচিত হইয়াছে। সৌন্দর্য্যের? না নরকের জগৎ রচিত হইয়াছে?

কিন্তু কুন্তী আজ এই সামান্য সাজ সজ্জার গর্ব্বেই গৌরবিনী নয়। কুন্তীর বক্ষঃস্থলের কাপড়ের নীচে ও তীক্ষ্ণধার ছুরীকাখানি কি জন্য লুকায়িত রহিয়াছে? ও বহুমূল্য সুগন্ধি ক্ষুদ্র রুমালখানির এক খোঁটে, ও বিষম মোহপ্রদ বিষের গুঁড়াগুলি কিসের জন্য এত যত্নে রক্ষিত হইয়াছে?

এই ছুরী দ্বারা কি কুন্তী আজ পিতৃহন্তার কলিজা বিদীর্ণ করিবে? ঐ বিষাক্ত গুঁড়া কি তাহারই সুরাপাত্রে মিশ্রিত করিবে? এ ভবিষ্যতের কথা কে বলিবে? কিন্তু কুন্তী আজ বাহিরের চাকচিক্যময় সাজের নিম্নে এই সাজে সাজিয়াই নিজকে কৃতার্থ ও গৌরবান্বিত মনে করিতেছে। "প্রতিহিংসা, প্রতিহিংসা, প্রতিহিংসা সার!" ও সর্ব্বনাশি, আজ আবার মনে মনে প্রাণের ভিতরে ভিতরে এ কি মন্ত্র জপিতেছিস্? তোর কি বুকের ভিতরে এ পিপাসা অনন্ত স্রোতে বহিতেছে? নারী চরিত্রের—মানব-চরিত্রের কলঙ্কিত পৃষ্ঠ আঁকিবার জন্যই কি কেবল বিধাতার জগতে তোর সৃষ্টির প্রয়োজন হইয়াছে?

কুন্তী অনেকক্ষণ দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া শেষে গুন্ গুন্ স্বরে একটী গান ধরিল। যেন বীণা, মুরলী, সেতার, বেহালা, তান্‌পুর একসঙ্গে সমতানে সুমধুর ঝঙ্কারে জাগিয়া উঠিল। যেন স্তব্ধতার মধ্যে অমৃতময় সুখ স্বপ্নের ধারা বর্ষিতে লাগিল। কুন্তীর কণ্ঠস্বর অতি অপূর্ব্ব। কুন্তী গায়িকা-জগতের রত্ন। কুন্তী গুন্ গুন্ স্বরে গাইতে লাগিল—

"এস মা, এস মা, ভীমে, ভৈরব-মোহিনি।
দেহি মা, দেহি মা, শক্তিং দেহি গো জননি।
চামুণ্ড-নাশিনী তুমি, ওগো ভয়ঙ্করি,
অসুরে নাশ গো আজি সমরে হুঙ্কারি।
হৃদয়ে শকতি তুমি, মুখে মাগো বাণী,
তোমারি দাসীকে সিদ্ধিং দেহি গো ভবানি।"

কুন্তীর গান শেষ হইতে না হইতেই, একজন দীর্ঘাকৃতি পুরুষ সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইয়া বলিল—"বাইজি বন্দিগির।"

কুন্তী গান করিতে করিতে একটুকু অন্যমনস্ক হইয়া পড়িয়াছিল। হঠাৎ সম্মুখে পুরুষের কথা শুনিয়া, চমকিয়া উঠিল। কিন্তু চাহিতেই দেখিল, যাহার জন্য এই রাত্রিকালে একাকী শূন্য মাঠের মধ্যে দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া অপেক্ষা করিতেছিল, সম্মুখে সেই ব্যক্তিই উপস্থিত। এ পুরুষ মুসলমান জাতীয়। পুরুষের নাম রহমতুল্লা সিপাহী। রহমতুল্লার বাড়ী উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে হইলেও অনেকদিন হইতে বাঙ্গালা দেশে থাকিয়া থাকিয়া কিছু কিছু বাঙ্গালা কথা শিখিয়াছে। কুন্তী রহমতুল্লাকে সংক্ষেপে সিপাহীজি বলিয়াই ডাকে। সিপাহীজির সম্ভাষণে কুন্তীর আপাদ মস্তক জ্বলিয়া উঠিল। মনে মনে

বলিল—"দূর হ—,বেটার ছেলে। বাইজি তোর মা,বাইজি তোর পিসী, মাসী, বোন। বাইজি তোর চৌদ্দ পুরুষের মা, বোন। আমি তোর মা।" প্রকাশ্যে বলিল—"সিপাহীজি এত দেরি হো'ল কেন?"

কুন্তীর গায়ের গয়নাগুলি দেখিয়া রহমতের লোভ সম্বরণ করা কঠিন হইতেছিল। রহমত্ এক এক বার ভাবিতেছিল—"এ স্ত্রীলোক বইত নয়। এর গয়নাগুলি কাড়িয়া নিয়ে একে তাড়াইয়া দিলেই বা এ কি করিবে? গোল করে ত তখনই গলা টিপিয়া ধরিব।" ইত্যাদি ইত্যাদি।

কুন্তী আড়চোখে আড়চোখে রহমতের ভিতরের সকল খপরই সংগ্রহ করিতেছিল। সিপাহীজিকে কথার উত্তর না দিয়া, অন্যমনে ভাবিতে দেখিয়া, কুন্তী মুহূর্তে তাহার সমস্ত দুষ্টাভিসন্ধি বুঝিয়া নিল। বুঝিয়া, মনে মনে হাসিয়া হাসিয়া বালতে লাগিল—"তবেরে বেটার ছেলে—, তোর এত আস্পর্দ্ধা? একটুকু বেশ কম করিস্ ত আজ এই ছুরী তোর সাহেবের বদলে তোরই বুকে মারিব। তুই কি মনে কো'রেছিস্ এ ছেলের হাতের মোয়া, কে'ড়ে নিলেই হো'ল? খপরদার—!" কিন্তু প্রকাশ্যে একটুকু কৃত্রিম বিরক্তি প্রকাশ করিয়া বলিল—"সিপাহীজি তুমি কি ভা'ব্‌ছ? তোমার সাহেব কি আমায় নিতে বলে নাই? তবে আমি চো'ল্লেম্।" এই বলিয়া কুন্তী সত্য সত্যই বেগে ছুটিয়া চলিল।

এদিকে সাহেবের নাম উচ্চারিত হইবা মাত্রই, রহমতের সকল চমক ভাঙ্গিয়া গেল। রহমত্ এইমাত্র সাহেবকে বলিয়া আসিয়াছে,—"হুজুর, বাইজি ময়দান্‌মে খাড়া হ্যায়। হুকুম হোনেসে আভি লে আউঙ্গে।" একথার উত্তরে সাহেব বলিয়াছেন,—"বুড়্‌বক্ এত্তা দেরি কাহে হুয়া? আভি যাও—। জল্‌দি লে আও—।" এখন বাইজিকে সত্য সত্যই বেগে চলিয়া যাইতে দেখিয়া, রহমত্ বিষম ফাঁপরে পড়িল। এবার তাড়াতাড়ি দৌড়াইয়া বাইজির কাছে গিয়া বলিল—"বাইজি সাহেব, মাপ কিজিয়ে। হামি একটা কথা ভা'ব্‌ছিল। তা গোসা হো'য়েছেন কেন?"

কুন্তী।—"যা, আমি বাইজি না। আমায় আর বাইজি,বাইজি বলিস্ না।"

রহমত্,—বাইজিকে গরম দেখিয়া আরও ফাঁপরে পড়িল। তাড়াতাড়ি বলিল—"ইয়ে তোবা! ইয়ে তোবা! হামার দেশে বাইজি বড় ভালা বাত্। হাপ্‌নাকে কি বো'ল্‌ব তবে?"

কুন্তী।—"মা জি।"

রহমত্ বাইজির রকম সকম দেখিয়া, শেষটা নিতান্ত অনিচ্ছাসত্ত্বেও মনে মনে তাহাতেই সম্মত হইয়া বলিল—"মাজি ফের, সাহেব তোমাকে নিতে হুকুম কো'রেছেন। জল্দি জল্দি হাপনাকে না নিলে হামি লোকের জরিমানা হোবে, বেত হোবে। সাহেব হামাকে আভি বেত মার্‌বে।"

কুন্তী এবার রহমতের এইরূপ কাতরতা দেখিয়া, কৃত্রিম ক্রোধ পরিত্যাগ করিয়া, ফিরিয়া দাঁড়াইয়া পূর্ব্বের মতই কর্কশ স্বরে বলিল—"চল্, চল্, যাই। পথে আর দেরি করিলে কিন্তু আমি যাব না। আগে আগে তাড়াতাড়ি হাঁট্।" অতঃপর কুন্তী আর রহমত্ এই অর্দ্ধ প্রহর রাত্রির সময়ে সেই নির্জ্জন মাঠ পার হইয়া উভয়ে নীরবে দ্রুতপদসঞ্চারে হেন্‌রি সাহেবের তাঁবুর দিকেই হাঁটিতে লাগিল। পথে আর কোথায়ও দেরি হইল না।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ।

হেন্‌রি সাহেবের তাঁবু।

রাত্রি গভীর। দেড় প্রহর রাত্রির পরেই জ্যোৎস্না শেষ হইয়াছে। এখন নক্ষত্র খচিত আকাশের নীচে শুধু আঁধার ঘুট ঘুট করিতেছে। চারিদিক্ নিস্তব্ধ। মাঝে মাঝে কেবল প্রহরীদের দুই একটী সাড়া শব্দ বা দূরে গ্রাম্য কুকুরের খেউ—খেউ—রব শুনা যাইতেছে। এমন সময়ে তাঁবুর মধ্যে এক জন স্ত্রীলোক চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া কাঁদিয়া বলিতে লাগিল—"এখানে কে আছ রে—। শীঘ্র এস রে—। একটা লোক সাহেবকে কাটিয়া চলিয়া গেল। তোমরা এস রে—। নৈলে আমাকেও কাটিবে—। এস রে—। তোমরা এস—। শীঘ্র এস রে—। ঐ যায়—। ঐ যায় রে—। রহমত্, রহমত্ সিপাহী সাহেবকে কেটেছে—।"

কুন্তী, সাহেবের তাঁবুতে আসিয়া সর্ব্বপ্রথমেই দেখিল, বিলাসপুর বিভাগের প্রধান কমিসনার কর্ণেল হেন্‌রি সাহেব, সুপরিস্কৃত আলোর সম্মুখে টেবিলের উপরে একটী মদের বোতল আর একটী সুন্দর ছোট কাঁচের গ্লাস রাখিয়া নিজমূর্ত্তিতে এক খানি বেত্রাসনে বসিয়া, শীশ্ দিয়া দিয়া ইংরেজি সুরে কি যেন একটী ইংরেজি গান গাইতেছেন। চতুরা কুন্তী অনুম্যানেই বুঝিল, সম্ভবত এটা একটী প্রণয়-সঙ্গীত গীত হইতেছে। সাহেব শীশ্ দিতে দিতে এক এক

বার সম্মুখের বোতল হইতে একটুকু একটুকু মদিরা ঢালিয়া ঢালিয়া খাইতেছেন। সাহেবের সম্মুখস্থ টেবিলখানির উপরে একখানি সুচিত্রিত মূল্যবান্ আস্তরণ সুশোভিত। তদুপরি একদিকে কয়েক খানি সুন্দর সুন্দর গ্রন্থ শোভা পাইতেছে। তাহার সম্মুখে ক্রমান্বয়ে মুঙ্গের অঞ্চলের তৈয়ারি আবলুস্কাষ্ঠের সুন্দর দোয়াতদানের উপরে "ব্লুব্ল্যাক্" ও লাল রঙ্গের কালি ভরা দুইটী দোয়াত, তৎপশ্চাৎ দিকে কলম রাখিবার স্থানে কয়েকটী ভাল ভাল পেনের কলম এবং দোয়াতদানের সম্মুখে "বুটিং" কাগজের এক খানি খাতা সাজান রহিয়াছে। মধ্যস্থলে "ল্যাম্প্" নামক সুপরিস্কৃত কাচ-নির্ম্মিত প্রকাণ্ড দীপাধারে সেই পরিষ্কার আলো জ্বলিয়া তাঁবুর অভ্যন্তর ভাগ আলোকিত করিতেছে। আলোর প্রতিফলনে বোতল মধ্যে সুরা জ্বলিতেছে। আলোর সম্মুখে এবং সাহেবেরও সম্মুখে একটী সুন্দর পুষ্পাধারে পত্র পুষ্প নির্ম্মিত পুষ্পগুচ্ছ সুগন্ধ ও শোভা বিস্তার করিয়া চারিদিক্ আমোদিত করিতেছে। যদিও বসন্তের সুমধুর দক্ষিণহিল্লোলে তাঁবুর গর্ভপ্লাবিত হইতেছিল, তথাপি সাহেবের মাথার উপরে এক খানি টানা পাখা অনবরতই সজোরে হেলিতে দুলিতেছে। হেন্‌রি সুশ্রী ও বলবান্ যুবক। যুবক সাহেব সুপরিস্কৃত সাহেবি সাজে সুসজ্জিত হইয়া,স্বর্গচ্যুত শাপভ্রষ্ট দেবপুত্রের মত পা দোলাইয়া দোলাইয়া শীশ্ দিতে দিতে ইংরেজি প্রণয়-গীতি গাইতেছেন। কুন্তী সঙ্গীতের পারিশ্রমিক স্বরূপ মনে মনে সাহেবকে কয়েকবার "বাঁদর—, ও বাঁদর—, কলা খাবে?—পক্ক রম্ভা।" ইত্যাদি সুমধুর সম্বোধন উপহার দিয়া, প্রকাশ্যে কেবল সাহেবের কাছে গিয়া, একটী সেলাম করিয়াই, অবাক্ হইয়া এক পার্শ্বে দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া তাঁবুর শোভা দেখিতে লাগিল। সঙ্গে রহমতুল্লা চোরের মত এক দিকে দাঁড়াইয়া অপেক্ষা করিতেছিল। রহমতের "ঙ"র মত পাগ্‌ড়ি যুক্ত ইজার চাপকান আঁটা সুদীর্ঘ বপু সাহেবের চক্ষুর গোচরীভূত হইবা মাত্রই,সাহেব বলিলেন—"যাও, টুমূকো সুট্টি মিলা।" সাহেবের কথা শেষ হইতে না হইতেই রহমত্ আপনার ভ্রমর কৃষ্ণবর্ণ, গোড়া কামান চাঁপদাড়ীর জঙ্গলটী প্রায় ভূমিসংলগ্ন করিয়া, সাহেবকে একটী সুদীর্ঘ সেলাম ঠুকিয়াই প্রস্থান করিল। তাঁবুতে তখন কুন্তী আর সাহেব রহিলেন। সাহেব "পাইপে" ধূমপান করিতেছিলেন।

হেন্‌রিও অনেক দিন বাঙ্গালা দেশে থাকিয়া কিছু কিছু বাঙ্গালা কথা শিখিয়াছেন। অন্তত তাঁহার বিশ্বাস এইরূপ। রহমতের গমনের পরে সাহেব,

কুন্তীর দিকে তাকাইয়া বলিলেন—"বাইজি, বৈঠ না?" এই বলিয়া সাহেব কুন্তীকে এক খানি আসন দেখাইয়া দিলেন।

কুন্তী এতক্ষণ দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া কেবল ভাবিতেছিল, "এ গোলামের বেটা বাঁদরকে সর্ব্ব প্রথমেই মদের সঙ্গে এই রুমালের গুঁড়া টুকু খাওয়াইয়া অজ্ঞান করিয়া নিতে হইবে। এ অসুরকে হতচৈতন্য করাও ত কম কথা নয়। তা মা ছিন্নমস্তা আজ এমন মহিষাসুরের কলিজার রক্ত না খাইয়া ছাড়িবেন না। তাঁর দয়ায় হয় ত কাজ সিদ্ধি হইবে।" ভাবিতে ভাবিতে কুন্তী রাক্ষসী রুমালের খোঁট হইতে গুঁড়া গুলি হাতে খুলিয়া রাখিল। এমন সময় সাহেব হাসিতে হাসিতে বলিলেন—"বাইজি বৈঠনা?" সাহেবের এই সুমধুর সম্ভাষণে কুন্তীর আপাদমস্তক জ্বলিতে লাগিল। এবারও কুন্তী মনে মনে বলিতে লাগিল, "দূর হ—, গোলামের বেটা গোলাম। বাইজি তোর চৌদ্দপুরুষের মেয়েরা। আমি তোর মা। মা জি বল্‌না?" কিন্তু প্রকাশ্যে কিছুই না বলিয়া, কেবল নীরবে সাহেবের নির্দ্দেশিত আসনে বসিয়া আড় চোখে আড় চোখে সাহেবের আপাদমস্তক দেখিতে লাগিল। দেখিয়া দেখিয়া, কুন্তীর ধারণা হইল, সাহেব যেমন গোঁয়ার ও দুশ্চরিত্র, তেমন চতুর নয়। কুন্তী কার্য্য সিদ্ধির পক্ষে এটাকে একটা মহৎ শুভ লক্ষণ মনে করিয়া রাত্রির প্রথম ভাগেই মদের গ্লাসে বারম্বার সেই বিষাক্ত গুঁড়াগুলি মিশাইয়া মিশাইয়া হেন্‌রিকে কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই সম্পূর্ণ হতচেতন করিয়া ফেলিল। কুন্তীকে সাহেব পুনঃ পুন মদ খাইতে বলিলেও, কুন্তী অস্বীকার করিয়া খায় নাই। এখন গভীর রাত্রিতে অন্যজন-প্রাণিশূন্য তাঁবুর গর্ভে কুন্তী মনে মনে ছিন্নমস্তার নাম জপিতে জপিতে একাকী মনের আনন্দে বসিয়া, বক্ষস্থলে লুক্কায়িত সেই তীক্ষ্ণধার সুবৃহৎ ছুরী বা ছোবা দ্বারা মৃতবৎ হতচেতন হেন্‌রির মাথাটা প্রায় এক কোপেই দেহ হইতে পৃথক্ করিয়া রাখিল এবং তাড়াতাড়ি গিয়া চুপি চুপি রহমত্‌কে ডাকিয়া আনিল। রহমত্ হেন্‌রি সাহেবের তাঁবুর নিকটেই বাস করে। রহমত্ হেন্‌রির দুরভিলাষ সাধনের প্রধান যন্ত্র বিশেষ এবং অতি প্রিয়পাত্র। কুন্তী তাঁবুতে ঢুকিবার সময়ে রহমতের পটমন্দিরও দেখিয়া আসিয়াছিল। এখন কুন্তীর ছলনাতে সিপাহীজি রহমত্ সাহেবের তাঁবুতে ঢুকিবামাত্রই, কুন্তী কৌশলক্রমে তাঁবুর গর্ভস্থিত হেন্‌রির ছিন্ন-কণ্ঠনিঃসৃত, রক্তনদীর মধ্য হইতে সেই ছিন্ন মুণ্ডকটী তুলিয়া বিদ্যুতের মত ক্ষিপ্রতা সহকারে রহমতের গায়ের উপরে ফেলিয়া দিয়া

রক্তাক্ত ছোরাখানিও তাহার কাছেই ফেলিয়া দিল। তখনও রহমতের চোখের ঘুমের ঘোর ভাঙ্গে নাই। রহমত্ এই অদৃষ্টপূর্ব্ব, ভাবনার অগোচর লোমহর্ষণ ব্যাপার দেখিয়া, একবারে যেন জ্ঞান-হারা হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। কুন্তী এই অবসরে চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া কাঁদিয়া বলিতে লাগিল, "ওখানে কে আছ রে—! শীঘ্র এস রে—!" ইত্যাদি ইত্যাদি। কুন্তীই এই গভীর রাত্রিতে সাহেবের তাঁবুতে চীৎকার করিয়া কাঁদিতেছিল।

পাহারার সিপাহীগণ ভিন্ন এই গভীর রাত্রিতে ছাউনীর সমস্ত লোকই ঘুমাইতেছিল। কুন্তীর চীৎকার ও কান্নার শব্দে অনেকেই ঘুমের ঘোরে চমকিয়া উঠিল এবং দৌড়াইয়া সাহেবের তাঁবুর দিকে আসিতে লাগিল। তাঁবুর মধ্যে দুই একজন লোক আসিবামাত্রই কুন্তী তাড়াতাড়ি রহমত্কে দেখাইয়া বলিল, "এই গোলামের বেটা গোলামকে মার—, এই আমার সাহেবকে কেটে ফে'লেছে।" লোকেরা রহমতের সর্ব্বাঙ্গে ও কাপড়ে রক্ত মাখা দেখিয়া এবং তাহারই পায়ের কাছে সাহেবের রক্তাক্ত ছিন্ন মুণ্ড ও ছোরা পড়িয়া আছে দেখিয়া, তাড়াতাড়ি তাহাকেই ধরিয়া প্রহার করিতে আরম্ভ করিল। এইরূপে তাঁবুর মধ্যে যে আসিতে লাগিল, সে-ই কুন্তীর প্ররোচনায় এবং অন্য লোকদিগকেও প্রহারোদ্যত দেখিয়া, রহমত্কেই প্রহার করিতে প্রবৃত্ত হইল। এইরূপ এলো' মে'লো প্রহারের চোটে এবার রহমতের ঘুমের ঘোরের সঙ্গে সঙ্গে ভবঘোর ভাঙ্গিয়া চৈতন্যোদয় হইল। কিন্তু রহমত্ এখন নিরুপায়। সুতরাং প্রহারকারীদের হাত ছাড়াইয়া অবশেষে প্রাণের দায়ে মাঠের দিকেই ছুটিয়া চলিল। এদিকে পূর্ব্ব প্রহারকারীগণ এবং ছাউনীর প্রায় সমস্ত লোকই জাগিয়া, রহমত্কে পলাইতে দেখিয়া রহমতেরই পিছে পিছে চীৎকার করিতে করিতে ছুটিতে লাগিল। অধিনায়ক শূন্য সিপাহীগণের এইরূপ বিশৃঙ্খল গোলমাল ও ভিড়ের সময়ে সুযোগ পাইয়া কুন্তীও তৎক্ষণাৎ পলায়ন করিল। সকলে রহমতের দিকেই ঝুঁকিয়া পড়িয়াছিল। সুতরাং পলায়নপর কুন্তীকে কেহই দেখিতে পাইল না।

কুন্তী সেই গভীর রাত্রির আঁধারে গা ঢালিয়া দৌড়াইতে দৌড়াইতে হাঁপাইতে হাঁপাইতে মাঠ পার হইয়া, একটী দূরবর্ত্তী গ্রামে আসিয়া একটী পোড়' বাড়ীতে ঢুকিয়া পড়িল। হেন্‌রি সাহেবের সিপাহীদিগের ভয়ে ও অত্যাচারে আজ কাল এ গ্রামটী একরূপ জনশূন্য হইয়াছে। গ্রামের লোকেরা স্ত্রীপরিবার লইয়া ঘর বাড়ী ছাড়িয়া স্থানান্তরে চলিয়া গিয়াছে।

কুন্তী দৌড়াইয়া যে বাড়ীটীতে ঢুকিল, তাহা অতি প্রকাণ্ড। কিন্তু দেখিলেই বোধ হয়, অনেক দিন হইতে ছাড়া পড়িয়া আছে। ভৈরবীকে নিয়ে কুন্তী কয়েকদিন পূর্ব্বে এই বাড়ীতেই আসিয়া বাস করিতেছিল। এখানে থাকিয়াই ভৈরবীর যোগাড়ে রহমতের সঙ্গে কুন্তীর দেখা সাক্ষাৎ ও সাহেবের তাঁবুতে যাইবার আলাপ হয়। এইরূপ গ্রামে গ্রামে বেড়াইয়া সাহেবের জন্য গোপনে গোপনে স্ত্রীলোক সংগ্রহ করাই, শ্রীমান রহমতুল্লা সিপাহীর একটা ব্যবসায় হইয়া পড়িয়াছিল। এই কারণেও, ইংরাজ সৈন্যের ছাউনীর নিকটবর্ত্তী গ্রামের লোকেরা অনেকে স্ব স্ব পরিবারস্থ আত্মীয়াদিগকে সঙ্গে করিয়া বহুকালের প্রিয়তম পৈত্রিক নিবাস গ্রাম ও বাড়ী ঘর ছাড়িয়া গ্রামান্তরে প্রস্থান করিয়াছে। আজ কাল দুর্ব্বৃত্ত হেন্‌রিই গভর্ণমেণ্টের প্রসাদে এই ক্ষুদ্র অরাজক রাজ্যের একরকম পরম স্বেচ্ছাচারী রাজা। সুতরাং দুর্ব্বৃত্ত প্রভুর অধীনস্থ সিপাহীগণও প্রত্যেকেই আপনাদিগকে এক একটী ক্ষুদ্র নবাব মনে করে। অবশ্যই গবর্ণমেণ্ট ভুলক্রমেও একথা শুনিতে পান নাই। বিলাসপুরের বন্দোবস্ত শেষ না হওয়া পর্য্যন্ত ১৪২ নম্বর দেশীয় সৈন্যের রেজিমেণ্টের তিন চতুর্থাংশ সৈন্য কর্ণেল হেন্‌রির অধীনে বিলাসপুরে থাকিবার আদেশ গভর্ণমেণ্ট হইতেই প্রচারিত হইয়াছে। কিন্তু নবাব-পুত্র সিপাহীগণ প্রজাদের ধন, মান ও শান্তি রক্ষার পরিবর্ত্তে তাহাদের বাড়ী গিয়া, ঘরে ঢুকিয়া, বিনা মূল্যেই বলপূর্ব্বক শাক, তরকারি ও দধি, দুগ্ধ, ঘি প্রভৃতি সংগ্রহ করিয়া থাকে। ইহাতে কেহ আপত্তি করিলেই, তাহাকে সিপাহীদের প্রহার খাইয়া, অবশেষে প্রচুর লাঞ্ছনা ও অপমান ভোগ করিতে হয়। সুতরাং গ্রামবাসীরা গ্রাম পরিত্যাগ করিয়া পলায়ন করাই উচিত মনে করিয়াছে। কুন্তী যে গ্রামে বাস করিতেছিল, ইহাও এই সকল অত্যাচারেই জনশূন্য হইয়াছে। আজ কুন্তীর অপেক্ষায় এই জনশূন্য গ্রামের সেই জনশূন্য প্রকাণ্ড ছাড়া পুরীর একদিকে একটী প্রকোষ্ঠ-মধ্যে প্রদীপ জ্বালাইয়া এত রাত্রিতেও ভৈরবী বসিয়া বসিয়া ঘুমে ঢুলিতেছিল। কুন্তী দৌড়াইয়া ঘরে ঢুকিবামাত্রই, ভৈরবী তাড়াতাড়ি উঠিয়া কাঁপিতে কাঁপিতে দাঁড়াইল। কিন্তু কুন্তী তাহাকে একটীও কথা না বলিয়া, প্রথমে অতি ক্ষিপ্রহস্তে গায়ের সমস্ত অলঙ্কারগুলি ও কাপড় ছাড়িয়া তাড়াতাড়ি বেশ পরিবর্ত্তন করিল। এখন কুন্তী আর পূর্ব্বের মত বিলাসিনী নয়, কিন্তু দিব্য একটী সামান্য গৃহস্থের ঘরের বিধবা কুলবধূ।

কুন্তী মহারাজের অন্তর্দ্ধানের খপর পাইয়া অবধি তাঁহার মৃত্যুই একরকম নিশ্চিত করিয়া বিধবার সাজেই সাজিয়াছে। এখনও সেই সাজেই সাজিল। সাজিয়া মুহূর্ত্তে ভৈরবীর দিকে তাকাইয়া বলিল—"দেখ কি? মা ছিন্নমস্তার আশীর্ব্বাদে অসুর বধ হইয়াছে। এখন সব একঠাঁই করিয়া তাড়াতাড়ি একটী পুটলী বাঁধ। পরে চল শীঘ্র শীঘ্র পালাই। দেরি হইলে ধরা পড়িতে হইবে। চল, শীঘ্র চল।"

ভৈরবী কুন্তীর কথা শেষ হইতে না হইতেই তাড়াতাড়ি যাহা যাহা নিবার মত ছিল, সমস্তগুলি একঠাঁই করিয়া, একটী পুটলী বাঁধিয়া কাঁধে ফেলিয়া, বলিল—"চল। তৈয়ার হইয়াছি। আর দেরির দরকার নাই।" এই ঘটনার পরে মুহূর্ত্তের মধ্যেই সেই শূন্য পুরী পুনরায় শূন্য করিয়া কুন্তী আর ভৈরবী উভয়ে অন্ধকারে গা ঢালিয়া বিদ্যুতের মত ছুটিয়া প্রস্থান করিল।

এদিকে অনেকক্ষণ পরে রহমতুল্লা সিপাহীও মূর্চ্ছিতাবস্থায় ধৃত হইল। সিপাহীদের অত্যন্ত প্রহারই রহমেতর মূর্চ্ছার কারণ। রহমতের মূর্চ্ছা ভাঙ্গিতে রাত্রি প্রায় প্রভাত হইল। কিন্তু রহমত্‌কে নিয়ে ছাউনীতে ফিরিবার পরেই, সাহেবের তাঁবুতে গিয়া, বাইজিকে না দেখিয়া, প্রত্যেকেই নানা সন্দেহ করিতে লাগিল। তখনই বাইজির তল্লাসে চারিদিকে লোক ছুটিল। পরে রহমত্‌ও স্বজ্ঞান প্রাপ্ত হইলে সকলকে বিশেষ করিয়া, সমস্ত কথা খুলিয়া বলিল। কিন্তু তখন আর বহু তল্লাসেও বাইজির কোনই সন্ধান পাওয়া গেল না। পরিশেষে উদ্ধতন গভর্ণমেণ্টের কর্ম্মচারীদের তদন্তে ও বিচারে রহমতুল্লা সিপাহীর ফাঁসীর আদেশ হইল। কর্ণেল হেন্‌রির পরিবর্ত্তে অতি সত্বরই মেজর মন্‌রো বিলাসপুরে আগমন করিলেন। ইহাঁর সময় হইতেই বিলাসপুরে ইংরেজ শাসনের চিরশান্তি-সুখ সর্ব্বত্র স্থাপিত হইল।

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ।

পাষাণী কলিকাতায়।

নির্ম্মলচন্দ্রের অসুখ বৃদ্ধির টেলিগ্রাফ্ পাইয়া হরগোবিন্দ রায় সপরিবারে কলিকাতায় আসিয়াছেন। সহরের উপরেই স্বাস্থ্যকর ও নির্জ্জন স্থান

দেখিয়া একটী খুঁব ভাল বাড়ী ভাড়া করা হইয়াছে। নির্ম্মলচন্দ্রকে ছাত্রনিবাস হইতে নূতন বাসায় আনিয়া কলিকাতার প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ চিকিৎসকদিগের দ্বারা চিকিৎসা আরম্ভ করা হইয়াছে। কিন্তু চিকিৎসকগণের মধ্যে কেহই রোগীর বাঁচিবার আশা দিতে সমর্থ হন নাই। নিতান্ত সংশয়ের উপরে চিকিৎসা চলিতেছে। হরগোবিন্দ রায় বলিয়াছেন—"যত টাকাই ব্যয় হউক্ না কেন, রোগীর শ্মশান পর্য্যন্ত চিকিৎসা করা হইবে। যথাসাধ্য ভাল শুশ্রূষাদিরও চেষ্টা করা যাইবে। পরে ভগবানের যাহা ইচ্ছা তাহাই ঘটিবে। মানুষের কর্ত্তব্যের ত্রুটি হওয়া উচিত নয়।" শুশ্রূষার ভার এবারও পাষাণীর উপরেই প্রধানতঃ অর্পিত হইয়াছে। এবারও সকলেই রোগীর শুশ্রূষা-কার্য্যে পাষাণীর সহৃদয়তা ও দক্ষতা দেখিয়া অবাক্ হইয়াছেন। মা ভগ্নী কোথায় লাগেন? পাষাণী দিন রাত জাগিয়া, আহার, নিদ্রা, স্নানাদি পরিত্যাগ করিয়া, ততোধিক স্নেহ মমতার সহিত অক্লান্ত চিত্তে নির্ম্মলচন্দ্রের জন্য খাটিতেছে। নির্ম্মলচন্দ্র রোগের যন্ত্রণায় অস্থির ও হতচৈতন্য হইয়া পড়িয়াছেন। যখনই একটুকু চৈতন্য হইতেছে, অমনি পার্শ্বোপবিষ্টা পাষাণীর দিকে চাহিয়া কাতর স্বরে "মা, মা," বলিয়া ডাকিতেছেন। আর বলিতেছেন "আহা! মা, তুমি আমার সত্যি সত্যি মা। উঃ! গা জ্ব'লে যায় যে মা! বুক যে জ্ব'লে যাচ্ছে! একবার তোমার হাতখানি আমার গায় বুলাও। হাত খানি বুকে রাখ ত মা, আমার পাপ দূরে যাক্, অঙ্গ শীতল হো'ক্, প্রাণ জুড়াক্। মা তুমি সত্যি সত্যি স্বর্গের দেবী।" পাষাণী অমনি সজলচক্ষু দুইটী আঁচলে মুছিতে মুছিতে রোগীর গায়ে হাত বুলাইতেছে। আর এক একবার অতি অজ্ঞাতসারে পাষাণীর চোক্ হইতে এক এক ফোঁটা জল ঝরিয়া ঝরিয়া গড়াইয়া গড়াইয়া রোগীর মাথার উপরে পড়িয়া যাইতেছে। পাষাণী অমনি চমকিয়া সতর্কতার সহিত মুছিয়া ফেলিতেছে। পাষাণী ঘণ্টায় ঘণ্টায় ঘড়ী দেখিয়া রোগীকে ঠিক নিয়মিত সময়ে ঔষধ সেবন করাইতেছে এবং গায়ের উত্তাপের পরিমাণগুলি সময়ের পরিমাণের সঙ্গে সঙ্গে যত্নপূর্ব্বক একখানি কাগজে নীচে নীচে লিখিয়া রাখিতেছে। আবার কখনও বা একখানি তালবৃন্ত হাতে করিয়া রোগীকে বাতাস করিতেছে। কখনও রোগীর মুখে অল্প অল্প জল দিতেছে। হরগোবিন্দ, চিকিৎসকদিগের ব্যবস্থানুসারে ঘরে দুই একটী ভিন্ন প্রায়ই অন্য মানুষ আসিতে দিতেছেন না।

প্রায়ই দেখা যায়, পাড়া গাঁ হইতে স্ত্রীলোকেরা সহরে আসিলে, যেন একদিনের মধ্যেই সহরটীকে একবারেই উলট্ পালট্ করিয়া দেখিতে ব্যগ্র হইয়া পড়েন। এই জন্য যতই বিপদ্ আপদ্ হউক্ না কেন, সহরে আসিলে, একবার তাঁহারা সহরটীকে প্রদক্ষিণ না করিয়া যেন সুস্থির হইতে পারেন না। কিন্তু পাষাণী বা সিদ্ধেশ্বরীর পক্ষে এবার কলিকাতা-সহরে আসাটা কিছুই নূতন ঘটনা নয়। ইহাঁরা ইতিপূর্ব্বে বারম্বার কলিকাতায় আসিয়াছেন। কেবল কলিকাতা নয়, হরগোবিন্দ রায়ের সঙ্গে একবার প্রায় সমস্ত ভারতবর্ষটী প্রদক্ষিণ করিয়াছেন। দেশ ভ্রমণ করা হরগোবিন্দ রায়ের একটী রোগ বিশেষ। হরগোবিন্দ রায় একবার সপরিবারে ভারতবর্ষের প্রায় সর্ব্বস্থানে বেড়াইয়াছেন। যেখানে যাহা দেখিবার আছে, প্রায় সমস্তই দেখিয়াছেন। কখন কখনও সিদ্ধেশ্বরী ফাঁকে পড়িলেও পাষাণী প্রায় বরাবরই দেশভ্রমণের সময় ঠাকুরদাদা মহাশয়ের সঙ্গে সঙ্গে রহিয়াছে। এইজন্য ভারতবর্ষের প্রায় প্রধান প্রধান সহরগুলির সমস্ত দৃশ্যই পাষাণীর মুখস্থ ও অভ্যস্ত হইয়া গিয়াছে। পাষাণী, এ মর্ত্ত্যলোকে জন্ম-গ্রহণ করিয়া মানবমাত্রেরই অবশ্যদর্শনীয় এবং পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা অদ্ভুত দৃশ্য হিমাদ্রির তুষার মণ্ডিত শেখরমালা এবং ভারতমহাসাগরের অনন্ত প্রসারময় ফেনিল নীল জলরাশি, এই দুইটীই দেখিয়াছে। হরগোবিন্দ এক-বার কিছুদিন হিমালয়ের একটী মনোহর নির্জ্জন প্রদেশে বাস করিয়া, যোগ ও সমাধি প্রভৃতি অভ্যাস করিয়াছিলেন। পাষাণী সে বারেও তাঁহার সঙ্গ ছাড়ে নাই। আর একবার শরীর অসুস্থ হওয়াতে চিকিৎসকগণের ও পিতা ঠাকুরের অনুরোধে হরগোবিন্দ রায় কলিকাতা হইতে এক খানি জাহাজে চড়িয়া কিছুদিনের জন্য লঙ্কাদ্বীপে গমন করেন। আবার অল্পদিন পরেই সেখান হইতে অপর একখানি জাহাজে মান্দ্রাজ সহরে আসিয়া, পুনরায় সমুদ্র পথেই আরাকানে গমন করেন এবং আরাকান হইতে পুনর্ব্বার কলিকাতায় ফিরিয়া আসেন। পাষাণী এই সমুদ্রভ্রমণের সময়েও আপনার পাঁজি পুথি নিয়ে ঠাকুরদাদা মহাশয়ের সঙ্গে থাকিয়া বিদ্যা-চর্চ্চা দ্বারা ও নানা অপূর্ব্ব দৃশ্য দেখিয়া জ্ঞান সঞ্চয় করিতেছিল। পাষাণীর প্রতিপালক বা অভি-ভাবকদিগের ধনবল ও সম্মান, প্রতিপত্তি সকলই বিপুল। ইচ্ছা হইলে, কখনও টাকার অভাবে কিম্বা অপরের বাধা বিঘ্নে কোনই বন্দোবস্ত বা যোগাড়ের ত্রুটি হইবার সম্ভাবনা নাই। পণ্ডিতপ্রবর হরগোবিন্দও, এক-

মাত্র প্রিয়তমা শিষ্যা এবং আদরের দৌহিত্রীটীকে সঙ্গে সঙ্গে নিয়ে ভ্রমণ করিতে বিশেষ আমোদ বোধ করেন। হরগোবিন্দ বুঝিয়াছিলেন, ইহাতে চির কুমারী পাষাণীর প্রকৃত জ্ঞান-বৃদ্ধি এবং চরিত্র সুগঠন উভয়ই একসঙ্গে সাধিত হইবে। যাহাহউক্, নানা কারণেই সাধারণ বঙ্গরমণী-কুলের অপেক্ষা পাষাণীকে এবিষয়ে বিশেষ ভাগ্যবতী বলা যাইতে পারে। সুতরাং কলিকাতায় আসিয়া, এবার পাষাণী বা সিদ্ধেশ্বরী একদিন, এক মুহূর্ত্তের জন্যও সহর দেখিতে ব্যগ্র হন নাই। সরস্বতী প্রভৃতি পরিচারিকাগণ ও দ্বারবানদিগকে সঙ্গে করিয়া, শকটারোহণে, প্রফুল্ল প্রভৃতি কুটুম্বিনীরা সিদ্ধেশ্বরীর অনুমতি নিয়ে, দুই তিন দিন মাত্র সংক্ষেপে সহরটী প্রদক্ষিণ করিয়াছেন। সকলের অনুরোধে এক দিন বৈকালে সিদ্ধেশ্বরীও বেড়াইতে গিয়াছিলেন। কিন্তু এসময়ে পাষাণী কাহারও অনুরোধ রক্ষা করে নাই।

ভালবাসা, তুমি রক্তমাংসের সর্ব্বপ্রকার সম্বন্ধের অতীত। রূপের পিপাসা, ইন্দ্রিয়ের ঐন্দ্রজালিক স্বপ্ন, প্রবৃত্তির নরকময় আবর্ত্ত, স্বার্থের দুর্গন্ধময় কুহক, কত কি এ জগতে তোমার পবিত্র পুণ্যময় নামে বিক্রীত হইতেছে। কিন্তু তুমি স্বর্গ ছাড়িয়া কখনও এ পাপ পৃথিবীতে অবতীর্ণ হও না। তোমার অপরিমিত বেগ, অদম্য উচ্ছ্বাস, অনন্ত প্লাবনের নিকট, আত্ম, পর, পাপ, দুর্ব্বলতা, প্রবৃত্তির কোলাহল, স্বার্থের ইন্দ্রজাল, রূপের মোহ, ইন্দ্রিয়ের চাঞ্চল্য কিছুই দাঁড়াইতে পারে না। তুমি যেখানে, দেবনিবাস পবিত্র স্বর্গধাম সেখানেই। অধিক আর কি বলিব? চির দুঃখিনী পাষাণী আজ তোমারই বিশ্বব্যাপী চরণে বিক্রীত। আজ আকস্মিক বর্ষার প্লাবনের জলের মত নির্ম্মলচন্দ্রের পীড়া হঠাৎ বাড়িয়া উঠিয়াছে। নির্ম্মলচন্দ্র হতচৈতন্য। পাষাণী এক একবার হৃদয়ের বেগ থামাইতে না পারিয়া, নিজের চোখের জলে মুমূর্ষু নির্ম্মলচন্দ্রের রক্তশূন্য পাণ্ডুবর্ণ মুখ ও কপাল সিক্ত করিয়া, রুদ্ধ দৃষ্টিতে, রুদ্ধ কণ্ঠে ধীরে ধীরে বলিতেছে—"ছোট মামা, ছোট মামা, আজ কি আপনার বড় কষ্ট হইতেছে? কি করিব? একটুকু বাতাস করিব? একটুকু কিছু খাবেন? বুকে হাত বুলাইব?" আজ আর নির্ম্মলচন্দ্র একটী কথাও বলিতেছেন না। কেবল অনেক্ষণ পরে পরে এক এক বার চোক মেলিয়া, কাতর দৃষ্টিতে পাষাণীর মুখের দিকে তাকাইয়াই আবার চোক বুজিতেছেন। আর যখন একটুকু একটুকু চৈতন্য হইতেছে,তখন নির্ম্মলচন্দ্র যেন স্বপ্নে দেখিতেছেন " যেন স্বর্গে একটা জ্যোতি দেখা দিল। জ্যোতি নয়নাভিরাম, মনো-

হয় এবং স্নিগ্ধ। সেই স্নিগ্ধ জ্যোতির মধ্য হইতে সহসা যেন বিমল সুধায় ধৌত প্রফুল্ল পারিজাত রাশি বৃষ্টি ধারার মত বর্ষিত হইতে লাগিল। তখন জ্যোতির কিরণে ঝুলাইয়া বাঁধা, এক খানি জ্বলন্ত বিজলী-গড়া মনোহর চৌদোলা, যেন অতি ধীরে দুলিতে দুলিতে স্বর্গ হইতে মর্ত্ত্যে নামিতে লাগিল। নির্ম্মলচন্দ্র প্রলাপ-মধ্যে এইরূপ স্বপ্ন দেখিতে দেখিতে সত্য সত্যই চক্ষু মেলিয়া বিস্ফারিত লোচনে চাহিয়া রহিলেন। তবুও দেখিতে লাগিলেন, চৌদোলা নামিতেছে। চৌদোলা মাটিতে ঠেকিলে, তাহা হইতে এক দেবকন্যা নিঃসৃত হইলেন। তাঁহার অঙ্গলাবণ্য যেমন পবিত্র তেমনই মনোমুগ্ধকারী। নির্ম্মলচন্দ্র দেখিলেন, যেন হঠাৎ প্রভাতের শিশিরে ধোয়া, পবিত্র, মনোহর-দৃশ্য, প্রফুল্ল গোলাপপুষ্পরাশি শূন্য হইতে তাঁহার সম্মুখে কেহ পুঞ্জীকৃত করিয়া রাখিল, যেন স্বর্গ হইতে কেহ রূপের সুধারাশি ঢালিয়া দিল, যেন শরতের জ্যোৎস্না, চাঁদের মাধুরি মূর্ত্তিমতী হইয়া দাঁড়াইল! দেবীর পরিধানে শুভ্র বসন, পশ্চাতে আজঘনলম্বিত মেঘরাশির মত তৈলস্পর্শশূন্য রুক্ষ রুক্ষ চুলের রাশি। কিন্তু দেবীর সুন্দর মুখে কেনই যেন এক খানি মেঘ ঢাকা পড়িয়াছে। নির্ম্মল সবিস্ময়ে দেখিলেন, দেবী তাঁহার শিওরে বসিয়া, দুই চোখের জলে প্লাবিত হইতেছেন! আর তিনিই এক একবার ধীরে ধীরে সুমধুর স্বরে, রুদ্ধকণ্ঠে বলিতেছিলেন—"ছোট মামা, ছোট মামা, আজ কি আপনার বড় কষ্ট হইতেছে? কি করিব? একটুকু বাতাস করিব? একটুকু কিছু খাবেন? বুকে হাত বুলাব?" ইত্যাদি ইত্যাদি। দেবীর এই অপার কৃপা দেখিয়াই যেন নির্ম্মলের মুখে কথা ফুটিল না। কিন্তু মন কৃতজ্ঞতায় পূর্ণ হইল। তাই কেবল দীনভাবে একবার মাত্র দেবীর মুখের দিকে তাকাইয়াই আবার চোক বুজিলেন। অনেক কষ্ট ও চেষ্টার পরে এক বার অস্পষ্ট স্বরে নির্ম্মলচন্দ্র পার্শ্বোপবিষ্টা দেবীকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"মা, দাদা কি আসিয়াছেন?" দেবী—পাষাণী দেবী উত্তরে ধীরে ধীরে সজলনেত্রে বলিল—"আসিবার সময় এখনও অতীত হয় নাই। ছোট মামা, আপনি এখন কিছু ভাবিয়া কাতর হইবেন না। ভয় কি? ভগবানকে ডাকুন। তিনিই আপনাকে শান্তি দিবেন। ভয় কি?"

সংসারের একি গূঢ় চক্র, কিছুই বুঝা যায় না, কিন্তু অনেক সময়ই দেখা যায়, যখন এক দিকে বিপদ্ উপস্থিত হয়, তখন যেন সহস্র দিক্ হইতে

সহস্র ধারায় বিপদ্ আসিয়া বিপন্নকে ঘিরিতে থাকে। এইরূপ যে কেন হয়,কে বলিবে? এই পর্য্যন্ত বলিতে পারি, "এইরূপ হয়।" যাহা হউক্, এদিকে নির্ম্মলচন্দ্র ভয়ানক কাতর; ওদিকে এই সুযোগ পাইয়া, ভবানীশঙ্কর হরগোবিন্দের সর্ব্বনাশের সমস্ত আয়োজন ঠিক্ করিয়া বসিয়া আছেন। আজ ডাকের চিঠির প্রথম বণ্টনের সময়েই হরগোবিন্দ রায় এক খানি রেজেষ্টারি চিঠি পাইয়াছেন। এই চিঠির মধ্যে এক খানি সমন আসিয়াছে। তাহার মর্ম্ম এই—"তোমার পিতা ঠাকুর ৶ মহারাজা কৃষ্ণগোপাল রায় মুখোপাধ্যায় বাহাদুর পরমানন্দ মাড়োয়ারীর নিকটে যে এক কোটি পঁচিশ লক্ষ টাকা ধার করিয়া ছিলেন, রাজা ভবানীশঙ্কর রায় বাহাদুর আপনার অংশের টাকা পরিশোধ করিয়া, পরমানন্দের নিকট হইতে ঐ দলিল নিজ-নামে খরিদ করিয়াছেন। এখন উক্ত রাজা বাহাদুর সুদ সমেত সমুদায়ে বাহাত্তর লক্ষ টাকার দাবিতে তোমার নামে নালিশ উপস্থিত করিয়াছেন। তুমি যথাসময়ে উপস্থিত হইয়া কোন আপত্তি থাকিলে জানাইবে।" ইত্যাদি ইত্যাদি।

হরগোবিন্দ সমন পড়িয়া একবারে বিস্মিত এবং অবাক্ হইয়াছেন। কারণ তিনি ঘুণক্রমেও পরমানন্দের এত টাকা পাওনার কোন কথাই ইতিপূর্ব্বে শুনেন নাই। আজ অকস্মাৎ একবারে এইরূপ সমন পাইয়া অত্যন্ত চমৎকৃত হইয়াছেন। হরগোবিন্দ কখনও এক পয়সাও জমা করেন নাই। এখন একবারে হঠাৎ এত টাকা কোথা থেকে দিবেন? হরগোবিন্দ সমন পড়িয়া হিসাব করিয়া দেখিয়াছেন, মোকদ্দমার তারিখও আগামী কল্যই। আর ভবানীশঙ্করকে এপর্য্যন্ত ক্রমান্বয়ে তিন চারিবার টেলিগ্রাফ করিয়া নির্ম্মলের অসুখ-বৃদ্ধির যে খপর দেওয়া হইয়াছিল, তাহার উত্তরে তিনি ভিন্ন এক খানি চিঠিতে নির্ম্মলকে সংক্ষেপে লিখিয়াছেন—

"প্রিয় নির্ম্মল,

তুমি আমাকে আত্মীয় মনে কর না। পিতামহ ঠাকুরের মৃত্যুর পর হইতে কখনও আমার হিত কামনা করিয়াছ বলিয়া আমার মনে পড়ে না। বরং সর্ব্বদা অত্যন্ত বিরুদ্ধাচরণে আমার প্রাণে অনেক ব্যথা দিয়াছ। আমার যাহাতে অপমান হয়, যেন তাহাই তোমার লক্ষ্য। তুমি যাঁহাকে আত্মীয় ভাব, তিনি ত তোমার কাছেই আছেন। তবে আর আমার কি দরকার বুঝিলাম না। যাহা হউক্, সম্প্রতি খুড়া মহাশয়ের নামে একটা নালিশ উপস্থিত করিয়াছি। এটা শীঘ্রই মিটিয়া যাইবে। মোকদ্দমার

তারিখ অতি সন্নিকটে। পারি ত তৎপরে একবার তোমাকে দেখিতে যাইব। আমি বড় ব্যস্ত আছি। অধিক আর কি লিখিব ?”

শুভাকাঙ্ক্ষী
শ্রীভবানীশঙ্কর রায়।

নির্ম্মল অজ্ঞানাবস্থায় থাকাতে হরগোবিন্দ এচিঠিও খুলিয়া পড়িয়াছেন। হরগোবিন্দ এই দুঃসময়েও ভগবানে নির্ভর করিয়া স্থির ভাবে কর্ত্তব্য অবধারণ করিয়াছেন। কলিকাতার একজন পরমাত্মীয়কে বাসার ও নির্ম্মলের তত্ত্বাবধানের সমস্ত ভার দিয়া, আজই রাত্রির গাড়ীতে দেশে যাইবেন, ঠিক করিয়াছেন। বাড়ী না গিয়া, কাল, একবারে বিচারালয়েই উপস্থিত হইবেন। পুনরায় সেখান হইতে কালই রাত্রিতে কলিকাতায় পৌঁছিবেন। বন্দোবস্ত ঠিক্ করিয়া সিদ্ধেশ্বরী এবং পাষাণীকেও সব খুলিয়া বলিয়াছেন। রাত্রি দশটার গাড়ীতে হরগোবিন্দ রায় কলিকাতার বাসা ছাড়িয়া যাইবার কালে মুমূর্ষু নির্ম্মলচন্দ্রের জন্য চুপি চুপি অনেক বার কোঁচার খোঁটে চোক মুছিলেন, আর অনেকবার আকাশের দিকে তাকাইয়া বলিলেন—“দেব, আমরা অজ্ঞান হীন মানুষ। অনেক সময়েই তোমার মঙ্গলময় গূঢ় অভিপ্রায়ের কোনই তাৎপর্য্য বুঝিতে পারি না। আর কি বলিব ? দেব, তোমারই মঙ্গলময় ইচ্ছা পূর্ণ হউক্। আমাকে তুমি অবিশ্বাসী করিও না।” বলিতে বলিতে, ভাবিতে ভাবিতে হরগোবিন্দ এক-খানি টিকেট্ কিনিয়া, অশ্রুপূর্ণ লোচনে গাড়ীতে উঠিয়া বসিলেন। কিন্তু তখনই লৌহময় বাষ্পীয় শকট ধরাবক্ষ কম্পিত করিয়া বেগে ধাবিত হইল। বায়ুর প্রবল স্রোত তাহার পশ্চাতে পড়িয়া রহিল। মুহূর্ত্ত পরেই পরিত্যক্ত ষ্টেশন হইতে গাড়ীর শব্দ পর্য্যন্তও আর শুনা গেল না। এদিকে পাষাণী আজ একাই সিদ্ধেশ্বরীকে নিয়ে নির্ম্মলের শয্যার পার্শ্বে সমস্ত রাত্রি জাগরণ করিতে বসিল।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ।

হরগোবিন্দ—রেলওয়ে ষ্টেশনে।

হরগোবিন্দ রায় কখনও প্রথম বা দ্বিতীয় শ্রেণীর গাড়ীতে যাতায়াত করেন না। দিনে হইলে প্রায়ই সর্ব্ব নিম্ন শ্রেণীর গাড়ীতে যাওয়া আসা

করেন। এই সকল গাড়ীতে যে সকল গরিব দুঃখী ও দেশের নিম্ন শ্রেণীর লোকেরা যায়, তাহাদের সঙ্গে নানা বিষয়ের আলাপ করিয়া, হরগোবিন্দ বিশেষ আনন্দ লাভ করেন। অনেক সময়ে তাহাদের সঙ্গে এক আসনে ঘেষা ঘেষি করিয়া বসিতে বড়ই আমোদ বোধ করেন। যখন অনেক নিরক্ষর দুরবস্থাপন্ন নিম্ন শ্রেণীর ব্যক্তিও,রেলওয়ে কোম্পানির দত্ত নিরপেক্ষ-অধিকার-পত্র-স্বরূপ "টিকেট" ওরফে টেগস্‌পত্র দেখাইয়া অতি ভদ্র লোককেও অগ্রাহ্য করিয়া আপনার স্থান দাওয়া করিতে করিতে বলিতে থাকে—"কি মশাই,আমি কি আর পয়সা দিয়ে আসি নাই? আপনিও যেমন পয়সা দিয়েছেন, আমিও তেমনই পয়সা দিয়াছি। আপনি ব্যাগ, বোচ্‌কা দিয়ে এক রাজ্যের যায়গা বন্ধ কো'রে রাখিবেন,আর আমি দাঁড়াইয়া থাকিব? কেন দাঁড়াব? যায়গা ছাড়িয়া দিয়ে কথা বলুন।" ইত্যাদি ইত্যাদি। তখন হরগোবিন্দ ভাবেন, কি আশ্চর্য্য! এদিগকে দেশের ভদ্র লোকেরা বহুকাল হইতে বা চিরদিনই এত পাথর চাপা দিয়া রাখিয়াছেন, তবুও সুযোগ পাইলে—প্রতিযোগিতা করিবার অবসর পাইলেই, এখনও ইহারা সেই সকল ভদ্র লোকের সঙ্গেই আপনাদের সাম্য স্থাপনের চেষ্টা করিতে কিছু মাত্র কুন্ঠিত হয় না। এদিগকে সুশিক্ষার আলোকে আলোকিত করিলেও,যে ভাবে, ইহারা তখনও আপনাদিগকে অকুন্ঠিত চিত্তে ভদ্র লোক-দিগের দাসানুদাস মনে করিবে, তাহার মত ভ্রমান্ধ আর কে আছে?" ইত্যাদি প্রকার কত কি কথা ভাবিতে ভাবিতে নিম্নশ্রেণীর গাড়ীর সমস্ত কষ্ট, যন্ত্রণা ও অসুবিধার মধ্যেও হরগোবিন্দ পরম সুখে গম্য স্থানে আগমন করেন। আজ যদিও রাত্রিকাল বলিয়া হরগোবিন্দ রায় সর্ব্ব নিম্নশ্রেণীর উপরের শ্রেণীতে চড়িয়াছিলেন কিন্তু লোকের বড় বেশী ভিড় হওয়াতে আজ আর সে প্রভেদটুকু রক্ষা পায় নাই। হরগোবিন্দ সমস্ত রাত্রি জাগিয়া অল্পরাত্রি থাকিতে, যে ষ্টেশনে নামিবার কথা ছিল, সেই ষ্টেশনে আসিয়া নামিয়াছেন। কিন্তু এতক্ষণ গাড়ীর লোকদের সঙ্গে আলাপে ও তাহাদের সম্বন্ধীয় নানা চিন্তায় নিমগ্ন থাকাতে যেন সকল মনের কষ্ট ভুলিয়া গিয়াছিলেন। এখন গাড়ী হইতে নামিবামাত্রই শুনিলেন, ষ্টেশনের একজন ইজার চাপকান আঁটা ভদ্রলোক, চীৎকার করিয়া বলিতেছেন "এ গাড়ীতে তুলসীগ্রামের জমিদার হরগোবিন্দ রায় নামে কেহ আসিয়াছে কি—? তাহার নামে একটা টেলিগ্রাফ আছে—।"

হরগোবিন্দ রায় তাঁহার চীৎকার শুনিয়াই, তাড়াতাড়ি নিকটে গিয়া দাঁড়াইলেন। বাবুকে চিনিতে আর হরগোবিন্দের বিন্দুমাত্রও কষ্ট করিতে হইল না! যেন বাবুটী না হারান, এই জন্যই রেলওয়ের কর্ত্তৃপক্ষেরা তাঁহার মাথার কাল টুপিতে রূপালি রূপালি ইংরেজি অক্ষরে বড় বড় করিয়া "ষ্টেশন মাষ্টার" এই কথাটী লিখিয়া দিয়াছেন। হরগোবিন্দ রায়, বাবুর মুখের দিকে অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত তাকাইয়া রহিলেন। কিন্তু বাবু, একটী খাতাতে "উডেন্ পেন্সিল্" দিয়া কি যেন লিখিতেছিলেন। বাবু আড় চোখে আড় চোখে হরগোবিন্দ রায়কে অনেক বার দেখিতে পাইয়াও, হঠাৎ মুখ তুলিয়া তাঁহার দিকে তাকাইয়া নিজের বহু মূল্য মানের হানি করিতে প্রস্তুত হইলেন না। হরগোবিন্দ ব্যগ্রতা ও বিনয়ের সঙ্গে অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। অনেকক্ষণ পরে বাবু মুখ তুলিলে, হরগোবিন্দ রায় সবিনয়ে বলিলেন—"মহাশয়, হরগোবিন্দ রায়ের নামে যে টেলিগ্রাফ আসিয়াছে,তাহা কাহার কাছে পাইব?" হরগোবিন্দ, মাষ্টার মহাশয়ের পিতাঠাকুরের সমবয়স্ক হইলেও, উত্তরে মাষ্টার বাবু, অক্লান্ত চিত্তে বলিলেন—"তুমি হরগোবিন্দ রায়ের কে হও?"

হরগোবিন্দ।—"আজ্ঞে আমিই হরগোবিন্দ রায়।"

তখন মাষ্টার বাবু, খোট্টা রকমের একটা নাম উচ্চারণ করিয়া সচীৎকারে ডাকিবামাত্রই, একজন নীল রঙ্গের পাগ্ড়ি-ধারী চাপরাসী এক খানি খাতা সহ আসিয়া, হরগোবিন্দের হাতে এক খানি বিশেষ রকমের লেপাফা বা চিঠির খাম দিয়া বলিল—"রসিদ দেও।" হরগোবিন্দ তৎক্ষণাৎ ছাপার রসিদে নাম লিখিয়া দিয়া, সেই খানেই দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া লেপাফাখানি ছিঁড়িয়া টেলিগ্রামের খপর পড়িতে লাগিলেন। টেলিগ্রামের অর্থ এই—"আজ রাত্রি দ্বিপ্রহরের কিঞ্চিৎ পরেই ভগবান্ আপনার প্রিয় সন্তান নির্ম্মল চন্দ্রকে সকল জ্বালাযন্ত্রণার হাত হইতে মুক্ত করিয়া, আপনার শান্তিময় ক্রোড়ে গ্রহণ করিয়াছেন। বাসার সকলেই শোকসাগরে মগ্ন হইয়াছেন। অন্য কোন অমঙ্গলের খপর নাই।" টেলিগ্রাফে, প্রেরকের স্তম্ভে পাষাণীর নাম লিখিত আছে।

হরগোবিন্দ টেলিগ্রাফের খপর অবগত হইয়াই, ধীরে ধীরে টিকেট্ সংগ্রহ কারকের হাতে নিজের টিকেট্ খানি দিয়া, তখনই ষ্টেশনের বাহিরে চলিয়া গেলেন। আজ আর মনের কষ্টে হরগোবিন্দের স্নানাহার কিছুই হইল না। হরগোবিন্দ অস্নাত, অনাহারে যথাসময়ে বিচারগৃহে উপস্থিত

হইলেন। বিচার গৃহে যাইবার পূর্ব্বে কলিকাতার বাসায় একটী টেলিগ্রাফ করিয়া গেলেন।

ষোড়শ পরিচ্ছেদ।

হরগোবিন্দ—বিচারগৃহের সমীপে।

বিচারগৃহ আজ লোকে লোকারণ্য। আজ দুইদিন হইল, গভর্ণমেণ্ট ভবানীশঙ্করের উপাধি বাড়াইয়া দিয়াছেন। সহসা এইরূপ উপাধি বৃদ্ধির কারণ এই যে,কিছুদিন হইল, রাজা ভবানীশঙ্কর রায় বাহাদুর, কলিকাতায় সাহেবদের বৈকালিক ভ্রমণের সুবিধা-বিধায়ক একটী প্রমোদ-বাগান প্রস্তুত-বিষয়ে ধার করিয়া এক লক্ষ টাকা সাহায্য করিয়াছেন। আর কলিকাতায় থাকাকালে কাশীপুরের বাড়ীতে একদিন সহরের সমস্ত বড় বড় সাহেবদিগকে সাদরে নিমন্ত্রণ করিয়া উচ্চদরের একটী ভোজ দিয়াছেন। তদ্ভিন্ন অনেকে বলে, সম্প্রতি দেশীয়দিগকে নির্যাতন করিতে কলিকাতায় সাহেবেরা কি একটা সভা করিয়া টাকা সংগ্রহ করিয়াছেন। ভবানীশঙ্কর তাহাতেও এক-কালে দশ হাজার টাকা দান করিয়াছেন। এই সকল কারণে ছোট ছোট মে'টে ফিরিঙ্গি সাহেব হইতে বড় লাট পর্য্যন্ত বিশ্বাস দাঁড়াইয়া গিয়াছে যে, এ বঙ্গ ভূমে ভবানীশঙ্করই একমাত্র সৎকার্য্য-শীল, সুশিক্ষিতাগ্রগণ্য, ইংরেজ গভর্ণ-মেণ্টের প্রকৃত রাজ-ভক্ত প্রজা। আগামী মনো-নয়নের সময়ে ভবানীশঙ্কর বড় লাটের মন্ত্রিসভার সভ্য মনোনীত হইবেন, এখনই চারিদিকে ইহার গুজব উঠিয়াছে। সাহেবদিগের অপার অনুগ্রহেই দুইদিন পূর্ব্বের রাজা ভবানীশঙ্কর রায় বাহাদুর, আজ মহারাজা ভবানীশঙ্কর রায় বাহাদুর হইয়াছেন। আজ বিচারালয়ের সম্মুখে মহারাজা ভবানীশঙ্কর রায় বাহাদুরের গড়ুরবৎ প্রকাণ্ড ইংলিশ্ অশ্বচতুষ্টয়বাহিত, আসা, সোটা ও চামর ধারী, ইজার চাপকান আঁটা, শালেরপাগড়ি পরা আরদালিবৃন্দ-পরিশোভিত, অতি বৃহৎ, মূল্যবান, "ফিটন্" নামক একখানি উৎকৃষ্ট গাড়ী সৌরদীপ্তির প্রতিফলনে চিক্, চিক্, ঝল মল, ঝল মল, করিতেছে। বিচারালয় গৃহের একঘর লোকের সমস্ত গুলি চক্ষু যেন একবার সেই গাড়ীর দিকে আর এক এক বার, যেখানে বড় বড় প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ উকিল ও "বারিষ্টার" বৃন্দে পরিবেষ্টিত হইয়া,

বিচারাসনের সম্মুখের নির্দ্দিষ্ট স্থানে বেত্রাসনে, সুসজ্জিতবেশে মহারাজা ভবানীশঙ্কর রায় বাহাদুর স্বয়ং বসিয়া আছেন, সেই দিকে পড়িয়া বিশ্রাম করিতেছে। বিচারপতি আসনে বসিয়াছেন। একঘর লোকের মধ্যে কাহারও মুখে যেন একটীও কথা নাই। যেন কাহারও চোখের পলক পড়িতেছে না, নিশ্বাসের শব্দ হইতেছে না। আজ সর্ব্ব প্রথমেই ভবানীশঙ্কর রায়ের মোকদ্দমার বিচার হইবে। ইজার চাপকান আঁটা বা মালকোচা মারা, পাগ্‌ড়ি-ধারী, রুলহস্ত প্রহরীগণ, বক্ষস্ফীত করিয়া, গ্রীবা বক্র করিয়া, চারিদিকে গজেন্দ্র গমনে পায়চারী করিয়া বেড়াইতেছে, আর এক এক বার সেই নির্ব্বাক্ দর্শকদিগের দিকে কট মট করিয়া তাকাইতেছে। কিন্তু ইহারাও আজ নিঃশব্দ।

বিচার-গৃহের বাহিরে, কিছু দূরে ভবানীশঙ্করের কয়েকজন কর্ম্মচারী অতি ছোট ছোট কথায়, ফিস্ ফিস্ শব্দে সাক্ষীদিগের সহিত কাহাকে কিরূপ বলিতে হইবে, তদ্বিষয়ের ঘোরতর আলোচনা করিতেছেন। সাক্ষীদের মধ্যে অনেক ভদ্র লোক এবং ব্রাহ্মণপণ্ডিতদলের লোক পর্য্যন্ত উপস্থিত হইয়াছেন। ইহাঁদের মধ্যে কেহ কেহ বলিবেন,—"তাঁহারা জানেন, বিষয়টা বিনামী করাটা কিছুই না।" কেহ কেহ বা বলিবেন,—"তাঁহারা মৃত মহারাজা কৃষ্ণগোপালকে স্বচক্ষে পরমানন্দের নিকট হইতে টাকা নিতে দেখিয়া, দলিলে সাক্ষী হইয়াছেন। পরমানন্দের নিকট হইতে ভবানীশঙ্কর যে দলিল ক্রয় করিয়াছেন, একথারও সাক্ষী হইয়া অনেকে আসিয়াছেন। বৃদ্ধ পরমানন্দ স্বয়ং এ বিষয়ের সাক্ষ্য দিতে হাজির হইয়াছে। অনেককে সাক্ষ্যদানের মুখ সাপাই বা দক্ষতানুসারে বার্‌বরদারি অথবা প্রচুর পরিমাণে দক্ষিণা দিবারও বন্দোবস্ত হইয়াছে। সুতরাং এই শ্রেণীর সাক্ষীগণ আগের ভাগেই ইষ্টমন্ত্রের মত আপনাদের কথ্য বিষয় সকল জপ করিয়া করিয়া মুখস্থ করিতেছেন। একজন সাক্ষী চালাকি করিয়া আগেই বারবরদারি হস্তগত করিয়াছেন। আহা! আজ এমন সময়ে ভবানীর শুভাকাঙ্ক্ষী তারা দাদা বিচার আলয়ে উপস্থিত নাই। আজ তিন দিন মাত্র হইল, হঠাৎ সাংঘাতিক পীড়ায় তারাচাঁদ বাড়ুয্যের মৃত্যু হইয়াছে। এই মোকদ্দমার মূল ও প্রথম নায়ক ধরণী শর্ম্মা আজও মরিসস্ দ্বীপে কুলির কাজে নিযুক্ত আছে। বাঁচিয়া আছে কি মরিয়াছে, কে জানে? হরগোবিন্দ এখনও বিচার-গৃহে উপস্থিত হন নাই।

মহাত্মন্, সাধু হরগোবিন্দ, তুমি আজ কি করিতেছ? তুমি ধনে, মানে,

ভূসম্পত্তিতে ভবানীশঙ্করের অপেক্ষা কিসে কম? তবে তোমার জুড়ী, গাড়ী, কিছুই নাই কেন? তোমার গভীর পাণ্ডিত্য, তীক্ষ্ণবুদ্ধি, উজ্জ্বল প্রতিভা, প্রগাঢ় ধর্ম্মনিষ্ঠা, উদার ভগবৎ-প্রেমভক্তি তোমাকে যে ধ্রুবরাজ্যে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে, তথায় কি এ সকলের কিছুই মূল্য নাই? এ সকল আড়ম্বর কি তথায় অতি হেয়? তাই কি তুমি, সামান্য ধুতি পরিয়া, সামান্য কোর্ত্তা গায়ে দিয়া, সামান্য মোটা থানের চাদর নিয়ে, অতি যৎসামান্য-বেশে একাকী সকলের চক্ষুর অন্তরালে এই নির্জ্জনস্থানে ম্রিয়মান হইয়া, চিন্তানিবিষ্ট-চিত্তে যেন বিশ্বসংসারটাকে করতলন্যস্ত আমলকবৎ তন্ন তন্ন করিয়া ভাবিতেছ? হয় ত সমস্ত বিষয় সম্পত্তি হইতে আজ তোমাকে বঞ্চিত হইতে হইবে, তজ্জন্যই কি তুমি এইরূপ ম্রিয়মান হইয়াছ? না। তোমার ঐ জ্ঞান ও প্রতিভার রত্নময় সিংহাসন-স্বরূপ মুখমণ্ডলে কে যেন উজ্জ্বল অক্ষরে লিখিয়া রাখিয়াছে, "যাঁহার করুণায় ও প্রসাদে পৃথিবীর এই ধূলিমুষ্টির অধিকারী হইয়াছি, তাঁহারই পানে তাকাইয়া ইহা দূরে নিক্ষেপ করিতে আমার বিন্দুমাত্রও মনোকষ্টের কারণ নাই।" তবে কি এ জগতে সাধুতার আদর নাই, ইহাই ভাবিয়া ভাবিয়া, কাতর হইয়াছ? না। তুমি ত জান, "সাধু লোকেরা আদর অনাদরের জন্য সাধুতাকে প্রাণের ভূষণ করেন না। সাধুতা, এ জগতে কাহারও আদর না পাইলেও, সাধুতাই থাকিবে। অতি সংগোপনে ভক্ত সন্তানের অঞ্জলি অঞ্জলি সাধুতার প্রফুল্ল কুসুম চরণে উপহার পাইয়াও, এই অনাদ্যনন্ত বিশ্বাধিপতি, ভূমা, মহান্, জ্যোতির্ম্ময়, আনন্দস্বরূপ ভগবান বড়ই পরিতৃপ্ত হন্। সাধুতা কাহারও আদরের ভিখারী নয়।" তবে বুঝিয়াছি, প্রিয় নির্ম্মলচন্দ্রের মৃত্যু-সংবাদ আজ তোমার প্রাণটাকে দুই হাতে ধরিয়া আলোড়িত করিয়া দিয়াছে। তুমি আজ আপনাকে এবং এ জগৎকে অসারের অসার দেখিতেছ। এই অসারের মধ্যে সারের সার ভগবৎ-জ্যোতির সহিত আত্ম-জ্যোতির তুলনা করিয়া প্রাণে প্রাণে মড়ার চেয়েও মরিয়া যাইতেছ। আজ তোমার অস্নান, অনাহার এবং বিষণ্ণতার কারণ ইহাই।

হরগোবিন্দ, কাছারিগৃহের অদূরে একটী স্থানে, একটুকু আড়ালে দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া, বিষণ্ণমনে নানা কথা ভাবিতেছেন। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, আজ যে মোকদ্দমার জন্য উপস্থিত হইয়াছেন, হরগোবিন্দ ইহার কোন বৃত্তান্তই জানেন না। তবে এই দুই দিন পর্য্যন্ত অনেক কথা ভাবিতে ভাবিতে শেষটা যেন ধূ ধূ

করিয়া একটুকু একটুকু মনে পড়িতেছিল,যেন এক সময়ে পিতাঠাকুরের কোন আত্মীয়ের মুখে শুনিয়াছিলেন, তিনি পরমানন্দের নিকট টাকা ধার করিবেন। পরে মৃত্যুর পূর্ব্বে পিতা ঠাকুর এই টাকা ধার করিয়াছিলেন কি না, এপর্য্যন্ত ঘুণাক্ষরেও ইহার কিছুই জানিতে পারেন নাই। ভবানীশঙ্কর দলিল কিনিয়া নিয়ে মোকদ্দমা করিতেছেন,ইহাতে হরগোবিন্দের মনে কিছু সন্দেহ উপস্থিত হইয়াছে। কিন্তু আজ আর হরগোবিন্দের সুতীক্ষ্ণ মস্তিষ্ক, এই বিষয়ের চিন্তার দিকে কিছুতেই ধাবিত হইতেছে না। হরগোবিন্দ কেবল মনে মনে ঠিক করিয়া রাখিয়াছেন,যদি ঘটনা দ্বারা দেখি যে, মোকদ্দমা সত্য হইবার অনেক সম্ভাবনা আছে, তাহা হইলে পিতৃঋণ পরিশোধ করিবার জন্য যদি আমাকে পথের ভিখারীও হইতে হয়, তাহাতেও অক্লান্তচিত্তে স্বীকৃত হইব। এই ঠিক করিয়া, কলিকাতার বাসায় টেলিগ্রাফ করিবার কালে হরগোবিন্দ, কলিকাতাস্থ বন্ধুকে লিখিয়াছেন—"অদ্যকার দিনের গাড়ীতেই বাসার সকলকে পাঠাইয়া দিয়া, বাড়ীওয়ালাকে সমস্ত ভাড়া চুকাইয়া দিবেন। আজ হইতে বাড়ী ছাড়িয়া দিবেন। আর আপনার নিজ তহবিল হইতে আমাকে কিছু টাকা ধার পাঠাইবেন।" ইত্যাদি ইত্যাদি

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ।

হরগোবিন্দ—বিচার-গৃহে।

হরগোবিন্দ যখন নির্জ্জনে নানা কথা ভাবিতেছিলেন, তখন হঠাৎ একজন লোক গম্ভীরস্বরে চিৎকার করিয়া হাঁকিতে লাগিল—"হরগোবিন্দ রায় প্রতিবাদী হাজির—? হরগোবিন্দ রায় প্রতিবাদী হাজির—? ইত্যাদি ইত্যাদি। এই প্রকার তিন বার হাঁকিয়াই যে লোকটা হাঁকিতেছিল, সে নীরব হইল। কিন্তু লোকটার গলার শব্দ থামিবার পূর্ব্বেই হরগোবিন্দ রায়,সেই লোকারণ্যের ভিড় ঠেলিয়া, একবারে বিচারকের সম্মুখেই আসিয়া উপস্থিত হইলেন। বিচারালয়ে হরগোবিন্দের জন্যও একখানি বেত্রাসন প্রস্তুত ছিল। মহারাজা কৃষ্ণগোপাল রায় মুখোপাধ্যায় বাহাদুরের কনিষ্ঠ পুত্র বিচারকদের কাছে এই প্রকার সম্মান পাইবার অধিকারী বলিয়াই,তথাবিধ বন্দোবস্ত হইয়াছিল। কিন্তু হরগোবিন্দ বেত্রাসনে না বসিয়া, বরাবর গিয়া প্রতিবাদীর নির্দ্দিষ্ট

স্থানেই দাঁড়াইলেন। হরগোবিন্দের আগমনের সঙ্গে সঙ্গে সত্য সত্যই বিচার-গৃহে যেন একটা স্বর্গীয় গাম্ভীর্য্য উপস্থিত হইল। কেন হইল কে বলিবে? কোন স্থানে সাধুদের আগমনে কি এইরূপই হয়? সকল লোকই যেন হরগোবিন্দের সেই আড়ম্বরশূন্য গম্ভীরমূর্ত্তি দেখিয়া, স্তম্ভিত অবাক্ এবং চমৎকৃত হইল। যেন কিছু একটা অজ্ঞাত স্বর্গীয় শাসন-শক্তি আসিয়া, সকলের মনকে শাসিত করিয়া, চপলতা হইতে এক অপূর্ব্ব গাম্ভীর্য্যের মধ্যে আনিয়া ফেলিল। হরগোবিন্দ, বিচারালয়ের নিয়ম লঙ্ঘন করিয়া নির্দ্দিষ্ট হলপের বাঁধা গদ কয়টী না আওড়াইয়াই, সর্ব্বপ্রথমে নিজেই বিচারাসনোপবিষ্ট. বিচারকের দিকে চাহিয়া গম্ভীরস্বরে, গম্ভীরভাবে বলিলেন—"আমাকে কি জিজ্ঞাসা করা হইবে?"

বিচারক।—"আপনার নাম হরগোবিন্দ রায়?"

হরগোবিন্দ।—"আজ্ঞে হ্যাঁ। আমার নাম হরগোবিন্দ রায়।"

বি।—"আপনার পিতার নাম কৃষ্ণগোপাল রায়।"

হর।—"হ্যাঁ আমার পিতৃদেবের নাম কৃষ্ণগোপাল রায়।"

বি।—"কতদিন তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে?"

হরগোবিন্দ।—"প্রায় দুই বৎসর।"

বি।—"তিনি যে পরমানন্দ মাড়োয়ারীর নিকটে সমস্ত সম্পত্তি বন্ধক রাখিয়া, এককোটি পঁচিশলক্ষ টাকা ধার করিয়াছিলেন, তাহা আপনি জানেন?"

হর।—"অনেক দিন পূর্ব্বে আমার বোধ হয় পিতার কোন আত্মীয়ের নিকট এই প্রস্তাবের আভাস মাত্র জানিতে পাইয়াছিলাম। তাঁহার মৃত্যুর কিছুদিন পূর্ব্বে আমি স্থানান্তরে থাকাতে এসম্বন্ধে কিছুই অবগত হইতে পারি নাই। এপর্য্যন্ত আমাকে কেহ কিছু বলেও নাই। কেবল কাল কলিকাতায় বসিয়া এই মোকদ্দমার একখানি সমন পাইয়াছি। আমার একজন কর্ম্মচারী আমাকে পাঠাইয়া দিয়াছিলেন।"

বিচারক, হরগোবিন্দর হাতে বহুমূল্য ষ্ট্যাম্প্ কাগজে লিখিত একখানি দলিল দিয়া বলিলেন—"দেখুন ত, এই দলিলে যে স্বাক্ষর আছে, ইহা আপনার পিতাঠাকুরের হাতের কিনা? এই দলিল সম্বন্ধে আপনার কোন সন্দেহ আছে কি?"

হরগোবিন্দ, গম্ভীরভাবে দলিল খানি হাতে করিয়া মনোযোগের সহিত

ভাল করিয়া দেখিয়া অতি বিনীতভাবে বলিলেন—"আজ্ঞে হ্যাঁ। এ দলিলে যে স্বাক্ষর আছে,ইহা আমার পিতা ঠাকুরের স্বাক্ষর বলিয়াই আমার নিশ্চিত বিশ্বাস হইতেছে। আর এই দলিল সম্বন্ধে সন্দেহ করিবারও কিছুই আমি দেখিতেছি না।"

বি।—"তবে বাদী আপনার নিকটে যে টাকার দাবি করিতেছেন, তাঁহা সহজে দিতে আপনার আপত্তি কি?"

হর।—"যখন ঘটনার কতক অংশ সত্য বলিয়া বোধ হইতেছে, তখন আমি আমার এই পিতৃ-ঋণ পরিশোধ করিয়া, পিতৃদেবকে লোকত, ধর্ম্মত কলঙ্ক-মুক্ত করিতে, কিছুতেই অপ্রস্তুত নই। এখন আপনি উচিত বিচার করিয়া, যাঁহার প্রাপ্য ঠিক করিয়া দিবেন, আমি টাকা তাঁহাকেই দিব।"

এখনও দর্শকদিগের এবং ভবানীশঙ্করের পক্ষের সমস্ত লোকের ধারণা ছিল, "বিষয় সম্পত্তি যে তাঁহার বা তাঁহার পিতাঠাকুরের নয়, তাহা অন্য ব্যক্তির, হরগোবিন্দ, অতঃপর হয় ত, পিতৃদেবের এই তঞ্চকতা-পূর্ণ কৌশলাস্ত্র ব্যবহার করিয়া ঋণদাতার পক্ষকে নিরস্ত করিতে চেষ্টা করিবেন। হয়ত এই জন্যই বা এতক্ষণ সরলভাবে এই সকল কথা কহিতে-ছিলেন। বস্তুত মানুষ যে এত দূর ত্যাগ স্বীকার করিয়া আপনার ধর্ম্ম রক্ষার জন্য, সামান্য মিথ্যা প্রবঞ্চনার ভয়ে একবারে রাজার উচ্চপদ হইতে পথের ফকীর হইতে পারে, একথা উপস্থিত ব্যক্তিদিগের প্রায় কাহারও অনুভবের আয়ত্তাধীন হইতেছিল না। সুতরাং কিছু ক্ষণের জন্য সেই একগৃহ লোকের মধ্যে ভয়ানক কাণা কাণি ও অস্পষ্ট গোলমাল উপস্থিত হইল। ভবানীশঙ্করের উকিল বারিষ্টারগণ, তৎক্ষণাৎ,গভীর প্রতিভাশালী,সুতীক্ষ্ণবুদ্ধি হরগোবিন্দ রায়ের সমস্ত যুক্তি তর্ক জল করিয়া দিবার আশায় উৎকর্ণ হইয়া দাঁড়াইলেন। কিছুক্ষণের জন্য যেন চারি দিকে একটা হুলস্থূল কাণ্ড পড়িয়া গেল। বিচারকের আসন পর্য্যন্ত এ সন্দেহের এবং আন্দোলনের বায়ুতে কম্পিত হইল। বিচারকও মনে মনে নিরপেক্ষভাবে সত্ত্ব সাব্যস্ত-সম্বন্ধীয় আইন সকলের বিধি আলোচনা করিতে লাগিলেন। এই অবসরে মহাত্মা হরগোবিন্দ সেই পূর্ব্বের মতই স্বর্গীয় গাম্ভীর্য্যের অবতার স্বরূপে দাঁড়াইয়া, সকলের অজ্ঞাতসারে, ধ্যাননিমজ্জিতচিত্তে সর্ব্বজন-রক্ষা-কর্ত্তা ভগবান্‌কে মনে মনে স্মরণ করিতেছিলেন। এখনও তাঁহার কোলে পবিত্রাত্মা নির্ম্মলচন্দ্রকে দেখিয়া ভাবে গদগদ হইতেছিলেন। এ দিকে প্রহরীদের

অক্লান্ত চেষ্টায় কিছুক্ষণ পরেই আবার ধীরে ধীরে চারি দিকের সমস্ত গোল থামিয়া গেল। কিন্তু তখনই ভবানীশঙ্করের পক্ষের একজন ব্যারিষ্টারের অনুরোধে বিচারক পুনরায় হরগোবিন্দের সেই সুগম্ভীর মুখশ্রীর দিকে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"যে বিষয় সম্পত্তি বন্ধক রাখিয়া আপনার পিতাঠাকুর এই টাকা ধার করিয়াছেন, সে সম্পত্তি কাহার?" এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসার পরে যেন সেই গৃহমধ্যস্থিত সহস্র সহস্র লোকের চক্ষু কর্ণ একমাত্র হরগোবিন্দ রায়কেই বিষয়ীভূত করিল। সর্ব্বত্র পুনরায় অখণ্ড স্তব্ধতা বস্তৃত হইল।

হর।—"এই বিষয় সম্পত্তি আমার ৺পিতৃদেবের দুইটী গুরু পুত্রের নামে বিনামী করা হইয়াছিল। ৺পিতৃদেব কি উদ্দেশ্যে এই কাজ করিয়াছিলেন, তাহা বলিতে পারি না। কিন্তু ঐ দুই গুরুপুত্র এবং তাঁহাদের বংশের কেহই এখন বর্ত্তমান নাই। আমি যত দূর জানি, তাহাতে বলিতে পারি, যাহাদের নামে ইহা বিনামী করা হইয়াছিল, তাঁহারা ইহা ঘুণাক্ষরেও জানিতেন কি না সন্দেহ। আমার স্বর্গগত পিতৃদেবের চরিত্রে দোষারোপ করিতে আমার প্রাণ বিদীর্ণ হয়। কিন্তু ভগবানের নির্দ্দিষ্ট সত্য সকল পিতা মাতার অপেক্ষাও উচ্চতর আসনে প্রতিষ্ঠিত। সেই সত্যের অনুরোধে এই পর্য্যন্ত বলিতে পারি, এই সকল চক্রান্ত সম্পূর্ণ মিথ্যা। এই সমস্ত সম্পত্তিই আমার পিতৃদেবের এবং তাঁহার উত্তরাধিকারী আমাদের। ৺পিতাঠাকুরের এই ঋণশোধের জন্য আমার এই সমস্ত সম্পত্তি বিক্রয় করা যাইতে পারিবে। বোধ হয়, আমার সমগ্র স্থাবরাস্থাবর সম্পত্তি বিক্রয় করিলে এই টাকা অনায়াসেই পরিশোধিত হইবে। যদি কিছু উদ্বৃত্ত হয়, তবে যেন গভর্ণমেণ্ট হইতে আমার সেই স্বর্গীয় পিতৃদেবের নামে, দেশের গরিব লোক ও স্ত্রীজাতির সাহায্য এবং উন্নতির জন্য তাহা দ্বারা কোন প্রকার সদনুষ্ঠান করা হয়। আমি এই আদালতের হস্তে আমার সমস্ত স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তি ছাড়িয়া দিলাম।"

এই বলিয়া, হরগোবিন্দ, তখনই দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া সমস্ত সম্পত্তির তালিকা লিখিয়া, অতি বিনয়ের সহিত তাহা বিচারকের হাতে দিলেন। বিচারক গম্ভীরভাবে তালিকা পড়িতে আরম্ভ করিলেন। এই অবসরে হরগোবিন্দ, হাতের আঙ্গুল হইতে একটী মূল্যবান্ অঙ্গুরীয় এবং গায়ের মোটা থানের চাদরখানি বিচারকের সম্মুখে রাখিয়া, ধীর ও বিনীতভাবে বলিলেন,—"তালিকায় লিখিত দ্রব্যাদি সমস্তই আমার গৃহে পাওয়া যাইবে। আমার পরিবারবর্গের সঙ্গে কলিকাতাতে কিছু জিনিষ পত্র

আছে। তাঁহাদের আজ সন্ধ্যার মধ্যেই এখানে আসিবার কথা। তাঁহারা আসিবামাত্রই, সে সকল পাঠাইতে চেষ্টা করিব। আমার সঙ্গে যাহা ছিল, তাহার মধ্যে এই অঙ্গুরীয় এবং চাঁদরখানি এখনই দিয়া যাইতে সমর্থ হইলাম। অবশিষ্ট গায়ের জামা, পরিধানের কাপড় এবং পাদুকা কিছুক্ষণ পরেই অথবা অন্যান্য দ্রব্যাদির সঙ্গেই পাঠাইব। আমার নিজের কিছুই নাই। এ সমস্তই ৺ পিতৃদেবের। সেই স্বর্গগত পিতৃদেবের নামেই আমার সমস্ত সম্পত্তি উৎসর্গীকৃত হইল। যদি ইহাতেও ঋণশোধ না হয়, তবে অবশিষ্ট টাকাও পরিশোধ করিতে আমি দায়ী রহিলাম। গভর্ণমেণ্ট হইতে তাহা কোন প্রকাশ্য সম্বাদপত্রে প্রকাশিত হইলে, আমি জীবিত থাকিলে, সে টাকা গভর্ণমেণ্টের নিকটেই পাঠাইব। আর যদি দুর্ভাগ্যবশত প্রাপ্য টাকা সংগ্রহ করিতে না পারি, তজ্জন্য যে বিহিত বিধান আছে, তদনুসারে যদি উত্তমর্ণগণ আমাকে কারাদণ্ড দিয়া সুখী হন, তাহাও আমি অক্লান্তচিত্তে ভোগ করিতে সম্মত আছি।" এই বলিয়াই হরগোবিন্দ অতি গম্ভীরভাবে বিচারগৃহ পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলেন।

এই ঘটনাতে বিচারপতির সহিত বিচারগৃহের সেই এক ঘর লোক প্রায় অর্দ্ধঘণ্টা পর্য্যন্ত অবাক্, স্তম্ভিত এবং নিস্পন্দ হইয়া, স্থিরভাবে রহিল। সেই জনতাপূর্ণ নিস্তব্ধ গৃহ হইতে হরগোবিন্দ রায় বাহির হইয়া গেলে, সকলেই এক সঙ্গে অনুভব করিতে লাগিল, যেন গৃহের, মধ্যহইতে একটা স্বর্গের তেজ এবং জ্যোতির স্রোত হঠাৎ অন্তর্হিত হইল, যেন সাধু হরগোবিন্দের সেই স্বর্গীয় গাম্ভীর্য্য ও সত্যনিষ্ঠাপূর্ণ পবিত্র তেজ এবং জ্যোতি তাড়িত যন্ত্রস্থিত তাড়িতের মত গৃহস্থিত প্রতি ব্যক্তির হৃদয়ে হৃদয়ে প্রবেশ করিয়া, তাহা আলোড়িত ও কম্পিত করিয়া তুলিল। পাষণ্ড ভবানীশঙ্করেরও মুখের উপরে হঠাৎ যেন একখানি মেঘ সাজিল। এ জয়েই আজ ভবানীর পরাজয় হইল। কিন্তু ভবানী এখনও তাহা ভালরূপে বুঝিল না। কেবল প্রাণে নিঃশব্দে যে একটী আঘাত হইল, তাহাতেই ভবানীশঙ্করের মুখ মলিন হইয়া উঠিল। হরগোবিন্দ,আর কাহাকেও দেখা না দিয়া, একটী নির্জ্জন স্থানে একাকী দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া, কলিকাতার দিক্ হইতে যে গাড়ী আসিবার কথা ছিল, তাহারই জন্য অপেক্ষা করিতে লাগিলেন।

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ।

শেষ অভিনয়।

বেলা তিন ঘটিকার পূর্ব্বেই হরগোবিন্দ বিচারগৃহ হইতে বাহির হইয়া নির্জ্জন স্থানে একাকী বসিয়া বিশ্রাম করিতেছিলেন। রাত্রি সাতটা কুড়ি মিনিটের সময় একটা গাড়ী ঝড় তুফানের মত শব্দ করিয়া কলিকাতার দিক্ হইতে আসিয়া ষ্টেশনে সংলগ্ন হইল। হরগোবিন্দ তাড়াতাড়ি উঠিয়া তখনই ষ্টেশনে আসিলেন। কিন্তু হরগোবিন্দ ষ্টেশনে পা ফেলিবার পূর্ব্বেই গাড়ী খানি যেন তাঁহাকে ব্যঙ্গ করিতে করিতে ফোঁস্ ফোঁস্ শব্দে পুনরায় ছুটিয়া চলিল। হরগোবিন্দ আশা করিয়াছিলেন, তাঁহার বন্ধু এই গাড়ীতেই পাষাণী প্রভৃতিকে নিয়ে যথা সময়ে আসিয়া পৌঁছিবেন। এই জন্য গাড়ী চলিয়া গেলেও হরগোবিন্দ ষ্টেশনে তাঁহার বন্ধুকে খুঁজিতে লাগিলেন। কিন্তু অনুসন্ধানে কাহাকেও না দেখিয়া, শেষটা বন্ধুর নাম করিয়া দুই একবার ডাকিলেন। তাঁহার সেই ডাকের উত্তরে দূরে প্রতিধ্বনি ব্যতীত আর কেহই কোন রূপ শব্দ করিল না। হরগোবিন্দ এবার বন্ধুর আগমনের বিষয়ে নিরাশ হইলেন। মনে করিলেন, হয়ত পরের গাড়ীতে আসিবেন। এখনও হরগোবিন্দের স্নান, আহার কিছুই হয় নাই। কিন্তু হরগোবিন্দ, সেই অবস্থায়ই ষ্টেশনের একখানি চারিদিক্ খোলা ঘরে, একখানি "বেঞ্চের" উপরে শুইয়া বিশ্রাম করিতে লাগিলেন। হরগোবিন্দের সঙ্গে তখনও কিছু টাকা পয়সা ছিল। কিন্তু হরগোবিন্দ, এখন আর উহাতে নিজের কোনই অধিকার আছে,মনে করিলেন না। কেবল ভুলক্রমে উহা বিচারককে দিয়া আসেন নাই। হরগোবিন্দ প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন, "আজ হইতে পিতৃদেবের বিষয় সম্পত্তি সমস্তই ঋণদাতার হইল। এই জন্য সঙ্গের টাকা পয়সা খরচ করিয়া কিছু কিনিয়া খাইতে,কিছুতেই হরগোবিন্দের মন সরিতেছিল না। উহা ধারস্বরূপে ব্যয় করাও হরগোবিন্দ অন্যায় বোধ করিলেন।

বিচারালয় হইতে হরগোবিন্দ বাহির হইয়া আসিবার কিছুক্ষণ পরেই শত শত লোক হরগোবিন্দের সঙ্গে দেখা করিবার জন্য ছুটিল। কিন্তু তখন আর হরগোবিন্দকে খুঁজিয়া না পাওয়াতে, কাহারও আশা পূর্ণ হইল না। তথাপি

রেলওয়ে ষ্টেশনে ও বিচারালয়ের সম্মুখে দলে দলে লোক আসা যাওয়া করিতে লাগিল। একদল নিরাশ হইয়া ফিরিয়া যাইতেছিল, আর একদল নবোৎসাহে ছুটিয়া আসিতেছিল। কিন্তু রাত্রি সাতটার পূর্ব্বে কাহারও সঙ্গে হরগোবিন্দের দেখা হইল না। সাতটা কুড়ি মিনিটের গাড়ী চলিয়া গেলে, সেই খোলা ঘরে অনেক রাত্রি পর্য্যন্ত বহু লোকের সঙ্গে হরগোবিন্দ প্রফুল্ল-চিত্তে, সহাস্যমুখে আলাপাদি করিলেন। শেষ রাত্রিতেও কলিকাতার দিক্ হইতে আর একটা আরোহীর গাড়ী আসিয়া ষ্টেশনে লাগিল। হরগোবিন্দ আবার অনুসন্ধান করিলেন। এবারও বন্ধুর বা পরিবারবর্গের কাহারও কোনরূপ সন্ধান পাইলেন না। এবারও তাঁহারা আসেন নাই।

সমস্ত রাত্রিই হরগোবিন্দের ভাল ঘুম হয় নাই। একে কখন্ গাড়ী আসিয়া চলিয়া যায়, এই চিন্তা; তাহার পরে সমস্ত রাত্রি মালগাড়ীর হড়-হড়ানি ঘরঘরানিতে, মাঝে মাঝে ষ্টেশনের লোকদের হাঁক্ ডাকে ও চীৎ-কারে, আবার বিপরীত দিকের একখানি আরোহীর গাড়ী আসিয়া চলিয়া যাওয়াতে, তাহার আরোহীদের "জল—জল—,পান—পান—" ইত্যাকার শব্দে এই ক্ষুদ্র ষ্টেশনে ঘুমাইবার কোনই সুবিধা হয় নাই। আর রেলওয়ের কর্ত্তৃপক্ষও তৃতীয় এবং মধ্যম শ্রেণীর আরোহী অথবা সাধারণত হতভাগ্য দেশীয়দের বিশ্রামের জন্য যে বন্দোবস্ত করিয়াছেন, তাহাতে লোকদিগকে কেবল দারুণ কষ্টই ভোগ করিতে হয়। সেখানে শুইয়া ঘুমান দূরে থাক্, এক আধ ঘণ্টার জন্য বসিয়া থাকাও কঠিন। রাত্রি প্রভাতে হরগোবিন্দের অনুসন্ধানে আবার শত শত লোক দলে দলে আসিতে আরম্ভ করিল। যে ষ্টেশনে হরগোবিন্দ আছেন, সেখান হইতে তুলসীগ্রাম অনেক দূরে। আরও দুই তিনটী ষ্টেশন পার হইয়া তুলসীগ্রাম রেলওয়ে ষ্টেশনে উপস্থিত হইতে হয়। রাত্রির গাড়ীতেই তুলসীগ্রাম হইতে বহু সংখ্যক লোক হরগোবিন্দের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে আসিয়া, রাত্রি প্রভাত হইবার অপে-ক্ষায় চারিদিকে বিশ্রাম করিতেছিল। প্রভাত সময়েই ষ্টেশনে, তীর্থক্ষেত্রে তীর্থযাত্রীর মত বহু লোকের ভিড় হইল। যে হিন্দুজাতি, মানবের মহত্ত্বকে দেবত্বের আসনে বসাইয়া পূজা করিতে প্রস্তুত, ভবানীশঙ্করের মত কপটাচারী হিন্দুকুলাঙ্গার ব্যতীত সেই হিন্দুসন্তান হইয়া, কোন মহাত্মা সাধুর সাধুতাকে পায়ে দলন করিবে, ইহা স্বপ্নেও কল্পনা করা অন্যায়। কিন্তু আজ কেবল হিন্দু নহে; হিন্দু, মুসলমান, খ্রীষ্টান যেখানে যে ছিল, যে হরগোবিন্দকে

জানিত বা চিনিত, সে-ই, মহাত্মা হরগোবিন্দের সঙ্গে দেখা করিতে ছুটিয়াছে। আজ মহারাজা কৃষ্ণগোপালের পুত্র হরগোবিন্দের ফকীরবেশ দেখিয়া, চারিদিকে যেন শোকের কোলাহল পড়িয়াছে। পরোপকারী, সাধু, মহাত্মা, পণ্ডিত প্রবর হরগোবিন্দকে দীন-বেশে দেখিয়া, আজ আর কেহই চক্ষুর জল থামাইয়া রাখিতে সমর্থ হইতেছে না। হরগোবিন্দ, প্রভাতের পূর্ব্বেই নিকটের একটী নির্জ্জন ক্ষুদ্র বনের মধ্যে গিয়া, বসিয়া আছেন। হরগোবিন্দ, বনের মধ্যে কোথায়ও ফল বা অন্য কিছু খাবার মত জিনিষ না পাইয়া, অবশেষে আজ পিত্তি রক্ষার জন্য বনের একটী পুকুরের পাড়ের গা হইতে একটুকু পরিষ্কার আটাল মাটি তুলিয়া, তাহাই মুখে দিয়া, অঞ্জলি অঞ্জলি জল খাইয়া পেট ভরাইয়াছেন। আর সেই বনের পাখীর সঙ্গীত মাখা নির্জ্জন নিস্তব্ধ কোলে বসিয়া, পুনরায় আর একবার প্রিয় নির্ম্মলচন্দ্রকে বিশ্বমাতার অনন্ত কোলে দেখিতে চেষ্টা করিতেছেন।

এদিকে বেলা দশটা আঠার মিনিটের সময় কলিকাতার ওদিক্ হইতে আর একখানি গাড়ী ষ্টেশনে আসিয়া সংলগ্ন হইল। কি দুর্ঘটনা! অনেক সময় এইরূপই হয়। স্বপ্নে যেমন ভয় পাইয়া দৌড়াইতে গেলে, এক পাও চলা যায় না, ঘোরতর বিপদের সময়ে সুবিধার জন্য যাহা মনে ভাবিয়া ঠিক করিয়া রাখা যায়, তাহাও যেন তেমনই আর কিছুতেই কাজে পরিণত হইতে চায় না। অবিশ্বাসী এইরূপ স্থলে অধীর হইয়া মনের যাতনায় অস্থির হয়। বিশ্বাসী, এই অন্ধকারেও ভগবানের মঙ্গলেচ্ছার গর্ভে এক জ্যোতির্ম্ময় রাজ্য দেখিয়া আশ্বস্ত হন। হরগোবিন্দ, এবারও ছুটিয়া ষ্টেশনে আসিয়া, বন্ধু বা পরিবারের কাহারও সাক্ষাৎ পাইলেন না। হরগোবিন্দ, এবার মনে মনে একটুকু হাসিয়া ফেলিলেন। মনের হাসি বাহিরেও ঈষৎ ফুটিল। হাসিতে হাসিতে মনে মনেই বলিলেন—"মা তুমি কত খেলাই জান। আমি সেদিন রাত্রিতে কলিকাতার ষ্টেশনে, আসিতে আসিতে তোমাকে বলিয়াছিলাম—"আমাকে তুমি অবিশ্বাসী কো'র না।" মা, আজ কি তাই তুমি সন্তানের বিশ্বাস পরীক্ষা করিতেছ? মা, দুর্ব্বল সন্তান কি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে পারে? মশা মারিতে কামান পাতিয়াছ? হীন আমি, দুর্ব্বল আমি, আমাকে তোমার করুণার ছায়ায় আশ্রয় দেও। মা, আমি যেন তোমাকে অবিশ্বাস করি না, আমাকে এই আশীর্ব্বাদ কর।" বলিতে বলিতে ক্ষণকালের জন্য হরগোবিন্দের চোক দুইটী আপনা হইতেই বুঝিয়া গেল।

এদিকে দর্শনার্থী লোকেরা, দর্শনীয় হরগোবিন্দকে না দেখিতে পাইয়া, এতক্ষণ বড়ই দুঃখ প্রকাশ করিতেছিল। এখন হঠাৎ একবারে তাঁহাকে সম্মুখেই উপস্থিত দেখিয়া, চারিদিক্ হইতে হাজার হাজার লোক আসিয়া ঘিরিয়া ফেলিল। হরগোবিন্দও, সাতিশয় বিনয় এবং ভদ্রতার সহিত সেই অর্দ্ধপক্বকেশযুক্ত মস্তকটী অবনত করিয়া, প্রফুল্ল মুখে, সুমিষ্ট আলাপে সকলকেই যথাসাধ্য পরিতুষ্ট করিতে চেষ্টা করিতে লাগিলেন। যাঁহারা বিরক্ত হইয়া ভবানীশঙ্করকে মন্দ বলিতে লাগিলেন, হরগোবিন্দ, বিষণ্ণ-মুখে, বিনীত ভাবে তাঁহাদিগকে বুঝাইয়া বলিলেন যে, "ভবানীশঙ্কর আপনার পাওনা টাকার জন্য আমার নামে নালিশ করিয়াছিলেন। তিনি নালিশ না করিয়া শুধু আমাকে বলিলেই, এখন যাহা করিলাম, তখনও তাহাই করিতাম। কিন্তু তাঁহার তাহাতে বিশ্বাস হয় নাই বলিয়াই, তিনি আমার নামে মোকদ্দমা উপস্থিত করিয়াছিলেন। ইহাতে তাঁহার কোন অপরাধ হয় নাই। তিনি আমার স্নেহ পাত্র। তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন কৃতবিদ্য ছাত্র। এখন দেশের শিক্ষিত দলের মুখপাত্র সম্প্রদায়ভুক্ত। সমাজে এবং গভর্ণমেণ্টের নিকট তাঁহার প্রচুর সম্মান হইয়াছে। আমি ইহাতে বড়ই সন্তুষ্ট হইয়াছি। তবে তাঁহার চরিত্রে ধর্ম্ম এবং নীতির প্রভাব বিস্তারিত হউক্, এজন্য আমি সর্ব্বদাই ভগবানের নিকট প্রার্থনা করিয়া থাকি। আপনারাও প্রার্থনা করুন। তাঁহাকে মন্দ বলিলে কোনই লাভ হইবে না। তিনি ভাল হইলে, সোণায় সোহাগা হইবে।"

এইরূপে আলাপাদি করিতে করিতেই বেলা গেল। আবার সন্ধ্যা আসিল। এবার রাত্রি সাতটা কুড়ি মিনিটের গাড়ী ষ্টেশনে সংলগ্ন হইবা-মাত্রই,স্ত্রীলোকদের গাড়ীর মধ্য হইতে একটী সতের আঠার বৎসরের মেয়ে, রেলওয়ে সম্পর্কীয় একজন লোককে একটুকু চেঁচিয়া জিজ্ঞাসা করিল—"হ্যাঁগা, এই ষ্টেশনে, তুলসীগ্রামের জমিদার হরগোবিন্দ রায় নামে একটী মানুষকে, কলিকাতা হইতে গাড়ীতে তাঁহার পরিবার পরিজনেরা আসিবেন বলিয়া, কোথায়ও অপেক্ষা করিতে দেখিয়াছেন কি? তাঁহার কোন খপর দিতে পারেন? আমাদের সঙ্গে কোন ভদ্র পুরুষ নাই। দুই একজন অপর লোক আছে। তাহারাও অন্য গাড়ীতে। আমরা সবগুলি পাড়া-গেঁয়ে স্ত্রীলোক। আপনারা অনুগ্রহ করিয়া তাড়াতাড়ি সেই ভদ্রলোকটীর একটুকু খোঁজ করিয়া দিলে বড়ই উপকৃত হইব। মেয়েটীর যেমন সুন্দর

মনোমুগ্ধকারী ভালবাসা-মাখা ছবিখানি, তেমনই সুমধুর কথাবার্ত্তা। তাহার উপরে আবার এইরূপ নিঃসঙ্কোচ সরল ভাব ও নির্ভীকতা দেখিয়া, চারি দিকের লোকগুলি যেন কেবল আপনাদের চির অভ্যাস-দোষের পরিচয় দিতেই, কিছু না বলিয়া শুধু ফ্যাল্ ফ্যাল্ করিয়া তাহারই দিকে চাহিয়া রহিল। পাষাণী তখন বেগোছ দেখিয়া, নিজেই নামিয়া পড়িয়া, অন্য গাড়ী হইতে চাকরদিগকে ডাকিয়া, গাড়ীর সমস্ত জিনিষ পত্র ও স্ত্রীলোকদিগকে তাড়াতাড়ি ষ্টেশনের "প্লাট্‌ফরমে"ই নামাইতে প্রবৃত্ত হইল। তখন অপর দিক্ হইতে খপর পাইয়া, হরগোবিন্দও আসিয়া, সত্বর-হস্তে এই সকল কাজের অংশ নিলেন।

গাড়ী মুহূর্ত্তপরেই চলিয়া গেলে, হরগোবিন্দ সকলকে একটী নির্জ্জনস্থানে বসাইয়া, তখনই একখানি ঘোড়ার গাড়ী ডাকিলেন। পাষাণী ইত্যবসরে ঠাকুরদাদা মহাশয়কে সংক্ষেপে কলিকাতার ইতিহাস কিছু কিছু বলিতে প্রবৃত্ত হইয়া, বলিতে লাগিল—"জয়কৃষ্ণ বাবুর হঠাৎ ভয়ানক জ্বর হইয়াছে। বোধ হয়, আমাদের সঙ্গে সঙ্গে এই কয়দিন রাত্রি জাগিয়াছেন এবং অনেক কষ্ট করিয়াছেন বলিয়াই, এইরূপ হইয়াছে। তাই আমরা কাল আসিতে পারি নাই। আজও আসিতে কাহারও সাহস হইতেছিল না। শেষটা ভগবানের নামে আমিই সাহস করিয়া, সকলের ভার তাঁহারই হাতে দিয়া, চলিয়া আসিয়াছি। ইহা না করিলে কয় দিন পরে যে আমরা আসিতে পারিতাম, বলিতে পারি না। পথে আসিতে আসিতে একটা ষ্টেশনে একটী লোক আমাদিগকে এ দিক্‌কার সব খপরই বলিয়াছে। শুনিয়া আমার মনে কেনই যেন কোন প্রকার বিমর্ষভাব আসে নাই। কিন্তু তাহার একটুকু পর থেকেই দিদীমার মধ্যে মধ্যে ভয়ানক "ফিট্" হইতেছে। গাড়ীতে অনেকবার "ফিট্" হইয়াছে। কথাটা আমি আর দিদীমাই আগে শুনিয়াছি। পরে সরস্বতীকেও বলিয়াছি। একটা হৈ, চৈ, গোলমাল উপস্থিত হইবে বলিয়া, আর কাকেও কিছু জানিতে দেই নাই। এই নিন্, জয়কৃষ্ণ ঠাকুরদাদা মহাশয় আপনাকে এই নোটগুলি দিয়াছেন। বো'লে দিয়াছেন, "ধার দিলাম।" এক্ হাজার টাকা দিয়াছেন।" এই বলিয়া পাষাণী হরগোবিন্দের হাতে নোটগুলি খুলিয়া দিয়া তাড়াতাড়ি দিদীমার কাছে গিয়া তাঁহাকে ধরিয়া বসিল। সিদ্ধেশ্বরী ভয়ানক অসুস্থ। আকস্মিক দারুণ মনের কষ্টই এই মূর্চ্ছারোগের কারণ, ইহা নিশ্চিতই অবধারিত হইয়াছে

হরগোবিন্দ, পরম বন্ধু জয়কৃষ্ণ বাবুকে পাষাণীদের সঙ্গে না দেখিয়া, এবং পাষাণীকেও টাকার কথা কিছু বলিতে না শুনিয়া, ঘোড়ার গাড়ী ডাকিয়াই ভাবিতেছিলেন, "টাকার কি হবে?" এখন পাষাণীর নিকট টাকা পাইয়া মনে মনে বারম্বার ভগবান্‌কে ধন্যবাদ দিলেন। পরে তাড়াতাড়ি নিজেই একটা কাপড়ের দোকানে গিয়া তখনই এক থান কাপড় কিনিয়া আনিলেন। এ দিকে ভৃত্যেরা হরগোবিন্দের আদেশেই আরও দুই খানি ঘোড়ার গাড়ী ডাকিয়া, সমস্ত জিনিষপত্রগুলি গাড়ী তিন খানির ছাদে তুলিয়া তুলিয়া সাজাইতে লাগিল। হরগোবিন্দ আসিয়া সিদ্ধেশ্বরী আর পাষাণীকে থাকিতে বলিয়া,অপর সকলকেই গাড়ীতে উঠিতে বলিলেন। যাহারা ঘুণক্রমেও বর্ত্তমান ঘটনা কিছুই জানিতে পারে নাই, তাহারা সকলেই নিরাপত্তিতে গাড়ীতে উঠিয়া বসিল। কিন্তু সরস্বতী কিছুতেই তদ্রূপ করিতে সম্মত হইল না। তখন অগত্যা হরগোবিন্দ গোলমালের ভয়ে তাহাকেও থাকিতে আদেশ দিলেন। গাড়ী প্রস্তুত হইলে হরগোবিন্দ সেই নূতন থানটী ফাঁড়িয়া ফাঁড়িয়া সিদ্ধেশ্বরী,পাষাণী ও সরস্বতী প্রত্যেককেই এক একখানি নূতন কাপড় পরিতে দিয়া, পরিধানের সমস্ত কাপড় ছাড়িয়া দিতে বলিলেন,এবং নিজেও তদ্রূপই করিলেন। অতঃপর একখানি গাড়ীর কোচ্‌বাক্সের উপর হইতে একজন বহুদিনের বিশ্বাসী বৃদ্ধ দ্বারবান্‌কে একটুকু দূরে ডাকিয়া নিয়ে,হরগোবিন্দ রায় তাহাকে সব কথাই খুলিয়া বলিলেন। কথা শুনিতে শুনিতে দ্বারবানের দুই চোক হইতে ধারা বহিয়া জল পড়িতে লাগিল। কিন্তু হরগোবিন্দের বিশেষ অনুরোধে সে আর দ্বিরুক্তি না করিয়া,কেবল কাণ পাতিয়া হরগোবিন্দের শেষ কথাগুলি শুনিতে লাগিল। হরগোবিন্দ, আপনাদের পরিধেয় কাপড়ের পুঁটুলীটী এবং সঙ্গে যে তেষট্টি টাকা তের আনা তিন পয়সা নগদ ছিল, তৎসমুদয়ই একটী ছোট ব্যাগের সহিত দ্বারবানকে বুঝাইয়া দিয়া বলিলেন—"এ সকল ভবানী বাবুকে দিও।" পরে পাষাণীর নিকট প্রাপ্ত ধারের টাকা হইতে আরও পাঁচ শত টাকার নোট দ্বারবানের হাতে দিয়া বলিলেন—"জমিদারীর কাজ কর্ম্মের জন্য ছাড়া আমার নিজের যে সকল চাকর চাকরাণী ছিল, ইহা হইতে তাহাদের বাকী বেতনের দরুণ প্রায় এক শত টাকা খরচ হইবে। পরে বাকী টাকা হইতে তাহাদিগকে কিছু কিছু বক্‌সিস্ দিলেও অবশিষ্ট প্রায় সাড়ে তিন শত টাকা থাকিবে। ধর, আরও দেড় শত টাকা দিতেছি। শেষের এই পাঁচ শত

টাকা এত দিন আমার আশ্রয়ে যে সকল অনাথিনীরা ছিল, তাহাদিগকে বাঁটিয়া দিও।” এই বলিয়া সজলনেত্রে বাকী দেড় শত টাকা দিয়া, হরগোবিন্দ, দ্বারবান্‌কে পুনরায় কোচ্‌বাক্সে উঠিয়া বসিতে অনুরোধ করিলেন। গাড়োয়ানেরা গাড়ী ছাড়িয়া দিয়া তখনই দ্রুতবেগে তুলসী গ্রামের দিকে হাঁকাইতে লাগিল। এখান হইতে ভাল ঘোড়ার গাড়ীতে তুলসী গ্রামে যাইতে প্রায় দ্বিপ্রহর সময় লাগে।

এদিকে হরগোবিন্দ সপরিবারে যে গাড়ীতে যাইবেন বলিয়া সংকল্প করিয়াছিলেন, এবার তাহারও আসিবার সময় হইয়া আসিতেছিল। সুতরাং আর একটুকুও দেরি না করিয়া, পাষাণী প্রভৃতিকে নিয়ে, হরগোবিন্দ দৌড়াদৌড়ি করিয়া ষ্টেশনে গিয়া, পুনরায় তাড়াতাড়ি চারিখানি টিকেট্‌ কিনিলেন। টিকেট্‌ কিনিয়া, টিকেট্‌গুলি তখনই সঙ্গের সকলের হাতে হাতে বাঁটিয়া দিলেন। লোকের অধিক ভিড় না হওয়াতে, সিদ্ধেশ্বরী, পাষাণী, সরস্বতী সকলেই অতি ব্যস্ত সমস্ত হইয়া এবার হরগোবিন্দের গাড়ীতেই চড়িয়া বসিল। যে দিকে ইহারা চড়িল, সে দিক্‌টায় অপর লোক না থাকাতে বসিবার বড়ই সুবিধা হইল। সকলে উঠিয়া বসিতে না বসিতেই গাড়ী ছাড়িবার সঙ্কেতস্বরূপ দ্বিতীয়বারের ঘণ্টা ঢং ঢং করিয়া বাজিয়া উঠিল। ক্রমে গাড়ী ছাড়িবার শেষ ঘণ্টাও বাজিবার সময় হইয়া আসিল। কিন্তু এখনও চারিদিকে হাজার হাজার লোক, হরগোবিন্দকে বিদায়-কালে দেখিবার জন্য অশ্রুপূর্ণ দৃষ্টিতে তাঁহারই দিকে চাহিয়া অপেক্ষা করিতেছিল। হরগোবিন্দ, মুখ বাহির করিয়া, উপস্থিত সকলকেই যথাসাধ্য শেষ অভিবাদন জানাইতে লাগিলেন। এমন সময় হঠাৎ এক বৃহৎ ব্যাপার উপস্থিত হইল! হরগোবিন্দ দেখিলেন, তাঁহার গাড়ীর সম্মুখেই “প্লাট্‌ফরমে”র উপরে ভবানীশঙ্কর ছদ্মবেশে গলবস্ত্র হইয়া দাঁড়াইয়া তাঁহাকেই কি যেন বলিবেন বলিয়া, অপেক্ষা করিতেছেন! হরগোবিন্দ, এই অদ্ভুত ঘটনা দেখিয়া, তাড়াতাড়ি গাড়ীর কপাট খুলিয়া, “ফুট্‌বোর্ডের” উপরে দাঁড়াইয়াই, হাত বাড়াইয়া, অতি বিগলিতচিত্তে ভবানীর মাথার উপরে হাত রাখিলেন। এদিকে গাড়ী ছাড়িবার সময় উপস্থিত হওয়াতে প্রহরীগণসহ স্বয়ং ষ্টেশন মাষ্টার, “প্লাট্‌ফরমে”র লোকের ভিড় সরাইয়া দিতে লাগিলেন। হঠাৎ দেখিয়া কেহ চিনিতে না পারে, এই জন্য ভবানীশঙ্কর, অতি সতর্কভাবে বেশ পরিবর্ত্তন করিয়া আসিয়াছিলেন। হরগোবিন্দও বারম্বার মুখের দিকে তাকাইয়া তাকাইয়া, ভবানীকে চিনিতে

পারিয়াছিলেন। এখন প্রহরীরা, তাড়াতাড়ি ভবানীশঙ্করকে অন্য লোক মনে করিয়া, দূরে ঠেলিয়া দিয়া, হরগোবিন্দকে শীঘ্র শীঘ্র গাড়ীর মধ্যে গিয়া বসিতে বলিয়াই,কপাট বন্ধ করিতে উদ্যত হইল। হরগোবিন্দ, অগত্যা গাড়ীর ভিতরে যাইতে বাধ্য হইলেন। এদিকে নিমেষ-মধ্যে লৌহবর্ত্মের উপর দিয়া, মেদিনী কম্পিত করিয়া, বায়ুপ্রবাহের আগে আগে লৌহশকট ধাবিত হইল। তখন যেন শত শত ঝটিকার শব্দে দিঙ্‌মণ্ডল পূর্ণ হইয়া উঠিল! যেন মানুষের কণ্ঠ আর সে শব্দকে কিছুতেই পরাজয় করিতে পারিবেনা বলিয়াই, ভবানীশঙ্কর আর হরগোবিন্দ, নীরবে কেবল উভয়ে উভয়ের মুখের দিকে নিমেষের জন্য তাকাইয়া রহিলেন। সে স্বপ্নময় নিমেষও যেন নিমেষের মধ্যেই ফুরাইয়া গেল। বলিবার থাকিলেও, আর কাহারও কিছুই বলা হইল না। হরগোবিন্দ, সেই নিমেষ-মধ্যেই দেখিয়াছিলেন, ভবানীর চোক হইতে ফোঁটা ফোঁটা জল গড়াইয়া পড়িতেছে। দেখিয়া, সাতিশয় আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন। হরগোবিন্দ, সপরিবারে কোথায় যাইতেছেন, তাহা কাহাকেও বলিয়া গেলেন না। হরগোবিন্দের গাড়ী চলিয়া গেলে, দর্শনার্থী লোকেরা সকলেই, মনের আবেগে দশদিক্ কাঁপাইয়া, সহস্র সহস্র কণ্ঠে হরিধ্বনি করিতে করিতে, গড্ডালিকা-প্রবাহে নিজ নিজ গৃহে ফিরিয়া চলিল। সকলেই যেন বুঝিল, এই দুই দিন, এই প্রদেশের আপামর-সাধারণ লোকের প্রাণের উপর দিয়া, ঝটিকার মত, আকস্মিক তেজের মত, কি যেন একটা ঘটনা চলিয়া গেল, একটা বৃহৎ অভিনয় শেষ হইল!

ঊনবিংশ পরিচ্ছেদ।

নদী-বক্ষে।

আজ বাইশ তেইশ দিন পর্য্যন্ত একখানি ক্ষুদ্র পান্সী নৌকা, ব্রহ্মপুত্র নদীর খরতর স্রোতের প্রতিকূলে যুঝিয়া যুঝিয়া, যেন অবশেষে ক্লান্ত হইয়াই, একটী ক্ষুদ্র পাহাড়ের কোলে আসিয়া লাগিয়াছে। নৌকা আজ হঠাৎ এখানে নঙ্গর করিয়া রাখিবার একটী বিশেষ কারণ উপস্থিত হইয়াছে। নৌকার আরোহীদের গম্যস্থান এই পর্ব্বত নহে। নৌকা, ব্রহ্মপুত্রের একটী ক্ষুদ্র পার্ব্বত্য উপনদী বহিয়া দক্ষিণদিকের পর্ব্বতাঞ্চলে যাইবে। তাই উপনদীর

সঙ্গম-স্থানে, ক্ষুদ্র পাহাড়ের কোলে আজ প্রাতঃকাল হইতে সমস্ত দিন নৌকাখানি বাঁধিয়া রাখা হইয়াছে। মাঝীরা, পাহাড় হইতে শুষ্ক কাষ্ঠাদি সংগ্রহ করিয়া, নদীর জলের ধারে, পর্ব্বতের পাদদেশে, একটী ক্ষুদ্র চড়ার উপরে বিষণ্ণমুখে একটী চিতা সাজাইতেই যেন ব্যস্ত সমস্ত হইয়া পড়িয়াছে। আজ তাহাদের কাহারও মুখে একটীও কথা নাই। নৌকার উপরে একটী স্ত্রীলোকের মৃতদেহ একখানি গৈরিক বস্ত্রে আপাদ মস্তক ঢাকা রহিয়াছে। একটী সতের আঠার বৎসরের পরম সুন্দরী বালিকা, তদ্রূপই একখানি গৈরিক বাস পরিয়া, এ'লো-চুলে, বিষণ্ণ-মুখে মৃতের শয্যার পার্শ্বে বসিয়া, চোখের গলদ্ধারায় বুক ভাসাইতেছে। নিকটে একজন ভরা-যৌবনের কৃষ্ণাঙ্গী যুবতী নীরবে আঁচলে চোখের জল মুছিয়া মুছিয়া, তাহার বড় বড় চোখ দুইটী আরক্তিম করিয়াছে। তাহারও পরিধানে তদ্রূপই গেরি মাটির রঙ করা একখানি থানের ধুতি। ইহার আকৃতি দেখিয়াই বোধ হইতেছে, বালিকার মত এ, কোন বিশেষ সমুচ্চ বংশসম্ভূতা নয়।

ইহাঁরা কি সন্ন্যাসিনী? না। ইহাদের ভাব দেখিয়া, বোধ হইতেছে, যেন কাপড় মলা হইবে বলিয়াই, এ বিদেশে পাহাড়ের লাল মাটি দিয়া পরিধানের নূতন শাদা থানের ধুতি গুলি রঙ্ করিয়া নিয়াছেন। বস্তুত ইহাঁদের এইরূপ গৈরিক-বসন পরিধানের কারণ, সংসার-বৈরাগ্য বা ধর্ম্মের ভাণ করা নয়। তবে যদি বল, ঐ বালিকার বিকারশূন্য অতি সরল পবিত্র মুখের ও দেহকুসুমের সুধাময় লাবণ্যরাশি দেখিয়া—ঐ পুণ্য-প্রতিমা দেখিয়া—ঐ ঢল ঢল বিমল স্বর্গ-মন্দাকিনীর মত, মন্দার-কুসুম রাশির মত, স্বর্গীয় রূপের জ্যোতি দেখিয়া, নিশ্চিতই বোধ হইতেছে, ইনি কোন স্বর্গের অমরবালিকা—ইনি অমরাবতী ছাড়িয়া, জ্যোতির কিরণ ধরিয়া, সুগন্ধি মলয়-হিল্লোলের কোলে বসিয়া, ধীরে ধীরে ধরাধামে অবতীর্ণ হইয়া, মৃতের অমর আত্মাকে সঙ্গে করিয়া নিতে জ্যোতির দেশ হইতে মৃতের শয্যার পার্শ্বে আসিয়া বসিয়াছেন। আহা! উঁহার মাথার উপরে,কেমন অনন্ত অনন্ত প্রসারময়, সুবিস্তারিত, অসীম নীল আকাশের পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন নির্ম্মল নীলিম ছায়া হাসিতেছে! আহা! তাহা কি সুন্দর! কি মধুর! ব্রহ্মপুত্রের নির্ম্মল জলরাশিতে সে ছায়া কেমন মাখামাখি হইয়া,কেমন গলাগলি হইয়া, বিশ্রাম করিতেছে! আবার নদী-বক্ষের ছায়াময় আকাশের কোলে,তরুলতা শোভিত ক্ষুদ্র পর্ব্বতের প্রতিবিম্ব জলের একটুকু চাঞ্চল্যেই কেমন হেলিতে দুলিতেছে! পর্ব্বতটী, অসীম

আকাশের নীচে, নদীতটে কেমন গভীর স্তব্ধতার কোলে দাঁড়াইয়া রহিয়াছে! ঐ দেবকন্যা, ঐ শোভায় ভুলিয়াই বুঝি মুগ্ধ ভাবে বসিয়া আছেন? এইরূপ বলিতে কাহারও ইচ্ছা হইলে বল। কিন্তু বালিকা সেই হরগোবিন্দ রায়ের ঘরের আলো,আশার মুকুল,প্রাণের স্নেহরাশি পাষাণী—সেই গ্রাম্য বালিকা।

হরগোবিন্দ কোথায়? সিদ্ধেশ্বরীর মৃতদেহের সৎকার করিতে হরগোবিন্দ, কিছু চন্দন-কাষ্ঠ, কিছু ধূনা, কিছু ঘী এবং নূতন বস্ত্রাদি কিনিয়া আনিবার জন্য, নিকটে কোন হাট বাজার আছে কিনা, তাহার অনুসন্ধানে গিয়াছিলেন। হরগোবিন্দ,অভীষ্ট দ্রব্যাদি নিয়ে ফিরিয়া আসিয়াছেন। পাঁষাণী দিদীমার মৃতদেহটীকে ঠাকুরদাদার সঙ্গে ধরাধরি করিয়া, ব্রহ্মপুত্রের নির্ম্মল শীতল জলে স্নান করাইয়া,নূতন বস্ত্রাদি পরাইয়া,সুন্দর করিয়া সাজাইয়াছে। সরস্বতী পাহাড়ের উপর হইতে কতকগুলি শাদা শাদা ফুল তুলিয়া আনিয়া, মালা গাঁথিতেছিল। পাষাণী, মালাগুলি আনিয়া যত্নপূর্ব্বক সিদ্ধেশ্বরীর মৃতদেহের গলায় পরাইয়া দিয়াছে। এবার হরগোবিন্দের মুখে শাদা কাল খাট খাট একমুখ দাড়ী গোঁপ হইয়াছে। হরগোবিন্দও, মলা হইবার ভয়ে কাপড়গুলি পাহাড়ের লাল মাটি দিয়া ছোপাইয়া নিয়াছেন। হরগোবিন্দ আর পাষাণী,সজলনেত্রে ধরাধরি করিয়া,সিদ্ধেশ্বরীর মৃত শরীর চিতায় শোওয়াইয়া, আগুন দিবামাত্র, ধূ ধূ করিয়া চিতার আগুন জ্বলিতে লাগিল।

"এ কি ব্যাপার! মানবলীলা কি ভোজের বাজি? একদিন ত সকলকেই এই অগ্নিময় পথে ইহ সংসার হইতে অন্তর্দ্ধান হইতে হইবে! আজ যাহাকে আদরের ধন বলিয়া,প্রাণে পূরিয়া রাখিতেছি,বুকে চাপিয়া ধরিতেছি, কে না জানে, কাল সেই মর্ম্মের ফুটন্ত ফুল, হৃদয়ের মুকুল ছিঁড়িয়া,এই জ্বলন্তচিতার অগ্নিশয্যায় শোওয়াইতে হইবে? কে না জানে, আজ ফুটন্ত ফুলের আঘাতে যে দেহে ব্যথা অনুভব করিতেছি; বসন্তের মলয়প্রবাহে, নদীর সুশীতল জলে ডুবাইয়াও আজ যাহার তাপ দূর করিতে পারিতেছি না; হয়ত মুহূর্ত্ত পরেই সে দেহ এই জ্বলন্ত জ্বালা-রাশির কোলে শায়িত হইবে এবং মুহূর্ত্তের মধ্যে এইরূপেই ভস্মময় হইয়া, ইহ জগতের চক্ষুর অন্তরালে চির-দিনের জন্য মিলাইয়া যাইবে? মানুষ জানে—সকলেই জানে, বুঝে কয়জন লোকে? বুঝিলে, হিংসা, বিদ্বেষ, অহঙ্কার, ক্রোধ, কাম, লোভ ও মোহের বশীভূত হইয়া, কেহই, এ শান্তির রাজ্যে অশান্তি আনিতে চেষ্টা করিত না; কেহই স্বার্থে ভুলিয়া,পরকে ভুলিতনা; ধরাধাম সত্য সত্যই স্বর্গধাম হইত!"

হরগোবিন্দ, সিদ্ধেশ্বরীর জ্বলন্তচিতার পার্শ্বে দাঁড়াইয়া, আজ এইরূপ কত কি চিন্তার তরঙ্গে ভাসিতে লাগিলেন। বিজন ব্রহ্মপুত্র-তীরে, জনমানবশূন্য পর্ব্বতের কোলে, সুনীল স্তব্ধ আকাশের নীচে, সন্ধ্যার আঁধারে সিদ্ধেশ্বরীর চিতার আগুন হেলিয়া দুলিয়া জ্বলিতে লাগিল। নদীর জলে তাহার ছায়া পড়িয়া ক্রীড়া করিতে লাগিল। পাষাণী, গৈরিকবাসে আপনার সেই সুন্দর দেহপ্রতিমার তপ্তকাঞ্চনকান্তি আবৃত করিয়া, পদ্মপলাশবিনিন্দিত, বিশাল চক্ষু দুইটী আকাশে সংলগ্ন করিয়া, গলদশ্রুধারায় ভিজিতে ভিজিতে গুন্ গুন্ স্বরে গাইতে লাগিল ;—

"স্বরগের তারা কিরে খো'সে খো'সে যায় পড়ে ?
তাই কিরে ফোটে ফুল সংসারের ঘরে ঘরে ?
দু'দিনে শুকা'য়ে যায়! ফলটী অমৃত হয়!
কার যেন পোষাপাখী অমনি আকাশে ধায়!
কাঁদাইয়ে মানবেরে, মরমের ফল ছিঁড়ে,
স্বরগের পাখীটী সে স্বরগেই যায় উড়ে!
ইচ্ছায় উদয় যাঁর, ইচ্ছাতেই লয় তাঁর,
আমরা ত মোহে অন্ধ ভাসি শুধু আঁখি-নীরে!"

পাষাণী অতি সুগায়িকা। পাষাণীর সুন্দর সুমধুর কণ্ঠ গোধূলির আকাশে যেন ধীরে ধীরে বিষাদ ও জ্বলন্ত বিশ্বাসের আগুন ছড়াইয়া নাচিতে লাগিল। হরগোবিন্দ, গম্ভীরভাবে দাঁড়াইয়া গান শুনিতেছিলেন। সিদ্ধেশ্বরীর দেহ চিতার আগুনে পুড়িয়া পুড়িয়া ধীরে ধীরে অদৃশ্য হইতেছিল। কলিকাতা হইতে আসিবার পথে গাড়ীতে সিদ্ধেশ্বরীর যে মূর্চ্ছা আরম্ভ হইয়াছিল, তাহাই বাড়িয়া ক্রমে ক্রমে সিদ্ধেশ্বরীকে ক্ষীণ করিয়া ফেলিয়াছিল। আজ প্রত্যুষের পরেই পীড়া অত্যন্ত বাড়িয়া উঠে। তখন বাধ্য হইয়াই নৌকা এই স্থানে নঙ্গর করিয়া রাখিতে হইয়াছিল। দ্বিপ্রহরের কিঞ্চিৎপরে সিদ্ধেশ্বরীর মৃত্যু হইয়াছে। রাত্রি শেষে পুনরায় নৌকা, খাসিয়া পর্ব্বতে দণ্ডীর পাহাড়ের দিকে যাইবে। সেখানে সন্ন্যাসী এবং শশাঙ্কশেখর থাকেন। হরগোবিন্দ চিঠি পাইয়াছেন—কলিকাতায় থাকিতে থাকিতেই পাইয়াছেন। তাহাতে আরও জানিয়াছেন, সন্ন্যাসী শশাঙ্কশেখরকে নিয়ে সম্প্রতি হিমালয়-ভ্রমণে গিয়াছেন। কিন্তু তাঁহাদের ঘর দরজা সকলই রহিয়াছে। তাঁহারাও, কিছু দিন পরেই ফিরিবেন। সন্ন্যাসী

অনেক দিন পূর্ব্বে তিন চারি বৎসর এই প্রদেশে খাসিয়া পাহাড়ে থাকিয়া, খাসিয়াদের সঙ্গে মিশিয়াছিলেন। সরল-প্রাণ খাসিয়ারা, সন্ন্যাসীকে শ্রদ্ধা করে, ভক্তি করে, ভাল বাসে। তিনিই, একটী সুন্দর খাসিয়া-পুঞ্জির নিকট-বর্ত্তী একটী সুন্দর স্থানকে দণ্ডীর পাহাড় নাম দিয়াছেন। সন্ন্যাসী, যখন পূর্ব্বে এই স্থানে ছিলেন, তখন একজন দণ্ডী বন্ধু তাঁহার সঙ্গে ছিলেন। সন্ন্যাসী, এ প্রদেশে আসিয়া, তাঁহারই স্মৃতির জন্য আপনাদের বাসস্থানের নাম দণ্ডীর পাহাড় রাখিয়াছেন। কিন্তু খাসিয়া ভাষায় ইহার প্রকৃত নাম "ডং ডং।" হরগোবিন্দ ভ্রমণার্থ একবার কামেক্ষা হইতে চেরাপুঞ্জি দিয়া নামিয়া, শ্রীহট্টে গিয়াছিলেন। সেবারও সঙ্গে পাষাণী এবং সিদ্ধেশ্বরী উভয়েই ছিলেন। সুতরাং যে প্রদেশে যাইতেছেন, তাহা পাষাণী বা হরগোবিন্দের পক্ষে নিতান্ত অপরিজ্ঞাত প্রদেশ নয়। হরগোবিন্দ, পথে আসিতে আসিতে মহা-প্রস্থানের ঠিকানায় সন্ন্যাসীকে চিঠি লিখিয়া, উপস্থিত বিপদের সমস্ত খপর জানাইয়াছেন। হরগোবিন্দ, বিচারগৃহ হইতে বাহির হইয়াই, মনে মনে ঠিক করিয়াছিলেন—"সিদ্ধেশ্বরী আর পাষাণীকে নিয়ে চিরনিস্তব্ধ, চিরবিজন, গম্ভীর মনোহর দৃশ্য দণ্ডীর পাহাড়ে গিয়া, সরল-প্রাণ, উদারচিত্ত, সত্যবাদী, বিনম্রস্বভাব, স্বাধীনপ্রকৃতি খাসিয়াপুরুষ ও সুবর্ণাঙ্গী, বনফুলভূষিতা, সদা হাস্যমুখী খাসিয়া ললনাদিগের সংসর্গে এবং সন্ন্যাসী ও শশাঙ্কশেখরের সহিত অবশিষ্ট জীবনের দিন কয়টী সুখ-শান্তিতে কাটাইবেন আর প্রাণ দিয়া খাসিয়াদের জন্য খাটিবেন।" কিন্তু এবার সিদ্ধেশ্বরী ইহজগৎ পরিত্যাগ করিয়া, প্রমাণ করিয়াছেন, "মানুষের আশা ও কল্পনা অতি অসার—অসারের অসার।" এখনও পাষাণী আর সরস্বতীকে নিয়ে, হরগোবিন্দ, দণ্ডীর পাহাড়েই বাস করিবেন, সংকল্প করিয়াছেন। তাই পার্ব্বত্য উপনদী বহিয়া কাল প্রত্যুষেই নৌকা, দণ্ডীর পাহাড়ের দিকে যাইবে। সন্ন্যাসী, শশাঙ্কশেখরকে নিয়ে, এ অঞ্চলে একপ্রকার গুপ্তভাবেই বাস করিতেছিলেন।

বিংশ পরিচ্ছেদ।

"চির দিন সমান না যায়!"

পাপের সহচর তারাচাঁদের মৃত্যু হইয়াছে, এ কথা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। বজ্রকুৎ পচিয়া, অল্প কয়েক দিন হইল, পাপিয়সী সুখদারও অতি ভীষণ

অপমৃত্যু ঘটিয়াছে। সে পাপময় মৃত্যুর ভয়ঙ্কর ছবি ভবানীর প্রাণের স্তরে স্তরে আঁকিয়া গিয়াছে। সে মৃত্যুর কথা যখনই মনে হয়, তখনই ভবানী, নিজে নিজে মনের ভিতরে ভিতরে চমকিয়া উঠিয়া, চোখে হাত দিয়া, মনে মনে বলিতে থাকেন—"উঃ—! কি ভয়ানক যাতনা! কি ভয়ানক কষ্ট! ভয়ানক! ভয়ানক! ভয়ানক!" যকৃৎ পচিয়া যাওয়াতে তাহার পূঁজ ও ক্লেদে সুখদার পেটের নাড়ীগুলি পর্য্যন্ত পচিয়া পচিয়া পড়িয়া গিয়াছে। সুখদা, যে ঘরে ছিল, আজও দুর্গন্ধে সে ঘরে প্রবেশ করা যায় না। ভয়ে ভবানী, মদ ছাড়িয়া দিয়াছেন। কেবল ভয়ে নহে। হরগোবিন্দের মোকদ্দমা-নিষ্পত্তির দিন হইতেই, ভবানীর মনে, প্রাণের ভিতরে অতি নিগূঢ় স্থানে কোথায় যেন কি একটা বিষম খট্‌কা লাগিয়া গিয়াছে। তাহাতে যেন এত দিন ভবানীর জীবন যে ভাবে চলিতেছিল, এখন আর সে ভাবে চলিতে চাহিতেছে না। কিন্তু ভবানী, এ মর্ম্মের খপর কাহাকেও বলিতে প্রস্তুত নন্। যখন প্রাণের গোপনীয় অন্ধকারে এই ভাবের দুই একটী মাত্র কিরণ, সহসা কেন যেন, কোথা হইতে যেন ভাঙ্গিয়া ভাঙ্গিয়া, পড়িয়া পড়িয়া, সরিয়া সরিয়া যাইতেছিল, তখনও সুখদা বাঁচিয়াছিল। ভবানী সুখদাকেও একথা বলেন নাই। বলিতে ভবানীর কিরূপই যেন একটা লজ্জা হয়, অনিচ্ছা হয়, তাই ভবানী কাহাকেও এ কথা বলেন না। কিন্তু প্রাণের ভিতরে ভবানীর বিনা অনুমতিতেই কে যেন বসিয়া বসিয়া, যখন ভবানী, কাজ করেন, কর্ম্ম করেন, ভাবেন, চিন্তা করেন, তখন থাকিয়া থাকিয়া ধীরে ধীরে বলে—"আমি ভাল হব! ছিঃ—,এ সব আর আমার ভাল লাগে না! কি আশ্চর্য্য! একজন মানুষ, হাসিতে হাসিতে পথের ধূলার মত পায়ে ঠেলিয়া যাহা ফেলিয়া গেল, আমি তাহা কাড়িয়া নিতে কতই ব্যস্ত হইয়াছিলাম! ছি—,ছি—,এ দিয়ে কি করিব? কৈ খুড়া মহাশয় ত, ইহা ছাড়িয়াও আমার চেয়ে কম সুখে আছেন বলিয়া, বোধ হইল না? মানুষে তাঁহাকে পথের ফকীর দেখিয়াও, দেবতা ভাবিল, আর আমাকে মনে মনে সকলেই ঘৃণার চোখে দেখে। আমি ভাল হব!"

ভবানী, এক একবার সুপ্তসিংহের মত জাগিয়া, যাই টের পাইতেছেন, অবাধ্য মন তাঁহারই মধ্যে বসিয়া বসিয়া নেমকহারামি করিতেছে, অমনি সিংহ গর্জ্জনে বলিতেছেন—মনে মনে বলিতেছেন—"না—। মদ ছাড়িব কি কো'রে? এত কো'রে, এত বিষয় সম্পত্তি হাত কো'রেছি, এখন একটুকুও

আমোদ করিব না? মদ ছেড়ে, আমোদ ছেড়ে, বাঁচিব কি কো'রে? খুড়ার সঙ্গে যে ব্যবহার কো'রেছি,ভালই কো'রেছি। "ভূতে পশ্যন্তি বর্ব্বরাঃ।"

ভবানীর ভিতরে কয়েক দিন হইতেই এই যুদ্ধ চলিতেছিল। ভবানী, হরগোবিন্দের সঙ্গে ছদ্মবেশে দেখা করিতে গিয়াছিলেন, এই যুদ্ধেরই ফলে। ভবানী, মদ ছাড়িয়াছেন,ইহাও, কতকটা এই যুদ্ধেরই ফল। বিচারালয় হইতে হরগোবিন্দ,সেই ভাবে চলিয়া যাইবার পরে এবং তৎপরে হরগোবিন্দকে নিয়ে, চারিদিকে ঘোরতর আন্দোলন হওয়াতে, তৎকালে ভবানীর মনে হঠাৎ কি যেন একটা সাময়িক উত্তেজনার স্রোত আসিয়া পড়িয়াছিল। সে স্রোত যেন ভবানীকে চুলে ধরিয়া, বলিতেছিল, "ভাল হ—! ভাল হ—! ঐ সাধু হরগোবিন্দের পায়ে পড়িয়া ক্ষমা চা—! ক্ষমা চা—!" কিন্তু এ বাহিরের উত্তেজনা সময়ে, চিরদিনেরই মত সময়ের আঘাত প্রতিঘাতে মিলাইয়া গিয়াছে। কিন্তু সেই আঘাতে ভবানীর ভিতরে ভিতরে যেন কি একটা গুপ্তদ্বার খুলিয়া গিয়াছে। সে দ্বার সুখদার মৃত্যু আরও খুলিয়া দিয়াছে। এদিকে তারা দাদার অভাবে নূতন নূতন পাপের আর আয়োজন হইতেছে না। সুতরাং মদ ছাড়িয়া, এই অল্পদিনের মধ্যেই ভবানী যেন আর সে ভবানী নাই।

ভবানীর গৃহ শূন্য। ঘরে একটীও স্ত্রীলোক নাই। সুখদার শ্রাদ্ধের সময়ে ভবানীশঙ্কর, এত দিন পরে অপর দুই স্ত্রীর অনুসন্ধান করিয়াছিলেন। অনুসন্ধানে জানিয়াছেন, এক স্ত্রী অনেক দিন হইল,পিত্রালয় হইতে কোথায় যেন চলিয়া গিয়াছেন। অপরা, গৃহিণী-রোগে পীড়িতা। তাঁহাকে বাড়ী আনা হইয়াছিল। কিন্তু সুখদার শ্রাদ্ধের দুই তিন দিন পরেই তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে। তাঁহারও শ্রাদ্ধ চলিয়া গিয়াছে। কিন্তু শেষ স্ত্রীর মৃতদেহ শ্মশানে পুড়িয়া ঘরে ফিরিবার পর হইতেই ভবানীশঙ্কর, যেন বায়ু-রোগগ্রস্তের মত অবাক্ এবং স্তম্ভিত হইয়াছেন। সন্দেহেই হউক্, অথবা অন্য যে কারণেই হউক্, ভবানীর যকৃৎটা মধ্যে মধ্যে একটুকু একটুকু চিন্ চিন্ করিয়া উঠে। ভবানী, ভয়ে ভয়ে মদ ত ছাড়িয়াইছেন; তৎপরে তামাকও ছাড়িয়া দিয়াছেন। এবার প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন, আর কোনরূপ নেশা করিবেন না। নেশার সহচরদিগকে সম্মুখে আসিয়া দেখা করিতে পর্য্যন্ত নিষেধ করিয়া দিয়াছেন। এবার ইয়ার মহলে কান্নার ঘোর রোল পড়িয়া গিয়াছে।

ভবানী, এখন প্রায় সর্ব্বদাই নির্জ্জনে পড়িয়া থাকেন। হ'রে ভিন্ন তাঁহার নিকটে আর কাহারও যাইবার অনুমতি নাই। ভবানী, আজ

সন্ধ্যা রাত্রিতেই বিছানায় শুইয়া স্বপ্ন দেখিতেছিলেন—"যেন বহুদিন পরে নির্ম্মলচন্দ্র বাড়ী আসিয়াছেন। সেই ভাল দিনে—যখন পিতামহ ঠাকুর ছিলেন; যখন ভবানী, নূতন নূতন বি,এ, পাশ করিয়া দেশে ফিরিয়া আসিয়াছেন; যখন সরমাসুন্দরী, ভবানীর প্রাণমন্দিরে প্রাণময়ী প্রতিমার মত—দ্বিভুজা ভগবতীর লাবণ্যময়ী, প্রেমময়ী প্রতিমার মত হাসিতেছিলেন; সরমার চাঁদমুখে, সুন্দর অধরোষ্ঠের কোণে যখন ঈষৎ ঈষৎ মৃদু মৃদু হাসির বিজলী চমকিয়া, বিশাল নয়নের কোণে মিলাইবার কালে ভবানীর বুক হইতে প্রাণ কাড়িয়া নিয়ে আপনার সঙ্গে মিশাইয়া ফেলিত; আর যখন সরমা সুন্দরীর পবিত্র সম্মুখে দাঁড়াইয়া, ভবানী, মনে মনে ভাবিতেন, বুঝি শরীরটা এবার গলিয়া মধুর মধুর সুধার স্রোতে মিশিয়া, ছুটিয়া চলিয়াছে—প্রাণ অমৃতরসসাগরে ডুবিয়া ডুবিয়া সাঁতার খেলিতেছে, তখন—সেই দিনে, যখন মধু—স্নেহের পুতলী মধু—ভালবাসা মাখা, সরলতা মাখা মধু—মধু মাখা মধু ছিল, মধুমতী বলিতে যখন ভবানীর চোখে জল আসিত অথচ বুকের ভিতরে কি যেন এক প্রকার গরলে সুধা মিশিয়া, দুঃখে সুখ মিশিয়া, বিষাদে হর্ষ মিশিয়া, প্রলাপে সুখস্বপ্ন মিশিয়া, আঁধারে জ্যোৎস্না মিশিয়া, জঙ্গলে কুসুম ফুটিয়া, কান্নায় নৈশ বাঁশরীর গান মিশিয়া, কি যেন একটা ব্যাপার ঘটিত, তখন—সেই দিনে; সেই শুভ দিনে—যখন নির্ম্মলে ভবানীতে বুকভরা সৌভ্রাত্র ছিল, একজন আর একজনকে দেখিয়া, আনন্দ সাগরে ভাসিতেন,—সেইদিন নির্ম্মলচন্দ্র বাড়ী আসিয়াছেন।" ভবানী স্বপ্নে দেখিলেন "নির্ম্মলচন্দ্র বাড়ী আসিয়াছেন। নির্ম্মল, একে একে এ বাড়ী ওবাড়ীর সকলকে প্রণাম করিয়া, শেষটা দাদার সঙ্গে সঙ্গে বাড়ীর মধ্যে গেলেন। সরমা, তখন ঘরের মধ্যে একখানি "বুক্" কাষ্ঠ-নির্ম্মিত আমেরিকান্ লেডী চেয়ার-বক্ষে বরাঙ্গ-লাবণ্য সাজাইয়া, চেয়ারের বুকভরা ঢলঢল, টলমল রূপরাশি ঢালিয়া, একখানি সুন্দর ত্রিপাদ সম্মুখে রাখিয়া, "উলের" কাজ করিতেছিলেন। কতকগুলি নানা রঙের পশমের গোলাপ ফুল তৈয়ার করিয়া, একটি টুপি সাজাইতে ছিলেন। সরমা, দূর থেকেই নির্ম্মলচন্দ্রের মধুর ধারার মত কথা শুনিয়া, অমনি তাড়া তাড়ি পশম, ফুল, টুপি সমস্ত ফেলিয়া রাখিয়া, আধ আধ ঘোমটাটী টানিতে টানিতে, মুখভরা হাসি হাসিতে হাসিতে, ছুটিয়া নির্ম্মলচন্দ্রের কাছে আসিলেন। নির্ম্মলও, একমুখ হাসিয়া, বৌদিদীকে প্রণাম করিলেন। এদিকে পাগ্লী মধু, বই পড়িতেছিল।

মধু, বইখানি হাতে করিয়াই, ছুটিয়া, "ছোট দাদা, ছোট দাদা" বলিতে বলিতে নির্ম্মলের কাছে আসিয়া দাঁড়াইল। নির্ম্মল, মধুর মাথায় হাত বুলাইতে বুলাইতে, জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেমন ছিলে মধু?" মধু, ছোট দাদার জিজ্ঞাসার উত্তরে হাসিয়া হাসিয়া বলিল—"ভালই ছিলাম। তুমি ভাল আছ ত?" এইরূপে উভয় পক্ষ হইতে কত আলাপ, কত কথা হইতে লাগিল। কত পুরাণ বাসি খপর নূতন আকার ধারণ করিল। কত দুঃখের কাহিনীও সুখপূর্ণ ইতিহাসে পরিণত হইল। নির্ম্মলের আগমনে বাড়ীর মধ্যে যেন হঠাৎ একটা আনন্দের ঢেউ উঠিল।" ভবানী, আজ স্বপ্নে যথার্থ বোধে সেই আনন্দের সাগরে সাঁতরাইতে সাঁতরাইতে আনন্দে আনন্দধ্বনি করিয়া উঠিলেন। ভবানীর নিকটে কেহই ছিল না। সুতরাং স্বপ্নের সেই অস্পষ্ট শব্দে কেবল ভবানীশঙ্করের নিজেরই ঘুমের ঘোর ভাঙ্গিয়া গেল। তখনই দেয়ালের ঘড়ীতে আঁধারে ঢং ঢং করিয়া এগারটা বাজিয়া উঠিল। বাহিরে পূর্ণিমার জ্যোৎস্না। চারিদিক্ নিস্তব্ধ। ভবানী, বুকের ঘন ঘন দুড়্‌দুড়ানির সহিত জাগিয়া, দেখিলেন, বাহিরের জ্যোৎস্না কপাটের ফাঁক দিয়া ও জানালা দিয়া ঘরের মধ্যে পড়িয়াছে। জাগিয়া অবধিই থর থর করিয়া ভবানীর গা কাঁপিতেছিল। কিন্তু বিছানায় আর মন টিকিল না। এবার ভবানীশঙ্কর, ক্ষিপ্তের মত কপাট ঠেলিয়া ফেলিয়া, একেবারে তেতালার ছাদে গিয়া, হাউ—হাউ—করিয়া চেঁচিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। কাঁদিতে কাঁদিতে, বুক চাপ্‌ড়াইয়া ছাদময় ছুটিতে লাগিলেন। আর এক এক বার ছাদের ধূলায় পড়িয়া, গড়াগড়ি দিতে দিতে আবার উঠিয়া ছুটিতে লাগিলেন। দূর হইতে কান্না শুনিয়া, হ'রে দৌড়াইয়া আসিয়া, অবাক্ হইয়া, এক কোণে দাঁড়াইয়া রহিল। ভবানী শঙ্কর, তাহার দিকে একবারও ফিরিয়া চাহিলেন না। কেবল আপন মনে কাঁদিয়া কাঁদিয়া বলিতে লাগিলেন, "হা! পরমেশ্বর—, এ পাপীর—এ দুরাচারের ভাগ্যে কি আর সে সুখের দিন ফিরিয়া আসিবে—? এ কি করিলে—? এ সুখের চেয়ে স্বস্তি যে আমার ভাল ছিল! হায়—কি স্বপ্ন দেখিলাম! দেখ, পরমেশ্বর—, দেখ—, আমার প্রাণে শত শত সর্পে দংশন করিতেছে! আহা! নির্ম্মলচন্দ্র—, প্রাণের ভাই—, তুমি আজ কোথায়—? যে দেশে আছ, সেখান হইতে কি তুমি আজ তোমার এই পাষণ্ড, নরাধম দাদার ডাক শুনিতে পাইতেছ—? দেখ—, আমার দুর্গতি দেখ—! দেখ—, আমার পাপের

শান্তি দেখ—! যে শ্মশানে তোমার শব পোড়ান হইয়াছে, সে শ্মশান যে আজ আমার বুকের ভিতরে জ্বলিতেছে! দেখ ভাই—, দেখ—! হা সরমা—! হা মধু—! এ পাপ মুখে আজ আমি তোমাদের নাম নিলাম। ভয় হইতেছে, এই জন্যই হয়ত তোমরা স্বর্গে কলঙ্কিত হইবে। তোমাদের নাম করিতেও যে আর আমি অধিকারী নই—!"

কাঁদিতে কাঁদিতে শেষটা ভবানীর মূর্চ্ছা হইল। ভবানী মূর্চ্ছার মধ্যেও দেখিতে লাগিলেন, "রক্ত! কেবল রক্ত! রক্তে সরমার বায়েও ভিজিতেছে! রক্তে মধুর কারাগৃহ ভাসিয়া যাইতেছে! রক্তে তুলসীগ্রাম মাখা! রক্তে পৃথিবী মাখা! রক্তে আকাশের চন্দ্র, সূর্য্য, তারা মাখা! রক্তে অনন্ত বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড ভাসিতেছে! যেন সেই রক্তের সাগরের উপর দিয়া মধু আর সরমা গলা ধরাধরি করিয়া, হাসিতে হাসিতে আসিল! তাহাদের পাদস্পর্শে সেই বিশ্বব্যাপী রক্ত-সমুদ্র ফুটন্ত ফুলের বিছানায় পরিণত হইল! ফুলের উপর দিয়া সুগন্ধি মলয় বায়ু বহিতে লাগিল! সরমা আসিয়া, দুইটী কোমল বাহুমৃণালে ভবানীকে জড়াইয়া ধরিলেন। মধু আসিয়া, "দাদা, দাদা," বলিয়া, ভবানীর হাত ধরিয়া টানিতে লাগিলেন! তখন স্বর্গে দুন্দুভি বাজিল! কে যেন গম্ভীর স্বরে সেই বাজনার সঙ্গে কণ্ঠ মিলাইয়া বলিতে লাগিল—"পাপি, তোর পাপের ক্ষমা হইল। ওঠ্, "মা, মা" বলিয়া একবার ডাক্। মা বলিয়া ডাকিলে, ভয় থাকে না, বিপদ থাকে না, অশান্তি থাকে না, প্রাণ জুড়ায়, বুক শীতল হয়। তবে ডাক্—"মা, মা, মা—, মা—মা—," বলিয়া ডাক্। ডাকিয়া ডাকিয়া গলা ভাঙ্। উদ্ধার পাইবি। মুক্তি হইবে। আর তোর ভয় নাই। মা ভৈ—! মা ভৈ—!"

এদিকে বাবুর মূর্চ্ছা দেখিয়া হ'রে দৌড়াইয়া জল আনিতে গিয়া, চীৎকার করিয়া আরও দশজনকে ডাকিয়া একত্র করিল। ডাক্তার, কবিরাজ, সকলেই ব্যস্ত হইয়া ছুটিয়া আসিলেন। সকলের অনেক যত্ন ও চেষ্টায় কিছুক্ষণ পরেই ভবানীশঙ্করের মূর্চ্ছা ভাঙ্গিয়া গেল। কিন্তু এবার মূর্চ্ছা ভাঙ্গিবামাত্রই, ভবানী কেবল কাঁদিয়া কাঁদিয়া, চীৎকার করিয়া, বলিতে লাগিলেন, "মা—মা—মাগো—মা—বিশ্বজননি—মা—মা—মা—!" শেষটা হ'রেকে ঠেলিয়া ফেলিয়া, নাচিয়া নাচিয়া, দুই বাহু তুলিয়া, করতালি দিতে দিতে সত্য সত্যই ভবানীশঙ্কর, ক্ষেপা পাগলের মত সুর

করিয়া, গাইতে লাগিলেন—"মা—,মা—,মা—,মা—,"এইরূপেই পাপীর উদ্ধার হয়।

এই ঘটনার পরে ভগবানের কৃপায় ক্রমে ক্রমে ধীরে ধীরে ছয় মাসের মধ্যেই ভবানীর জীবনের অনেক পরিবর্ত্তন হইল। ভবানীশঙ্করের প্রকৃতির একটী বিশেষত্ব এই যে, যেদিকে একবার গোঁ চড়ে, ভবানীশঙ্কর, প্রথম প্রথম অতি সত্বরেই সেই দিকের যথাসম্ভব চরম সীমায় পৌছিতে চেষ্টা করেন। প্রথমের এই আবেগ থামিলে, শেষে তদ্বিষয়ে ধীরে ধীরে উন্নতি হইতে থাকে। নূতন দিকে মনুষ্য প্রকৃতির এই প্রকার ঝোঁক প্রায় সর্ব্বত্রই দেখা যায়। ক্রমে মহারাজা ভবানীশঙ্কর রায় বাহাদুর, বিনয়ের অবতার যোগী ব্রহ্মচারী ভবানীশঙ্করে পরিণত হইতে চলিলেন। ক্রমে বিষয়ের সুবন্দোবস্তের দিকে দৃষ্টি পড়িতে লাগিল। কালক্রমে ভবানীর প্রমোদভবন, ধর্ম্মগ্রন্থের পুস্তকালয় হইল। প্রমোদোদ্যানে প্রত্যহই হরি-সংকীর্ত্তন হইতে লাগিল। ভবানী আর বিবাহ করিলেন না।

চতুর্থ খণ্ড।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

ধরণীধর—মরিসসে।

কুলি-আফিসের লোকেরা, ধরণীকে বলিয়াছিল, "তোমাকে একটা লেখা পড়ার কায দিয়া, মরিস্ সহরে পাঠাইতেছি। মাইনা খুব লম্বা। তবে ডাক্তার সাহেবটা, মন বুঝিবার জন্য এখন তোমায় অনেক রকম ভাওচি দিতে চেষ্টা করিবে। ও বেটার প্রকৃতিই ঐ রকম। কিন্তু আমরা যেরূপ বলিয়া দিয়াছি, যাইবার জন্য তুমি সেইরূপই জেদ করিও। তুমি ব্রাহ্মণের ছেলে। তোমার যাতে ভাল হয়, তা-ই আমরা করিব। যাতে মন্দ হয়,তেমন কি আর কিছু করিব ?" তখন তারাচাঁদ, উপস্থিত ছিলেন। তিনিও, বলিয়াছিলেন, "তোমার একটু বুদ্ধি আছে বলিয়া আমি জানিতাম। কিন্তু এখন দেখিতেছি, তুমি হাবার মত করিতেছ। এঁরা ভদ্রলোকের ছেলে। তোমার একটা ক্ষতি হয়, একি আর ইচ্ছা করেন ?"

ধরণী বলিয়াছিল, "না মশাই, এঁরা, আমার ক্ষতি করিবেন, তা বলিতেছি না। তবে আমি ভাল লেখা পড়া জানি না। সামান্য বাঙ্গালা লিখিতে পড়িতে পারি। এতে আমার ভাল কাজই বা হবে কেন? মাইনাই বা বেশী দিবে কেন?" ইহার উত্তর হইল, "আ মোল যা—! এই রকম লোকেরই যে দরকার! এই যে ওরা পায় না। ইংরেজীর কোনই দরকার নাই। কুলিদের হিসাব রাখিতে হইবে বাঙ্গালায়। দশ টাকা উপরিও পাবে।" ধরণী আবার বলিয়াছিল, "মশাই, তবে মরিস্ সহরটা কত দূরে? সেখানে যখন যাইবার লোক পাওয়া যায় না, তখন খুব দূরেই হবে? না?" ইহাতে কুলি-আফিসের বড় কর্ত্তা চটিয়া বলিয়াছিলেন, "যাও বাপু, তুমি যখন ভদ্র লোকের কথায় বিশ্বাস কর না, তখন তোমাকে নিয়ে বড়ই বিপদ দেখিতেছি। তারাচাঁদ বাবু আমাদের আত্মীয়। তারাচাঁদ বাবুর মে'সো-মহাশয়ের বে'ই, আমাদের কুল-পুরোহিতের গোমস্তা—ঘনিষ্ঠ গোমস্তা। তুমি নাকি তাঁরাচাঁদ বাবুব কুটুম্বের ছেলে, তাই তোমার জন্য সাহেবকে কত তোষামোদ করিয়া, সুপারিস করিয়া, কাজটা যুটাইয়াছি। বাপু, ঝক্-মারি হইয়াছে। যাইতে হয় যাও, না হয় হাজার টাকার মানের দাবিতে তোমার নামে কালই নালিস রুজু করিব। নেকাকে পাঁচবার বলিলাম, "মরিস্ সহর কাছে—,কাছে—, কাছে—। ষ্টিমারে চোড়ে গেলেই—, মরিস্ সহরে যাওয়া যায়—। তবু ও কথায় হাবার বিশ্বাস নাই। উনি কাজ পে'লে যেন আমার স্বর্গবাস হবে, আমার চৌদ্দপুরুষ স্বর্গে যাবে। এ কলিতে কাহারও ভাল করিতে নাই ছাই!!!" এই সকল কথার পরে এবং বড় বাবুর এইরূপ রাগ দেখিয়া ও নিম্নস্থ কর্ম্মচারীদের ঠাণ্ডা প্রবোধবাক্যে, ধরণী, অগত্যা ডাক্তার সাহেবের নিকট স্বীকার পাইয়া, মরিসস্‌গামী একখানি ষ্টিমারে চড়িয়া, পরদিনই অজ্ঞাতসারে দ্বীপান্তরে যাত্রা করিল,—শত শত দুর্ভাগ্য কুলি ও কুলি-রমণীদের সঙ্গে যাত্রা করিল। ডায়মণ্ড হার্‌বার ছাড়াইয়া, বাষ্পীয়পোত সমুদ্রে পৌঁছিবার পূর্ব্বেই ধরণী বুঝিল,সেও একজন দুর্ভাগ্য সামান্য কুলি বই আর কিছুই নয়। অনন্ত নীলাম্বুরাশির তরঙ্গের উপর দিয়া, হেলিয়া দুলিয়া, টলিয়া টলিয়া, সেই প্রকাণ্ড পোত, সেই নিরাবিল অনন্তের তুলনায় বিন্দুমাত্রে পরিণত হইয়া, ছুটিতে লাগিল। ক্রমে ভারতোপকুল ধুঁয়ায় পরিণত হইয়া, দৃষ্টির অন্তরালে লুকাইয়া গেল। কলিকাতায় পৌঁছিয়াই, ধরণী,মনে করিয়াছিল,জন্মভূমি ছাড়িয়া,দেশ দেশান্তরে আসিয়া নির্ব্বা-

সিত হইয়াছি। এবার বুঝিল, আর এ জীবনে কখনও ফিরিতে পাইব না। যদিও অনেকে বলিল, "তিন বৎসর পরে ইচ্ছা হইলেই ফিরিতে পারিবে।" কিন্তু ধরণী, এবার বুঝিয়াছে, মানুষে কখনও সত্য কথা বলে না। এরাও যাহা বলিতেছে, সর্ব্বৈব মিথ্যা। কাহারও কথায় ধরণীর বিশ্বাস হইল না। ধরণী, কেবল সকাল সন্ধ্যায় সুবিধা পাইলেই কোনস্থানে লুকাইয়া বসিয়া কান্দিত। রাত্রিতে সমস্ত রাত্রিই কান্দিয়া কাটাইত।

পথে তবুও ধরণীর দিন, কুলিদের সঙ্গে আমোদে আহ্লাদে কাটিয়া গেল। জাহাজ যে দিন মরিসসে পৌছিল, তাহার পরদিনই প্রাতে অন্যান্য কুলিদের মত ধরণীও, এক খানি নূতন কোদাল এবং একখানি দা উপহার পাইল। কর্ত্তৃপক্ষের একজন লোক, সকলের সঙ্গে তাহাকেও বুঝাইয়া বলিল, "এই দা দিয়া জঙ্গল কাটিয়া, এই কোদাল দিয়া জমির মাটি খুড়িতে হইবে। কাজে অবহেলা হইয়াছে, টের পাইলে, বেত খাইতে হইবে।" এই বলিয়াই, খোরাকির দরুণ প্রত্যেক কুলির এক মাসের মাইনার অর্দ্ধেক তখনই আগামী দিয়া, কর্ম্মচারী চলিয়া গেলেন। একজন কুলির সরদার নূতন কুলিদিগকে একটা জঙ্গলাকীর্ণ মাঠে নিয়ে, কাজ দেখাইয়া দিয়া, দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া, কে কেমন কাজ করিতেছে, তাহার তদন্ত করিতে লাগিল এবং ত্রুটি দেখিবামাত্র তখন তখনই দুই এক ঘা বেত মারিয়া, দুর্ভাগ্য কুলিদের ভাবী জীবনের দুর্গতির শুভ পুণ্যাহ সেই দিনই করিল। প্রথমদিনই, ধরণীও, সরদারের হাতের দুই এক ঘা খাইল। এখানে কুলিদের মাসিক বেতনের হার প্রত্যেক পূর্ণ বয়স্ক পুরুষের আট, প্রত্যেক পূর্ণ বয়স্ক স্ত্রীর ছয় এবং বার বৎসরের উর্দ্ধতন বয়স্ক বালকের চারি টাকা মাত্র। সুতরাং ধরণী, আগামী চারি টাকা পাইল। আর থাকিবার জন্য একখানি লম্বা খড়ের ঘরের একটী কুঠরী পাইল। সেই কুঠরীতেই রান্না এবং শোওয়া উভয় কাজই করিতে হইবে। পথে প্রত্যেক কুলির সঙ্গে সঙ্গে ধরণীও, নিয়ম মত একখানি নূতন কাপড়, এক খানি মোটা কম্বল, একটী টিনের গ্লাস এবং একখানি টিনের থালা পাইয়াছিল। এখানে আসিয়া বেতনের চারিটী টাকা বই অতিরিক্ত কিছুই পাইল না। পথে সরকার হইতেই খোরাকি পাইয়াছিল। এখানে বেতনের অর্দ্ধেক চারি টাকাতেই মাস কাটাইতে হইবে, সরকার হইতেই এইরূপ মর্ম্মের উপদেশ হইল। ধরণী এবার পূর্ব্বের অপেক্ষাও ফাঁপরে পড়িল।

ধরণীধর, মাসিক খরচের জন্য আরও কিছু বেশী টাকা পাইতে পারে কি না, জানিতে গিয়া শুনিল, এখানে প্রত্যেক কুলিকেই অর্দ্ধেক বেতন দিয়া, অর্দ্ধেক হাতে রাখা হয়। কুলিরা, বহুদিন পরে যখন দেশে যায়, তখন যাহার যাহা পাওনা থাকে, হিসাব করিয়া তাহা তাহাদিগকে দেওয়া হয়। কোন কুলি পালাইলে তাহার বাকী বেতন সরকারে জব্দ করা হয়। আর পলাতক ধরা পড়িলে, তাহার ঘোরতর শাস্তি হইয়া থাকে। এই অনন্ত সমুদ্র পার হইয়া, পালান কথার অর্থ কি, তাহা ধরণী, অনেকক্ষণ ভাবিয়াও কিছুই বুঝিতে পারিল না। সহিতে সহিতে মানুষের সকলই অভ্যাস পায়। মাস কয়েক পরে ধরণীরও মরিসসের সমস্ত কষ্ট যন্ত্রণাই সহ্য হইল, অভ্যাস পাইল। নানা রকম কুলির সঙ্গে মিশিয়া, দুর্ব্বৃত্ত ধরণী, এক বৎসরের মধ্যেই বিষম দুরন্ত হইয়া উঠিল। ধরণী বুঝিয়াছে, দেশে তাহার কেহই নাই, যাঁহারা আছেন, তাঁহাদের কাছে, আর কখনও যাইতে পারিবে না। তবে এখান হইতে পালাইতে পারিলে এ যন্ত্রণার হাত হইতে বাঁচিতে পারে। কিন্তু চারিদিকে নীলিমাময় অনন্ত তরঙ্গাকুল সমুদ্রের দিকে চাহিয়া, সে আশাও করা, বৃথা বুঝিয়াছে। যণ্ডামার্ক, দুর্ব্বৃত্ত, দুর্দ্দান্ত ধরণী, শেষটা ঠিক করিল, এ বিষম যন্ত্রণার চেয়ে কারাবাস অধিক কিছু নয়। অতঃপর অপমৃত্যু হইলেও, এ দায় হইতে বাঁচা যায়। সুতরাং এখন কেবল "জোর যার মুলুক তার" এই করিয়াই যত দিন সুবিধায় চলে, সেই ভাল।

প্রথম বৎসরেই ধরণী, কোন কোন কুলির সরদারকে প্রহার করিয়া, এক এক দিন ভূতলশায়ী করিতে লাগিল। কিন্তু ধরণীর মত কোদাল মারিতে এবং জঙ্গল কাটিতে সমস্ত কুলিদিগের মধ্যে একজনও মজবুত নয়। কর্ত্তৃপক্ষ, এজন্য ধরণীকে সরদার মারার অপরাধে কেবল কয়েক ঘা করিয়া বেত মারিয়া মারিয়াই, মোকদ্দমা মিটমাট করিয়া দিতে লাগিলেন। দ্বিতীয় বৎসরে বাধ্য হইয়া, কর্ত্তৃপক্ষ ধরণীধরকে কুলির সরদার করিয়া দিলেন। কুলির সরদার হইয়া, ধরণীর সাহস আরও বাড়িল। ধরণী বুঝিল, সত্য সত্যই "জোর যার মুলুক তার।" সুতরাং এবার ধরণী শর্ম্মা, ছোটখাট কর্ম্মচারী দিগকেও চোক রাঙাইতে বা অত্যাচার করিতে দেখিলেই, ধরিয়া মা'র দিতে আরম্ভ করিল। কিন্তু ধরণীর অধীনে কুলিরা যেমন ভয়ে ভয়ে প্রাণপণে কাজ করে, এমন আর কোন সরদারেরই অধীনে নয়। কাজে কাজেই এবারও কর্ত্তৃপক্ষ, ধরণীর শাস্তির পরিমাণ বাড়াইলেন

না। কর্ত্তৃপক্ষের এই পক্ষপাতের ফলে ক্রমে ক্রমে এই দাঁড়াইল যে, শেষটা বহুতর কুলি ও সরদার ধরণীর বাধ্য হইয়া পড়িল। ধরণী, তখন দলবল নিয়ে, মধ্যে মধ্যে রাত্রিযোগে দ্বীপের উপনিবাসী গৃহস্থ কুলিদের বাড়ীতে পড়িয়া, না না রকম অত্যাচার করিয়া, পালাইতে লাগিল। কর্ত্তৃপক্ষের নিকটে অত্যাচারিত, গৃহস্থ কুলিরা নালিশ করিলেই, ধরণীর বাধ্য কুলিগণ, ধরণীরই স্বপক্ষে সাক্ষ্য দিয়া, পুনরায় তাহাদিগকেই শাস্তি দিতে লাগিল। সুতরাং অত্যাচারিত হইয়াও, শেষে আর কেহ নালিশ করিত না। ইহাতে ধরণীধরের অত্যাচার ক্রমেই বাড়িতে লাগিল। সাহস অনেক বাড়িল।

অবশেষে ধরণী, মধ্যে মধ্যে ছোট "বোট" নিয়ে দলবল সহ সমুদ্রে মাছ ধরিবার নাম করিয়া, কর্ত্তৃপক্ষের কাছে ছুটি লইয়া গিয়া, সুযোগমত জাপানি ও মগ প্রভৃতি সমুদ্রগামী ছোট ছোট মহাজনদের সুলুকাদি একাকী বা বিপন্নাবস্থায় পাইলেই লুঠপাট করিতে লাগিল। কিন্তু বড় বড় মৎস্য উপহার পাইয়া, কর্ত্তৃপক্ষ, ধরণীর সমুদ্র-যাত্রাতে কিছুমাত্র আপত্তি বা সন্দেহ করিতেন না। এমন কি এইরূপ প্রশ্রয় পাইয়া, তৃতীয় বৎসরে ধরণী, একদিন ক্রোধান্ধ হইয়া, কর্ত্তৃপক্ষেরই একজনকে ভয়ানক প্রহারে অচেতন করিয়া ফেলিল। কিন্তু এবারকার ফল, ধরণীর পক্ষে বড়ই ভয়ঙ্কর হইল। ধরণীকেও কর্ত্তৃপক্ষের লোকেরা, বেতের আঘাতে হতচেতন করিয়া, অবশেষে কারাবাসে পাঠাইয়া দিল। ধরণীর ছয় মাস কারাদণ্ড হইল। কিন্তু কারাগারেও ধরণীর অত্যাচারে সকলে ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়িল। ছয় মাস পরে কারামুক্ত হইয়া, ফিরিয়া আসিলে, কর্ত্তৃপক্ষ, ধরণীধরকে পুনরায় অতি নিম্ন শ্রেণীর কুলির কাজে নিযুক্ত করিয়া, ভয়ানক শাসন করিতে আরম্ভ করিলেন। এবার প্রত্যহই বেত্রাঘাতে ধরণীশর্ম্মার পিঠের ছাল উঠিয়া গিয়া ঘা হইতে লাগিল। এক ঘা শুকাইতে না শুকাইতেই, আবার বেতের বাড়িতে নূতন নূতন ঘা হইয়া, ধরণীশর্ম্মাকে দিন দিনই কাতর করিয়া ফেলিতে লাগিল। কিন্তু প্রতিশোধে ধরণী, যাহা করিল, তাহা আরও ভয়ানক। একদিন ঝড় তুফানের মধ্যে অন্ধকার রাত্রিতে ধরণী, কারখানার প্রধান কর্ত্তাকে এবং আট নয় জন কুলির সরদার ও কুলিকে একবারে জঙ্গল কাটিবার তীক্ষ্ণ ধার লম্বা দা দিয়া, কাটিয়া ফেলিয়া অন্তর্দ্ধান হইল। সেই দিন যে ধরণী, সেই ভীষণ তরঙ্গাকুল সাগরে ঝাঁপ দিয়াছে, ইহা প্রথমে কেহই সন্দেহ

করিল না। সুতরাং স্থলভাগেই ধরণীকে খুঁজিতে চারিদিকে বহুসংখ্যক লোক ছুটিল। সেদিন ছোট "বোট" বা ষ্টিমার নিয়ে সমুদ্রে খুঁজিতে যাইতে, কাহারও সাহস হইল না। কিন্তু যখন কারখানার ও দ্বীপের গভর্ণমেণ্টের লোকেরা ধরণীধরের খোঁজ করিতে পারিল না, তখন সকলেই দৃঢ়তার সঙ্গে বলিতে লাগিল, "দুর্দ্দান্ত ধরণী নিশ্চয়ই এই ভীষণ সাগরতরঙ্গে ঝাঁপ দিয়া মরিয়াছে।" যতই সময় যাইতে লাগিল, অনুসন্ধান শেষ হইয়া আসিতে লাগিল, ততই দ্বীপবাসীদের মন এ বিষয়ে নিঃসন্দেহ হইতে লাগিল। তখন কেবল ধরণীকে যাহারা মনে মনে ভালবাসিত, তাহারা মধ্যে মধ্যে সমুদ্র-তীরে দাঁড়াইয়া, সেই অনন্ত নীলিমার দিকে অনেক ক্ষণ একদৃষ্টিতে তাকাইয়া তাকাইয়া, শেষটা গভীর নিরাশার সহিত এক একটী দীর্ঘ নিঃশ্বাস ছাড়িত, আর বলিত, "আহা! আমাদের সেই দুর্দ্দান্ত ধরণী এই অনন্ত জলে ডুবিয়াছে!"

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

সন্ন্যাসি-পরিবার।

আকাশ মেঘাচ্ছন্ন। এক এক বার বৃষ্টি বর্ষণের পরে সম্মুখের পর্ব্বতের চূড়াগুলি ভাসিয়া ভাসিয়া উঠিতেছে। দেখিতে দেখিতে আবার নিবিড় মেঘে ঢাকা পড়িতেছে। আজ দিবসেই চারিদিক্ রাত্রির মত অন্ধকারাচ্ছন্ন। অনবরত টিপ্ টিপ্ করিয়া বৃষ্টি ঝরিতেছে।

একজন অশ্বারোহী পুরুষ এই দুর্দ্দিনের মধ্যে মেঘ বৃষ্টি অবহেলা করিয়া নিকটবর্ত্তী উচ্চ পাহাড়শ্রেণীর অন্তরাল হইতে আসিয়া একটী ক্ষুদ্র পার্ব্বত্য নদী পার হইয়া ঘোড়া সহিত সম্মুখের আর একটী ক্ষুদ্র পর্ব্বতশৃঙ্গের উপরে উঠিলেন। পুরুষ যেস্থান দিয়া বেগে ঘোড়া চালাইয়া আসিতেছিলেন, তাহা সমুদ্রবক্ষ হইতে প্রায় সাড়ে চারি হাজার ফিট উচ্চ। ঘোড়ার মুখ-রজ্জু টানিয়া ধরিয়া ধীরে ধীরে একটী পার্ব্বত্যপথ বহিয়া যে ক্ষুদ্র পাহাড়ের উপরে উঠিলেন, তাহার উচ্চতা পাঁচ হাজার ফিটের প্রায় কাছে কাছে। এই পাহাড়গুলিতে ঝাউজাতীয় সরলবৃক্ষের সামান্য বন ভিন্ন অন্য গাছ পালা প্রায়ই নাই। কিন্তু অধিকাংশ পর্ব্বত-শৃঙ্গই বৃক্ষাদি পরিবর্জ্জিত,

অতি আড়ম্বরশূন্য। যেন সুন্দর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঘাসের পরিচ্ছদ পরিয়া প্রবীণ-চেতা বিজ্ঞ পণ্ডিতের মত গম্ভীরভাবে দাঁড়াইয়া, মাথা তুলিয়া আকাশের শোভা পর্য্যবেক্ষণে সদা নিমগ্ন রহিয়াছে। যেন বৃক্ষ-লতা-পুষ্প-অলঙ্কার গুলিকে বালকের ধূলা-খেলার দ্রব্যমাত্র মনে করিয়া সকলেই, পায়ে দলন করিতেছে। তাই যেন সে সকল কেবল অন্ধকার গুহার অতল তলেই পড়িয়া আছে দেখিতে পাওয়া যায়। আবার দেখিবে, পর্ব্বতের চূড়ায় চূড়ায় দূর হইতেই থাসিয়া-পুঞ্জি সকলের কুটীর-শ্রেণী এবং গোল আলু প্রভৃতি শস্য ক্ষেত্রের সুন্দর শোভা নয়ন মনের অপূর্ব্ব প্রীতি সম্পাদন করিতেছে। নিকটে গেলে দেখিবে, স্বভাবের সরল শিশু,সবলকায় থাসিয়া-কৃষক বন-কুসুম-ভূষিতা সুবর্ণাঙ্গী যুবতী প্রণয়িণীর মধুর হাসিতে হাসি মিশাইয়া, বুকের ভালবাসাতে বুকের ভালবাসা ঢালিয়া, কেমন সচ্ছন্দ-চিত্তে চাষ ও বপন-কার্য্যে রত রহিয়াছে। ভদ্র থাসিয়া-রমণীগণ স্বর্গভ্রষ্টা দেবীর মর্ত্ত, ইন্দ্রের ইন্দ্রাণীর মত, সুন্দর অথচ সুরুচির পরিচায়ক বেশভূষায় সাজিয়া কেমন এখানে, সেখানে, পথে, ঘাটে, বিজনে, সজনে, পর্ব্বতশৃঙ্গে,পর্ব্বতগুহায় সর্ব্বত্র সরলতা-সুধামাখা পবিত্র রূপের ফুলভরা সুবর্ণ সাজীর মত শোভা পাইতেছেন। প্রত্যেক থাসিয়ারই হৃদয়-মন আকাশের পাখীর মত চির-স্বাধীনতাতে পরিপূর্ণ। সকলেরই মুখে সেই স্বর্গীয় স্বাধীনতার সুন্দর তেজ। কি স্ত্রীলোককে, কি পুরুষকে, দেখিলেই, প্রাণে বিপুল প্রীতির সঞ্চার হয়। কিন্তু থাসিয়া-রমণী অতুলনীয়। এ অতুলনীয় দৃশ্য দেখিতে স্বদেশীয় বা বি-দেশীয় কাহাকেও কষ্ট করিতে হয় না। থাসিয়া-সরদার বা রাজার রাজরাণীও প্রকাশ্যে হাটে, বাজারে শাকসব্জি ও তরকারির দোকান সাজাইয়া রূপে দশ দিক্ আলো করিয়া বসিয়া থাকেন। কাছে যাও, সরলভাষায়, সরল-প্রাণে হাসিয়া হাসিয়া মধুরভাবে সম্ভাষণ করিবেন, মধুরভাবে কথার উত্তর দিবেন। পতিপ্রেম, সাধ্বীর সাধুতা এ সকলের প্রকৃত মূল্য থাসিয়া-রমণী যেমন জানেন, তেমন পৃথিবীর কোন দেশের কোন রমণীরা জানেন কিনা জানি না। সভ্যতার বিপুলগর্ব্বে গর্ব্বিত মানুষ,যদি তোমার সন্তপ্ত চক্ষু জুড়াইতে চাও, অপবিত্র প্রাণে পবিত্রতার বাতাস লাগাইতে চাও, তবে অশিক্ষিত, অসভ্য মনে না করিয়া নিস্তব্ধ, প্রকৃতির উচ্চতাব্যঞ্জক গম্ভীর-দৃশ্য-পরিপূর্ণ থাসিয়া-পর্ব্বতশ্রেণীতে একবার বেড়াইতে যাও। ভাই, আর্য্য-বংশাভিমানি, এই অনার্য্য থাসিয়া জাতিকে সমাদরে কোলে টানিয়া লইতে

যত্ন কর। এই সরল প্রাণে প্রাণ ঢালিতে চেষ্টা কর। এই অশিক্ষার আঁধারে পবিত্র সুশিক্ষা ও বিশুদ্ধ ধর্ম্মের নির্ম্মল সুধাময় জ্যোতি বিস্তার করিতে বদ্ধ-পরিকর হও। বঙ্গের সৌভাগ্যের দিন, ভারতের গৌরবের দিন অবিলম্বে ফিরিয়া আসিবে। কিন্তু এ সকল দৃশ্য আজ অন্ধকারাচ্ছন্ন—মেঘে ঢাকা। প্রকৃতি দেবী, মেঘাবরণ না সরাইলে, কাহারও চক্ষুর নিকটে ফুটিবে না। যাহা হউক্, অশ্বারোহী, অশ্বসহ ধীরে ধীরে যে পাহাড়ে উঠিলেন, ইহার নাম দণ্ডীর পাহাড়।

এ পাহাড়ের উপরে মনুষ্য-কৃত একটী ক্ষুদ্র বাগানে নানা প্রকার ফল ফুলের গাছ শোভা পাইতেছে। গাছগুলির মধ্যে মধ্যে স্থানে স্থানে,চারিদিকে ফুলবাগানে ঘেরা কয়েকখানি কুটীর অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্য ছড়াইয়া, যেন শান্তি ও শুদ্ধতার কোলে ঘুমাইতেছে। কুটীরগুলি সামান্য হইলেও, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতায় ও মনোহারিত্বে রাজ-প্রাসাদকেও যেন পশ্চাতে ফেলিয়া রাখিয়াছে। চারিদিকে গাছের সবুজ স্নিগ্ধ পত্রমণ্ডিত শাখাগুলি,ফল ও ফুলের ভারে অবনত হইয়া, হেলিয়া পড়িয়াছে। গাছে গাছে পত্রপুষ্পের আড়ালে বসিয়া, সকালে, সন্ধ্যায়, দ্বিপ্রহরে সর্ব্বদাই নানাপ্রকার পার্ব্বত্য গায়ক পক্ষী, দশদিক্ আমোদিত করিয়া গান করে। ফুলবাগানে ও নানা স্থানে নানা জাতীয় পার্ব্বত্য-বনকুসুমের সঙ্গে যুঁই, গোলাপ, বেল, চামেলী ও গন্ধরাজ প্রভৃতি নিম্ন প্রদেশীয় ফুল, রাশি রাশি ফুটিয়া রহিয়াছে। কিন্তু সকল শোভা সৌন্দর্য্যের উপরেই শান্তি, গাম্ভীর্য্য ও পবিত্রতা যেন গলাগলি ও কোলাকোলি করিয়া, স্থিরভাবে নিদ্রা যাইতেছে। একটী পোষা হরিণশিশু এবং একটী ময়ূর নিজের ইচ্ছামত উন্মুক্তভাবে যেখানে সেখানে চরিয়া বেড়াইতেছে। কিছুদিন হইল, একটী হরিণী,কোন বন্যজন্তুদ্বারা আহত হইয়া, একটী শাবক সঙ্গে গুহার-মধ্য হইতে দৌড়াইয়া আসিয়া, পর্ব্বত-পৃষ্ঠস্থ এই কুটীর শ্রেণীর নিকটে আশ্রয় গ্রহণ করে। হরিণীটী, তখনই মরিয়া যায়। কুটীর বাসীরা, এই হরিণ-শিশুটীকে প্রতিপালন করিয়া ছাড়িয়া দিয়াছে। কিন্তু হরিণশাবক, মনুষ্য-সংসর্গ ছাড়িয়া জঙ্গলে না গিয়া, এই বাড়ীতেই স্বেচ্ছাক্রমে বাস করিতেছে। ময়ূরটীও, এই ভাবেই প্রতিপালিত হইয়া, পোষ মানিয়াছে। বস্তুত, কুটীরবাসীরা, যে, কেবল আমোদ চরিতার্থ করিতে ইহাদিগকে বন্দী করে নাই, তাহা ইহাদের উন্মুক্ত ভাব দেখিয়াই, বুঝা যাইতেছে। ফলত, এই স্থানে প্রবেশমাত্রই, কেহ না বলিলেও, যেন আপনা হইতেই বোধ হয়,

ইহা পূর্ব্বকালের কোন মুনিঋষির পবিত্র তপোবন, অথবা ইহা কোন যোগীর পবিত্র যোগাশ্রম—একটী অখণ্ড শান্তিপূর্ণ আনন্দভবন। বাড়ীটার চারিদিকে নির্ম্মল শীতল জলের ঝরণা সকল হইতে অনবরতই রাশি রাশি মুক্তা-বর্ষণের মত ঝর ঝর করিয়া, কুল কুল, কল কল, তর তর শব্দ করিয়া নিম্নস্থ গুহার মধ্যে বেগে জল ঝরিয়া ঝরিয়া পড়িতেছে। বাড়ীর এক পার্শ্বে অতি নির্জ্জন স্থানে সুন্দর দুইখানি বৃহদাকার গৃহ শোভা পাইতেছে। এঘর দুই খানির কাছে যাইবামাত্রই বুঝা যায়, এই দুই খানি বিদ্যালয়-গৃহ। বিদ্যালয়-গৃহের নিম্নেই আদর্শ কৃষিক্ষেত্র। ইহাতে নানা প্রকার কপি, শালগাম; গাজর, মূলা, মটর, আলু, কচু, শাকসব্জি ও শস্যের গাছ শোভা পাইতেছে। এই কৃষিক্ষেত্র পর্ব্বত গাত্রে অতি বিস্তীর্ণ স্থান যুড়িয়া রহিয়াছে। কিন্তু আজ এ সকলও মেঘে ঢাকা।

অশ্বারোহী, মেঘান্ধকারে ঢাকা দণ্ডীর পাহাড়ে উঠিয়া, এক লম্ফে ঘোড়া হইতে নামিয়া, ঘোড়ার মুখের দড়ী গাছি ধীরে ধীরে সঙ্গের ভৃত্যের হাতে দিলেন। ভৃত্য ঘোড়াটী নিয়ে তখনই একটা প্রকাণ্ড পাথরের আড়ালে গিয়া দাঁড়াইয়া, বিশ্রাম করিতে লাগিল। পুরুষও, নিমেষমধ্যেই তাড়াতাড়ি অথচ চিন্তা-নিবিষ্টচিত্তে সম্মুখের ফল ও ফুলের উদ্যান-মধ্যে প্রবেশ করিয়া, একখানি কুটীরের দ্বারে গিয়া তাহাতে ঘন ঘন আঘাত করিতে লাগিলেন। একাদিক্রমে কয়েকটী আঘাতের পরেই, কুটীরের মধ্য হইতে দ্বারের সম্মুখে আসিয়া, দরজা না খুলিয়াই, একটী খাসিয়া-বালিকা, ভিতর হইতে খাসিয়া-ভাষায় জিজ্ঞাসা করিল, "কে ?" বাহির হইতে গম্ভীর স্বরে উত্তর হইল, "দরজা খোল।"

বালিকা, কণ্ঠস্বরেই পুরুষকে চিনিয়া, তাড়াতাড়ি ব্যস্ত সমস্ত হইয়া, কুটীরের কপাট খুলিয়া দিয়া এক পার্শ্বে দাঁড়াইল। যে বালিকা পুরুষকে দরজা খুলিয়া দিল, ইহার বয়স সতর কি আঠার বৎসর। কিন্তু এ, এখনও কুমারী। কুমারীর নাম জুন। খাসিয়া দেশের রীত্যনুসারে সকলে ইহাকে কাজুন বলিয়া ডাকে। "কা" শব্দের অর্থ "শ্রীমতী"।

বৃষ্টি ও বাহিরের কন্‌কনে শীত-নিবারক উপরের আবরণ ভৃত্যের নিকট দিয়া আসাতে, পুরুষ, কুটীরের বাহিরে দাঁড়াইয়া, অল্প অল্প বৃষ্টিতে ভিজিতে ভিজিতে শীতে কাঁপিতে ছিলেন। সুতরাং কাজুন কপাট খুলিবামাত্রই, পুরুষ তাড়াতাড়ি কুটীরের মধ্যে প্রবেশ করিলেন। কুটীরের

ধূম-নিঃসারক নল বা চিমনীতে আজ সকালবেলা হইতেই আগুন জ্বলিতেছিল। সুতরাং বাহিরের অপেক্ষা কুটীরের অভ্যন্তরভাগ খুব গরম বোধ হইতে লাগিল। কিন্তু কপাট খোলাতে বাহির হইতে হু হু করিয়া কুটীর মধ্যে শীতল বাতাস আসিতেছিল। তাই পুরুষ, ঘরে আসিবামাত্রই আবার কপাট বন্ধ হইল। চারিদিকের জানালার সাসী দিয়া ঘরে প্রচুর আলো আসিতেছিল। শীতকাল না হইলেও, বাদলার দিনে মধ্যেমধ্যে পাহাড়াঞ্চলে ভয়ানক শীত বোধ হয়।

পুরুষ,যে কুটীরে প্রবেশ করিলেন,তাহা দুইটী প্রকোষ্ঠে বিভক্ত। পুরুষ, সম্মুখের প্রকোষ্ঠে প্রবেশ করিবামাত্র,একটী কৃষ্ণাঙ্গী যুবতী,পুরুষকে সাতিশয় সমাদরে অভ্যর্থনা করিয়া, তাড়াতাড়ি বসিবার জন্য একখানি আসন দেখাইয়া দিল। কিন্তু পুরুষ বসিলেও,যুবতী,দাঁড়াইয়া রহিল। দেখিয়াই বোধ হইতেছিল, এ যুবতী, বাঙ্গালী। যুবতীর বয়স অপেক্ষাকৃত কিছু বেশী। ইহাকে এখন প্রৌঢ়া বলিলেও বলা যাইতে পারে। ইহার নাক, মুখ, চোক দিয়া যেন বুদ্ধির জ্যোতি ছুটিয়া বাহির হইতেছিল। কৃষ্ণাঙ্গী যুবতী, বাঙ্গালী হইলেও, খাসিয়া কথাতেই পুরুষকে জিজ্ঞাসা করিল,—"এ বাদ্‌লার দিনে মহাশয়ের এত কষ্ট কো'রে কেন আসা হইয়াছে,জানিতে পারি কি ?"যুবতী, পুরুষকে জানে। পুরুষও, যুবতীকে জানেন। যুবতী, বিনম্রভাবে এই কয়টী কথা জিজ্ঞাসা করিবামাত্রই, পুরুষ বলিলেন—"দণ্ডীজি ঘরে আছেন ?"

যুবতী, পূর্ব্বভাবেই উত্তর দিল—"না। তিনি, সন্ন্যাসী এবং পরিব্রাজক, এক সঙ্গে মনাক্রিমে গিয়াছেন। তাঁহাদের কা'ল ফিরিবার কথা আছে। সন্ন্যাসিনী কেবল একা ঘরে আছেন।"

পুরুষ।—"আচ্ছা। তাঁহাকেই আমার প্রণাম জানাও।"

পুরুষের কথা শেষ হইতে না হইতেই কৃষ্ণাঙ্গী যুবতী, কুটীরের বারেন্দার দিক্‌দিয়া অপর প্রকোষ্ঠে ছুটিয়া চলিল। এ প্রকোষ্ঠে এক অতি পরমরূপবতী পূর্ণযৌবনা সুন্দরী, গৈরিকাঞ্চলে আপনার অপূর্ব্ব রূপরাশি অতি যত্নে আচ্ছাদিত করিয়া, রুক্ষ রুক্ষ বিপুল কেশরাশিতে পশ্চাৎভাগ সম্পূর্ণরূপে ঢাকিয়া, নিবিড় ঘনদামের কোলে অচঞ্চল বিদ্যুৎ রাশির মত স্থিরভাবে গালে হাত দিয়া বসিয়া, অতি নিবিষ্টচিত্তে গ্রন্থ পাঠ করিতেছিলেন। সুন্দরীর হাতে গাল রক্ষিত হওয়াতে বোধ হইতেছিল, যেন প্রভাতের শিশিরে ধোয়া সদ্যফুটন্ত গোলাপ রাশির উপরে কেহ গোলাপের

রাশি ঢালিয়া দিয়াছে অথবা একটী প্রফুল্ল শতদলের উপরে শাণ-বিশোধিত অকলঙ্ক পূর্ণিমার চাঁদ সাজাইয়া রাখিয়াছে। যে দিকে সুন্দর চাঁদমুখখানির সহিত সুন্দরীর সুন্দর মস্তকটী একটু হেলিয়া রহিয়াছে, তাহারই বিপরীত দিকের পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন চুলের গুচ্ছগুলি ছড়াইয়া পড়িয়া, কপাল, গণ্ড ও গ্রীবার একাংশ আধ আধ ঢাকিয়া, বক্ষস্থলের উপর দিয়া শয্যার উপরে লুণ্ঠিত হইতেছে। নবীনসন্ন্যাসিনী, দ্রাবিড় দেশ হইতে সংগৃহীত একখানি পরিশুদ্ধতম তুলট কাগজের হাতের লিখা ঋগ্বেদের সঙ্গে তাহার দুইখানি পৃথক্‌পৃথক্ ভাষ্য মিলাইয়া পড়িতেছেন। ভাষ্য দুইখানির মধ্যে একখানি হাতের লিখা সংস্কৃত ভাষ্য। এখানি পুনানগর হইতে সংগৃহীত। দ্বিতীয়খানি, জর্ম্মন দেশীয় কোন সুপ্রসিদ্ধ পণ্ডিত ভট্টপ্রবরের লিখিত। কৃষ্ণাঙ্গী যুবতী, বারান্দা হইতে প্রকোষ্ঠের দরজার কপাট ঠেলিয়া ভিতরে গিয়া, সম্মুখে দাঁড়াইলেও, সন্ন্যাসিনী, মুখ তুলিয়া তাহার দিকে চাহিলেন না। পূর্ব্বের মতই প্রগাঢ় মনোনিবেশের সহিত পড়িতে লাগিলেন। সুন্দরীর পবিত্র মুখশ্রী হইতে যেন একসঙ্গে প্রতিভার জ্যোতি, সরলতা, গাম্ভীর্য্য ও পুণ্যের স্নিগ্ধ আভা বিকীর্ণ হইতেছিল। কৃষ্ণাঙ্গী, সন্ন্যাসিনীকে মুখ তুলিতে না দেখিয়া, ধীরে ধীরে ডাকিল,—"দিদী বাবু" সুন্দরীর এবার চৈতন্য হইল। সুন্দরী, অন্যমনস্কভাবে কৃষ্ণাঙ্গীর মুখের দিকে তাকাইয়া বলিলেন,—"কেন সরস্বতি, কেন ডাকিতেছ?"

সরস্বতী।—"মতিরায় আসিয়াছেন। তোমার জন্য ওকুঠরীতে অপেক্ষা করিতেছেন।"

সুন্দরী, এবার কিছু ব্যস্ত হইয়া, সম্মুখের গ্রন্থগুলি তাড়াতাড়ি বন্ধ করিতে করিতে পুনরায় সরস্বতীর দিকে চাহিয়া বলিলেন,—"কি সরস্বতি, মতিরায় আমার জন্য অপেক্ষা করিতেছেন!"

সরস্বতী।—"হ্যাঁ দিদীবাবু, তোমারই জন্য। বোধ হয়, কর্ত্তাবাবুর কাছে আসিয়াছিলেন।"

সুন্দরী যুবতী বা নবীন সন্ন্যাসিনী, পাষাণী। এখানে পাষাণী, খাসিয়াদের নিকটে সন্ন্যাসিনী নামেই পরিচিত হইয়াছে। এখানেও ধোপার অভাবে কাপড় আপনাদেরই কাচিয়া নিতে হয়। কাপড় ঘন ঘন ময়লা না হয়, এজন্য এখানেও হরগোবিন্দ, পাষাণী, শশাঙ্কশেখর, সন্ন্যাসী, সকলেই কাপড়গুলি পাহাড়ের গেরিমাটি দিয়া রঙ করিয়া নিয়ে থাকেন। এই

জন্যই হউক্ বা অন্য যে কোন কারণেই হউক্, অনিচ্ছাসত্ত্বেও খাসিয়াদের মধ্যে হরগোবিন্দ, দণ্ডীজি নামে; পাষাণী, সন্ন্যাসিনী নামে এবং শশাঙ্ক-শেখর, পরিব্রাজক নামে অভিহিত হইয়াছেন। নামগুলি খাসিয়া ভাষাতে খাসিয়ারা, অন্যরূপে বলিলেও, তাহার বঙ্গানুবাদ এইরূপই হয়। সন্ন্যাসী, এখনও পূর্ব্ববৎ সন্ন্যাসী নামেই পরিচিত আছেন। দণ্ডীর পাহাড়ের এই সমস্ত পরিবারটী, এখন সন্ন্যাসি-পরিবার নামে খাসিয়াদের মধ্যে পরিচিত। সন্ন্যাসী এবং শশাঙ্কশেখর বা পরিব্রাজক, কেবল মধ্যে মধ্যে আসিয়া, দণ্ডীর পাহাড়ে সন্ন্যাসি-পরিবারে মিশিয়া থাকেন। নতুবা অধিকাংশ সময়ই নানা স্থানে, বিশেষত হিমালয়-অঞ্চলে ভ্রমণ করিয়া থাকেন। মতিরায়, খাসিয়া-সরদার বা খাসিয়াদের একজন রাজা।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

"সেই ছিল এক দিন আর আজ এক দিন!"

দেখিতে দেখিতে মাসের পরে মাস, বৎসরের পরে বৎসরগুলি যেন অদৃশ্যে, ধীরে ধীরে অতীতের অন্ধকারে মিশিয়া গিয়াছে। নীরব ঘটনাগুলিও, যেন তাহাদেরই অনুসরণ করিয়াছে। আছে, কি? আছে কালের বুক আর মানুষের বুক উভয়কে মিলাইয়া, মিশাইয়া, একটী জ্বলন্ত দাগ। এই দাগের নামই অতীতের নিবু নিবু স্মৃতি অথবা মানুষের প্রাণে আঁকা বিগত কাল ও ঘটনার স্বপ্নময় চিত্রপট। যত দিন নূতন থাকে, মানুষ, মর্ম্মে লুকাইয়া এই চিত্রপট—বিজন বিরল পাইলেই—একবার, দুইবার, দশবার, খুলিয়া দেখে। দেখিতে দেখিতে শেষটা ইহাও, বাহিরের চিত্র-পটের মত মলিন হইয়া যায়। মলিন পটখানি শেষে সকলেই গুটাইয়া রাখে। তখন কালে ভদ্রে কখনও এক আধ বার, মানুষ, সেই পোকা-কাটা জীর্ণ শীর্ণ পটখানি খুলিয়া দেখে, আর বলে,—"সেই ছিল এক দিন আর আজ এক দিন!" ঘটনাবিশেষে বেশী হইলে, কেহ, একটী দীর্ঘশ্বাস ছাড়ে, কেহ বা দুই এক ফোঁটা চোখের জলেই মনের সমস্ত কষ্ট ধুইয়া ফেলে। ইহার অতিরিক্ত আর কে কি করে, জানি না। সিদ্ধেশ্বরীর মৃত্যু-ঘটনা মনে হইলে, পাষাণী আজও কিন্তু কাঁদিয়া কাঁদিয়া বুক ভাষায়।

হরগোবিন্দ, কি করেন, জানি না। তবে ভাবিতে ভাবিতে সকলেই, মধ্যে মধ্যে মনে মনে বলেন,—"সেই ছিল এক দিন আর আজ এক দিন!" আজ সাত আট বৎসর হইল, হরগোবিন্দ রায়, সিদ্ধেশ্বরীর সেই মৃত দেহ ব্রহ্মপুত্রের তীরে শ্মশানের ছাইয়ে মিশাইয়া, অনাথা পাষাণী ও সরস্বতীকে নিয়ে, দণ্ডীর পাহাড়ে বাস করিতেছেন। এই বহুকালের কথা মনে করিয়াই, বলিতেছিলাম,—"*সেই ছিল এক দিন আর আজ এক দিন!*"

যে দিন হরগোবিন্দ, দুইটী অনাথিনী যুবতীকে লইয়া, বন্ধুবান্ধব-শূন্য স্বদেশ হইতে বহুদূরে—পর্ব্বতময় প্রদেশে— অসভ্য খাসিয়ার দেশে—জঙ্গলাকীর্ণ দণ্ডীর পাহাড়ে, অর্থবল-লোকবলহীন হইয়া, একাকী আশ্রয় নিলেন, সেই ছিল এক দিন। সেই দিনই, রাজপুত্র হরগোবিন্দ, এ জগতে প্রথম দুঃখ কষ্টের সংসার পাতাইলেন। সেই দিনই সিদ্ধেশ্বরীর শোকের আগুন অশ্রুর সহিত প্রাণ হইতে মুছিয়া ফেলিয়া, উর্দ্ধদিকে তাকাইয়া বলিলেন, "প্রভু, তোমারই ইচ্ছা পূর্ণ হউক্। আমি আর কি বলিব?" সে দিন হরগোবিন্দের হাতে একটীও টাকা পয়সা ছিল না। দেশ হইতে যাত্রাকালে যে কিছু টাকা আনিয়াছিলেন, তাহা পথেই সিদ্ধেশ্বরীর পীড়ার চিকিৎসা ও শুশ্রূষায়, গাড়ী ভাড়া, নৌকা ভাড়া, এবং খোরাকি প্রভৃতির দরুণই ফুরাইয়া গিয়াছিল। অবশিষ্ট যাহা কিছু ছিল, সিদ্ধেশ্বরীর শব সংকার করিতে তাহাও নিঃশেষ রূপে ব্যয় হইয়াছিল। সুতরাং এক সন্ধ্যা চলিতে পারে, হরগোবিন্দের হাতে এমন একটী কপর্দ্দকও ছিল না। সন্ন্যাসী ও শশাঙ্কশেখর উপস্থিত না থাকাতে হরগোবিন্দ, তাঁহাদের শূন্য বাসায় আশ্রয় মাত্র পাইয়াই, কৃতজ্ঞতাতে ব্যাকুলভাবে ভূমিষ্ট হইয়া, ভগবানকে কেবল একটী গড় করিলেন। অনাথশরণ ভগবান ভিন্ন কাঁহারও দ্বারে চাকরি কিম্বা ভিক্ষা করিয়া বা চাহিয়া কিছু সাহায্য লইবেন না, ইহা হরগোবিন্দের জীবনের মূল মন্ত্র। হরগোবিন্দ, এ দুর্দ্দিনেও, এই মন্ত্র লঙ্ঘন করিতে প্রস্তুত হইলেন না।

দণ্ডীর পাহাড়ে আসিয়া, প্রথম দিন সন্ন্যাসি-পরিবারের নিরম্বু উপবাস গেল। দ্বিতীয় দিন প্রাতেই হরগোবিন্দ, নিকটবর্ত্তী গুহায় নামিয়া, বন জঙ্গল হইতে নানা প্রকার ফল মূল সংগ্রহ করিয়া আনিলেন। বিপদে বুদ্ধি যোগায়। এদিকে পাষাণীও, সরস্বতীকে নিয়ে, পাহাড়ের চারিদিক্ হইতে কতকগুলি পাখীর পালক ও ময়ূরের পুচ্ছ সংগ্রহ কৰিল। এবং তখনই সেই পালকগুলি নিয়ে, পাষাণী, নিজহাতে আপনার কাঁপড়ের

কিনারা ছিঁড়িয়া, তাহার সূতা দিয়া বাঁধিয়া, কয়েক খানি সুন্দর সুন্দর পাখা এবং কয়েকটী চামরের মত এক রকম অতি সুন্দর জিনিষ তৈয়ার করিল। আর কল্পনা করিয়া করিয়া, ময়ূরপুচ্ছ ও নানা রঙের পাখীর পালক ছিঁড়িয়া কয়েকটী সুন্দর মাথার ফুলও প্রস্তুত করিল।

পাষাণী ময়ূরপুচ্ছ এবং পাখীর পালকের পাখা, চামর ও ফুল তৈয়ার করিয়া সাজাইয়া রাখিলে, সরস্বতী আহ্লাদে আট খানা হইয়া, এক মুখ হাসিয়া বলিল, "বা! দিদীবাবু, এযে বেশ হো'য়েছে! বড়ই সুন্দর জিনিষগুলি হো'য়েছে! আমার ইচ্ছা হো'চ্ছে এ গুলি রেখে দি। বেচ্‌লে যে নিশ্চয়ই পয়সা হবে।"

পাষাণী।—"কি জানি ভাই, এ পাহাড়ে দেশে এ কেউ কিনিবে কি না, কে জানে? যাহোক্, একবার চেষ্টা করিলে হয়। এ শীতের মুলুকে পাখা চামরের কোনই দরকার নাই। তবে শোভার জন্য যদি কেহ কেনে। বোধ হয়, ফুলগুলি চুলে পরিতে, নিশ্চয়ই খাসিয়াদের মেয়েরা কিনিবে। যদি আজ ইহাতে কিছু পয়সা হয় দেখি, তবে আমি মনে মনে ভাবিয়া ভাবিয়া, কাল, পাখীর পালক ও ময়ূরপুচ্ছের ছাতা, টুপি, লাঠি ও এক রকম খেলনার পুতুল তৈয়ার করিয়া দিব। তুমি ভাই, বেচিয়া আসিতে পারিবেত? ছিট পাইলে, ঐ পালকের কুচাগুলি ফেলিয়া দিতে হইবে, তাহা দিয়া বালিশ তৈয়ার করা যাইতে পারিত।"

সরস্বতী।—"সে কি দিদীবাবু, এ ক'দিনের মধ্যেইত আর আমি পুরুষ হো'য়ে যাইনি! আজ বাজারে যে'তে বো'ল্‌ছ। কাল দেখ্‌ছি, আমায় আর সরস্বতী না বো'লে, বো'ল্‌বে, "সরস্বতী চন্দ্র বিদ্যেবালিশ।" বিদ্যেবালিশ না কি বলে?"

এই বলিয়াই, সরস্বতী, হো—হো করিয়া হাসিয়া ফেলিল। পাষাণীও হাসিতে হাসিতে বলিল, "এ ত আর বাঙ্গালা মুলুক নয়। খাসিয়া-পাহাড়ে স্ত্রীলোক পুরুষ সকলেই, হাটে বাজারে যেখানে ইচ্ছা, সেখানে যাওয়া আসা করে। কোনই ভয় নাই। না হয় এখন কিছুদিন সরস্বতী চন্দ্র বিদ্যেবালিশই হও। সরস্বতী সুন্দরী ত বহুদিন থেকেই আছ। ও ছাই কি আর পুরাণ হয় না?" হাসিতে হাসিতে এই সকল কথা বার্ত্তা হইতেছিল। তখন হরগোবিন্দও, হাসিতে হাসিতে আসিয়া, তাহার ভাগ নিলেন। পরে সকলেই, সংগৃহীত ফল, মূল ও ঝরণার জলে ক্ষুৎপিপাসা

দূর করিয়া পরিতৃপ্ত হইলেন। তৎপরে হরগোবিন্দ, সত্য সত্যই পাষাণীর প্রস্তুতকরা জিনিষ গুলি নিয়ে, হাঁটিতে হাঁটিতে ধীরে ধীরে একটা খাসিয়া-বাজারে গিয়া উপস্থিত হইলেন। সেই সুন্দর সুন্দর জিনিষগুলি, খাসিয়ারা দেখিয়াই কিনিতে ব্যগ্র হইল। সেদিন হরগোবিন্দ এই সকল জিনিষ বিক্রয় করিয়া, প্রায় পাঁচ টাকা পাইলেন। টাকা পাইয়া, সেই পক্ককেশ হরগোবিন্দ তখনই ছুটিয়া একটা নির্জ্জন পাহাড়ে গিয়া মনের আবেগে মাটীতে পড়িয়া, গড়াগড়ি করিয়া, কাঁদিয়া কাঁদিয়া, চেঁচিয়া চেঁচিয়া, প্রাণের সাধ মিটাইয়া, "মা—মা—" বলিয়া, ভগবানকে অনেক ডাকিলেন। অনেক কাঁদিলেন। পরদিনই হরগোবিন্দ, পাষাণীর ফরমাইশ মত পাখীর পালকাদি সংগ্রহ করিতে দুইজন খাসিয়া-রমণীকে ভৃত্য নিযুক্ত করিলেন। আর নীচের হাট বাজারে যে সকল খাসিয়ারা সর্ব্বদা যাওয়া আসা করে, তাহাদের দ্বারা পাষাণীর কথা মত কিছু ছিটের কাপড়ও আনাইয়া দিলেন। ক্রমে সূচ, সুতা সকলই আসিল। খাসিয়া-রমণীরা জামা ব্যবহার করে দেখিয়া, পাষাণী সরস্বতীকে নিয়ে জামাও তৈয়ার করিতে আরম্ভ করিল। খাসিয়ারা যেমন বিশ্বাসী, তেমনই সত্যবাদী এবং সরল। এটী খাসিয়াদের সাধারণ জাতীয় ভাব। খাসিয়ারা অতি অল্পসন্তুষ্ট-চিত্ত। প্রাপ্য পাইলে, খাসিয়ামজুরেরা কখনও নিম্ন অঞ্চলের মুটে মজুরদের মত পুরস্কারের জন্য নিরর্থক দাতাকে বিরক্ত করে না। খাসিয়াভৃত্যদের সাহায্যে পাষাণীর ক্ষুদ্র ব্যবসায়, দিনে দিনে, ধীরে ধীরে, ক্রমে ক্রমে, নীচের হাট বাজারে পর্য্যন্ত ছড়াইয়া পড়িল। ক্রমে ক্রমে পাষাণী, কলিকাতায় জয়কৃষ্ণ বাবুকে লিখিয়া, একটী শেলাইয়ের কল ও বস্ত্রাদিও অনেক সংগ্রহ করিল। এক বৎসরের মধ্যেই পাষাণীর ব্যবসায়ের প্রচুর উন্নতি হইল। পাষাণী, রঙ আনাইয়া, মধ্যে মধ্যে ভাল ভাল চিত্র আঁকিয়াও বাজারে পাঠাইতে লাগিল।

এদিকে হরগোবিন্দও, খাসিয়ারাজের সঙ্গে দেখা করিয়া, আলুর চাষের জন্য অনেক পাহাড়ের জমি বন্দোবস্ত করিয়া লইলেন। খাসিয়াদেশে রাজাকে বিপুল পরিমাণে রাজস্ব দিতে হয় না। অতি যৎসামান্য মাথাগন্তি কর ও উপহার দিলেই রাজা সন্তুষ্ট থাকেন। প্রজারা, রাজার দরকার হইলেই, পরিশ্রম করিয়া, নানা প্রকার সাহায্য করে। সন্ন্যাসীর বন্ধু বলিয়া, সন্ন্যাসিপরিচিত নিকটবর্ত্তী পুঞ্জির খাসিয়ারাজ বা খাসিয়াসরদার, হরগোবিন্দকে অনেকগুলি

পাঁহাড়ে নিরাপত্তিতে চাষ বাস করিতে অনুমতি দিলেন।" এতদ্ভিন্ন রাজা, স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়াই, হরগোবিন্দকে চেরাপুঞ্জির নীচে একটা বাগান ছাড়িয়া দিলেন। যাঁহারা কখনও চেরাপুঞ্জি হইতে থারিয়াঘাট দিয়া শ্রীহট্টের দিকে নামিয়া আসিয়াছেন, তাঁহারাই জানেন, এই নিম্ন পর্ব্বতগুলিতে প্রকৃতিদেবী, আপনার বক্ষে কি প্রকার স্বভাবজাত অনন্ত সুপারিবৃক্ষরাজর হরাৎ-তরঙ্গময়-সমুদ্র সাজাইয়া রাখিয়াছেন, আবার সুস্নিগ্ধ শ্যামলকান্তি কণ্টকী ও কমলা লেবুর বৃক্ষরাজিতে সেই সুন্দর সুপারিকানন কি প্রকার ভূষিত করিয়াছেন। উদ্যমশীল হরগোবিন্দ, এই বাগান হইতেও চাষের কাজে খাসিয়া সহযোগীগণের সাহায্যে অল্প দিনের মধ্যেই প্রচুর লাভবান হইতে লাগিলেন। প্রথম প্রথম হরগোবিন্দ, কুলিদের সঙ্গে সঙ্গে নিজেই হাতে কোদাল নিয়ে মাটী খুঁড়িতে লাগিলেন। সরস্বতী এবং পাষাণীও অবসর মত মধ্যে মধ্যে ক্ষেতে গিয়া, খাসিয়ারমণীদের মত আলু রোপণাদিকার্য্যে সাহায্য করিতে লাগিল। পরে যখন ক্ষেত্র প্রস্তুত হইলে প্রচুর লাভ হইতে লাগিল, তখন বিশ্বাসী খাসিয়াকর্ম্মচারী সকল নিযুক্ত করিয়া, সন্ন্যাসিপরিবার খাসিয়াদের সেবার জন্য খাটিতে বদ্ধপরিকর হইলেন। পাষাণীও, সরস্বতী এবং কতকগুলি খাসিয়ার মেয়েকে কাজ শিখাইয়া, নিজের ক্ষুদ্র ব্যবসায় তাঁহাদের হাতেই ছাড়িয়া দিল।

হরগোবিন্দ, ইতিপূর্ব্বেই চেষ্টা করিয়া, খাসিয়াদের বহুসংখ্যক বালক বালিকা এবং যুবক যুবতী সংগ্রহপূর্ব্বক, একটী অনাবৃত স্থানেই তাহাদিগকে নিয়ে, লিখা পড়া শিখাইতে ও তাহাদিগকে কাজের মানুষ করিবার জন্য যত্ন করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। বালিকা ও যুবতীদের শিক্ষাদির ভার পাষাণীর হাতেই দিয়াছিলেন। কাজ অতি অল্পে অল্পে ধীরে ধীরে চলিতেছিল। এখন হরগোবিন্দ, বহুদিনের মনের সাধ পূর্ণ করিতে, দণ্ডীর পাহাড়ে, ছাত্র ছাত্রীদের শিক্ষার সুবিধার জন্য বিদ্যালয়ের দুইখানি বড় বড় ঘর, একটী আদর্শ কৃষিক্ষেত্র ও একটী আদর্শ উদ্যান প্রস্তুত করিলেন। অল্প দিন পরেই কলিকাতার বন্ধুর ধারের এক হাজার টাকা শোধ করিয়া, তাঁহাকেই লিখিয়া, ভাল ভাল গ্রন্থ আনিয়া, দণ্ডীর পাহাড়ে পুনরায় একটী বৃহৎ পুস্তকালয় সাজাইতে লাগিলেন। ক্রমে সন্ন্যাসী এবং পরিব্রাজকও, দণ্ডীর পাহাড়ে ফিরিয়া আসিলেন। এখন সকলেই মিলিয়া মিশিয়া, প্রাণ দিয়া ভগবানের সন্তানগণের সেবায়

নিযুক্ত হইলেন। খাসিয়াপুঞ্জিতে ক্রমে একটি অনাথাশ্রমও স্থাপিত হইল। সন্ন্যাসী, লৌহসিন্দুকমধ্যে প্রাপ্ত শশাঙ্কশেখরের সেই টাকাগুলির কিছুমাত্র রাখিয়া, অবশিষ্ট সমস্তই এই সাধু কাজের সাহায্যের জন্য হরগোবিন্দের হাতে দিলেন। ধীরে ধীরে আরও পাঁচ ছয় বৎসর চলিয়া গেল। এই সাত আট বৎসরে সন্ন্যাসি-পরিবারে অনেক পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। তাঁহাদের কার্য্যক্ষেত্র বিস্তৃত হইয়াছে। একেই বলে, "সাধু ইচ্ছার সহায় স্বয়ং ভগবান।"

পাষাণী, এই কয়েক বৎসরে, বয়সে যেমন পূর্ব্বের অপেক্ষা বড় হইয়াছে, তেমনই দিন রাত হরগোবিন্দের নূতন পুস্তকালয়ের পুস্তকরাশি এবং সন্ন্যাসী ও শশাঙ্কশেখরের সংগৃহীত রাশি রাশি গ্রন্থ পাঠ করিয়া, খাসিয়াদের জন্য খাটিয়া এবং তাহাদের ও সাধুদলের সংসর্গে থাকিয়া, জ্ঞানে এবং মনপ্রাণের উন্নতিতেও পূর্ব্বের চেয়ে অনেক বড় হইয়াছে। স্বাধীনতার কাম্য-কানন খাসিয়াপর্ব্বতের সুন্দর গম্ভীর প্রকৃতির কোলে, কি পাষাণী, কি পরিচারিকা সরস্বতী, সকলেই, আজ কানন-সুন্দরী কুরঙ্গীর মত উন্মুক্তস্বভাব। দেব-কন্যা খাসিয়াযুবতীদের সদা-উন্মুক্ত ভাব দেখিয়া দেখিয়া, এই বঙ্গ-যুবতীদ্বয়ও তদ্রূপই সঙ্কোচশূন্য উন্মুক্তাবস্থায় চলিতে ফিরিতে অভ্যস্ত হইয়াছে। হরগোবিন্দ, সন্ন্যাসী ও শশাঙ্কশেখর, ঔষধের বাক্স নিয়ে, খাসিয়ারোগীদের দ্বারে দ্বারে ভ্রমণ করেন, পাষাণীও তদ্রূপ করে। পাষাণী, খাসিয়াদেশে খাসিয়াদের মধ্যে সন্ন্যাসিনী মা নামে পরিচিত। প্রেমের মূর্ত্তি, প্রশান্ততার প্রতিমা সন্ন্যাসিনী মা যাহার বাড়ী যান, তাহার ঘরে পীড়ার ঘোর যাতনাই থাক্‌, আর দারিদ্রের গভীর অশান্তিই থাক্‌, কিম্বা গৃহ-কলহের জ্বলন্ত আগুনই থাক্‌, সে ভাবে, "সকলই দূর হইল। অসার গৃহ আমার স্বর্গের নন্দনবনে পরিণত হইল।" সন্ন্যাসী এবং পরিব্রাজক, যখন দণ্ডীর পাহাড়ে থাকেন না, তখন কেবল সন্ন্যাসিনী মাই খাসিয়াদের গৃহের পীড়িতকে ঔষধ দেন, সেবা করেন, শুশ্রূষা করেন, দারিদ্র্য-দুঃখ দূরের সাহায্য করেন, কলহ শান্তির চেষ্টা করেন, এবং তাহাদের মনের দুঃখ জানিয়া, নানা মতে সুমিষ্ট প্রবোধ দান করেন। দণ্ডীজি প্রভৃতিরও সকল কাজের উপরে ইহাই মূলমন্ত্র। কিন্তু খাসিয়ারা অন্য কাহাকেও সন্ন্যাসিনী মার মত এত ভালবাসে না। সকলেই জানে, সন্ন্যাসিনী মা আমার পরিবারের প্রতি ব্যক্তির গর্ভধারিণী মায়ের চেয়েও ভালবাসাময়ী মা। সেই ব্রহ্মপুত্র-

তটোপবিষ্টা, তৈল-স্পর্শমাত্র-শূন্য-চির-উন্মুক্ত-কেশী, ভূষণ-শূন্যা, গৈরিক-বাস-পরিহিতা, সপ্তদশ বর্ষীয়া পরম রূপবতী বালিকা: পাষাণী, আজ পঞ্চবিংশ-বর্ষীয়া, পূর্ণ-বয়স্কা যুবতী, অসাধারণ রূপ-লাবণ্যের প্রতিমা সন্ন্যাসিনী-মা। সন্ন্যাসিনী মা আজ জ্ঞান ও প্রতিভার প্রতিমা, ভক্তি ও প্রেমের জীবন্ত লহরী, অথচ সদা-হাস্যমুখী সরলা বালিকা। একাধারে প্রবীণত্ব ও বালকত্বের একত্র সমাবেশে সরল-প্রাণ খাসিয়ার চক্ষুর নিকট আজ সন্ন্যাসিনী-মা, শাপভ্রষ্টা স্বর্গের অধীশ্বরী-মহাদেবী। পাষাণীরও "সেই ছিল এক দিন, আর আজ এক দিন!"

"মতিরায়, অপর প্রকোষ্ঠে বসিয়া, অপেক্ষা করিতেছেন" সন্ন্যাসিনী সরস্বতীর মুখে ইহা শুনিয়াই, আস্তে ব্যস্তে ধীরে ধীরে ঋগ্বেদ ও তাহার ভাষ্য গ্রন্থগুলি বন্ধ করিয়া, তাড়াতাড়ি উঠিয়া, মতিরায়ের নিকটে উপস্থিত হইলেন। মতিরায়, সন্ন্যাসিনীকে সম্মুখে দেখিয়া, সসম্ভ্রমে উঠিয়া দাঁড়াইলেন। সন্ন্যাসিনী, মতিরায়কে উঠিতে দেখিয়া, সলজ্জভাবে বলিলেন— "সে কি! আপনি বসুন!" এই বলিয়া, সন্ন্যাসিনী, কিঞ্চিৎ দূরস্থিত অপর একখানি আসনে বসিলেন। কিছুক্ষণের জন্য ক্ষুদ্র কুটীরের ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠটী যেন গাঢ় স্তব্ধতা ও গাম্ভীর্য্যে পরিপূর্ণ হইল। কিছুক্ষণ কেহই কোন কথা বলিলেন না।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

পণ্ডিতে পণ্ডিতে সমস্যা।

সন্ন্যাসিনী, মতিরায়ের সম্মুখে কিঞ্চিৎ দূরে আসন গ্রহণ করিলে, কিছুক্ষণ উভয়েই, নীরবে রহিলেন। কিন্তু সর্ব্বাগ্রে সন্ন্যাসিনীই ধীরে ধীরে বিনীতভাবে খাসিয়ারাজের দিকে তাকাইয়া বলিলেন, "এ বাদ্‌লার দিনে এত কষ্ট করিয়া যে আমাদের কুঁড়েতে পদার্পণ করিয়াছেন, এতে বড়ই অনুগৃহীত বোধ করিলাম। রাণী এবং ছেলেরা ভাল আছেন ত?"

খাসিয়া-রাজ মতিরায়, কিছু কিছু বাঙ্গালা লিখিতে ও বলিতে পারেন। এমন কি, সন্ন্যাসি-পরিবারের প্রসাদাৎ দুই চারিখানি ভাল ভাল বাঙ্গালা বইও পড়িয়াছেন। কয়েকখানি বাঙ্গালা, ইংরেজি সম্বাদপত্রও নিয়ে

থাকেন। মতিরায় একজন খ্রীষ্টান পাদ্রীর উদ্যোগে ও যত্নে অনেক পূর্ব্বেই কিছু কিছু ইংরেজি শিখিয়াছিলেন। বিশেষত, খাসিয়াদের লিখিত ভাষা ইংরেজি অক্ষরে লিখা। ইহাও পাদ্রী সাহেবদের উদ্যোগ ও চেষ্টার ফল। সুতরাং ভদ্র খাসিয়া মাত্রই, সর্ব্বাগ্রে ইংরেজি বর্ণের সঙ্গেই পরিচিত হন। এজন্য তাঁহাদের অনেকের পক্ষে ইংরেজি শিক্ষার বেশ সুবিধাও হয়। যাহা হউক্, সন্ন্যাসিনী খাসিয়া-রাজের সঙ্গে খাসিয়া-ভাষাতেই কথাবার্ত্তা আরম্ভ করিলেন। খাসিয়াসরদার মতিরায়, খুব পণ্ডিত লোক না হইলেও, বিচক্ষণ মনুষ্য। মতিরায়, সন্ন্যাসিনীর কথার উত্তরে বলিলেন, "আমি এ বাদ্‌লার দিনে আমারই দরকারে আসিয়াছি। আমরা পাহা'ড়ে লোক। আমাদের বাদ্‌লাতে কিছুই কষ্ট হয় না। মেজর হটন, বাষট্টি নম্বর রেজিমেণ্টের তিনশ সিপাই, বন্দুক, গুলি, গোলা, বারুদ, আর দুইটী কামান লইয়া বড় বাঙ্গালা পর্য্যন্ত পৌঁছিয়াছেন। সঙ্গে অনেক গরুর গাড়ীতে রসদ আসিয়াছে। কুলিও প্রায় চারি পাঁচ শ সঙ্গে আসিয়াছে। মন্‌ক্রিম্ অঞ্চলের খাসিয়ারা এখনও হটন সাহেবকে কোনরূপ বাধা দেয় নাই। কিন্তু সকলে তীর ধনুক নিয়ে পাহাড়ের উপর দিয়া চুপি চুপি এদিকে আসিয়া দলবদ্ধ হইতেছে। এইমাত্র এই সকল খপর শুনিয়া আসিলাম। কিন্তু এ সময়ে দণ্ডীজি, সন্ন্যাসী এবং পরিব্রাজক সকলেরই এক সঙ্গে বাড়ীখালি ফেলিয়া, মন্‌ক্রিমের দিকে যাওয়াটা ভাল হয় নাই।

মতিরায়ের কথা শুনিয়া, সন্ন্যাসিনী পূর্ব্বের চেয়েও গম্ভীর হইলেন। কিছুক্ষণ ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া, কি যেন ভাবিয়া ভাবিয়া, গম্ভীরভাবেই বলিলেন, "ভাল মন্দ বিচারের ভার ভগবানের হাতে। তবে হঠাৎ এত কাণ্ড উপস্থিত হইবে জানিলে, আমিও তাঁহাদের সঙ্গে যাইতাম।"

মতিরায় দেখিলেন, কথা বলিতে বলিতে সন্ন্যাসিনী মার মুখের উপরে হঠাৎ কি যেন একটা স্বর্গীয় জ্যোতি রাশি ছড়াইয়া পড়িয়া, খেলা করিতে লাগিল। মতিরায়, ধীরে ধীরে ভাবিতে ভাবিতে বলিলেন, "আপনি সঙ্গে গিয়া কি করিতেন?"

সন্ন্যাসিনী।—"মেজর হটনের সঙ্গে দেখা করিয়া, তাঁহাকে ফিরিয়া যাইতে অনুরোধ করিতাম।"

মতি।—"হটন সাহেবের সঙ্গে আপনার পরিচয় আছে?"

সন্ন্যাসিনী।—"না। সাহেবের সঙ্গে পরিচয়ের সম্ভাবনা কি?'

মতি।—"তবে?"

সন্ন্যাসিনী।—"ইংরেজেরা, স্ত্রী জাতির অসম্মান করে না, এক সাহস এই। দ্বিতীয় সাহস, ভগবানকে ডাকিয়া, সাধু ইচ্ছায় তাঁহার কাছে গেলে, তিনি আমার কথা বিচার না করিয়া, শুধুই উপেক্ষা করিতে পারিতেন না।"

মতি।—"ইংরেজেরা, আমাদের কিম্বা আপনাদের মত নিগারদের স্ত্রীলোককে সম্মান করে না। অন্তত এ দেশে যে সকল ইংরেজ আছে, তাহাদের প্রায় ষোল আনাই এই দরের লোক। দ্বিতীয় কথা, ইংরেজ সরল-প্রকৃতির লোক নয়। সকলে না হউক্‌, যে শ্রেণীর লোকের কাছে যাইবেন, তাহারা অন্তত মতলব না গুছাইয়া; কাহারও কোন অনুরোধ শুনিবার মানুষ নয়। মধ্যে থেকে আপনাকে বিপদে ফেলিতে চেষ্টা করিত। বোধ হয়, সন্ন্যাসী প্রভৃতি বিপদে পড়িবেন।"

সন্ন্যাসিনী।—"বিপদে পড়াও ভাল ছিল। আপনার কথাগুলি ষোল আনা সত্য, ইহাও জানি। তবুও, "ভগবানের কৃপায় যাহা সদুপায় বলিয়া বুঝিব,তাহা সমাধা করিতে চেষ্টা করিব," এই প্রাণগত প্রতিজ্ঞা রক্ষা হইত।"

মতি।—"এইরূপ সে'ধে বিপদে পড়ার দরকার কি না?"

সন্ন্যাসিনী।—"দরকার, খাসিয়াদিগকে নিজের তুচ্ছ প্রাণটার চেয়ে অনেক বেশী ভাল বাসি।"

বলিতে যেন সন্ন্যাসিনীর সুন্দর চাঁদমুখে ঈষৎ লজ্জার ছায়া পড়িল, কণ্ঠরোধ হইয়া আসিল, কথা থামিয়া গেল। কিন্তু সন্ন্যাসিনী, মুখ-খানি এমন মলিন করিয়া, এমন প্রাণের সরল ভাব প্রকাশ করিয়া, শেষের এই কথা কয়টী বলিলেন যে, শুনিয়া মতিরায়, আর চোখে জল রাখিতে পারিলেন না। মতিরায়ের চোক ভাসাইয়া, দুই দিকের দুই গণ্ডের উপর দিয়া অবাধ্য জলের ধারা দুইটী নিঃশব্দে ক্ষুদ্র ঝরণার মত বহিয়া চলিল। মতিরায় মুখ ফিরাইয়া তাড়াতাড়ি কাপড়ে চোক মুছিতে ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন। মনের ইচ্ছা সন্ন্যাসিনী, তাঁহার, এ নীরব কান্না টের না পান। সন্ন্যাসিনী, এমনই গভীর চিন্তায় মগ্ন হইয়া চোখের জলে ভাসিতেছিলেন যে, তিনি সত্য সত্যই মতিরায়ের কান্না টের পাইলেন না। মতিরায় চোক মুছিয়া মুখ ফিরাইলে, সন্ন্যাসিনীর চমক ভাঙ্গিল। সন্ন্যাসিনী তখন তাড়াতাড়ি লজ্জারক্তিমমুখে গৈরিক অঞ্চলে চোক

মুছিয়া ফেলিলেন। মতিরায় অতি ধীরে ধীরে জিজ্ঞাসা করিলেন, "মা, তবে এখন কি করা কর্ত্তব্য ?"

সন্ন্যাসিনী।—"যাহা কর্ত্তব্য, তাহা সমাধা করিতে আমার ত কোনই হাত দেখিতেছি না। বোধ হয়, এখন আর মহাশয়েরও হাত নাই। আমার ইচ্ছা, বিন্দু রক্তপাত বিনা সমস্ত গোলমাল মিটিয়া যায়। ভগবান যদি এইরূপ ঘটাইতেন, তাহা হইলে আর আমার প্রাণে কোনই অশান্তি থাকিত না। এখন যাহা ঘটুক্ না ঘটুক্, সমস্তই তাঁহার হাতে।"

মতি।—"রক্তপাত বিনা মিটিয়া যাওয়া অসম্ভব। বোধ হয়, খাসিয়া এবং সিপাহীর রক্তে পাহাড় ভাসিলেই মঙ্গল হইবে। ভগবানের ইচ্ছায়ইত ইহা ঘটিতেছে ?"

সন্ন্যাসিনী।—"মঙ্গল, ঘর পুড়িয়া গেলেও হয়, হাত ছুরী দিয়া কাটিলেও হয়। ইহা ভগবানের ইচ্ছায় ঘটেও, আবার নাও। ভগবান, যেমন প্রকৃতির মধ্যে এই সকল ঘটনা ঘটিবার সমস্ত আয়োজন করিয়া রাখিয়াছেন, আবার এ সকল না ঘটিতে পারে,এমনওত কিছু করিয়াছেন ? এখন বলুন্ত, কোন্ দিক্‌টা সমাধা করিতে আমাদের বিবেক পরামর্শ দেয় ?"

মতি।—"কখনও কখনও হাত কেন, নিজের গলা কাটিয়া ফেলিতেও, বিবেক পরামর্শ দেয়। মা, আপনাদের এখানেই অনেক দিন গল্পে শুনিয়াছি, শত শত খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মযাজক, ধর্ম্মার্থ প্রথম প্রথম এইরূপ করিয়াছিলেন।"

সন্ন্যাসিনী।—"বিবেক আপনার গলা কাটিয়া ফেলিতে বলিতে পারে। কিন্তু অপরের গলা কাটিতে বা জগতে একটা খুনা খুনি ব্যাপার উপস্থিত হউক্, ইহার অনুকূলে কিছু করিতে বলে না। ফরাসী-বিপ্লব-ঘটনাতে জগতের উপকার হইয়াছে সত্য। কিন্তু যাহারা ইহাতে লিপ্ত ছিল, তাহারা নর-পিশাচ, একথা বলিতে কাহার না বিবেক সায় দেয় ?"

মতি।—"যখন একজন বা এক জাতি, অপর একজন বা এক জাতির উপরে অন্যায় আধিপত্য বিস্তার করে, তাহার বা তাহাদের স্বাধীনতায় হাত দিয়া সকল অমঙ্গলের নিদান হয়, তাহাকে বা তাহাদিগকে অবহেলা ও ঘৃণার চোখে দেখে, তাহাদের স্ত্রীজাতির উপরে পর্য্যন্ত মধ্যে মধ্যে অত্যাচার করিতে কুণ্ঠিত হয় না, বলুনত, সেখানে বিবেক কি বলে ?"

সন্ন্যাসিনী।—"এ কঠিন সমস্যা, তাহাতে বিন্দুমাত্রও সন্দেহ নাই। শুনিতে শুনিতে যেন শরীরের সমস্ত রক্ত গরম হইয়া উঠে। জ্ঞান,বুদ্ধি,কিছুই,

এইরূপ নিপীড়ণের প্রতিবিধান না করিতে সায় দেয় না। হৃদয় রুধির-পিপাসায় উন্মত্ত হইয়া উঠে। কিন্তু উদার প্রেমিকের উন্নত বিবেক বলে, "মাল্লি মাল্লি কলসীর কাণা, তাই বো'লে কি প্রেম দিব না?" এখানে বিবেকের এ কথা সৃষ্টি ছাড়া বলিয়া বোধ হয়। সৃষ্টি বলে, এরূপ করিলে সৃষ্টি যাবে। মানুষের ভিতর হইতে ভগবানের সেই গম্ভীর বাণী বলে, "সৃষ্টি যাক্, আর বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডে ঘোর মহাপ্রলয়ই উপস্থিত হোক্, ইহাই কর।" অদ্যাবধি পৃথিবীর সকল দেশের সমস্ত জাতি ও মনুষ্যদ্বারা এই বাণী চিরকাল অবমানিত হইয়া আসিতেছে। এই জন্য যুগ যুগান্তের পরে যিনি এই সকল প্রতিকূল ঘটনার সংগ্রামক্ষেত্রে দাঁড়াইয়া বল্লেন, "মাল্লি মাল্লি কলসীর কাণা, তাই বো'লে কি প্রেম দিব না?" তিনিই মহাপুরুষ নামে অভিহিত হন। মার্কিন দেশের দাসত্ব যুদ্ধকে লোকে অবিসংবাদিতরূপে পবিত্র ঘটনা বলিয়া বর্ণনা করে। খ্রীষ্ট, বুদ্ধ, চৈতন্যকে কি কেহ এ কথার বিচার করিতে দিয়া দেখিয়াছে? ম্যাট্সিনীও মহাপুরুষ। তিনি কি খ্রীষ্ট, বুদ্ধ বা চৈতন্যের আসনে কখনও স্থান পাইবেন? লোকে এখন কতকটা দেয় বটে। কিন্তু একদিন আসিবে, যে দিন দিবে না।"

মতিরায় স্তম্ভিত হইয়া রহিলেন। অনেকক্ষণ পরে বলিলেন, "তবে আপনি বর্ত্তমান ঘটনায় কি করিতে বলেন? বিষয়টা আর একবার বিচার করিয়া দেখুনত?"

সন্ন্যাসিনী।—"সোবার পুঞ্জি আর বুড়ীর হাটের খাসিয়ারা কমলালেবুর বাগান নিয়ে নিজেরা নিজেরা দাঙ্গা করিতেছিল। বুড়ীর হাটের খাসিয়াগণ স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়াই নীচের পুলিসকে খপর দেয়। কিন্তু পুলিসের লোক আসিলে, শেষটা উভয় বিরোধী পক্ষই একত্র হইয়া তাহাদিগকে প্রহার করে। তখনই পুলিসের একজন লোক খুন হয়। এ বিষয়ের প্রতিবিধান করিয়া, যাহারা দাঙ্গায় যোগ দিয়াছিল, তাহাদিগকে গ্রেপ্তার করিয়া নীচের পুলিসের হাতে অর্পণ করিবার জন্য নীচের নিকটবর্ত্তী জেলার মাজিষ্ট্রেট সাহেব সোবার পুঞ্জি ও বুড়ীর হাটের খাসিয়া-সরদারদিগকে চিঠি লিখেন। চিঠির উত্তর না পাওয়াতে, গভর্ণমেণ্টের একদল পুলিস-সৈন্য পুনরায় মাজিষ্ট্রেটের চিঠি সহ বুড়ীর হাটের নীচের একটী পাহাড়ে আসিয়া উপস্থিত হয়। তখন খাসিয়ারা রাত্রিযোগে পাহাড় হইতে নামিয়া

গিয়া দা-দিয়া নীচের প্রজাদিগকে ও পুলিস-সৈন্যের অনেকগুলি কনষ্টেবলকে কাটিয়া পালায়। প্রধান কমিসনার সাহেব সমস্ত খাসিয়া-প্রধানদিগকে এ ঘটনা জানাইয়া যখন সদুত্তর পান নাই, তখনই গভর্ণমেণ্ট সিপাহী সহ মেজর হটনকে, খাসিয়াদিগকে শাসন করিতে পাঠাইয়াছেন। এই ত বটে? ইহা সত্য হইলে, আমার মতে এই ঘটনায় খাসিয়ারাই দোষী। এখন খাসিয়াদের উচিত গবর্ণমেণ্টের নিকট ক্ষমা চাওয়া।”

খাসিয়ারাজ মতিরায় সন্ন্যাসিনীর কথা শুনিয়া অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া গম্ভীরভাবে চিন্তা করিতে লাগিলেন। অনেকক্ষণের গভীর চিন্তার পরে ধীরভাবে বলিলেন, “আপনি যাহা বলিলেন, ইহার মত কাজ হওয়া সম্ভবপর নয়। খাসিয়াপুঞ্জি সকল স্ব স্ব প্রধান। স্বাধীনতা ইহাদের প্রাণের চেয়েও প্রিয় জিনিষ। যুদ্ধে না হারিবার পূর্ব্বে এরা আপোষ করিবার মানুষ নয়। যুদ্ধে হারিলেও, এরা আপনাদের মত নীরবে গভর্ণমেণ্টের অধীনতা মাথা প্যাতিয়া বহন করিবে না। মা, খাসিয়া-হৃদয়ের তেজ ভিন্ন জাতীয়। আমরা জঙ্গলা মানুষ। আমাদের নিকট এ সকল আশা করিতে পারেন না। যে সাহেবেরা আপনাদের রাজধানী লণ্ডন সহরের বর্ণনা করিতে গিয়া গর্ব্বে স্ফীত হইয়া বলে, “সভ্যতার প্রধান কেন্দ্রস্থল,” সেই সাহেবরাই যখন প্রত্যহ মানুষের রক্তপাত না করিয়া ভাত মুখে দেয় না, তখন আর আমাদের কাছে কি আশা করিতে পারেন?”

সন্ন্যাসিনী।—“আমি কিছুই আশা করিতেছি না। আপনি আত্মীয় বলিয়া আপনাকে মনের কথাগুলি খুলিয়া বলিলাম মাত্র। আশা থাকিলে বিষণ্ণভাবে নিশ্চিন্ত থাকিতাম না। সন্ন্যাসী প্রভৃতিও নিরাশ হইয়াই মন্‌ক্রিমের রাজার সাহায্যে ঐ অঞ্চলের খাসিয়াদের মনের ভাব জানিতে মন্‌ক্রিমে গিয়াছেন। তাঁহারা তিন জনে ভিন্ন ভিন্ন পুঞ্জিতে গিয়া তাড়াতাড়ি কাজ করিবেন মনে করিয়াই এক সঙ্গে গিয়াছেন। আমাকে বিদ্যালয়ের ও পুঞ্জির গরিবদিগকে দেখিবার ভার দিয়া গিয়াছেন। তবে আপনার কথার উত্তরে এই পর্য্যন্ত বলিতে পারি, “যে গ্রন্থের যে স্থানে ইংরেজের এই সুভ্যতার গর্ব্বের কথা লিখা আছে, তাহা পড়িয়া একদিন মানুষেরা তীব্র ভাষায় উপহাস করিবে। এই শতাব্দীর সভ্যতা একদিন ঘোর অসভ্যতায় পরিণত হইবে। তখন ঘৃণিত তলোয়ারের বীরত্বের পরিবর্ত্তে সাধুতা

এবং চরিত্রের বীরত্ব আদর পাইবে। তখনকার সৈন্যদলের সেনাপতি কাহারা হইবেন জানেন ?”

মতিরায় সন্ন্যাসিনীর মুখের গাম্ভীর্য্য, হৃদয়ের প্রবল আবেগ অনুভব করিয়া, চমৎকৃত হইয়া কথাগুলি শুনিতেছিলেন। হঠাৎ প্রশ্ন হইবামাত্র বেশী কিছু না বলিয়া, কেবল সাতিশয় গম্ভীরভাবে বলিলেন, “আপনিই বলুন।” মতিরায়ের কথা শেষ হইলে, সন্ন্যাসিনী বলিতে লাগিলেন, “বুদ্ধ, চৈতন্য, নানক, খ্রীষ্ট। ইঁহারাই সেনাপতি হইবেন। জাতীয় পতাকায় বড় বড় অক্ষরে লিখা থাকিবে “প্রেম!” সমস্ত পৃথিবীর বুকে তখন একমাত্র জাতীয় পতাকা উড়িবে। আমি বিশ্বাস করি—খাসিয়ারাজ, আমি বিশ্বাস করি, লক্ষ লক্ষ সৈন্য সামন্ত নিয়েও যদি কেহ কোন দেশ চড়াও করে, আর সেই দেশের তিন শত নয়, তিনটী লোক, যদি সেই অগণিত সৈন্যের এবং সেনাপতির সম্মুখে দাঁড়াইয়া বলিতে পারেন, “কে তোমরা ভাই? এস, আমাদের বুকে তোমাদের হাতের ঐ তীক্ষ্ণ তরবারি বিদ্ধ হইবার পূর্ব্বে একবার গলা ধরিয়া তোমাদের সঙ্গে কোলাকোলি করি! এস, আজ একবার এ জন্মের মত সকল ভাই বোন মিলিয়া, আমাদের সকলের বাপ মা সেই নিখিল ব্রহ্মাণ্ডেশ্বরকে প্রাণ ভরিয়া, মনের সাধ মিটাইয়া ডাকিয়া লই। এস, তোমরা কে এসেছ ভাই?” এই ঘটনার পরেও যদি সেই দুর্দ্দান্ত রক্ত-পিপাসু দস্যুগণ তাঁহাদিগকে আক্রমণ করিয়া খণ্ড খণ্ড করে, আর তাঁহারা পূর্ব্বের মতই তখনও নিজের স্থানে দাঁড়াইয়া, “শির দিয়া, শির নেহি দিয়া” এই জ্বলন্ত বিশ্বাসের কথা বুকে লিখিয়া হাসিতে হাসিতে প্রাণদান করিতে পারেন, তবে এই পর্য্যন্ত বলিতে পারি, সেই অগণিত সেনার গতি সেই মুহূর্ত্ত হইতে সেইস্থানেই থামিয়া যাইবে। আর এক পাও অগ্রবর্ত্তী হইতে তাহাদের সাহস হইবে না। এরূপ না হইলেও, কালে তাঁহারা এমনই পরাজিত হইবে যে, এ জগতে অদ্যাবধি আর কোন সেনাদল তেমন ভাবে পরাজিত হয় নাই। “মেরাথন” অথবা “থর্ম্মাপলির” যোদ্ধ্‌গণের অপেক্ষা এই তিন জনমাত্র বীরের বীরত্ব কি অনন্তগুণে শ্রেষ্ঠ নয়? যে জাতির মধ্যে তিন জন খ্রীষ্ট বা তিন জন বুদ্ধ কিম্বা তিন জন চৈতন্য এক সময়ে আবির্ভূত হইবেন, সে জাতির মত বিজয়ী জাতির ইতিহাস কি ধরাধামে আর কোথায়ও পড়িয়াছেন? যে জাতি খাসিয়ারাজ, যে জাতি—”

বলিতে বলিতে সন্ন্যাসিনীর কণ্ঠ পুনরায় রুদ্ধ প্রায় হইল। জলে আবার চোক ভাসিয়া উঠিল। খাসিয়ারাজ মতিরায় তখন গল-বস্ত্র হইয়া চিত্রপুত্তলের মত সন্ন্যাসিনী মার সম্মুখে স্তম্ভিতভাবে দণ্ডায়মান। সেই আলুলায়িতকেশী, গৈরিকবসনা, পঞ্চবিংশবর্ষীয়া দেবী, স্বর্গীয় ভাবে পূর্ণ হইয়া, চক্ষুর জল আঁচলে মুছিয়া আবার বলিতে আরম্ভ করিলেন, "যে জাতি এত দিন জগতে এই বিজয়পদ অধিকার করিতে আসিতেছিল, দৈবদুর্ব্বিপাকে সে জাতি আজ চিতার ভস্মে মিশিয়া অন্ধকারে ঢাকা পড়িয়াছে। যদি কোন দিন ভগবানের কৃপা স্বয়ং অবতীর্ণ হইয়া জগৎকে এই অদৃষ্টপূর্ব্ব মহাব্যাপার দেখাইতে সেই ভস্মের উপরে সঞ্জীবনী মন্ত্র উচ্চারণ করে, তবেই—ইহজগতেও না হউক্, পরজগতে বসিয়া দেখিবেন, সেই হিন্দুজাতি ভূমণ্ডলে এই বিজয়ী জাতির আসনে বসিয়াছে। প্রেমের এবং সাধুতার জগতে হিন্দু কাহারও পশ্চাতে দাঁড়াইবে, ইহা আমার বিশ্বাস হয় না। কিন্তু যদি এই জাতি পুনরায় জাগে। নতুবা এখন যেমন দিন দিনই নিজের রাজ্য ছাড়াইয়া অপরের রাজ্যে গিয়া সঙ্কীর্ণ হইতে সঙ্কীর্ণতম হইয়া পড়িতেছে, এইরূপ ঘটিতে থাকিলে, স্বল্প দিন পরেই ইহার নামও আর জগতে থাকিবে না।"

মতি।—"মা, এখন এ জাতির অবস্থা এরূপ কেন?"

সন্ন্যাসিনী।—"তাহাই বলিতেছিলাম। এ জাতির জাতীয় চরিত্র বিনষ্ট হইয়াছে। খাসিয়ারাও এখন আমাদের অপেক্ষা উচ্চ স্থানে আছে। কারণ, খাসিয়াদেরও জাতীয় চরিত্র আছে, মা আছে।"

এই বলিয়া সন্ন্যাসিনী,মতিরায়কে সেই ভাবে সম্মুখে দণ্ডায়মান দেখিতে পাইলেন। এতক্ষণ সন্ন্যাসিনী ভাবে এতই বিভোর ছিলেন যে, এ ঘটনার প্রতি মুহূর্ত্তের জন্যও মনোযোগ করিতে অবসর পান নাই। এখন কিছু না বলিয়া, কেবল নীরবে আসন ছাড়িয়া দাঁড়াইলেন। মতিরায়ও ভাবে বিভোর হইয়াছিলেন। তাঁহার ভাবের ঘোর এখনও ভাঙ্গে নাই। মতিরায় ধীরে ধীরে সন্ন্যাসিনীর পানে তাকাইয়া বলিলেন, "আপনাদের জাতির কি মা নাই?"

সন্ন্যাসিনী।—"না। আমাদের জাতি মাতৃহীন।"

মতি।—"আপনি?"

সন্ন্যাসিনী।—"দাসী—জাতির পদে দলিত দাসী।"

মতি।—"আপনাদের জাতি কি মাকে ভক্তি করিতে জানে না?"

সন্ন্যাসিনী।—"একদিন জানিত। তখন জগতে যত জাতি ছিল, আমাদের জাতি এ সকল বিষয়ে তাহাদের দৃষ্টান্ত ছিল। নতুবা, গার্গী, অরুন্ধতী, সীতা, সাবিত্রী, দময়ন্তী, লীলা, খনা প্রভৃতি ভারতের বক্ষ পবিত্র করিতে ধরাধামে আসিতেন না। কিন্তু এখন আর জানে না। ভক্তি দূরে থাক্, এখন আমাদের জাতি, জাতীয় মাতার প্রতি সামান্য শ্রদ্ধা এবং সম্মানও দেখাইতে পারে না। মাকে আর এ জাতি বিশ্বাস পর্য্যন্ত করে না। খাসিয়ারা মাতৃভক্ত। মাতার সম্মান জানে বলিয়াই, খাসিয়াদের মাতারা স্বর্গভ্রষ্টা দেবীর মত সর্ব্বত্র পবিত্র জ্যোতি বিকীর্ণ করিয়া জাতির মুখ উজ্জ্বল রাখিতেছেন। স্বর্গ-মন্দার হইয়াও দরিদ্রের কুটীরে পর্য্যন্ত তাঁহারা সৌরভ ছড়াইতেছেন। সাধে কি খাসিয়া স্বাধীনতা-প্রাণ? সাধে কি বিস্তীর্ণ ভারতের পঁচিশ্ কোটী সন্তানের অপেক্ষা জঙ্গলের এক মুষ্টি খাসিয়াকে ইংরেজেরা একটু বেশী ভয় করে। বলুনত, আজ খাসিয়ারা সামান্য তীর ধনুক নিয়ে দুর্দ্দান্ত ব্রিটিস সিংহের সম্মুখীন হইতেও কাহার মুখের দিকে তাকাইয়া একটুও ভয় পাইতেছে না? খাসিয়ার মা আজ তীর ধনুক নিয়ে, পৃষ্ঠে বনকুসুম-শোভিত বেণী দোলাইয়া, জাতীয় পতাকা কাঁধে করিয়া অগ্রে অগ্রে চলিয়াছেন। খাসিয়া আজ কি করিয়া ঘরে ঘুমাইয়া ভীরু জীবন ভোগ করিবে?"

এই কথা বলিয়াই, সন্ন্যাসিনী অশ্রুপূর্ণ লোচনে সাতিশয় বিনয়াবনত ভাবে নীরবে খাসিয়ারাজ মতিরায়কে শেষ অভ্যর্থনা জানাইয়া, গম্ভীরভাবে প্রকোষ্ঠের বাহিরে চলিয়া গেলেন। খাসিয়াপতিও ভাবিতে ভাবিতে ভাবিতে, ধীরে ধীরে পুনরায় অশ্বের নিকটে আসিলেন। অশ্বপৃষ্ঠে চড়িয়া পাহাড় হইতে নামিয়া যে পথে আসিয়াছিলেন, সেই পথেই প্রস্থান করিলেন। দিন এখন পরিষ্কার হইয়া উঠিতেছিল। এবার আর মতিরায়কে বৃষ্টি, ঝড়, অন্ধকার ভেদ করিয়া চলিতে হইল না। মতিরায় যাইবার কালে ভাবিতে ভাবিতে গেলেন, সন্ন্যাসিনীমার মত মা চাই। এমন মায়ে প্রগাঢ় মাতৃভক্তি চাই। নতুবা হিন্দুজাতির পুনরুদ্ধার সম্ভবপর নয়।" খাসিয়াদের এই দুর্দ্দিনেও খাসিয়ারাজ অনন্যমনে এই কথা ভাবিতে ভাবিতে চলিলেন। কথাটা মতিরায়ের মনে বড় লাগিয়াছিল।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

প্রবীণা না বালিকা ?

"ও সরস্বতি—, ও জুন—, মঙ্গলা মো'ল যে। একবার তাড়া তাড়ি এ'সো না ভাই। আমি যে এ ছাইয়ের চুলগুলি ছাড়িয়ে কিছুতেই এগুতে পাচ্ছি নে। মঙ্গলার পেছনের পাখানা ভেঙে যাবার যোগাড় হো'য়েছে। ও জুন—, ও সরস্বতি—, তোমরা তাড়া তাড়ি এ'সো না ভাই—।"

সরস্বতী।—"যাই—, যাই দিদী বাবু—, জুন ওদিক্‌টা পানে. কোথায় গেছে যেন—। হাতের এই কাজটা সেরে যাচ্ছি—।"

সেই দিন সন্ধ্যার পরে—যে দিন মতিরায়ের সঙ্গে সন্নাসিনীর কথা-বার্ত্তা হইল, সেই দিন।

সেই দিন মতিরায় চলিয়া যাইবার কিছুক্ষণ পরেই খাসিয়া-পুঞ্জি হইতে দলে দলে ছাত্র ছাত্রীরা আসিয়া, যথা সময়ে ক্রমে ক্রমে দণ্ডীর পাহাড়ের বিদ্যালয়ের ঘর ভরিয়া ফেলিল। কি আশ্চর্য্য, এতগুলি ছাত্র ছাত্রী—বালক, বালিকা, যুবক, যুবতী উপস্থিত কিন্তু আজ কাহারও মুখে একটীও কথা বা হাসি নাই! বিশ পঁচিশ বৎসরের যুবক যুবতী হইতে পাঁচ ছয় বৎসরের বালক বালিকা পর্য্যন্ত সকলেরই একই ভাব—একই প্রকার বিষণ্ণতা,একই প্রকার চিন্তা-মগ্নতা! আজ পথে ঘাটে খাসিয়াদের যে সকল ভদ্র, অভদ্র, বৃদ্ধ, প্রবীণ, মধ্যবয়স্ক, যুবক, যুবতী, বালক, বালিকা যাইতেছে, আসিতেছে, কাজ কর্ম্ম করিতেছে, সকলেরই এক ভাব। প্রত্যেকেরই মুখ দেখিয়া বোধ হইতেছে, তাহারই—শুধু আজ তাহারই উপরে খাসিয়া জাতির সুখ দুঃখের যেন এক মহা ব্রত উদ্যাপন করিবার ভার পড়িয়াছে। যেন একাই সে সেই ব্রত পালন না করিলে খাসিয়া-জাতির অমঙ্গলের শেষ থাকিবে না। সে আজ আর অন্য কাহারও মুখের দিকে চাহিতেছে না। কেবল নিজের কর্ত্তব্য কিরূপে সাধন করিবে, সেই চিন্তাতেই বিভোর। তাহার কথাবার্ত্তা ভাব ভঙ্গি সমস্তই শুধু এইরূপ ভাবেরই পরিচয় দিতেছে। একেই কি বলে জাতির জাতীয়তা ?

আজ নির্দ্দিষ্ট সময়ে স্নান আহারের পরে সন্ন্যাসিনী একাই বিদ্যালয়ের গৃহপ্রাঙ্গণে উপস্থিত হইলেন। উভয় গৃহে গিয়া বালক, বালিকা, যুবক ও যুবতীদের মুখে যে ভাব দেখিলেন, তাহাতে তাঁহার মুখে একটীও কথা ফুটিল না। ছাত্র ছাত্রীরা সকলে সন্ন্যাসিনীমাকে দেখিয়াই, সেই মুখশ্রী লইয়া চারিদিকে ঘিরিয়া দাঁড়াইল। সন্ন্যাসিনী দেখিলেন, তাঁহাদের অনেকের চোক হইতেই নীরবে জলের ধারা বহিয়া পড়িতেছে। এতগুলি ছাত্রছাত্রীর মধ্যে কেবল একটী ছাত্রী গদ গদ স্বরে বলিল, "সন্ন্যাসিনী মা, আজ আমাদের ছুটি দিন্।" এই বলিয়া সেও চোখের জল মুছিতে লাগিল। আর কেহই একটীও কথা বলিল না। সন্ন্যাসিনী যতক্ষণ নীরবে একখানি একখানি করিয়া, সমস্তগুলি মুখ দেখিয়া শেষ করিলেন, ততক্ষণ সকলেই স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। সন্ন্যাসিনী সেই স্নেহ-বিগলিত দৃষ্টিতে যাহার পানে তাকাইলেন, তাহারই চোক হইতে নীরবে জলের ধারা গলিয়া পড়িতে লাগিল। সন্ন্যাসিনী আজ খাসিয়া যুবক যুবতী ও বালক বালিকাদের মনেরভাব বুঝিয়া, অধিক কিছুই বলিলেন না। কেবল প্রবল অশ্রুধারা সম্বরণ করিয়া, ধীর গম্ভীর মধুর স্বরে বলিলেন, "যাও। তোমাদিগকে আমাদের যাহা বলিবার ছিল, তাহা এ কয় বৎসর ধোরে সব সময়েই বলিয়াছি। তোমাদের এ মনের অবস্থায় আর কিছুই বলিব না। বিপদে সেই বিপদ-ভঞ্জনকে ভুলিও না!" এই বলিয়া সন্ন্যাসিনী পুনরায় সকলের দিকে তাকাইয়া, আবার বলিলেন, "যাও। এই শেষ দেখা কি না ভগবানই জানেন্।" এই কথা বলিতে বলিতে সন্ন্যাসিনীরও দুই চোক হইতে নীরবে জলের ধারা বহিয়া পড়িতে লাগিল। তখন সেই সূচিভেদ্য স্তব্ধতার মধ্যে একটা কান্নার ভয়ানক রোল উঠিল। সন্ন্যাসিনীমার চোখে জল দেখিয়া, সরল-প্রাণ খাসিয়া ছাত্রছাত্রীরা সকলেই কাঁদিতে লাগিল। অনেকে কাঁদিতে কাঁদিতে মাটীতে পড়িয়া, সন্ন্যাসিনীমার পাদ চুম্বন করিতে লাগিল। সন্ন্যাসিনী অত্যন্ত ব্যস্ততাসহ তাহাদিগকে তাড়া তাড়ি হাতে ধরিয়া তুলিয়া, মুখেরদিকে তাকাইয়া কেবল সেই নিঃশব্দ চোখের জলেই ভাসিতে লাগিলেন। অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত অধীর হইয়া প্রাণে কাঁদিয়া শেষটা ছাত্র ছাত্রীরা সকলেই নীরবে সন্ন্যাসিনীমাকে শেষ অভ্যর্থনা জানাইয়া প্রস্থান করিল। তাহাদের মধ্যে যদিও অনেকে

সন্ন্যাসিনীর সমবয়স্ক এবং অনেকে সন্ন্যাসিনীর চেয়ে অধিক বয়স্ক, তবুও সকলেই সন্ন্যাসিনীমাকে মাতৃভক্তির সহিত ভূমিষ্ট হইয়া প্রণাম করিল। সন্ন্যাসিনীও প্রত্যেকের নিকট মস্তক অবনত করিলেন। ছাত্র ছাত্রীরা সকলে চলিয়া গেলে, সন্ন্যাসিনী বিষণ্ণমুখে একাকী কুটীরে ফিরিলেন।

সন্ন্যাসিনী বিদ্যালয়ের ছুটির পরে আজ একবার খাসিয়া পুঞ্জিতেও গিয়াছিলেন। সেখানে গিয়া দেখিলেন, খাসিয়ারা সকলেই তীর, ধনুক ও দা প্রস্তুত এবং পরিষ্কার করিতে ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছে। স্ত্রী, পুরুষ, বালক, বালিকা, যুবক, যুবতী সকলেরই যুদ্ধ সজ্জায় সজ্জিত হওয়াই যেন আজ একমাত্র কাজ। সন্ন্যাসিনীর তত্ত্বাবধানাধীন শয্যাগত রোগীরাও আজ রোগ-যন্ত্রণা ভুলিয়া, হটন সাহেবকে প্রতিযুদ্ধদানের জন্য তীর, ধনুক ও দা লইয়া সাজিতেছে। সন্ন্যাসিনীমাকে এই বিপদের দিনে পূর্ব্বের মতই দ্বারে দ্বারে ঘুরিতে দেখিয়া, খাসিয়া পুরুষ, রমণী, বালক, বালিকা, যুবক, যুবতী সকলেই আজ তাঁহার কাছে আসিয়া, ভাবে গদ গদ হইয়া চারিদিকে ঘিরিয়া দাঁড়াইল। সকলেই যেন কেবল নীরবে কাতর দৃষ্টিতে সন্ন্যাসিনীমাকে আপনাদের প্রত্যেকের মনের সমস্ত বেদনা জানাইয়া, এঘোর অশান্তির দিনেও প্রাণভরা শান্তি পাইতে লাগিল। সন্ন্যাসিনী যেখানে যাইতে লাগিলেন, সেখানেই এইরূপে যুদ্ধ সাজে সজ্জিত খাসিয়া পুরুষ, রমণী, বালক, বালিকা, যুবক, যুবতী সকলে মিলিয়া, তাঁহাকে ঘিরিয়া দাঁড়াইতে লাগিল, সেই খানেই জনতা হইতে লাগিল। আজ এক স্থানে নিকটের ও দূরের ভিন্ন ভিন্ন পুঞ্জি হইতে সহস্রাধিক খাসিয়া পুরুষ, রমণী অস্ত্র শস্ত্র নিয়ে যুদ্ধের সাজে সাজিয়া দাঁড়াইয়াছিল। তাহারা সন্ন্যাসিনীর পরিচয় পূর্ব্ব হইতেই জানিত। সুতরাং সন্ন্যাসিনী তাহাদের মধ্যে উপস্থিত হইবামাত্র তাহারা খাসিয়া ভাষায় একরূপ জয়ধ্বনি করিয়া উঠিল। সে ধ্বনিতে চারিদিকের পাহাড় প্রতিধ্বনিত ও আকাশ পূর্ণ হইল। তাহারা অনেকে সন্ন্যাসিনীমার কাছে আসিয়া নিজেদের সেই সরল ভাবে, সরল ভাষাতে বলিল, "মা আপনিই আমাদের সেনাপতি হউন্।" সন্ন্যাসিনী তাহাতে কেবল লজ্জাবনতমুখে উত্তর দিলেন, "ওব্লাই তোমাদের সেনাপতি হউন্।" খাসিয়ারা ওব্লাই অর্থাৎ অনন্তবিশ্বব্রহ্মাণ্ডের একমাত্র অধীশ্বর চিন্ময় দেবতা। এইরূপ সন্ন্যাসিনী সমস্ত কথাগুলিই খাসিয়া ভাষাতে বলিলেন। সেই সহস্রাধিক

সরল-প্রাণ খাসিয়া আজি এই বিপদের দিনে ওব্লাইয়ের মহামহিমা-ন্বিত নাম শুনিয়া, উৰ্দ্ধদিকে তাকাইয়া, স্থিরভাবে, জোড়হাতে দাঁড়াইল। সন্ন্যাসিনী খাসিয়াদিগের সেই ভাব দেখিয়া, গম্ভীর ভাবে সেস্থান হইতে প্রস্থান করিলেন। কুটীরে ফিরিতে আজ সন্ন্যাসি-নীর সন্ধ্যা হইল। এইরূপ উন্মুক্ত স্বাধীনভাব বাঙ্গালী পাঠক পাঠিকার ভাল লাগিবে কি ? এইরূপ দেশ-ভেদে, ঘটনাবিশেষে ভাল লাগাই সঙ্গত হইবে। সেই সন্ধ্যা সময়েই সন্ন্যাসিনী, জুন ও সরস্বতীকে নিয়ে ঝরণা হইতে ক্ষুদ্র কলসীতে করিয়া জল বহিয়া বহিয়া আশ্রমের বাগানের গাছগুলিতে দিতে চলিলেন। সদানন্দচিত্ত সরস্বতীর নিকটে সম্পদ বিপদ কিছুরই প্রভেদ নাই। সন্ন্যাসিনী খাসিয়া-পুঞ্জি হইতে আজ বড়ই গম্ভীর হইয়া আসিয়াছিলেন। কিন্তু সরস্বতীর কাছে আসিবা-মাত্রই, সরস্বতী হাসিতে হাসিতে বলিল, "এই যে, আমার কর্ত্তা বাবু হাজির। আমি বো'ল্‌ছিলুম্ কি দিদীবাবু, তোমার সরস্বতীচন্দ্র বিদ্যে-বালিশ থাক্‌তে সাহেব মিন্‌সে এসে এখানে কি কোর্‌বে? যেটা লঙ্কা পোড়াকে "গুড্, ড্যাম্" বো'লে দশটা ইংরেজি কথা ক'ইলেই যে, পালাতে পথ পাবে না। না হয় আমার শতমুখী বাণ দিয়ে বেটার ছেলের আগা-গোড়া ঝেড়ে ভূত ছাড়িয়ে দেবো।"

সরস্বতীর কথা শেষ হইলে, পাষাণী একটু একটু হাসিতে হাসিতে বলিল, "আচ্ছা, তুমি খুব মন্দ। এখন জুনকে নিয়ে চল ত গাছে জল দিগিয়ে।"

সরস্বতী তাড়া তাড়ি হাসিতে হাসিতে, "জুন সদ্দার—, জুন সদ্দার—, এধার আও—!" বলিয়া, ঘন ঘন চীৎকার করিয়া ডাকিতে লাগিল। জুনও আজ অন্যান্য দিনের চেয়ে গম্ভীর এবং বিষণ্ণ। কিন্তু সরস্বতী বাচা-লের হাতে পড়িয়া তাহার সে ভাব আর সে সর্ব্বদা রক্ষা করিতে পারিতেছে না। জুন, সরস্বতীর ডাক শুনিয়া ছুটিয়া কাছে আসিয়াই সরস্বতীর ভাব ভঙ্গি দেখিয়া এক মুখ হাসিয়া ফেলিল। সরস্বতী, জুনের দিকে তাকাইয়া হাসিতে হাসিতে বলিল, "চলত সদ্দার—, ঘড়া নিয়ে গিয়ে বাগানের গাছে জল দি।"

গাছে জল দিতে দিতেই সন্ধ্যা অতীত হইয়া গিয়াছে। সরস্বতী তাড়া তাড়ি ঘরের কাজ কর্ম্ম করিতে ছুটিয়া গিয়াছে। জুনও তাহার সাহায্য

করিতে গিয়াছে। জুন, পিতৃ মাতৃ-হীন একটী অনাথা খাসিয়াবালিকা। এই কয়েক বৎসর হইতেই সন্ন্যাসি-পরিবারে প্রতিপালিত হইতেছে। পাষাণী নিরঞ্জনকে ঘরে রাখিয়া মঙ্গলার তল্লাসে বাগানের চারিদিকে একাকী ঘুরিতেছিল। নিরঞ্জন, ময়ূরটীর নাম। মঙ্গল বা মঙ্গলা সেই হরিণ-শাবকটী। মঙ্গলবারে পাওয়া গিয়াছিল বলিয়া, পাষাণী হরিণটীর নাম মঙ্গলা রাখিয়াছে। আদর করিয়া মঙ্গলও বলে। আজ নির্ম্মল আকাশে পূর্ণিমার চাঁদ নীরবে হাসিতেছে। মঙ্গলের একখানি পা একটী চাঁপা ফুলের গাছের শিকড়ের নীচে পড়িয়া আট্‌কে যাওয়াতে মঙ্গলচন্দ্র হতভম্বার মত দাঁড়াইয়া আছে।

পাষাণী মঙ্গলের এইরূপ দুর্দ্দশা দেখিয়া, যাই তাড়া তাড়ি মঙ্গলের পা ছাড়াইয়া দিতে ছুটিতে উদ্যত হইল, অমনি তখনই সেই পিঠছাওয়া মেঘের মত এ'লো মে'লো চুলের রাশি একটা ফুটন্ত যুঁই-ফুলের ঝাড়ের ডালে জড়াইয়া গেল। এদিকে পালয়িত্রীর কণ্ঠস্বর শুনিয়া, মঙ্গলা পা টানিয়া ছুটিয়া কাছে আসিতে চেষ্টা করিতে লাগিল। কিন্তু কৃতকার্য্য হইল না। পাষাণী তাড়া তাড়ি চুল ছাড়াইতে না পারিয়া ডাকিতে লাগিল, "ও সরস্বতি—, ও জুন—, মঙ্গলা মো'ল যে—। ইত্যাদি ইত্যাদি।"

সরস্বতী গৃহকার্য্যে ব্যস্ত ছিল। তাই পাষাণীর ডাক শুনিয়া ঘরের মধ্য হইতেই উত্তর দিল। উত্তর দিল বটে কিন্তু শীঘ্র ঘর হইতে বাহির হইল না।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

কুসুমে কীট।

ফুট্ ফু'টে চাঁদের আলোতে শাদা ধব্ ধবে ফুলভরা যুঁই-ঝাড়ের ডাল হইতে সন্ন্যাসিনী চুলগুলি খুলিতেছিল, আর থাকিয়া থাকিয়া সরস্বতীকে এক একবার ডাকিতেছিল। সরস্বতী প্রতি ডাকেই উত্তর দিতেছিল। নির্জ্জন নিস্তব্ধ চাঁদের আলো-ধোয়া উচ্চ পাহাড়ের উপরে সে কথাবার্ত্তাগুলি যেন স্বপ্নে পরীর মধুর মধুর, ভাঙ্গা ভাঙ্গা গানের মত বোধ হইতেছিল। কল্পনা কর, চারিদিকে যত দূর দৃষ্টি চলিতেছে, ততদূর বৃক্ষ লতা শূন্য, কেবল সবুজ বর্ণ ঘাসে ঢাকা, কেবল মধ্যে মধ্যে স্থানে স্থানে খাসিয়া-পুঞ্জির কুটীর-রাশির মুকুট পরা, অনন্তপ্রসারময় সেই খাসিয়াপর্ব্বত-শ্রেণী। দৃষ্টির শক্তি

যত দূর দেখিতে সমর্থ, ততদূরের মধ্যে আর কোনই বাধা নাই। কেবল সেই নীল বর্ণ স্থির-সাগর-তরঙ্গের মত একই ভাবে উঁচু নীচু পর্ব্বতগুলি চারিদিকে সুনীল চক্রবাল-রেখা স্পর্শ করিয়া, যেন গভীর স্তব্ধতার কোলে ঘুমাইতেছে। এখন বৃষ্টির জল ঘাসের আগে, গাছের পাতায় ফোঁটা ফোঁটা শোভা পাইতেছে। এই বিস্তীর্ণ স্থিরতরঙ্গময় সুনীল সাগর-বক্ষের ঠিক্ মধ্য স্থলে সর্ব্বোচ্চ দণ্ডীর পাহাড়, সন্ন্যাসীদের হস্তরোপিত পত্র, পুষ্প ও ফল ভরে অবনত উদ্যান বৃক্ষলতার সুন্দর রাজমুকুট পরিয়া, দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। এই সু-বিস্তীর্ণ, বৃষ্টি-জলাভিসিক্ত প্রকৃতির মস্তকে আকাশ হইতে নির্ম্মল জ্যোৎস্নার সাগর যেন উছলিয়া পড়িয়াছে। জলাভিসিক্ত গম্ভীর প্রকৃতি চাঁদের আলোতে হীরাখচিত হইয়া চিক্ চিক্ ঝল্ মল্ ঝল্ মল্ করিতেছে। যে যুঁই-ঝাড়ের কথা বলিতেছিলাম, তাহারও পাতার উপরে, ফুলের উপরে ফোঁটা ফোঁটা বৃষ্টির জল চিক্ চিক্ করিতেছিল। সন্ন্যাসিনীর হাতের নাড়া পাইয়া, অনেক জল ঝরিয়া তাঁহার মুখে, গায়ে ও মাথায় পড়িয়াছে। তবু এখনও শাদা ফুলভরা যুঁই-ঝাড়টী হীরা-খচিতবৎ চিক্ চিক্ ঝল্ মল্ করিতেছে। এই যুঁই-ঝাড়ের গায়ে গৈরিকবাস পরা, ফুটন্ত, হাসন্ত যৌবনের রূপরাশি, মাধুরির চিত্রপটখানি, লাবণ্যের উৎস; সরলতা ও পবিত্রতার ছবিস্বরূপ সন্ন্যাসিনী পাষাণীর আকাশ যোড়া মেঘের রাশির মত সুদীর্ঘ চুলের বোঝাটী জড়াইয়া রহিয়াছে। শাদা শাদা রাশি রাশি ফুটন্ত অফুটন্ত থোকা থোকা যুঁইফুলে আর চুলে জড়াইয়া, মিশামিশি হইয়া যেন শাদা ধব্ ধবে অভ্রখণ্ড আর কাল মেঘে মিলিয়া চন্দ্রমণ্ডলে ঘেরা পূর্ণিমার কলঙ্ক-রেখাশূন্য জ্যোৎস্নাভরা চাঁদের পার্শ্বে স্তূপাকার হইয়া রহিয়াছে। ঘুমন্ত প্রকৃতির কোলে এই জীবন্ত চিত্র। ইহারও উপরে আকাশের সেই রাশি রাশি জ্যোৎস্না এবং পূর্ণিমার চাঁদের কিরণ পড়িয়াছে। কাছে আর কেহ নাই। কেবল ফুটন্ত চাঁপা-ফুলের ছোট গাছটীর নীচে থাকিয়া, বিপন্ন হরিণ-শিশু মঙ্গলা সেই ছল ছল চল চল কাতর চাহনিতে ছোট ছোট শিঙ্গগুলি বেঁকাইয়া এক দৃষ্টে সেই মোহিনী চিত্রের পানে ফ্যাল্ ফ্যাল্ করিয়া চাহিয়া আছে। মঙ্গলা নীরবে উদ্ধার-প্রার্থী। এই মধু-মাখা, গম্ভীর, গভীর স্তব্ধতার মধ্যে থাকিয়া থাকিয়া কেবল সেই দুইটী সুমধুর কণ্ঠ বাজিতেছিল। কল্পনা কর, কি ব্যাপার! আজ কি কেবল অনন্ত নীল আকাশ অসংখ্য নক্ষত্র-চক্ষু মেলিয়া শুধুই ধ্যান

ধরিয়া নীরবে এক দৃষ্টে, নিস্পন্দ দৃষ্টিতে এই শোভা দেখিতেছে? তাই কি?

আরও একটী লোক দেখিতেছিল। দেখিতেছিল, বাদ্‌লার পরে ভাঙ্গা ভাঙ্গা, শাদা শাদা, বাতাসে ভাসা ভাসা, চিক্‌চিকে অভ্র-স্তূপের পার্শ্বে নীল আকাশের ধোয়া পাক্‌লা নীলিমার কোলে কোলযোড়া, হাসিভরা পূর্ণিমার চাঁদ আর ভূতলে স্তূপাকার যুঁইফুলের শাদা ধব্‌ধবে ঝাড়টীর পার্শ্বে, এক বোঝা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন এ'লো মে'লো রুক্ষ রুক্ষ চুলের মাঝ-খানে গৈরিকবাস-রূপ-চন্দ্রমণ্ডলে ঘেরা, শত শত চাঁদের জ্যোৎস্না ভরা সোণার চাঁদ। যিনি দেখিতেছিলেন, তিনিও একজন রূপবান প্রিয়দর্শন যুবক। সে যৌবনের শোভায় শুক বিনিন্দিত বা বিগঞ্জিত নাসা নাই। পদ্ম-পলাশ বিগঞ্জিত, বিনিন্দিত ইত্যাদি ইত্যাদি না হউক্, পদ্ম-পলাশের যে উৎকৃষ্ট ভাব লইয়া কবির মনে সুন্দর চোখের একটী ভাব দাঁড়ায়, এ সৌন্দর্য্যের উপরে তেমন দুইটী চোক প্রতিভার জ্যোৎস্নায় ভরিয়া, চিন্তাশীলতার জ্যোতিতে ভাসিয়া, বিনয়ের ছায়া মাখিয়া শোভা পাইতেছিল। এমুখে যেমন ভালবাসা মাখা রূপের জ্যোৎস্না আছে, তেমনই প্রতিভা, বিনয়, গাম্ভীর্য্য, পাণ্ডিত্য, চিন্তা ও পবিত্রতার চাঁদের হাট বসিয়াছে। যুবকের বয়স পঁচিশের উপরে এবং ত্রিশের নীচে। দেহ সমুচ্চ, সুগঠিত ও বলিষ্ঠ। সে মনোহর, প্রিয়দর্শন, প্রতিভা-বিস্ফারিত, গম্ভীর মূর্ত্তি দেখিলেই বোধ হয়, ইনি কোন রাজকুল-ভূষণ কিম্বা অতি সমুচ্চ বংশের গৌরবান্বিত মণিমুকুটস্বরূপ ভাবী মহাপুরুষের পূর্ণ যৌবন-লীলার সাক্ষাৎ উদার প্রেমময় অবতার। যুবক বাগানের গাছের আড়ালে দাঁড়াইয়া, আকাশে সেই পূর্ণিমার চাঁদ, ভূতলে সেই পূর্ণিমার ভরা পূরা সোণার চাঁদ দেখিতেছিলেন, আর গত রাত্রিতে দেখা একটী স্বপ্নের কথা শিহরিয়া শিহরিয়া ভাবিতেছিলেন। যুবকের মুখ বিষন্ন।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

কীট না আগুন?

পূর্ব্ব দিবস সমস্ত দিন মন্‌ক্রিম অঞ্চলে খাসিয়াদের পুঞ্জিতে পুঞ্জিতে দ্বারে দ্বারে ঘুরিয়া, দ্বিপ্রহর রাত্রিতে যখন একাকী একটী জন-মানব-

শূন্য নিস্তব্ধ পাহাড়ের উপরে একটী গাছের ছায়ায় শুষ্ক পত্ররাশির উপরে গায়ের উত্তরীয় বস্ত্রখানি পাতিয়া ক্লান্ত-শরীর ঢালিয়া, পরিব্রাজক নানা কথা ভাবিতে ভাবিতে তন্দ্রা দিতেছিলেন, তখন হঠাৎ একটী স্বপ্ন দেখিলেন। দেখিলেন, "যেন তিনি দেশে দেশে, গ্রামে গ্রামে বেড়াইয়া, ভারতের কল্যাণের জন্য প্রাণ দিয়া খাটিতেছিলেন। বালক-কাল হইতে সন্ন্যাসীর শিক্ষায় ও উপদেশে তাঁহার মনে যে সকল আশার অঙ্কুর মাথা তুলিয়াছিল, ভগবানের কৃপায় সেগুলির অনেকই পত্র-পুষ্প-ফল-ভরে অবনত বৃক্ষে পরিণত হইয়াছে। সঙ্গে আর কেহই নাই। সন্ন্যাসী নাই, দণ্ডী নাই, সন্ন্যাসিনী নাই। কতকাল হইতে যে ইহাঁদের সঙ্গ ছাড়িয়া দূরে আসিয়া পড়িয়াছেন, এখন আর যেন তাহা ঠিক্ মনে পড়িতেছে না। কিন্তু সেই বাল্য-সহচরী, কৈশোর বয়সের ভালবাসার প্রতিমা, যৌবনের মধুময়ী সঙ্গিনী, চিরসন্ন্যাসিনী, সরলা, প্রতিভাময়ী পাষাণীকে আজও ভুলিতে পারেন নাই। কেবল ভুলিতে পারেন নাই তাহা নহে, কেমন করিয়া যেন, কেন যেন, কখন্ কোন্ অবসরে কিরূপে অতি অজ্ঞাতসারে যেন, সেই প্রাণের প্রেম-মধুভরা, হৃদয়ের শান্তি-সুরভিমাখা সোণার ফুলটী—প্রভাতের কিরণ-স্নাত গোলাপ ফুলটী, অন্তরের অন্তস্তলে, মর্ম্মের মর্ম্ম গ্রন্থিতে লুকাইয়া ফুটিয়া রহিয়াছে। এমনই করিয়া ফুটিয়া আছে যে, তাহা ছিঁড়িতে গেলে এখন প্রাণের মূল সহিত উপাড়িয়া আসে। খাটিয়া খাটিয়া যখনই বিরাম পান, তখনই পরি-ব্রাজক সেই হৃদয়-পুত্তলীকে হৃদয়ের মধ্যে অঞ্জলি অঞ্জলি ভালবাসার ফুটন্ত ফুল দিয়া পূজা করিতে বসেন। একদিন যেন শ্রান্তদেহে হিমালয়াঞ্চলে পর্ব্বতপৃষ্ঠে বিশ্রাম করিতেছিলেন। তখন ভাবিতে ভাবিতে আবার সেই সরার মত ধরাখানি অনন্ত আনন্দময় ব্রহ্মাণ্ডে পরিণত হইয়া, সেই ক্লান্ত চক্ষুর নিকট কত কি আশার চিত্র আঁকিতে লাগিল। যেন ভাবিতে লাগিলেন, 'এ প্রেমমাখা, নবোৎসাহমাখা, আনন্দমাখা, প্রাণের শান্তিভরা কার্য্যক্ষেত্র কেমন মধুর—কেমন মনোহর! ইত্যাদি ইত্যাদি।"

এমন সময় হঠাৎ জ্যোৎস্নালোকিত গাছের উপরে একটা পর্ব্বতাঞ্চলের পাখী বিকটস্বরে চীৎকার করিয়া উঠিল। পাখীটা কয়েকবার ঘন ঘন চীৎকার করিয়াই, সশব্দে আকাশ দিয়া উড়িয়া গেল। পাখী চীৎকার করিতেই পরিব্রাজকের ঘুম ভাঙ্গিল। পরিব্রাজক

জাগিয়া বুঝিলেন, স্বপ্নের শেষভাগে একটী পুরাতন চিন্তার কথাগুলিই ভাবিতেছিলেন। একদিন তুলসী গ্রামে রোগশয্যায় শুইয়া—বিদায়ের পূর্ব্বদিন অপরাহ্নে, এই কথাগুলি ভাবিতেছিলেন। সেই দিনের কথা মনে পড়াতে, পরিব্রাজকের মনে আনন্দও হইল, বিষাদও হইল। পরিব্রাজক একে একে অনেক কথা ভাবিলেন, অনেক চিন্তা করিলেন। পরে ধীরে ধীরে অস্পষ্টস্বরে বলিলেন, "হায়! সেই হইতেই আমার মনে কি যেন একটা আগুনের রেখা পড়িয়াছে! আমার সরল প্রাণে গরলের দাগ বসিয়াছে! কুসুমে কীট ঢুকিয়াছে! এ আগুন, এ গরল চিরদিন আমাকে মনে চাপিয়া গুমরে গুমরে জ্বলিয়া পুড়িয়া মরিতে হইবে। কত চেষ্টা করিলাম—এ দাগ মুছিয়া ফেলিতে কত যত্ন করিলাম, কিছুতেই মুছিল না। ইচ্ছা করিয়া সন্ন্যাসীকে প্রকারান্তরে কত কি বলিয়া কহিয়া প্রায় তিন বৎসর সাড়ে তিন বৎসর দূরে দূরে থাকিলাম; চিঠিপত্র লিখিলাম না। তবুও যেন দিন দিনই দাগ প্রাণের ভিতরে উজ্জ্বল হইতে লাগিল। মনে করিয়াছিলাম, দূরে থাকিলে দাগ ঘুচিবে না, নিকটে যাই। তখন আবার দণ্ডীর পাহাড়ে আসিয়া নূতন সন্ন্যাসি-পরিবারে মিশিলাম। এবার আকাশের চাঁদ হাতে আসিয়াছে, দূরের ধন ঘরে আসিয়াছে, এই বলিয়া আনন্দ হইল না। দেখিলাম, চাঁদে কলঙ্কের দাগ নাই। সে সরল প্রাণে আগুনের রেখা পড়ে নাই, গরলের দাগ বসে নাই। প্রথমে মনে করিলাম, ভালই হইয়াছে। ভাল মনে করিয়া খাসিয়াদের জন্য প্রাণ দিয়ে খাটিতে লাগিলাম। খাটিতে সুখ হইল, আনন্দ হইল। বহুদিনের আশার মত কাজ পাইয়া বড় খুষী হইলাম। কিন্তু প্রাণের পূর্ব্ব সরল ভাব, উষার স্নিগ্ধতার মত শান্তি, আর ফিরিল না। দেখিলাম, যাহা ভাল মনে করিয়াছিলাম, তাহা বড় কষ্টের। দেখিলাম, আমি যাহাকে মনে মনে এক ভাবে পাইতে চাই, সে আমাকে আর একভাবে প্রকাশ্যে পাইয়া বসিয়া আছে। সে আমাকে হৃদয়ে পূরিয়া, প্রাণে স্থান দিয়া, সুখ শান্তির নিরাবিল সাগরে গা ঢালিয়া ভাসিতেছে। আমার তাহার কাছে যাইতে লজ্জা হয়। তাহার মুখের দিকে চাহিতে কেমন কেমন বোধ হয়। পাছে আমার এ মনের বিষ তাহার সরল প্রাণে সংক্রামিত হয়, এজন্য সর্ব্বদা শঙ্কিত ও সঙ্কোচিত হইয়া চলিতে হয়। তাই বুকের আগুন বুকে চাপিয়া

আবার দূরে গেলাম, আবার নিকটে আসিলাম। বারম্বার এইরূপ করিলাম। কি আশ্চর্য্য! এই আটটী বৎসর কাল কিন্তু প্রায় এই রকম করিয়াই পথে পথে স্বপ্ন, আগুন ও বিষের মধ্য দিয়া চলিয়া গিয়াছে! তবে ভগবান্ এই কৃপা করিয়াছেন যে, এই আট বৎসরেও সরলা সন্ন্যাসিনী আমার মনের এ আগুন জানিতে পারে নাই। ছি, ছি, এ কি হইয়াছে! মনের ভিতরে এ আগুন কি করিয়া লাগিল! হা! পাষণ্ড প্রাণ, একটা পবিত্র সম্বন্ধের ছল করিয়া, একটা পবিত্র ভালবাসার ফাঁদ পাতিয়া, শেষটা এইরূপ জঘন্য বিশ্বাসঘাতকতা করিবি, ইহা এক দিন স্বপ্নেও ত ভাবি নাই? প্রাণ থাকিতে সন্ন্যাসিনীকে বা জগৎকে এ কথা জানিতে দিব না। আমি এবার নিশ্চয়ই এই ইংরেজ-সেনাপতির হাতে ধরা দিয়া কারাগৃহে বন্দী হইব। আমি যখন অসংযমী, তখন এই শাস্তি ব্যতীত এখন আর আমার ইহা হইতে বাঁচিবার উপায় দেখিতেছি না। জেলে গিয়া কয়েদীদিগের মধ্যেও ভগবানের কাজ করিতে পারিব। নতুবা আমি এক করিতে আর এক হইয়া পড়িতেছে। এখন যেন আমার জীবনের বন্ধন গুলি শিথিল হইয়া পড়িয়াছে। হা! সন্ন্যাসি, দেব, তুমি জান না যে, তোমার এত যত্নের গঠিত জীবন এইরূপ বিষম সংকটে পড়িয়াছে! পবিত্র চরিত্র পাষাণি, তুমি জান না যে, আমি অনেক দিন হইতে তোমার সেই পবিত্র সুমধুর ডাকের আর অধিকারী নাই। তুমি জান না বলিয়া, পূর্ব্বের সম্বন্ধ রাখিতে ব্যগ্র হও। তুমি রোজই বল, "তোমার কি হোয়েছে? দিন রাত কি ভাব? মুখে যেন তোমার তেমন ভাব আর দেখি না কেন! তুমি কি তোমার পিতৃরাজ্যের জন্য, মায়ের জন্য, পিতার জন্য ভাব? ভগবানকে ডাক। তিনি বই শাস্তি কে দিবে?" ঠিক্, ভগবান বই শান্তি আর কে দিবে? কিন্তু তুমি জানন না, আমি দিন রাত তোমাকেই ভাবি। ভগবানকে ভাবি বটে কিন্তু তখনও তোমাকে তাঁহার চরণতলে দেখি। ছি, ছি, এ কি হোয়েছে! মনে এ আগুন কেন লাগিল?" ভাবিতে ভাবিতে পরিব্রাজকের চোখের জলে দুইটী গণ্ড, গ্রীবা ও বিছানার কাপড় ভিজিয়া যাইতে লাগিল। কাঁদিতে কাঁদিতে আবার কখন্ তন্দ্রা আসিল, পরিব্রাজক তাহা কিছুই জানিতে পারিলেন না।

তন্দ্রার মধ্যে আবার স্বপ্ন দেখিলেন। এবার দেখিলেন, "সন্ন্যাসিনী

সেই গৈরিক বাসখানি পরিয়া, চুলগুলি এলাইয়া, মুখ টিপিয়া টিপিয়া হাসিতে হাসিতে দশদিক্ ভাসান চাঁদের আলোতে সেই নিস্তব্ধ পাহাড়ের উপরে আসিয়া, ঠিক্ মাঝখানটীতেই দাঁড়াইলেন। যুবক ঘুমাইতে ঘুমাইতে সেই স্বপ্নাবেশেই দেখিতেছিলেন, "আকাশে জ্যোৎস্না-ভরা, হাসিভরা চাঁদ, ভূতলে যেন তদধিক শোভার ভাণ্ডার ভরাপুরা পূর্ণিমার সোণার চাঁদ।" যুবক আপনা ভুলিয়া গিয়া স্বপ্নেই হাত বাড়াইয়া চাঁদ ধরিতে গেলেন। চাঁদ দূরে সরিয়া না গিয়া কাছে আসিল! আনন্দে, বিস্ময়ে ও লজ্জাভরে যুবক তখন ধীরে ধীরে চক্ষু নিমীলিত করিয়া বলিলেন, "আরও কাছে, আরও কাছে!" বলিতে বলিতে যাই হাত ধরিতে উদ্যত হইলেন, অমনি সন্ন্যাসিনী একটা অন্ধকার গুহার মধ্যে ঝুপ্ করিয়া পড়িয়া গেলেন! পরিব্রাজক এইরূপ স্বপ্ন দেখিয়া চমকিয়া উঠিলেন, শিহরিয়া উঠিলেন।

এখন আর রাত্রি বেশী ছিল না। প্রভাতের অল্প পূর্ব্বেই শুক্লা-চতুর্দ্দশীর চাঁদ অস্ত গমন করিয়াছিল। মেঘে আকাশ ঢাকা ছিল। পরিব্রাজক আর না শুইয়া তখনই উঠিয়া দণ্ডীর পাহাড়ের দিকে যাত্রা করিলেন। সন্ন্যাসী এবং দণ্ডী ভিন্ন ভিন্ন দিকে গিয়াছিলেন। পরিব্রাজকের আরও একদিন মন্ক্রিমাঞ্চলের খাসিয়াপুঞ্জিতে ঘুরিবার কথা ছিল। কিন্তু এই কুস্বপ্নে মনটা অত্যন্ত খারাপ হওয়াতে আজ আর অপর কোথায়ও না গিয়া, বরাবর দণ্ডীর পাহাড়ে যাইতে ব্যগ্র হইলেন। পরিব্রাজক বুঝিয়া-ছিলেন, খাসিয়াদের সঙ্গে ইংরেজদের এখন আর সহজে মিটমাট হইবার আশা নাই। এই জন্যই দণ্ডীর পাহাড়ে যাইতে মনে অন্য কোন বিশেষ আপত্তি উপস্থিত হইল না।

আজ দিনের প্রথম ভাগে অত্যন্ত বাদলা গিয়াছে। শেষভাগে দিন ভাল হইলেও, পাহাড়ের উপর দিয়া তেত্রিশ মাইল পথ চলিয়া আসিতে পরিব্রাজকের সমস্ত দিন লাগিয়াছে। দণ্ডীর পাহাড়ে উঠিবার পথের ধারেই ফুটন্ত ফুলভরা ছোট চাঁপা ফুলের গাছের শিকড়ে পা আটকিয়া যাওয়াতে মঙ্গলা দাঁড়াইয়া ছিল।. পাষাণী শাদা ধব্ ধবে ফুলভরা যুঁই-ঝাড়ের জালগুলি হইতে চুল ছাড়াইতে ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছিল। পরিব্রাজক পথে সমস্ত দিন ভাবিতে ভাবিতে আসিতেছিলেন, "না জানি, দণ্ডীর পাহাড়ে গিয়া সন্ন্যাসিনীর কি একটা অমঙ্গলই দেখিব।" ভাবিতে

ভাবিতে সমস্ত পথে কেবল ভগবানকে ডাকিতেছিলেন। ভগবানের কৃপায় ঘরে পৌঁছিবার পূর্ব্বেই সম্মুখে এই ব্যাপার দেখিয়া, পরিব্রাজক বাগানের একটা গাছের আড়ালে দাঁড়াইলেন। দাঁড়াইয়া, বেশীক্ষণ নয়, মুহূর্ত্তের জন্য ভূতলের সেই পূর্ণিমার চাঁদের শোভা দেখিতে দেখিতে গত রাত্রির স্বপ্নের কথা মনে করিয়া শিহরিয়া উঠিলেন।

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

ঘোর অন্ধকারে।

যুবক গাছের আড়ালে দাঁড়াইয়া মুগ্ধভাবে ভূতলে যে চাঁদের শোভা দেখিতেছিলেন, তাঁহার ইচ্ছা হইতেছিল সেই শোভায় চিরকালের জন্য ডুবিয়া মিশিয়া যান। ইচ্ছামত এ জগতে কয়টী কাজ হয়? যুবক এক মুহূর্ত্তের বেশী গাছের আড়ালে দাঁড়াইতে পারিলেন না। হঠাৎ সরস্বতীর আসিয়া পড়িবার ভয়ে তখনই গাছের ছায়া হইতে পাষাণীর দিকে সরিয়া আসিলেন। শশাঙ্কশেখরের ছায়া জ্যোৎস্না-ধৌত পর্ব্বতের গাত্রে হেলিয়া পড়িল। পাষাণী তখনও একটীও ফুল বা থোবা না ছিঁড়ে, একখানি ডালও না ভাঙ্গে, অথচ চুলগুলি যুঁই ঝাড়ের পেঁচ ঘোঁচ বিশিষ্ট সরু সরু ডালসকল হইতে তাড়া তাড়ি খুলিয়া যায়, এই ভাবে ব্যস্ততার সঙ্গে চুলের জড়া ছাড়াইতেছিল। এইরূপ স্থলে সচরাচর যাহা ঘটে তাহাই হইতেছিল। চুল ছাড়াইতে পাষাণীর দ্বিগুণ ত্রিগুণ পরিমাণ সময় বিলম্ব হইতে লাগিল। শশাঙ্কশেখর ধীরে ধীরে আসিয়া যখন পাষাণীর একবারে কাছে দাঁড়াইলেন, তখনও পাষাণী তাঁহাকে দেখিতে পাইল না। শশাঙ্কশেখর পাষাণীর অত্যন্ত নিকটে দাঁড়াইয়া বলিলেন, "কি হো'চ্ছে? এ'কি হো'চ্ছে সন্ন্যাসিনি?"

পাষাণী হঠাৎ কাণের কাছে দাদার কথার মত কথা শুনিয়া একবারে চমকিয়া উঠিল। চমকিয়া, তাড়া তাড়ি চুলের গোছাটী বাঁ হাতে ধরিয়া মুখ ফিরাইয়া দাঁড়াইল। এইরূপ গাঢ় অন্যমনস্কতার সময়ে হঠাৎ এই প্রকার অপূর্ব্বচিন্তনীয় ব্যাপারে চমকিয়া উঠাতে পাষাণীর বুক দুড় দুড় করিতেছিল, গা একটু একটু কাঁপিতেছিল। পাষাণী ফিরিয়া সত্য সত্যই

শশাঙ্কশেখরকে কাছে দেখিয়া, একটু স্থির হইয়া বলিল, "দাদা তুমি? ভাগ্যিস্! এই রকম হঠাৎ এত কাছে তোমার কথা শুনিয়া আমি চমকিয়া উঠিয়াছি। তুমি কখন্ আসিয়াছ? আজ ত তোমাদের আসিবার কথা নয়? তা বেশ হো'য়েছে। তাঁরাও আসিয়াছেন ত?"

শশাঙ্কশেখর পাষাণীর কথার একটীও উত্তর না দিয়া, কেবল স্থির-দৃষ্টিতে পাষাণীর মুখপানে তাকাইয়া রহিলেন। মুখ ফিরাইয়া শশাঙ্ক-শেখরের দিকে হঠাৎ তাকাইতে, আকাশের চাঁদের রশ্মিগুলি ঠিক্ পাষাণীর মুখের উপরেই ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছিল। পাষাণীর কপালে ও মুখের উপরে যুঁই ঝাড় হইতে যে দুই চারি ফোঁটা জল ঝরিয়া পড়িয়া মুক্তাবৎ শোভা পাইতেছিল, চাঁদের কিরণে, এ'লো মে'লো চুলের মাঝে মুখের লাবণ্যে আর সেই জলের ফোঁটা কয়টাতে মিলিয়া মিশিয়া আচম্বিতে কি যেন এক অপূর্ব্ব শোভা ফুটিয়া উঠিল। সে শোভায়, কি স্বপ্ন আঁকা আছে, কি মধুমাখা আছে, কি মর্ম্মস্পর্শী সঙ্গীতের ধারা লিখা আছে, যেন শশাঙ্কশেখর ধ্যান ধরিয়া তাহাই পাঠ করিতে লাগিলেন। যেন শশাঙ্ক-শেখরের সমস্ত ইন্দ্রিয় সেই শোভায় ডুবিয়া তাহা পান করিতেছিল। পাষাণী দাদাকে নিরুত্তর দেখিয়া বলিল, "কি দেখিতেছ?" পাষাণীর এই সরল প্রশ্নে আত্ম-বিস্মৃত যুবক চমকিয়া উঠিলেন। এবার শশাঙ্কশেখর মনে মনে ঈষৎ লজ্জিত হইযা, পাষাণীর কথার উত্তর না দিয়া পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি কি বলিতেছিলে না?"

পাষাণী।—"বলিতেছিলাম, এমন কো'রে মুখপানে তাকাইয়া একভাবে ধ্যান ধো'রে কি দেখিতেছিলে?"

শশাঙ্কশেখর এবারও মনে মনে লজ্জিত হইয়া বলিলেন। "তার আগে তুমি কি না জিজ্ঞাসা করিলে?"

পাষাণী।—"বলিতেছিলাম, তুমি কখন্ আসিলে? তাঁহারাও আসিয়াছেনত?"

শশাঙ্ক।—"না। তাঁরা বোধ হয় কাল ফিরিবেন।"

পাষাণী।—"তুমি ফিরিলে, তাঁরা ফিরিলেন না কেন?"

শশাঙ্ক।—"তাঁরা একদিকে গিয়াছিলেন, আমি আর একদিকে গিয়া-ছিলাম। তাদের সঙ্গে আমার দেখা হয় নাই।"

পাষাণী শুষ্কমুখে বলিল, "যে কাজে গিয়েছিলে তার কি হো'ল?"

শশাঙ্ক।—"তার হবে কি? খাসিয়ারা এখনও দোষ স্বীকার করিয়া ক্ষমা চাহিতে প্রস্তুত নয়। আর মেজর হটনও সহজে ফিরিবেন বোধ হয় না। বিনা রক্তপাতে একটা মীমাংসা হইবার কোনই সম্ভাবনা নাই।"

পাষাণী কয়েক মুহূর্ত্তের জন্য যেন মঙ্গলাকে ভুলিল, চুল ছাড়ান ভুলিয়া গেল। বাঁ হাতের মুষ্টিমধ্যে চুলের গোছাটী সেই ভাবেই ধরা রহিল। পাষাণী, শশাঙ্কশেখরের মুখের উপরে চোক দুইটী স্থাপন করিয়া কেবল অনিমিষে একদৃষ্টে চাহিয়া কি যেন ভাবিতে লাগিল। এই অবসরে শশাঙ্কশেখরও আত্ম-বিস্মৃত হইলেন। সেই ঢল ঢল, ছল ছল, সরল মধুর দৃষ্টি, সেই খাসিয়ার অমঙ্গল-চিন্তায় ঈষৎ ছায়া-বৃত মুখে কোটি চন্দ্রের ঘুমন্ত জ্যোৎস্নারাশি দেখিতে দেখিতে যুবক আবার সেই রূপসাগরে অজ্ঞাতসারে ডুবিয়া গেলেন। যুবতীও খাসিয়া-জাতির ভাবী সুখ দুঃখ ভাবিতে গিয়া তন্ন তন্ন করিয়া এক মুহূর্ত্তে অনেক কথা ভাবিলেন। ভাবিতে ভাবিতে, কখন্ জানেন না, তাঁহারও দৃষ্টি যেন যুবকের রূপময় হইয়া উঠিল। যুবতী জ্ঞানহারা হইয়া দেখিতে লাগিলেন, "দাদা ভূতলে অতুলচাঁদ। কোটি কোটি পূর্ণিমার ভরাপূরা সোণার চাঁদ ইহার পায়ের নিছনি। এ রূপের তুলনা নাই। দাদা আমার সুধামাখা মধুর পুতুল। দাদা আমার ভালবাসার অমৃতময় সাগর, জ্ঞান ও প্রতিভার অগাধ সিন্ধু, সাধুতার আদর্শ।" ভাবিতে ভাবিতে যেন যুবতীর প্রাণ, একটা নিরাবিল স্বপ্নময় সুধার সাগরে ভাসিতে লাগিল। হৃদয়ে যেন পরমানন্দের সমুদ্র উথলিল। এ আনন্দে—এ মগ্নতায় যুবকের আনন্দের মত—মগ্নতার মত, বিষাদের গভীর রেখা নাই। এ স্নিগ্ধতার নীচে গুম্‌রে গুম্‌রে জ্বালাইবার জন্য তুঁষের আগুন নাই। এ কমলের মৃণালে কণ্টক নাই। এ গোলাপের ডালে কাঁটা নাই। কেবল বাধাশূন্য, সীমাশূন্য, সঙ্কোচ, লজ্জা, ভয় ও কপটতাশূন্য, নিরাবিল, নির্ম্মল আনন্দরাশি এ হৃদয়ের ধন। এ সরল প্রাণে গরলের দাগ নাই। এ কুসুমে কীট নাই। শশাঙ্কে আর পাষাণীতে আজ এই প্রভেদ। শশাঙ্কশেখর আজও পাষাণীর কাছে ছোট বেলার সেই সোদরোপম ভালবাসার খনি, প্রাণমাখা দাদা। কিন্তু পাষাণী আজ শশাঙ্কশেখরের নিকটে কণ্টকাবৃত মৃণালে কমল, কাঁটাঢাকা ডালে প্রভাতের ফুটন্ত গোলাপ ফুল, আগুনে ঘেরা সুধারাশি, গরল-মিশ্রিত অমৃত, আগুন-মিশ্রিত শীতলতা। একজনের যাহা পাইবার

ছিল, সে তাহা পাইয়া বিভোর হইয়াছে। আর একজন কামনীয় বস্তু পায়, পায়, পায় না। ধরে, ধরে, ধরিতে পারে না। আশা করিতে গিয়া নিরাশ হইয়াছে। শীতের আগুন সুখপ্রদ মনে করিয়া হাত দিতে গিয়া দেখিয়াছে, হাত পুড়িয়া যায়! নিরাশা! অনন্ত নিরাশা! একজন এই নিরাশায় ডুবিয়া যাইতেছে! আর একজনের আশা অনন্ত, পূর্ণ, সুখময়। পাষাণী ভুলিয়াও বুঝে নাই দাদার প্রাণে আগুন লাগিয়াছে।

নবম পরিচ্ছেদ

প্রকৃতির লীলা।

পাষাণীর বয়স যখন বার বৎসর, তখন একদিন হরগোবিন্দের তুলসীগ্রামের সেই মুনি ঋষির আশ্রমের মত সুন্দর, গ্রাম্যস্তব্ধতাপূর্ণ, শান্তিপূর্ণ, পর্ব্বতাকার বাটীতে প্রত্যূষের কিছু পরেই একজন তেজঃপুঞ্জ সন্ন্যাসী একটী বালককে সঙ্গে করিয়া আসিয়া আতিথ্য গ্রহণ করিলেন। ইঁহারা সাড়ে ছয়টার সময় গাড়ী হইতে ষ্টেশনে নামিয়াছিলেন। তাই এত সকালেই উপস্থিত হইলেন। যে তেজঃপুঞ্জ সন্ন্যাসী আসিলেন, ইনি বাটীর কাহারও অপরিচিত নন। ইনি যখন গৃহী ছিলেন, তখন হইতেই হরগোবিন্দের পিতার পরম আত্মীয় ছিলেন। হরগোবিন্দকে চিরদিনই খুব ভাল বাসিতেন। এখন সংসার ছাড়িয়া সন্ন্যাসী হইয়াছেন। কিন্তু সে ভালবাসা ভুলিতে পারেন নাই। সন্ন্যাসী বছরে অন্ততঃ দুই চারি বার আসিয়া হরগোবিন্দের খপর লইয়া থাকেন। পোষাক বা অন্য কোন বাহ্যলক্ষণ দেখিয়া, সন্ন্যাসীকে সন্ন্যাসী বলিয়া অপরিচিত কেহই চিনিতে পারে না। কিন্তু যাঁহারা ইঁহাকে বরাবর থেকেই জানেন, তাঁহাদের ধারণা, ইনিই প্রকৃত সন্ন্যাসী। সুতরাং সন্ন্যাসীর অনিচ্ছাসত্ত্বেও, সকলে ইঁহাকে সন্ন্যাসী নামেই পরিচিত করিয়াছেন। সন্ন্যাসীর পূর্ব্ব নাম অল্প লোকেই জানে। কাজে কাজেই সন্ন্যাসী নিজেও বাধ্য হইয়া সন্ন্যাসী বলিয়াই আপনার পরিচয় দিয়া থাকেন। তেজঃপুঞ্জ বৃদ্ধ সন্ন্যাসীর সঙ্গে যে বালকটী আসিয়াছিল, সেটীকেও একটী ছোট সন্ন্যাসী বলিয়াই বোধ হইতেছিল। বালকের বয়স তখন ষোল বৎসর মাত্র।

হরগোবিন্দের বড় আদরের নাতিনী বার বৎসর বয়সের পাষাণী ধীরে ধীরে সন্ন্যাসীর কাছে আসিয়া, সুন্দর বালকটীকে দেখিয়া ধীরে ধীরে চুপি চুপি কাণে কাণে জিজ্ঞাসা করিল, "হ্যাঁ সন্ন্যাসী ঠাকুর, ঠাকুরদাদা মহাশয় এখনই দিদীমাকে বলিতেছিলেন, এই ছেলেটী আমাদের বাড়ীতে থাকিবেন। থাকিবেন? তা বেশ হোল। বড় সুন্দর ছেলেটী। না? আমি এঁকে দাদা বো'লে ডা'কব। আমার একটীও দাদা নাই। বেশ হো'ল।" বালক, বালিকার কথা শুনিতেছিল। বালক দেখিল, যে মেয়েটী সন্ন্যাসীর কাছে বসিয়া তাঁহার মুখ পানে তাকাইয়া চুপি চুপি কথা বলিতেছে, সেটী যেন একটী ছোট পরী। যেন মেয়েটীর হাত, পা, গা, মুখ সকলই শুধু তাজা তাজা গোলাপের পাপড়িগুলি ছিঁড়িয়া গড়ান হইয়াছে। তাহার উপরে ঘন নিবিড় কৃষ্ণ কৃষ্ণ আজঘনলম্বিত কেশ-রাশি ছড়াইয়া রহিয়াছে। মুখে যেন সর্ব্বদাই হাসি ফুটিয়া আছে। তাহার সুন্দর চোক দুইটী ও চাঁদ-মুখখানি যেন গলা গলা ভালবাসাতে মাখান। কিন্তু মেয়েটী বিধবার সাজে সাজিয়াছে। সে সুন্দর কচি গায়ে, অলঙ্কারের নামও নাই। পরিধানে একখানি যৎসামান্য শাদা থানের ছোট ধুতীমাত্র। মেয়েটীকে বিধবা দেখিয়া, বালক শশাঙ্কশেখরের মনে বড়ই কষ্ট হইল। ছদ্মবেশী রাজপুত্র শশাঙ্কশেখর সেই মুহূর্ত্তেই মনে মনে বলিতে লাগিল, "যদি আমার এখানেই থাকা হয়, তবে বড়ই সুখী হইব। আমিও এই মেয়েটীকে দিদী বলিয়া ডাকিব।"

প্রকৃতির অন্ধকার কুক্ষি-মধ্যে কি এক মায়াজাল লুক্কায়িত আছে জানি না। ইহাকে এখন অদৃষ্টই বল অথবা ঘটনার চক্রই বল, যাহা খুসী বল, কিন্তু স্থূল চক্ষুতে, স্থূল ভাবে আজ যাহা দেখিতেছ, সেই মায়াবলে অনাদির আঁধারে ইহার মূল-পত্তন অতি অস্ফুটরূপে গঠিত হইতেছিল। অনাদিতে যাহা ফুটিতেছিল, অনন্তে তাহার পূর্ণ বিকাশ হইতে থাকিবে মাত্র। ঘটনাক্রমে বালকের কিছু দিনের জন্য হরগোবিন্দের বাটীতেই থাকা হইল। সন্ন্যাসী বালকের কোন পরিচয় দিলেন না। কেবল হর-গোবিন্দের হস্তে তাহার সমস্ত ভার দিয়া বিশেষ কারণে দীর্ঘ দিনের জন্য স্থানান্তরে প্রস্থান করিলেন। প্রকৃতির লীলা আরম্ভ হইল।

এই হইতে শশাঙ্কশেখর আর পাষাণী দুইটী ভাই বোনের মত এক পরিবারে বাস করিতে লাগিল, এক শিক্ষক হরগোবিন্দের নিকটে

এক পাঠে পড়িতে লাগিল। এক বৎসর গেল। দ্বিতীয় বৎসরও গত হইতে চলিল। প্রথম দিনই, প্রথম দেখাতেই যে দুইটি সরল, পবিত্র, কোমল প্রাণের ধারা, মধুর মধুর ভাবে মিশিতে চাহিয়াছিল, পলে পলে, তিলে তিলে, প্রহরে প্রহরে, দিনে দিনে, সপ্তাহে সপ্তাহে, মাসে মাসে, বৎসরে বৎসরে, তাহা এমন কো'রে মিশিয়া গেল যে, শেষটা দুইটী ধারাকে দুইটী বলিবার যেন কিছুই রহিল না,অথবা যাহা রহিল তাহা বুঝিয়া উঠাই ভার হইল। দুইটী সুন্দর ভাই বোন সমভাবে এক ঘরের, এক পরিবারের আনন্দ ও শোভা বাড়াইতে লাগিল। দুইটী ফুল মালীর কৌশলে অপূর্ব্বভাবে ফুটিল। ত্রিকালদর্শী বিজ্ঞ হরগোবিন্দ এ শোভা দেখিয়া, যুগপৎ মোহিত ও চিন্তিত হইলেন। হরগোবিন্দ পরমাত্মীয় ত্রিকালদর্শী পণ্ডিত-প্রবর বৃদ্ধ সন্ন্যাসীকে চিঠিপত্রে বহিয়া বহিয়া সে চিন্তা ও আনন্দের অংশ দিলেন। সন্ন্যাসী চিঠিতে হরগোবিন্দকে প্রশ্ন করিলেন, "যদি প্রকৃতি কালের সূতায় এই দুইটী সুন্দর ফুলে একটী সুন্দর মালা গাঁথিয়া অঞ্জলি ভরিয়া ভগবৎ-চরণে ঢালিয়া দেয়?" হরগোবিন্দ উত্তরে লিখিলেন, "গঙ্গা যমুনা একত্র এক স্রোতে মিশিয়াছে। হিমাদ্রিও বাধা দিতে সমর্থ হয় নাই। সাগর বুঝি অপার অনন্ত বুক পাতিয়া সেই মিলিত ধারা লইতে আপত্তি করিয়াছিল। ধারা তাই শতমুখে আস্ফালন করিয়া, তরঙ্গ তুলিয়া সাগরে মিশিয়াছে। গঙ্গা তাই শতমুখী, সাগর তাই এত গম্ভীর। এই দৃষ্টান্ত না ভুলিলে, কখনও কোন আপত্তির সম্ভাবনা থাকিবে না। তবে আমার বিশ্বাস, এ পৃথিবীর রক্ত মাংস পৃথক্ পৃথক্ থাকিবে। মিলিবে, দুইটী আলোকের বিন্দু। মিলিবে, সুরভিটুকুতে সুরভিটুকু, সুষমাতে সুষমা-টুকু।" সন্ন্যাসী প্রত্যুত্তরে লিখিলেন, "শিষ্যকে মন্ত্রপাঠ পাঠাইবে। হিমালয় কত উচ্চ, কত সহিতে পারে, শিষ্যকে এখন কিছু দিন তাহাই শিখাইব। শিষ্যের সাধনা হয় নাই।" আঠার বৎসরের বালক শশাঙ্কশেখর যে দিন চৌদ্দ বৎসরের বালিকার কাছে বিদায় নিয়ে চোখের জলে বুক ভাসাইতে ভাসাইতে হরিদ্বারে গেল, পাষাণী যে দিন চোখের জলে ক্ষুধা তৃষ্ণা ভাসাইয়া দিয়া বিষণ্ণতায় ডুবিল, সেদিনও সেই ফোটা ফোটা ফুলে বা কোরকে কীট ছিল না—শশাঙ্কের বুকে গরলের দাগ ছিল না। স্থূলদর্শী দেখিল, প্রকৃতির দুইটী সুন্দর পদার্থে মিলিবার যথেষ্ট উপকরণ ছিল বলিয়াই এত শীঘ্র শীঘ্র মিলিল। এবার এই পর্য্যন্তই হইল।

কিছুকাল পরে আবার দেখা হইল। আবার উভয়ের কাছে উভয় চোখের জলে ভাসিয়া বিদায় চাহিল। এবার ষোল বৎসরের বালিকার সঙ্গে কুড়ি বৎসরের বালকের ক্ষণিক মিলন হইল। ইহাতেও আগুনের রেখা, গরলের দাগ ছিল না। দিন গেল, মাস গেল, বৎসর গেল, আর এক বৎসর আসিল। আবার শশাঙ্কশেখরের রুগ্ন শয্যার পার্শ্বে পাষাণী বসিল। অনেক দিনের সুচিকিৎসায়, পাষাণীর অজস্র অক্লান্ত সেবা শুশ্রূষায় ধীরে ধীরে চৈতন্য-শূন্য রুগ্ন শশাঙ্কশেখরের চেতনা ফিরিল, স্বাস্থ্য ফিরিল। এবার তাহার সঙ্গে সঙ্গে আরও কি যেন একটা নূতন রকমের কিছু অন্তরের মধ্যে কোথা থেকে ফুটিয়া উঠিল! অস্পষ্ট স্বপ্নের নিবু নিবু স্মৃতির মত কুয়াশা-মাখা কুয়াশা-মাখা, ধুঁয়া-মাখা ধুঁয়া-মাখা, একটা কি যেন আসিল, প্রাণে তাহা যেন ভাল করিয়া ফুটিতে ফুটিতে আর ফুটিল না। যেন কি কথা কহিবে কহিবে বলিয়া আর কহিল না। যেন কি গান গাইতে গাইতে আর গাইল না। যেন শশাঙ্কশেখর কি খপর পাইতে পাইতে আর পাইল না। এবার আর শশাঙ্কশেখর দিদীর কাছে বিদায় নিয়ে সহজে দূরে যাইতে চাহিল না। ঘটনা বাধ্য করিল। সন্ন্যাসী শশাঙ্কশেখরের শরীর ভাল করিয়া সুস্থ হইবার পূর্ব্বেই তাহাকে নিয়ে তুলসী গ্রাম ছাড়িয়া চলিলেন। কুসুমে কীট ঢুকিল! প্রাণে আগুন লাগিল! এ সকল কথা পূর্ব্বেও বলিয়াছি।

যে আগুন নিকটে জ্বলি জ্বলি করিতে করিতে জ্বলিল না, দূরে তাহা জ্বলিল। জ্বলিয়া ধীরে ধীরে অল্প দিন পরেই প্রাণ মন ছাইয়া ফেলিল। যুবক এবার বুঝিলেন—স্পষ্টরূপে বুঝিলেন, প্রাণে আগুন লাগিয়াছে। যুবক এতকাল বুঝিয়াছিলেন—পাষাণীর সঙ্গে এক পাঠে, পড়িতে পড়িতে শিখিয়াছিলেন, ভালবাসার কেবল সাগরই আছে, আকাশই আছে। এ জগতে কেবল বুদ্ধ আছেন, চৈতন্য আছেন আর খ্রীষ্ট আছেন। শশাঙ্কশেখর গত আট বৎসরে, ধীরে, ধীরে, ধীরে বুঝিয়াছেন, এ পৃথিবীতে শকুন্তলা আর দুষ্মন্তও আছেন, দেস্‌দিমনা আর ওথেলও আছেন। এবার বুঝিয়াছেন, সাগরে ডুবিতে হয়, আকাশে উড়িতে হয়, আবার কূপেও নিমগ্ন হইতে হয়, পিঁজরায়ও বাঁধা পড়িতে হয়। অনাদি চাই, অনন্ত চাই, আদি এবং সীমাও চাই। অনেকও চাই; একও চাই, বড়ও চাই, ক্ষুদ্রও চাই। ক্ষুদ্রই প্রাণে বসিয়া জ্যোৎস্না

ঢালিয়া ঘুমের ঘোরে সুখের স্বপ্নে প্রথম বাঁশীর তান ধরে। প্রাণ জাগিলে, ক্ষুদ্রই ক্ষুদ্র হাতে হাত ধরিয়া বলে, "স্বর্গে চল"। ক্ষুদ্রই বড়র কাছে নেয়। পরিবারই জগতে নেয়। শশাঙ্কশেখরের মনের আগুন এতদূর জ্বলিয়াছে সন্ন্যাসী বা হরগোবিন্দ তাহা বুঝেন নাই, পাষাণীও জানে নাই। পাষাণী যেমন ছিল, তেমনই আছে। পাষাণীর প্রাণ অনেক উন্নত হইয়াছে, হৃদয় অনেক উঁচু হইয়াছে। কিন্তু প্রাণের শান্তি, হৃদয়ের ভালবাসা অটুট, অখণ্ড, দাগশূন্যই আছে। সে প্রাণ আজও শীতল।

দশম পরিচ্ছেদ।

সরল প্রাণে মেঘ সাজিল!

শশাঙ্কশেখরের চিন্তা আজ এক স্রোতে একদিকেই প্রবল বেগে ছুটিতেছে। সে চিন্তা, পাষাণীময়, পাষাণীর ভিতর বাহিরের রূপের জ্যোৎস্নাময়, পাষাণীর বুকভরা রাশি রাশি ভালবাসাময়। পাষাণী খাসিয়ার মঙ্গলামঙ্গল ভাবিতে ভাবিতে শশাঙ্কশেখরের রূপের জ্যোৎস্নায় জ্যোৎস্নাপ্রিয় পাখীটীর মত উড়িতেছিল। আবার ধীরে, ধীরে, ধীরে, উড়িয়া, উড়িয়া, উড়িয়া, খাসিয়ার ভাগ্যের আঁধারে পড়িয়া পথ হারাইল। পাষাণী ধীরে, ধীরে, ধীরে, ভাবিতে, ভাবিতে, ভাবিতে, ধীরে, ধীরে, ধীরে শশাঙ্কশেখরের সুন্দর চাঁদ মুখখানির উপর হইতে সেই ছল ছল, ঢল ঢল, চাহিনী ফিরাইয়া, ধীরে, ধীরে, ধীরে একটী দীর্ঘ নিঃশ্বাস ছাড়িয়া বলিল, "দাদা, মানুষের জন্য মানুষ ভাবিয়া কি করিতে পারে? ভগবান্ খাসিয়ার ভাগ্যে এবার কি ঘটাইবেন, কিছুই বুঝিতেছি না।"

পাষাণী ভাবিতেছিল, দাদাও বুঝি তাহারই মত অঙ্গুলির পর্ব্বে এক, দুই, তিন করিয়া, নীরবে, গম্ভীরভাবে খাসিয়ার ভাগ্যই ভাবিতেছেন। সুতরাং একবারে শশাঙ্কশেখরের চিন্তার ঘোর ভাঙ্গিল না দেখিয়াও পাষাণী আবার বলিল, "দাদা, আর ভাবিয়া কি হবে? তবে না ভাবিয়াও পারা যায় না সত্য। তুমি কি ঘরে যাও নাই? ক্লান্ত হ'য়ে এসেছ, চল এখন গিয়ে বিশ্রাম করা যাক্।"

পাষাণীর দ্বিতীয় বারের কথায় আত্মবিস্মৃত যুবকের আবার চমক ভাঙ্গিল।

শশাঙ্কশেখর এবারও মনে মনে লজ্জিত হইলেন, দুঃখিত হইলেন। এমন সময় মঙ্গলা আবার হুড়্ মুড়্ করিয়া নড়িয়া উঠিল। শশাঙ্কশেখর মঙ্গলার সাড়া উপলক্ষ করিয়া বলিলেন, "তুমি যে তোমার চুলও ছাড়াইতেছ না, মঙ্গলাকেও ছাড়াইতেছ না?"

পাষাণী।—"ও মা—, কি হবে গো! ও দাদা, আমি যে তোমার সঙ্গে কথা বলিতে বলিতে সব ভু'লে গিয়েছি। লক্ষ্মীটী, দাদাটী, ধনটী, মণিটী আমার, মঙ্গলার পা খানি ছাড়িয়ে দেও না সোণা দাদাটী?"

শশাঙ্কশেখর অনেক দিন হইতেই পাষাণীকে আর দিদী বলিয়া ডাকেন না। দিদীর বদলে এখন সন্ন্যাসিনী বলিয়া ডাকেন। শশাঙ্কশেখর এই পরিবর্ত্তন এমনই কৌশলক্রমে করিয়াছেন যে, পাষাণী বুঝিয়াছে দাদা শুধু আদর করিয়াই আমায় আর দিদী না বলিয়া সন্ন্যাসিনী বলিয়া ডাকেন। কিন্তু যে দিন কুসুমে কীট প্রবেশ করিয়াছে, সুধায় গরল মিশিয়াছে, সেই দিন হইতেই শশাঙ্কশেখর আপনাকে আর পাষাণীর প্রতি এই সরল প্রাণের বুকভরা, প্রাণ মাখা, মধু মাখা ডাক ব্যবহার করিবার অধিকারী মনে করিতেছিলেন না। তাই সুবিধা মত এই পরিবর্ত্তন করিয়া নিয়েছেন। সরলা পাষাণী, যে মুহূর্ত্তে শশাঙ্কশেখরের মধ্যে এত যুগ-প্রলয়, যুদ্ধ বিগ্রহ চলিতেছিল, সেই বর্ত্তমান মুহূর্ত্তেও আগে পিছে, প্রায় সওয়া ছ'বুড়ি "দাদা" ডাক না বসাইয়া, শশাঙ্কশেখরের সঙ্গে কথা বলিতে পারিতে ছিল না। পাষাণীর দাদা মনে কাদা নাই। শশাঙ্কশেখর পাষাণীর এত কাকুতি মিনতি শুনিয়া, একটু হাসিয়া বলিলেন, "কেন সন্ন্যাসিনি, আমি কি নূতন কুটুম্ব আসিলাম নাকি? এত কো'রে বলিতেছ কেন? মঙ্গলাকে আমিও ভাল বাসি।" এই বলিয়াই শশাঙ্কশেখর মঙ্গলার পা ছাড়াইতে চাপা গাছের ছায়ায় গিয়া দাড়াইলেন।

পাষাণী।—"ও দাদা—, চাঁপাফুলের গাছটীতে এই নূতন নূতন ফুল ফুটিয়াছে। দেখিও যেন একটীও শিকড় না ছিঁড়ে। ওটী এখনও কচি গাছটীই আছে। শিকড় ছিঁড়িলে মরিয়া যাবে।"

শশাঙ্কশেখর একটু উঁকি মারিয়া দেখিয়াই বলিলেন, "পা ছাড়াইতে গেলে কিন্তু শিকড় ছিঁড়িতে পারে। একজনে অন্ততঃ ছাড়ান যাইবে না।"

পাষাণী।—"ও দাদা, তবে এখন ছাড়াইয়া দরকার নাই। এ'স আগে

আমার চুলগুলি ছাড়াইয়া দেও। আমি একলা তাড়া তাড়ি ছাড়াইতে পারিতেছি না।"

শশাঙ্ক।—"চুল ছাড়াব?"

পাষাণী।—"ছাড়াও না? ছাড়াও।"

শশাঙ্কের পক্ষে এ কাজ সুখের হইলেও ইচ্ছার বিরুদ্ধ। শশাঙ্কশেখর অনেক দিন হইতেই মনে মনে বুঝিয়াছিলেন, "ও পবিত্র দেহ স্পর্শ করিতে আর আমার অধিকার নাই।" তবুও পাষাণীর সরলতা দেখিয়া এ অনুরোধ ছাড়াইতে পারিলেন না। পারিলেন না? তাহা নয়, অনুরোধ ছাড়ান যুক্তি যুক্ত এবং কর্ত্তব্য মনে করিলেন না। মনে মনে শশাঙ্কশেখর বুঝিলেন, "এ সরল অনুরোধ রক্ষা না করিলে, হয়ত এখনই পাষাণী অন্য কিছু বুঝিবে। এখানে শশাঙ্কের ভুল হইল। শশাঙ্কশেখর ধীরে ধীরে নীরবে পাষাণীর কাছে গিয়া ফুটন্ত যুঁইফুলভরা জ্যোৎস্না ধোয়া ফুলের ডালগুলি হইতে ধীরে ধীরে চুলের গুচ্ছ ছাড়াইতে লাগিলেন। সঙ্গে সঙ্গে পাষাণীও চুল ছাড়াইতে লাগিল আর বলিতে লাগিল, "দেখিও দাদা, দাদাটী, মণিটী, লক্ষ্মীটী দেখিও, ফুল যেন ছিঁড়ে না। ডালগুলি দে'খেছ, কেমন ফুলের ভারে নুয়ে আছে। একখানি ডালও যেন ভাঙ্গে না।" চুল ছাড়াইতে ছাড়াইতে পাষাণীর হাত শশাঙ্কের হাতে বারম্বার ঠেকিতে লাগিল। শশাঙ্কশেখর ইচ্ছা করিয়াই হাত দূরে সরাইয়া নিতে লাগিলেন। তবুও ঠেকিতে লাগিল। পাষাণীর হাত শশাঙ্কশেখরের হাতে ঠেকিতেছে,ইহাতে পাষাণীর ইচ্ছা অনিচ্ছার কোনই কাজ নাই। না থাকিলেও, এই ঘটনা শশাঙ্কের প্রাণকে ধীরে ধীরে দুর্ব্বলতাময় করিয়া, অবশ করিয়া, তাহার উপরে একরূপ কাজ করিতে লাগিল। এই স্নিগ্ধসময়ে সুশীতল প্রদেশেও শশাঙ্কশেখরের কপালে ধীরে ধীরে ক্রমে ক্রমে বিন্দু বিন্দু ঘর্ম্ম দেখা দিল। কেহ তখন তাঁহার বুকে হাত দিয়া পরীক্ষা করিলে জানিতে পারিত, সেখানেও একটা প্রবল ঝড় বহিতেছে। যেন হঠাৎ এক অপরিজ্ঞাত সুখে বিভোর হইয়া পরিব্রাজক ফুল ভরা ডাল হইতে ধীরে ধীরে সন্ন্যাসিনীর আলুলায়িত কেশগুচ্ছ ছাড়াইতে ছাড়াইতে মনে মনে অনুভব করিতে লাগিলেন, "যেন একটা ফুলের জগতে বাস করিতেছেন! যেন উপরে, নীচে, আসে পাশে, চারিদিকে কেবল ফুল! কোটী কোটী ফুল! শিশিরে ধোয়া,

সুধায় মাখা ফুল—রাশি রাশি ফুল! কেবল ফুলের গন্ধ ভুর ভুর করিতেছে! কেবল ফুলের শোভা উথলিতেছে! ভিতরে ফুল! বাহিরে ফুল! ফুলের অনন্ত রাজ্য! ফুল ভরা রাজ্যে, ফুলের ভিতরে ডুবিয়া, ফুলের পাখা তুলিয়া উড়িয়া উড়িয়া, ফুলে গড়া পরীগুলি ফুলের স্বপ্ন ছড়াইতেছে! ফুলে ফুলে লুকাইয়া যেন গাইতেছে, "কিসুখ উথলিল! কিসুধা ঝরিল, পরাণ ভাসিল রে! আনন্দে ডুবিল রে!" অজ্ঞাতসারে, সুখ-ভরে যুবকের চক্ষু দুইটী নিমীলিত হইতে ছিল। এমন সময় পাষাণী বলিল, "ও দাদা, তুমি যে মোটেই চুল ছাড়াইতে পারিতেছনা। দেখত, আমি দেখিতে দেখিতে কত চুল ছাড়াইয়াছি!"

শশাঙ্কশেখর পুনরায় আত্মবিস্মৃত—এবার যেন একবারে জ্ঞান-হারা। পাষাণীর কথার কোনই উত্তর না দিয়া, আবার কেবল পাষাণীর মুখের উপরে স্থির দৃষ্টি ফেলিয়া হত-চেতনের মত দাঁড়াইয়া রহিলেন। এবার শশাঙ্কশেখরের হাত দুইখানি ফুলের ডাল হইতে চুলের গুচ্ছটীর সহিত ধীরে, ধীরে, ধীরে শিথিল হইয়া পাষাণীর কাঁদের উপরে পড়িয়া গেল। চোক দিয়া ঝর ঝর করিয়া জল ঝরিতে লাগিল। পাষাণী এবার হঠাৎ শিহরিয়া উঠিল। বলিল, "এ কি কর দাদা! এ কি কর! কাঁদ কেন দাদা?"

পাষাণীর মুখ হইতে এই কথা কয়টী ফুটিতে না ফুটিতেই, শশাঙ্কশেখর স্বপ্নোত্থিতের মত পাষাণীর কাঁধ হইতে হাত তুলিয়া চকিতের ন্যায় তৎক্ষণাৎ দূরে সরিয়া দাঁড়াইলেন—চন্দ্রালোক সম্মুখীন করিয়া দাঁড়াইলেন। এবার শশাঙ্কশেখরের প্রাণে প্রবেশ করিতে পারিলে শুনিতে পাইতে, সেখানে কি ব্যাপার হইতেছে! যেন স্বর্গ, মর্ত্ত্য, পাতাল হইতে দেব, যক্ষ, রক্ষ, নাগ, গন্ধর্ব্ব, কিন্নর, নর, সকলেই সমকণ্ঠে বলিতেছে, "ধিক্! ধিক্! ধিক্! মানুষ কি এতই দুর্ব্বল! ধিক্! ধিক্! কি করিলি? কি করিলি? পর্ব্বতশৃঙ্গ হইতে ঐ অতল অন্ধকার পর্ব্বতের গুহায় পড়িয়া যাওয়াও যে, এর চেয়ে শতগুণে ভাল ছিল! ধিক্! ধিক্! ধিক্! ছি! কি করিলি? ছি! ছি! ছি! আর এ মুখ দেখা'স্‌নে!" পাষাণী দেখিল, শশাঙ্কশেখরের চন্দ্রালোক-উদ্ভাসিত মুখচন্দ্র চোখের দুইটী গলদ্ধারায় ভাসিয়া যাইতেছে। জলের ধারার উপরে চন্দ্রের কিরণ ভাঙ্গিয়া পড়িয়া প্রতিফলিত হইতেছে। তখন পাষাণীর মনে হইল, সেই পদ্মপলাশায়ত চক্ষু দুইটী হইতে চন্দ্র-বিম্ব-প্রতিফলিত ফোঁটা

ফোঁটা জল পড়িতেছে না, কিন্তু শত শত পূর্ণিমার চাঁদই ঝরিয়া ঝরিয়া পড়িতেছে! তখনও পাষাণী কিছুই বুঝিতে পারে নাই। কেবল সরলা পাষাণী তাড়া তাড়ি শুষ্কমুখে গৈরিক আঁচল খানি তুলিয়া, শশাঙ্কশেখরের সম্মুখে গিয়া বলিল, "দাদা, ছি—, কাঁদ কেন? তোমার আজ কি হয়েছে?" এই বলিয়া পাষাণী শশাঙ্কশেখরের চোক দুইটী মুছিয়া দিতে উদ্যত হইলে, শশাঙ্কশেখর এবার চমকিয়া হঠাৎ আরও দূরে সরিয়া দাঁড়াইলেন। পাষাণী দেখিল, শশাঙ্কশেখর তখনও নীরবে চোখের ধারায় বুক ভাসাইতেছেন। পাষাণী আরও কাছে সরিয়া আসিল—আঁচল খানি সেই রূপেই হাতে তুলিয়া চোখের জল মুছাইতে আসিল। শশাঙ্কশেখর আরও সরিয়া গেলেন। পাষাণী আবার সম্মুখে আসিল। শশাঙ্কশেখর আরও সরিয়া গেলেন। পাষাণী যতবার কাছে আসিতে লাগিল, শশাঙ্কশেখর তত বারই সরিয়া সরিয়া পিছে হটিতে লাগিলেন। এইরূপে পাষাণী ক্রমেই এগু'তে লাগিল, শশাঙ্কশেখরও ক্রমেই পিছে হটিতে লাগিলেন। ক্রমে যে পথে পাহাড়ে উঠিয়াছিলেন, শশাঙ্কশেখর পুনরায় সেই পথেই পিছে হটিয়া হটিয়া পাষাণীর দিকে মুখ করিয়া, ধীরে ধীরে নীচেরদিকে নামিতে লাগিলেন। পাষাণীও ফিরিল না, শশাঙ্কশেখরও আর দাঁড়াইলেন না। পাষাণী কেবল মধ্যে মধ্যে বলিতে লাগিল—মুখ খানি মলিন করিয়া, কাঁপিতে কাঁপিতে কাঁদ কাঁদ স্বরে বলিতে লাগিল, "দাদা, তোমার কি হয়েছে? এমন ধারা করিতেছ কেন? তোমার কি হয়েছে? আমার কোন দোষ দে'খেছকি? মাপ কর না দাদা? এবারটী মাপ কর। কি হয়েছে? কি হো'ল? হঠাৎ এ কি হো'ল? তোমার পায়ে পড়ি দাদা, দাঁড়াও! একবারটী দাঁড়াও!" পাষাণী দেখিতেছিল, যতই কথা বলিতেছে, শশাঙ্কশেখরের চোখে জলের ধারা ততই বেগে বহিতেছে। পাষাণী তখন একটু জোরে জোরে পা ফেলিয়া নীরবে কেবল সম্মুখের দিকেই এগু'তে লাগিল। শশাঙ্কশেখরও তখন বেগে সরিতে লাগিলেন। শেষটা অত্যন্ত উঁচু নীচু স্থান দেখিয়া, পাষাণীকে পিছে ফেলিয়াই তাড়া তাড়ি হাঁটিতে বাধ্য হইলেন। পাষাণীও ফিরিল না। কেবল দ্রুতপদে শশাঙ্কশেখরের পিছে পিছে চলিতে লাগিল। শশাঙ্কশেখর এবার চলিতে চলিতে এক এক বার মুখ ফিরাইয়া পাষাণীকে দেখিতে লাগিলেন। পাষাণী দেখিতেছিল, তখনও শশাঙ্কশেখরের

চোক হইতে দুইটী জলের ধারা বহিয়া পড়িতেছে, তাহার উপরে চন্দ্রের কিরণ ভাঙ্গিয়া পড়িয়া প্রতিফলিত হইতেছে। অবশেষে এ স্বপ্নও ভাঙ্গিয়া গেল। শশাঙ্কশেখর যাইতে যাইতে হঠাৎ পথের মধ্যে একটা জঙ্গলাকীর্ণ ছোট পাহাড়ের আড়ালে ঢাকা পড়িলেন। পাষাণী শশাঙ্কশেখরকে ধরিতে ধরিতে আর ধরিতে পারিল না! শেষটা পাষাণীও জঙ্গলের আড়ালে আসিল। এখানে আসিয়া দেখিল, অনেকগুলি পথ নানা দিক্ হইতে আসিয়া নানা দিকে চলিয়া গিয়াছে। কোনটা গুহার দিকে, কোনটা বা উঁচু পাহাড়ের উপরে গিয়াছে। শশাঙ্কশেখর এখানে আসিয়া কোন্ পথ ধরিয়া গেলেন, কিছুই আর ঠিক করিবার সুবিধা হইল না। পাষাণীকে এবার এখানেই দাঁড়াইতে বাধ্য হইতে হইল। কিন্তু পাষাণী আর দাঁড়াইতে পারিল না। সেই পথের মধ্যেই তাহার মাথা ঘুরিয়া গেল। এবার পাষাণী বসিল। কিন্তু এ কিরূপ একটা ব্যাপার হইল, তাহা অনেকক্ষণ ভাবিয়াও বুঝিতে পারিল না। পাষাণী প্রথমে কাঁদিলও না, কিছু বলিতেও পারিল না। শেষটা থাকিয়া থাকিয়া দুই হাতে চোক চাপিয়া ধরিয়া, জন্মদুঃখিনী বুক ভাসাইয়া কাঁদিয়া ফেলিল। সে কান্নার মৃদু শব্দে নিস্তব্ধ পাহাড়, পর্ব্বত, গুহা, বন, জঙ্গল, প্রতিধ্বনিত হইল। কেবল আকাশে বসিয়া নিস্তব্ধ চাঁদ, এদুঃখের—এদুর্ঘটনার সাক্ষী হইল!

পাষাণী যখন দুইটী চোক দুই হাতে ঢাকিয়া মনের আবেগে কাঁদিতেছিল, তখন হঠাৎ স্পষ্ট বোধ করিল, যেন কে তাহার গা ঘেসিয়া দাঁড়াইয়া, তাহার কাঁধের উপরে মুখ রাখিল। পাষাণী এবার শিহরিয়া তাড়া তাড়ি চোক্ মেলিল। দেখিল, পোড়ারমুখ মঙ্গলা। পাষাণী চোখের জলে ভাসিতে ভাসিতেই দেখিল, মঙ্গলার পায়ে চাঁপাগাছের একটী মাটী মাখান শিকড় এখনও জড়াইয়া রহিয়াছে। মঙ্গলা যে জোর করিয়া গাছের শিকড় ছিঁড়িয়া চলিয়া আসিয়াছে, ইহা তাহারই নিদর্শনমাত্র। পাষাণীর মাথার চুলের সঙ্গে শেষটা তাড়া তাড়ি বশত যে কয়টী যুঁইয়ের থোবা পাতার সহিত ছিঁড়িয়া আসিয়াছিল, মঙ্গলা কামড়াইয়া ধরিয়া তাহা টানিতে লাগিল। পাষাণী তখন জ্ঞানহারার মত সম্মুখ হইতে একখানি গাছের ডাল ভাঙ্গিয়া মঙ্গলার মুখের কাছে ধরিবামাত্রই মঙ্গলা তাহা নিরাপত্তিতে ভোজন করিতে প্রবৃত্ত হইল। যতক্ষণ মঙ্গলা পাতা খাইল, ততক্ষণ পাষাণী সেই নিস্তব্ধ পাহা-

ড়ের কোলে কেবল অন্যমনস্ক হইয়া সম্মুখের সেই সীমাশূন্য দূরত্বের দিকে একদৃষ্টে তাকাইয়া কাঁদিতে লাগিল। শেষটা মঙ্গল ধীরে ধীরে, একে একে, পাতা কয়টী নিঃশেষ করিলে, ডাল খানি দূরে ফেলিয়া দিয়া, মঙ্গলার গলায় আঁচল খানি জড়াইয়া ধীরে ধীরে উঠিয়া সন্ন্যাসিনী পুনরায় হরিণ-শিশুটী সহ কুটীরে ফিরিলেন। এদিকে সরস্বতী প্রথমটা কাজ কর্ম্মে ভুলিয়া গিয়াছিল যে, দিদীবাবু তাহাকে ডাকিয়াছেন। শেষে হঠাৎ মনে হওয়াতে সে দণ্ডীর পাহাড়ের প্রায় চারিদিকে "দিদী বাবু, দিদী বাবু" বলিয়া ডাকিয়া বেড়াইতেছিল। ডাকিয়া ডাকিয়া অবশেষে শুষ্ক-মুখে আবার কুটীরে ফিরিয়া আসিয়া দেখিল, দিদীবাবু কুটীরেই মাটীতে আঁচল পাতিয়া শুইয়া কাঁদিতেছেন। সরস্বতী তাড়া তাড়ি দিদীবাবুর কাছে গিয়া ডাকিল, "দিদীবাবু, দিদীবাবু।" দিদীবাবু আজ আর কান্না রাখিয়া একটীও কথা বলিলেন না। সরস্বতী আপনার বাচাল স্বভাবের চির অভ্যাস বশত দুই চারিটী হাসি-ঠাট্টার কথা বলিতেও ত্রুটি কবিলনা। কিন্তু পাষাণী আজ তাহাতে কেবল বিরক্ত হইয়া বলিল, "ওদিকে স'রে যাও।" সরস্বতী মনে করিল, দিদী বাবু এবার তাহারই উপরে রাগ করিয়া কাঁদিতেছেন। সুতরাং সেও ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিতে বসিল। আজ পাষাণী সরস্বতী উভয়ই সমান আঁধারে। পাষাণীর প্রাণ সত্য সত্যই ফাটিয়া যাইতেছিল!

একাদশ পরিচ্ছেদ।

ইংরেজ-শিবির।

আজ দণ্ডীর পাহাড়ের তিন ক্রোশ উত্তরে হটন সাহেবের ছাউনী পড়িয়াছে। অসভ্য খাসিয়াদের ছাউনী নাই। তাহারা তীর, ধনুক, দা আর কয়েকটী মাত্র বন্দুক ও বল্লম নিয়ে সর্ব্বোচ্চ দণ্ডীর পাহাড়ে সম্মিলিত হইয়াছে। সেখানে ছোট বড় রাশি রাশি পাথর সংগ্রহ করিয়া রাখিয়াছে। খাসিয়া স্ত্রী পুরুষ বালক বালিকা সকলেই আজ জন্মভূমির স্বাধীনতা রক্ষার জন্য হটন সাহেবের আক্রমণের অপেক্ষায় অনাবৃত স্থানে মিলিতেছে। আজ সমস্ত দিনে দূরদূরান্তরের পুঞ্জি সকল হইতে আসিয়া তিন চারি সহস্র খাসিয়া

একস্থানে মিলিত হইয়াছে। খাসিয়ার মুখে আজ গাম্ভীর্য্য, তেজ এবং উৎসাহ ভরা। আজ অসভ্য খাসিয়ার জীবন্ত ভাব দেখিয়া মরা মানুষেরও মনে আগুন জ্বলিয়া উঠিতেছে। সোবার পুঞ্জি প্রভৃতি অনেকগুলি দূরবর্ত্তী পৃথক পৃথক্ পুঞ্জিতেও হটনকে প্রতি যুদ্ধ দানের জন্য হাজার হাজার খাসিয়া নর নারী বদ্ধপরিকর হইয়াছে। বেলাশেষে সূর্য্য ধীরে ধীরে পাহাড় শ্রেণীর পশ্চাতে হেলিয়া পড়িয়াছে। আজ অল্পক্ষণমাত্র সামান্য অন্ধকারের পরেই নির্ম্মল আকাশে চন্দ্রোদয় হইবে। যেন স্বভাবের সরল শিশু চির স্বাধীন খাসিয়ার ভাগ্যে আজ যাহা ঘটিবে, তাহা ভাবিতে ভাবিতেই বহুলোকদর্শী সূর্য্য বিষাদান্ধকারে ডুবিতে উদ্যত হইয়াছে। সন্ধ্যার কিছু পূর্ব্বে একটী প্রতিভাশালী বাঙ্গালী যুবক হটন সাহেবের ছাউনীর প্রবেশদ্বারে আসিয়া, একজন প্রহরীর হাতে একখানি ক্ষুদ্র কাগজ দিয়া দাঁড়াইয়া অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। প্রহরী কিছুক্ষণ পরে ফিরিয়া আসিয়া যুবককে বলিল, "মেজর সাহেব আপনাকে তাঁহার তাঁবুতে যাইতে বলিয়াছেন।" যুবক, প্রহরীর কথা শেষ হইলে ছাউনীর মধ্যে প্রবেশ করিয়া বরাবর মেজর হটনের তাঁবুর সম্মুখে উপস্থিত হইলেন।

হটন সাহেব পরিণত-বয়স্ক বীরাকৃতি পুরুষ। চেহারা দেখিলেই বোধ হয় ইঁহার প্রকৃতির মধ্যে গাম্ভীর্য্য, বিচক্ষণতা এবং উদারভাব যথেষ্ট পরিমাণে আছে। জগতে ভাল মানুষের সাংসারিক উন্নতি প্রায়ই হয় না। হটনকেও যে, দপ্তরের এই অত্যাচারের ফলেই আজ সামান্য দেশীয় সিপাহী দলের অধিনায়ক হইয়া খাসিয়া পাহাড়ে আসিতে হইয়াছে, তদ্বিষয়ে অণুমাত্রও সন্দেহ নাই। হটন সাহেব বাঙ্গালী যুবককে তাঁবুর সম্মুখে উপস্থিত দেখিয়াই ভিতরে আসিয়া বসিতে অভ্যর্থনা করিলেন। যুবক যদিও সামান্য পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন দেশীয় পরিচ্ছদমাত্র পরিয়া আসিয়াছিলেন; তবুও পক্ককেশ হটন দেখিয়াই কেন যেন বুঝিলেন, ইনি কোন্ সমুচ্চ বংশের লোক এবং বিশেষ বিচক্ষণ ব্যক্তি হইবেন। হটন সাহেবের অভ্যর্থনার পরে যুবক আসন গ্রহণ করিয়া, হটনের জাতীয় ভাষাতেই, বলিলেন, "আপনার এই আশাতীত অনুগ্রহে আমি কৃতার্থ হইয়া আপনাকে শত শত ধন্যবাদ দিতেছি। এই সময়ে যে, কৃপা করিয়া আপনি আমাকে আপনার তাঁবুতে আসিয়া সাক্ষাৎ করিবার অধিকার দিবেন, ইহা আমি মুহূর্ত্তপূর্ব্বেও আশা করিতে পারি নাই।"

বৃদ্ধ মেজর হটন প্রথমাবধিই গাঢ় নিবিষ্টচিত্তে যুবকের চোক মুখের দিকে চাহিয়া কি যেন পাঠ করিতেছিলেন। হটন চিন্তা-বিশুষ্ক-মুখে যুবককে ধন্যবাদ ফিরাইয়া দিয়াই বলিলেন, "আপনার এই অচিন্তনীয়পূর্ব্ব আগমনের কারণ জানিতে আমার বড়ই কৌতূহল হইতেছে।"

যুবক প্রথম আলাপেই বুঝিলেন, হটন সাহেব কাণে কিছু কম শুনিতে পান। কিন্তু বড়ই ভদ্র প্রকৃতির লোক। বুদ্ধিমান যুবক, হটনের সঙ্গে প্রথমে কোন্ জাতীয় আলাপ আরম্ভ করিবেন, তাহাই ভাবিতেছিলেন। হটন আগমনের কারণ জিজ্ঞাসু হইলে, যুবক মনে মনে আনন্দিত হইয়া বিনীতভাবে উত্তর করিলেন, "আমার আগমনের কারণ অনেক। সুতরাং ক্রমে বলিতেছি। ভরসা করি, এজন্য ক্ষমা পাইবার অধিকারী হইব।" এইরূপ ভূমিকা করিয়াই, যুবক দুই চারিটী বাহিরের আলাপের পরে, প্রথমেই খাসিয়াদের প্রতিকূলে ও অনুকূলে অনেক কথা বলিলেন। এই উপলক্ষে রাজনীতি, সমাজনীতি ও ধর্ম্ম সম্বন্ধে অনেক কথাবার্ত্তা হইল। যুবক দেখিলেন, হটন সাহেব যেমন ভদ্র প্রকৃতির উদার-চরিত্র ব্যক্তি তেমনই বেশ লেখা পড়া জানা বিজ্ঞ লোক। যুবক হটনের সঙ্গে লিখা পড়া সম্বন্ধেও অনেক আলাপ করিলেন। সার্ ওয়াল্টার স্কট্, ডিকেন্স্, লিটন প্রভৃতি ইংলণ্ডীয় গ্রন্থকর্ত্তাদিগের কাব্য গ্রন্থের সহিত, যুবক ফরাসী দেশের কাব্যকারদিগের যে সকল উৎকৃষ্ট গ্রন্থ মূলভাষায় পড়িয়াছিলেন, তৎসমুদয়ের তুলনা করিয়া ফরাসীকাব্য বা নভেলেরই শ্রেষ্ঠতা দেখাই-লেন। মহাকবি সেক্স্পিয়ারকে অকুণ্ঠিত চিত্তে সকলের প্রধান আসন দিলেন। মহাকবি কালিদাসের শকুন্তলার কথাও হটনকে বুঝাইয়া বলিয়া, ইংরেজ মহাকবির কোন কোন নায়ক নায়িকার সঙ্গে কালিদাসের নায়ক নায়িকার তুলনা করিয়া দেখাইলেন। গেঁটে, ভিক্টর হুগ প্রভৃতি ইয়ুরোপের অন্যান্য প্রদেশের কবি এবং লেখকদিগের লেখার সম্বন্ধেও অনেক আলাপ করিলেন। ইংরেজ কবি মিল্টন, কাউপার, বায়রণ, সেলি, ওয়ার্ড্স্ ওয়ার্থ প্রভৃতির কবিত্বের কথাও হইল। বাঙ্গালী যুবক বিজ্ঞতার সহিত ওয়ার্ড্স্ওয়ার্থের উজ্জ্বল প্রতিভার পক্ষপাতী হইয়া তাঁহার কবিত্বের অনেক প্রশংসা করিলেন। প্রাচীন দার্শনিকদিগের কথার পরে বর্ত্তমান যুগের চিন্তাশীলজগতের পরিচালক ফরাসী পণ্ডিতশ্রেষ্ঠ অগষ্ট্-কোমত্, জনষ্টুয়ার্টমিল, স্পেন্সার, ডারুইন প্রভৃতির সম্বন্ধেও নানা

আলাপ হইল। অবশেষে যুবক ইচ্ছা করিয়াই প্রাচীন হিন্দু-দর্শন ও হিন্দু-ধর্ম্মের বিষয়ে আর্য্যদিগের গভীর সূক্ষ্ম গবেষণার কথা তুলিয়া বিবিধ রকমে আর্য্য-চিন্তার গাম্ভীর্য্য ও মহত্ত্ব হটনকে বুঝাইতে চেষ্টা করিলেন। সৈন্য-বিভাগের যেরূপ পদে হটন সাহেব অধিষ্ঠিত, তদ্রূপ পদস্থ লোকদের ত কথাই নাই, যুবক দেখিলেন, হটন সাহেব লিখা পড়ার পাণ্ডিত্যে এ দেশের অনেক বিজ্ঞ ইংরেজের চেয়েও বিচক্ষণ লোক। কিন্তু সংস্কৃতভাষা এবং হিন্দুজাতির পূর্ব্ব ইতিহাস সম্বন্ধে অত্যন্ত অনভিজ্ঞ। বিশেষত পাশ্চাত্য সভ্যতা-সুলভ স্থূল জগতের ভাব নিয়ে হটনের হৃদয়,মন, প্রাণ গঠিত বলিয়া, সে প্রাচীন আর্য্য-মহত্ত্বের কথা তাঁহার মাথায় কিছুতেই ঢুকিতেছিল না। যুবক তবুও হটনকে বুঝাইতে লাগিলেন,হিন্দুজাতি হৃদয় ও পরমার্থ চিন্তাতে জগতের সমস্ত জাতির উপরে। হটন খুব উদার হইলেও, আত্ম-গর্ব্ব-পরায়ণ জনবুলের সন্তান। সুতরাং তিনি ইংরেজ জাতির উপরে জগতের অপর কোন জাতিরই আসন প্রতিষ্ঠা করিতে রাজি হইলেন না। হটন পূর্ব্ব-ভারতের কথা ছাড়িয়া,বর্ত্তমান ভারতের কথা তুলিয়া বলিলেন, "আপনাদের পূর্ব্ব গর্ব্ব রাখিয়া বর্ত্তমান দেখুন্। আমার মতে এখন আপনারা একটা জাতির মধ্যেই গণ্য নন্।"

হটনের কথা শুনিয়া বাঙ্গালী যুবকের লাবণ্যময়, প্রতিভাবিস্ফারিত, শ্মশ্রু-মণ্ডিত, সুগৌর কান্তিযুক্ত, সুন্দর মুখের গোলাপি গোলাপি রঙ কিছু রক্তাভ হইল, চক্ষুতে এক রকম তেজ দেখা দিল, যুবক পূর্ব্বাপেক্ষা শতগুণে গম্ভীর হইয়া বলিলেন, "আমার বিশ্বাস, আজও হিন্দুজাতি ইংরেজ প্রভৃতি সভ্যতাভিমানী জাতির অপেক্ষা অনেক বিষয়ে উঁচু।"

হটন ধীরভাবে বলিলেন, "আমার ভ্রম থাকিতে পারে। কিন্তু আপনি আমাকে আপনাদের জাতির বর্ত্তমান শ্রেষ্ঠতা কিছু দেখাইতে পারিলে, আমি সুখী হইব। আমার বিশ্বাস, পারিবেন না।"

যুবক।—"ধর্ম্ম বিষয়ে হিন্দুজাতি শ্রেষ্ঠ। হিন্দুধর্ম্ম অতি শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম।"

হটন।—"আমার বিশ্বাস, যাঁহারা কাষ্ঠ, লোষ্ট্র, গাছপালা, মাটীর পুতুল পূজা করেন, তাঁহারা ধর্ম্মবিষয়ে শ্রেষ্ঠ হইতে পারেন না। অনন্ত, অপার, অনধিগম্য, আনন্দ পরিপূর্ণ আকাশের সৌন্দর্য্য না দেখিয়া, যাঁহারা চিরদিন আপনাদের খোদিত সামান্য কূপে অন্ধকারে বাস করেন, তাঁহাদের ধর্ম্ম একটী ধর্ম্ম হইতে পারে, তাহা কিন্তু মানুষকে মানুষ করিতে পারে না।"

যুবক।—"মানুষকে ঈশ্বরের পদে প্রতিষ্ঠা করাতেও ধর্ম্মের সে মহান্ ভাব রক্ষা পায় না। আর্য্যধর্ম্ম কাষ্ঠ লোষ্ট্র পূজার ধর্ম্ম নয়। যখন আপনাদের দেশের অস্তিত্ব ছিল না কিন্তু তখনও আর্য্যগণ ভগবান্‌কে অপার, অনধিগম্য, আনন্দময় জ্যোতিঃস্বরূপ জানিয়া তাঁহার ধ্যান করিতেন।"

হটন।—"পূর্ব্ব কালের কথা শুনিতে চাই না। এখন যাহা প্রত্যক্ষ করিতেছি, তাহাতে আমার বিশ্বাস, আপনাদের ধর্ম্মই আপনাদিগকে জাতিত্বহীন এবং চরিত্রহীন করিয়া ফেলিয়াছে। আপনাদের ধর্ম্মই বলিতেছে, "আমার ভাই আমার ভাই নয়।" সমস্ত মানুষকে ঘৃণা এবং অবহেলা করিয়া দূরে তাড়াইয়া দেওয়াই আপনাদের এখনকার ধর্ম্মের ধর্ম্ম। যে ধর্ম্ম বলে না, "মানুষ হইলেই সে মানুষের ভাই, মানুষকে ঘৃণা করাই মানুষের অধর্ম্ম," সে ধর্ম্ম একটী ধর্ম্ম হয় হউক্, তাহা কিন্তু মানুষের ইহ পরকালের কোনই কাজে আসে না।"

যুবক।—"আমাদের ধর্ম্ম নিষ্কাম ধর্ম্ম। বসুধৈব কুটুম্বকং ইহার মূলমন্ত্র।"

হটন।—"নিষ্কাম বা সকাম ধর্ম্ম বুঝি না। সরল পবিত্র প্রাণের ক্ষুধায় ভগবানের দ্বারে জোড় হাত করিয়া দাঁড়ানই ধর্ম্ম। ভগবানের সন্তানের সেবাই ভগবানের সেবা। তাঁহার সন্তানকে প্রীতি করিলেই তাঁহাকে প্রীতি করা হয়। তাঁহার সন্তানকে ঘৃণা বা অবহেলা করা এবং শত্রু মনে করাই অধর্ম্ম। আবার বলি, আপনাদের বর্ত্তমান ধর্ম্মই আপনাদিগকে জাতিত্বহীন এবং চরিত্রহীন করিয়াছে। বসুধার প্রতি ঘৃণা ইহার মূলমন্ত্র।"

হটন বর্ত্তমান হিন্দুজাতিকে জাতিত্বহীন এবং চরিত্রহীন বলাতে যুবক মনে মনে অত্যন্ত বিরক্ত হইলেন। তথাপি স্থির ভাবে বলিলেন, "আপনাদের দেশের নিম্ন শ্রেণীর লোক আর আমাদের দেশের নিম্নশ্রেণীর লোক, এই দুই শ্রেণীর তুলনা করিয়া আমাদিগকে চরিত্রহীন বলিলে ভাল হইত। অথবা ভারতে আপনাদের যে সকল ভ্রাতা শাসনবিভাগের কাজ কর্ম্মে নিযুক্ত আছেন কিম্বা ব্যবসায় বাণিজ্য করিতে আসিয়াছেন, তাঁহাদিগকেও ভুলিয়া এইরূপ একটা কথা বলা প্রশস্ত হয় নাই। আপনাদের সমাজের অনেক গুপ্ততত্ত্ব আপনাদের লিখিত পুস্তকেই পড়িয়াছি।"

হটন্।—"আমিও যেমন আপনাদের প্রাচীন ভারতের কিছু জানি

না, আপনিও দেখিতেছি, তেমনই বর্ত্তমান ইংরেজজাতির গূঢ় খপর কিছুই রাখেন না। আপনাদের দেশের নিম্ন শ্রেণীর লোকদের অপেক্ষা আমাদের দেশের নিম্ন শ্রেণীর লোকেরা ভাল নয়, এটী সত্য কথা। কিন্তু আপনাদের দেশের নিম্ন শ্রেণীর লোকেরা, আপনাদেরই উচ্চ শ্রেণীর অনেক-লোকের অপেক্ষা ভাল লোক। পরন্তু ইহাদের উন্নতির কোনই আশা নাই। ইহারা সাতিশয় কুসংস্কারাপন্ন এবং অজ্ঞানান্ধ। আপনাদের দেশের এখনকার ভাল যাহা তাহার শেষ এখানেই বলিলেও অন্যায় হয় না। এ দেশে যে সকল ভদ্র-বংশীয় ইংরেজ কাজ কর্ম্মের উপলক্ষে আছেন,তাঁহাদের অধিকাংশই ইংলণ্ডের ষষ্ঠ সপ্তম শ্রেণীর লোক। ইংলণ্ডের সমাজ এই সকল ভিত্তির উপরে স্থাপিত নয়। ইংরেজ জাতির ভিত্তিমূল অন্য উপাদানে গড়া। একদল সর্ব্বোচ্চ শ্রেণীর বিচক্ষণ, স্বাধীনচেতা, রাজনীতিজ্ঞ পণ্ডিত সেই ভিত্তির একটী উপাদান। অপর এক শ্রেণীর স্বাধীন-চিন্তাশীল উন্মুক্ত-স্বভাব পণ্ডিতগণ ভিত্তির দ্বিতীয় উপাদান। এই শ্রেণীর লোকেরাই বর্ত্তমান সভ্যজগতের চিন্তার নিয়ামক ও পরিচালক। স্বাধীন-জীবী, বিচক্ষণ পত্রিকা-সম্পাদকগণ ও অন্য এক শ্রেণীর লেখকগণ তৃতীয় উপকরণ। ধর্ম্ম-ভীরু, উদ্যমশীল ধর্ম্মযাজকগণ চতুর্থ উপাদান। সুশিক্ষিত স্বাধীন বাণিজ্য-ব্যবসায়ীগণ ও শিল্পীগণ পঞ্চম উপাদান। ইংলণ্ডের ধর্ম্মযাজক পৃথিবীর কোন্ দেশে না আছেন? কোন্ দেশের লোক তাঁহাদের দ্বারা কিছু না কিছু পরিমাণে উপকৃত নয়? ইংলণ্ডের জাহাজ, ইংলণ্ডের শিল্পদ্রব্য পৃথিবীর কোন্ স্থানে পৌছায় নাই? আরও আছে। ইংলণ্ডের প্রতি নর নারী স্বাধীনভাবে আপনার উন্নতি সাধন করিয়া একদিন না একদিন সমাজের ও জাতির সর্ব্বোচ্চ সুখ সম্পদ্ এবং সম্মান গৌরবের অধিকারী হইতে পারে। এইজন্য তাহারা সকলেই আপনার জাতিকে বুকের মাংস মনে করে। এই জন্য *হিন্দুজাতি বলিলে,যেমন কতকগুলি বিভিন্ন জাতির শব-সমষ্টি বুঝায়,* ইংরেজজাতি বলিলে, তদ্রূপ কিছুই বুঝায় না। "ইংরেজ" বলিলে, একটী অখণ্ড, জীবন্ত দেহের মত একটী মাত্র জীবন্ত জাতি বুঝায়। বাবু, বু'ঝেছেন, ইংরেজজাতিটা কি পদার্থ?'

যুবক, পক্ককেশ হটনের এই সকল স্পর্দ্ধার কথা শুনিয়া ও মুখের আরক্তিম ভাব দেখিয়া, স্তম্ভিত এবং অবাক্ হইলেন। কিন্তু গম্ভীরভাবে বলিলেন," আমাদের জাতিটাকে আপনি কি মনে করেন?"

হটন।—"বাবু, আপনাদের জাতি যে কাহাকে বলিব, তাহাই বুঝি নাই। আপনাকে দেখিতেছি বাঙ্গালী। আপনার জাতি কি শুধু বাঙ্গালী, না ভারতের সমগ্র হিন্দুজাতি, কিছুই বুঝি না। আবার সমস্ত বাঙ্গালীই আপনার স্বজাতি একথারই বা প্রমাণ কি? আপনি যে বর্ণের লোক, শুধু সেই বর্ণের বাঙ্গালীই প্রকৃত পক্ষে আপনার জাতি হইতে পারে। আপনাদের সমবর্ণে যে ভাব, সেই ভাবকেই শুধু স্বজাতিত্ব নাম দিলে দেওয়া যাইতে পারে। নতুবা আদান নাই, প্রদান নাই, একজন অপর একজনকে ছুঁইলে না নাহিয়া ঘরে যাইতে পারে না। এমন ভাবনিয়ে এই সকল বিভিন্ন বর্ণসমূহ একজাতি হইতে পারে না। আমার হিন্দুস্থানী সিপাহীগণ আমাকে আর আপনাকে বা আপনাদের বাঙ্গালীকে বড় বেশী তফাত মনে করে না। ইহারা আপনাদিগকে অন্তরের সহিত ঘৃণা করে।"

যুবক হটনের কথা শুনিয়া চমকিয়া উঠিলেন। যুবকের মুখের উপরে যেন একখানি মেঘ ভাঙ্গিয়া পড়িল। যুবক মুখ হেঁট করিয়া ভাবিতে ভাবিতে বলিলেন, "ইংরেজগভর্ণমেণ্ট কি এই সকল ভাবিয়া চিন্তিয়াই আমাদের চীৎকার শুনেন না?"

হটন।—"আপনাদের দেশে এখন প্রধানত দুই শ্রেণীর লোক। হিন্দু আর মুসলমান। মুসলমানদের জাতীয় ভাব কিছু আছে। কিন্তু তাহাদের আর কিছুই নাই। তাহাদের সঙ্গে কখনও আপনাদের মিল হইবার সম্ভাবনা নাই। হিন্দুর মধ্যে নিম্ন শ্রেণী, মধ্যম শ্রেণী আর উচ্চ শ্রেণী, এই তিন শ্রেণীর লোক আছে। নিম্ন শ্রেণীর কথা বলিয়াছি। উচ্চ শ্রেণীর জমিদার বা ধনীলোকেরা আপনাদের দেশের অপকারী এবং গভর্ণমেণ্টের তোষামোদ-প্রিয়। ইহারা গভর্ণমেণ্টকে কিছু বলিতে সাহস পায় না। বলার প্রয়োজনও বুঝে নাই। মধ্যম শ্রেণীর লোকেরা গভর্ণমেণ্টের এবং ইংরেজ বণিকদিগের নিম্ন শ্রেণীর কর্ম্মচারী মাত্র। ইহাঁরাই এখন আপনাদের দেশের মুখপাত্র। ইহাঁরাই আপনাদের জাতির সাহিত্য এবং সংবাদ-পত্র লেখক। এঁরাই আপনাদের রাজনৈতিক উন্নতির জন্য চীৎকার করিয়া থাকেন। আপনাদের দেশের ইংরেজি এবং বাঙ্গলা পত্রিকাগুলি ইংরেজদেরই এ দেশীয় ও বিলাতি পত্রিকা সকলের ছায়া মাত্র। এই শ্রেণীর লোকদের এবং পত্রিকার চীৎকার শুনিয়া গভর্ণমেণ্ট রাজ্য চালাইতে প্রস্তুত হইতে পারেন না। মনে করুন, আপনার বাড়ীর কয়েকজন অল্প বেতনের সামান্য বাজার-

সরকার,একটা সভা করিয়া,একটা পত্রিকা লিখিয়া,কি বলিতেছে, এই সকল লক্ষ্য করিয়া কি আপনার বিস্তীর্ণ সংসারের কাজ চালাইতে পারেন কিম্বা পারা উচিত, না, সম্ভবপর মনে করেন ? বাবু, আমি এইরূপ তুলনা করিলাম বলিয়া আপনার নিকট অবশ্যই ক্ষমা চাহিতেছি। আপনাদের মধ্যে যতদিন না কতকগুলি স্বাধীন-প্রকৃতির ধর্ম্মভীরু পণ্ডিত ও রাজনীতিজ্ঞ চরিত্রবান্ উদারচেতা সাধু পুরুষ জন্মিয়া, সকল স্বার্থ বিসর্জন দিয়া, দেশের সমস্ত লোকের স্বর এক করিতে পারিবেন, তত দিন ইংরেজেরা আপনাদিগকে সম্মান ও ভয় করিতে শিখিবেন না। এই ভয় এবং সম্মানার্হতা দ্বারা যে দিন আপনারা ইংরেজকে স্তম্ভিত করিতে পারিবেন, সেই দিন হইতেই ইংরেজগভর্ণমেণ্ট আপনাদের একটী কথাও অবহেলা করিয়া কোন কাজ করিতে সাহস পাইবেন না। এই জাতীয় উন্নতভাবের জন্য আপনারা ভগবান্‌কে ডাকুন্। কিন্তু আমরা বিশ্বাস করি না যে,এদিন আপনাদের শীঘ্র আসিবে। জাতিভেদাদি অনৈক্য আপনাদিগকে যত দিন ছিন্নভিন্নাবস্থায় রাখিবে, যতই অত্যাচার করিনা কেন, ততদিন আমাদের প্রভুত্ব এ দেশে অটল থাকিবে। এই জন্যই আপনাদের দেশের লোকের মধ্যে বিচ্ছিন্নতা বাড়াইয়া দিতে আমরা সর্ব্বপ্রযত্নে চেষ্টা করিয়া থাকি। স্থূল কথা,আমাদের সেবার জন্যই আপনাদের সৃষ্টি। বাবু, কথাগুলি কিছু কড়া হইল। ভরসা হয়, ক্ষমা করিবেন।”

যুবক দেখিলেন, হটনের জিভটী কাটিয়া না ফেলিলে, নিজের জাতির এত নিন্দার প্রতিশোধ হয়না। যুবক, হটনের কথা শুনিতে শুনিতে মনে করিতে ছিলেন, “এবার হটন চুপ করিলেই, কতক গুলি তীব্র তিরস্কার করিয়া, যে উদ্দেশ্যে আসিয়াছ তদ্রূপ কাজ করিব। কিন্তু পক্ককেশ হটন কথা শেষ করিয়াই আন্তরিক কাতর ভাবের সহিত ক্ষমা প্রার্থনা করাতে, যুবক মনের সে উত্তেজিত ভাব কিঞ্চিৎ দমন করিতে সমর্থ হই-লেন। যুবক মনে করিলেন, খেলা ঘরের ছেলেদের মত হটনের সঙ্গে “হিন্দু বড় কি ইংরেজ বড়” এই সকল কথা নিয়ে ঝগড়া করাতে কিছুই লাভ হইবে না। হটনের কথাগুলির মধ্যে যদি কোন সার থাকে, তবে তাহা সময়ান্তরে সুস্থচিত্তে চিন্তা করিয়া স্থির ভাবে গ্রহণ করাই উচিত হইবে। এই ভাবিয়া, যুবক, হটনের কথার কোন উত্তর না দিয়া, কেবল হটনকে বর্ত্তমান যুগের অন্ধকারগুলি অতি বিজ্ঞতা ও বিচক্ষণতার সহিত সাধারণ ভাবে

বুঝাইয়া দিয়া বলিলেন, "এই নাস্তিকতা ও রুধির-পিপাসাপূর্ণ ইয়ুরোপীয় সভ্যতার স্রোত পরিবর্ত্তিত না হইয়া, আর কিছুদিন এই ভাবে চলিলেই, জগতে পুনরায় ঘোর অন্ধকার যুগ আসিবে। যাহা এখন ভ্রান্ত মানুষদের কাছে সভ্যতা বলিয়া আদর পাইতেছে, তাহার মত অসভ্যতা দূর না হইলে এ পৃথিবীর মঙ্গল নাই। এখনকার ধর্ম্ম, নীতি ও সমাজ কিছুই মানুষকে মানুষের উপযুক্ত পদে নিয়ে যাইবার উপযোগী নয়। অসরলতা সঙ্কীর্ণতা, অসাধুতা, সাম্প্রদায়িকতা, স্বার্থপরতা, অপ্রেম, অসারতা এবং আত্মাভিমানই বর্ত্তমান শতাব্দীর আলোক। এই আলোকের চরম ফল "নিহিলিষ্ট" ও "সোসালিষ্ট"র স্বেচ্ছাচারিতার চেয়ে আর উন্নততর কিছু হইতে পারে না। বস্তুত এখন মানাভিমান ভুলিয়া পৃথিবীর সকল জাতি, সকল বর্ণ ও সকল সম্প্রদায়কেই একত্র গলবস্ত্র হইয়া, এই ঘোর মহাপ্রলয় হইতে ধরাধামকে রক্ষা করিতে ভগবানের দ্বারে কাতরে প্রার্থনা করা উচিত। আমি শুধু স্বজাত্যভিমান বশত বলিতেছি না, কিন্তু সত্যের অনুরোধে বলিতেছি, আমাদের জাতির অনেক অভাব আছে সত্য এবং তজ্জন্য দিন দিনই আমরা অধঃপাত হইতে অধঃপাতে যাইতেছি বটে, কিন্তু আপনাদের জাতি আমাদের উপরে যে ব্যবহার করিতেছে, তাহা কদাপি ধর্ম্মানুমোদিত হইতে পারে কি না, বিচার করিয়া দেখুন। ধর্ম্মের কথা কি বলিব? সামান্য দস্যুদলের বিচারেও ইহা অসঙ্গত। আমরা লাঠি মারিতে পারি না, এই জন্য আপনারা আমাদের প্রতি অমানুষোচিত অত্যাচার ও অসদ্ব্যবহার করিবেন, ইহা কি রকম ভদ্রতার কথা? ইহা দ্বারা কি আপনারা এ দেশের লোককে এই শিক্ষা দিতেছেন না যে, লাঠি ছাড়া আপনাদের অত্যাচার হইতে তাহাদের মুক্তিলাভের আর সম্ভাবনা নাই; কিন্তু যে শিক্ষা দিতেছেন, তাহার ফলভোগের জন্য শীঘ্রই আপনাদিগকে প্রস্তুত হইতে হইবে। কেবল দুঃখ এই, পবিত্র ভারতবক্ষ দুরপনেয় কলঙ্কে কলঙ্কিত হইবে——হইবে আপনাদের দোষে।" এই বলিয়াই যুবক গম্ভীর ভাবে হটনের দিকে চাহিলেন। হটন অতি গম্ভীর-চিত্তে যুবকের কথা শুনিতে শুনিতে যুবকের মুখের ভাব ভঙ্গিগুলি যেন নিবিষ্ট হইয়া পাঠ করিতেছিলেন। হটন দেখিলেন, এই বাঙ্গালী যুবক যেমন পণ্ডিত ও বিচক্ষণ, তেমনই তেজস্বী এবং ধর্ম্মভাবে পরিপূর্ণ। হটন এইভাবে কখনও কোন বঙ্গবাসীর সঙ্গে আলাপ করেন নাই। এই

জঙ্গলের মধ্যে বলিয়াই এই বাঙ্গালী যুবকের সঙ্গে কথাবার্ত্তা বলিতে ইচ্ছুক হইয়াছিলেন। নতুবা অন্যত্র হইলে শ্বেতাঙ্গ হইয়া, কৃষ্ণাঙ্গ বাঙ্গালীকে এই ভাবে গ্রহণ করিতে প্রস্তুত হইতেন কি না সন্দেহ। যুবকের সঙ্গে নানা আলাপে হটন সাহেব মনে মনে বুঝিলেন, "বাঙ্গালীর মধ্যেও আজ কাল দুই একটী মানুষ জন্মিতেছে।" হটনও, যুবকের কথা শেষ হইলে গম্ভীর-ভাবে রহিলেন। যুবকও আর কিছু বলিলেন না।

হটন সাহেব আর বাঙ্গালী যুবক উভয়ই অনেকক্ষণ নীরবে রহিলেন। যুবক, হটনের সঙ্গে অনবরত চেঁচিয়া চেঁচিয়া কথা বলাতে আপনাকে একটু ক্লান্ত বোধ করিয়াছিলেন। হটনও, যুবকের সঙ্গে আলাপে আলাপে অনেক-ক্ষণ কাটাইয়াছেন দেখিয়া আর আলাপ করিতে ইচ্ছুক হইলেন না। বাঙ্গালী যুবক সাহেবের অনিচ্ছা টের পাইয়া গম্ভীরভাবে বলিলেন, "মহাশয়,রক্ত-পাত বিনা কি এই খাসিয়াদের সঙ্গে মিটমাট হইতে পারে-না? আপনারা খ্রীষ্টান। এইমাত্র বলিলেন, "মানুষকে শত্রু ভাবাই পাপ।" জানিয়া শুনিয়া এ পাপ করিতে প্রবৃত্ত হইতেছেন কেন? "ডান গালে চড় মারিলে বাঁ গাল ফিরাইয়া দেওয়া" যাঁহাদের ধর্ম্মের আদেশ, তাঁহারা কি অসভ্য খাসিয়াকে ক্ষমা করিতে পারেন না? খাসিয়ারা যদি মাপ চায়, তবে কি আপনি ফিরিয়া যাইবেন?"

হটন যুবকের কথার কোনই উত্তর দিলেন না। কেবল পূর্ব্বের মতই নীরবে গম্ভীর ভাবে রহিলেন। যুবক দেখিলেন, হটন তাঁহার কথার প্রকৃত সদুত্তর কিছুই না দিতে পারিয়া, একটু অপ্রতিভ হইয়াই এবার গাম্ভীর্য্য অবলম্বন করিয়াছেন। যুবক, সাহেবের মনের অবস্থা টের পাইয়া বলিলেন, "যাহোক্, আর আপনার মূল্যবান্ সময় আমি অপব্যয় করিব না। আমি যে জন্য আপনার সঙ্গে দেখা করিতে আসিয়াছিলাম, তাহা আমার সম্পন্ন হইল। আমরা অনেক চেষ্টা করিয়াছি। তবুও খাসিয়ারা মাপ চাহিতে সম্মত হয় নাই। যদি আপনি মাপ করিতে সম্মত হইতেন, তবে সে কথা তাহাদিগকে বলিয়া আর একবার চেষ্টা করিতাম মাত্র। এখন আমার শেষ নিবেদন শুনুন্। আপনি লোক দ্বারা গত রাত্রিতে বিদ্রোহীদের উত্তেজনাদাতা চক্রান্তকারী বলিয়া যে দুইটী বঙ্গবাসী বৃদ্ধ সন্ন্যাসীকে খাসিয়া-পর্ব্বতের পথ হইতে ধরিয়া আনিয়া বন্দী করিয়াছেন, আমি তাঁহাদেরই একজন

সঙ্গীমাত্র। আপনার শিবিরেই উপস্থিত আছি। ইচ্ছা হইলে আমাকেও বন্দী করুন্।”

পক্ককেশ মেজর হটন্ এবার যুবকের কথায় অবাক ও বিস্ময়ান্বিত হইয়া কেবল তাঁহার সেই প্রিয়দর্শন, প্রতিভাশালী, বলিষ্ঠ-দেহ-বিশিষ্ট সাম্য মূর্ত্তির মস্তকের কেশাগ্র হইতে পায়ের অঙ্গুলি পর্য্যন্ত ধীর ভাবে নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। যুবক আবার বলিলেন, “আমার কথায় সন্দেহ করিবেন না। আমরা কেহই সন্ন্যাসী নই। এ রজকশূন্য প্রদেশে শীঘ্র শীঘ্র কাপড় ময়লা না হয়, এই জন্য সচরাচর কাপড়গুলি পাহাড়ের লাল মাটী দিয়া রঙ করিয়া নিয়ে থাকি। আবশ্যক হইলে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন পরিচ্ছদও পরিয়া থাকি। তবুও খাসিয়ারা আমাদিগকে সন্ন্যাসী বলে। যে দুইটী বৃদ্ধকে বন্দী করিয়াছেন, তাঁহাদের একজনকে দণ্ডী অপর একজনকে সন্ন্যাসী বলে। আমাকে পরিব্রাজক বলে।

হটন যুবকের শেষ কথাগুলি শুনিয়া, পূর্ব্বেরই মত গম্ভীরভাবে কেবল ইংরেজি ধরণে বিদায়-সূচক অভ্যর্থনা জানাইয়া, তাঁবু হইতে বাহির হইয়া আসিলেন। যুবকও তৎক্ষণাৎ হটনকে যথারীতি অভ্যর্থনা করিয়া, তাঁহারই সঙ্গে সঙ্গে তাঁবুর বাহির হইলেন। কিন্তু যুবকের মুখে যেন এবার একখানি বিষণ্ণতা-পূর্ণ চিন্তার মেঘের ছায়া ছড়াইয়া পড়িল। যেন কোন নিগূঢ় অভিসন্ধি সিদ্ধ হইল না বলিয়া যুবক বিষণ্ণ হইলেন। হটন এখন মনোযোগের সহিত যুবকের ভাব ভঙ্গি পরীক্ষা করিতেছিলেন। যুবক তাঁবুর বাহির হইয়া দুই চারি পা ফেলিবার পরেই হটন সাহেবের ইঙ্গিতক্রমে একজন সিপাহী যুবকের সম্মুখীন হইয়া বলিল, “আপনি কিছুক্ষণ অপেক্ষা করুন।”

আকাশ হইতে নির্ম্মল জ্যোৎস্নার ধারা ক্ষরিত হইয়া বিশ্বব্রহ্মাণ্ড ভাসাইতেছিল। যুবক উচ্চ পর্ব্বত-বক্ষে ইংরেজ ছাউনীর মধ্যস্থলে নির্ভয়ে—পূর্ব্বাপেক্ষা ঈষৎ প্রসন্ন চিত্তে সেই জ্যোৎস্নার আলোকে দাঁড়াইয়া অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। মেজর হটনের প্রেরিত সৈনিক বেশ-ধারী সিপাহী আপনার কোষ হইতে কিরিচ্ নামক তীক্ষ্ণধার তরবারি নিষ্কোষিত করিয়া যুবকের সম্মুখে দাঁড়াইয়া রহিল। তলোয়ারে চন্দ্রের রশ্মি পড়িয়া প্রতিফলিত হইতে লাগিল। সিপাহীও হটনের মত বৃদ্ধ এবং পক্কশ্মশ্রুসমন্বিত। সিপাহী সৈন্যদলের একজন হাওয়ালদার। যখন

হাওয়ালদার সিপাহী নির্ভীক এবং ঈষৎ প্রসন্ন-চিত্ত বাঙ্গালী যুবকের সম্মুখভাগ আগুলিয়া দাঁড়াইল, তখনই আর একজন সৈনিক পুরুষ হটনের ইঙ্গিতানুসারেই অন্যদিকে ছুটিয়া গিয়াছিল। সে কিছুক্ষণ পরেই দুই জন পক্কশ্মশ্রুধারী বন্দীকে দুই চারি কথায় সংক্ষেপে যুবকের পরিচয়াদি জিজ্ঞাসা করিয়া আবার দ্রুতপদে ফিরিয়া আসিল। সৈনিক ফিরিয়া আসিয়া হাওয়ালদারকে কি যেন কাণে কাণে বলিয়া চলিয়া গেল। তখন হাওয়ালদার, বাঙ্গালী যুবকের দিকে চাহিয়া হিন্দী ভাষায় বলিল, "তুমি এখন গভর্ণমেণ্ট বাহাদুরের কয়েদী"। এই বলিয়াই হাওয়ালদার সিপাহী যুবকের হাত ধরিয়া ফেলিল। যুবক দেখিলেন, ইচ্ছা করিলে, হাওয়ালদার সাহেবকে একটী ধাক্কা দিয়া পাঁচ হাত দূরে ফেলিয়া দিতে পারেন। কিন্তু তাহা না করিয়া, কেবল হাসিয়া বলিলেন, "ভয় নাই, পালাব না।" হাওয়ালদার যুবকের কথায় উল্লাসিত হইয়া বলিল, "তেরা ডর্‌সেই গভ্‌লন্‌মেণ্ট বাহাদুর মর্ যাতা।" এই বলিয়াই ইঙ্গিত করিবামাত্র অপর দুই জন সিপাহী আসিয়া বাঙ্গালী-যুবকের হাতে লৌহময় হাতকড়ি পরাইতে লাগিল। হাতকড়ি পরান হইলে, যুবক প্রসন্ন-চিত্তে, ঈষৎ হাস্য-বিকসিত-মুখে সিপাহীদিগের সঙ্গে সঙ্গে তাহাদেরই কথিত স্থানের দিকে চলিলেন। হটন সাহেব হাওয়াল-দারকে কেবল ডাকিয়া সাহেবি হিন্দীতে বলিলেন, "ইস্‌কো উপর বহুট্ নেগাঁও রাখ্‌না চাহি।" এই বলিয়াই হটন গম্ভীরভাবে প্রস্থান করিলেন।

এই ঘটনার অর্দ্ধ ঘণ্টা পরেই হঠাৎ "বিউগল্" নামক রণ-ভেরীর উন্মাদ-কর ঘন ঘন শব্দে দশদিক্ ভাসিয়া যাইতে লাগিল। মুহূর্ত্ত-মধ্যে সুশিক্ষিত সিপাহীগণ যুদ্ধ-সাজে সাজিয়া সারি সারি হইয়া দাঁড়াইল। চারিদিকে তাঁবুর খুঁটায় ঘন ঘন আঘাত পড়িতে লাগিল। মুহূর্ত্ত পরেই যেস্থানে ইংরেজ সৈন্যের ছাউনী ছিল, সেস্থান খালি হইয়া, পুনরায় বিজন পার্ব্বত্য গাম্ভীর্য্য ও স্তব্ধতায় পূর্ণ হইয়া উঠিল—যেন নিদ্রিত জ্যোৎস্নার কোলে ঘুমাইয়া পড়িল!

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ।

ভালবাসার অদ্ভুত প্রতিদান।

বৃদ্ধ সন্ন্যাসী এবং দণ্ডী ইংরেজ-হস্তে বন্দী হইয়াছেন, একথা আজ সকাল বেলা হইতেই চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িয়াছে। মেজর হটন সিপাহী নিয়ে দণ্ডীর পাহাড়াঞ্চলে আসিয়াছেন, ইহাও খাসিয়ারা জানিয়াছে। সন্ধ্যার পরে একজন খাসিয়া আসিয়া খপর দিয়াছে, "এখনই পরিব্রাজক নিজেই হটনের তাঁবুতে গিয়া ধরা দিয়াছেন। হটন সাহেব সৈন্য নিয়ে দণ্ডীর পাহাড়ের দিকে আসিতেছেন।" এই সংবাদ পাইয়া অবধি খাসিয়ারা সতর্ক হইয়া চারিদিকে পাহারা দিতেছিল। গভীর রাত্রিতে সিপাহীগণ নীরবে চুপি চুপি পাহাড়ের নীচে আসিবামাত্রই, খাসিয়াগণ উপর হইতে বড় বড় পাথর সকল গড়াইয়া দিতে লাগিল। সিপাহীরা পাথর চাপা পড়িবার ভয়ে অবশেষে অগত্যা হটিয়া গিয়া দণ্ডীর পাহাড়ের সংলগ্ন একটী গিরিশৃঙ্গ অধিকার করিয়া তাহারই উপরে উঠিয়াছে। এখানেও খাসিয়ারা পাথর জমা করিয়া রাখিয়াছিল। কিন্তু খাসিয়ার সংখ্যা কম হওয়াতে, সিপাহীরা তাহাদিগকে হটাইয়া দিতে সমর্থ হইয়াছে। অল্প সংখ্যকমাত্র সিপাহী মারা পড়িয়াছে। কিন্তু খাসিয়া বহু সংখ্যক মরিয়াছে।

সিপাহীরা যে পাহাড় অধিকার করিয়াছে, তাহা দণ্ডীর পাহাড়ের অপেক্ষা কিছু কম উচ্চ হইলেও, সিপাহীগণ নূতন অধিকৃত পাহাড়ে উঠিয়াই, দণ্ডীর পাহাড়ের উপরে ঝাঁকে ঝাঁকে বন্দুকের গুলি, কামানের জ্বলন্ত গোলা বর্ষণ করিতেছিল। এখন রাত্রি দ্বিপ্রহরেরও বেশী। কৃষ্ণপক্ষের প্রতিপদের দিগন্তব্যাপী জ্যোৎস্না ধূমের অন্ধকারে ঢাকা পড়িয়াছে। সেই অন্ধকারের মধ্য হইতে ঘন ঘন বজ্রশব্দে চারিদিকের পর্ব্বতশ্রেণী কাঁপাইয়া, দশদিক্ আলোড়িত করিয়া, প্রভাত কালের সূর্য্যের মত কামানের জ্বলন্ত গোলা, বন্দুকের গুলি সকল ঝাঁকে ঝাঁকে ছুটিয়া আসিয়া দণ্ডীর পাহাড়ের পাথর সকল স্থানভ্রষ্ট করিয়া ভাঙ্গিয়া ফেলিতেছে। সিপাহী-অধিকৃত সেই অন্ধকার পর্ব্বত-শৃঙ্গের উপরে পক্ব-কেশ বৃদ্ধ হটন যুবকের উৎসাহ উদ্যমকে লজ্জা দিয়া, অশ্বপৃষ্ঠে চড়িয়া,

যেন একই মুহূর্ত্তে সমস্ত সৈন্যগণকে উত্তেজিত করিয়া তুলিতেছেন। সৈন্যগণ মধ্যে মধ্যে "হীপ্—হীপ্—হুর্রে—! হীপ্—হীপ্—হুর্রে—!" শব্দে চারিদিক্ কাঁপাইয়া তুলিতেছে। তাহাতে "গুড়ুম্গুম্—" কামানের বজ্রশব্দ, বহুসংখ্যক বন্দুকের শব্দ মিশিয়া, ভীষণতার উপরে যেন আরও ভীষণতা ঢালিয়া দিতেছে। আবার তাহার সহিত প্রলয় কালের মেঘ-গর্জ্জনের মত ইংরেজ-রণবাদ্যের সঙ্গে সঙ্গে মধ্যে মধ্যে "বিউগল্"এর উন্মাদকর শব্দে দূর-দূরান্তর ভাসিয়া যাইতেছে। সংগ্রামোন্মত্ত খাসিয়া নর নারীর মন বিপক্ষের সেই রণবাদ্যের তালে তালে এক একবার নাচিয়া উঠিতেছে। কিন্তু তথাপি আজ তাহাদের কেহই একটীও তীর ধনুকে যোজনা করিয়া বিপক্ষের দিকে ছুড়িতেছে না। বীর-প্রকৃতি, সরল-প্রাণ, কৃতজ্ঞ খাসিয়ারা আজ সন্ন্যাসিপরিবারের এত দিনের উপকার স্মরণ করিয়া সন্ন্যাসিনীমার অনুরোধে জন্মভূমির স্বাধীনতার যুদ্ধে নীরবে এক স্থানেই দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া প্রাণ দিতেছে। কাহারও মুখে কথা নাই। সকলেই যেন নিঃশ্বাস বন্ধ করিয়া নিঃশব্দে সন্ন্যাসিনীমার অপেক্ষা করিতেছে। সন্ন্যাসিনীমা খাসিয়ার চক্ষুতে মহাদেবী, সন্ন্যাসিনীমার মত খাসিয়ারা কাহাকেও ভক্তি করিতে জানে না, খাসিয়াগণ আজ এই চরম দুর্দ্দিনেও এই কথার পরিচয় দিতে কুণ্ঠিত নয়। খাসিয়ার উপকার যে করে, খাসিয়ার মঙ্গলের জন্য যে ভাবে, সরল-প্রাণ খাসিয়ারা তাহার অনুরোধে প্রাণ দিতেও অপ্রস্তুত নয়। সুসভ্যতার অভিমানে স্ফীত মনুষ্য জাতির অপেক্ষা অরণ্যচারী প্রকৃতির সরল শিশু অসভ্য লোকেরা উপকারীকে প্রত্যুপকার ও কৃতজ্ঞতা দিতে কখনই হীন নয়, এ পৃথিবীতে ইহার প্রমাণ অনেক আছে।

যুদ্ধ-সময়ে অসভ্য খাসিয়ার সেনাপতি বা অধিনায়কের দরকার হয় না। জন্মভূমির জন্য পাঁচ বৎসরের খাসিয়া বালক বালিকাও অকুণ্ঠিত-চিত্তে প্রাণ দিতে প্রস্তুত। এজন্য উত্তেজনা করিতে হয় না, বেতন দিতে হয় না, সৈনিক নিয়মে কাহাকেও শাসন করিতে হয় না। প্রত্যেক খাসিয়াই স্বতঃ প্রবৃত্ত হইয়া প্রাণ দিয়া যুদ্ধ করে। খাসিয়ার উৎকৃষ্ট রণবাদ্য নাই। খাসিয়ার "বিউগল্" বা রণভেরীও নাই। খাসিয়ার রণবাদ্য, রণ-ভেরী সেই সরল-প্রাণ, আগ্রহপূর্ণ, ভাবপূর্ণ হৃদয়। স্বয়ং "ওব্লাই" অনাদি অনন্ত জ্যোতির্ম্ময় সিংহাসনে বসিয়া তাহা বাজাইতে থাকেন। "ওব্লাই"ই খাসিয়ার পরিচালক—খাসিয়ার সেনাপতি। খাসিয়ারা যুদ্ধে

জিতিলে অন্ধকার প্রাণের সংস্কারানুসারে মনে করে, "ওব্‌লাই" তাঁহার প্রিয়তম খাসিয়া জাতির উপরে প্রসন্ন হইয়াছেন। হারিলে মনে করে, "ওব্‌লাই" খাসিয়া-জাতির অজ্ঞাত দোষে খাসিয়াদের প্রতি কোপাবিষ্ট হইয়াই এই যুদ্ধে হারাইলেন। তখন খাসিয়াগণ জঙ্গল হইতে জঙ্গলান্তরে গিয়া পুনরায় "ওব্‌লাই"য়েরই প্রসন্নতা লাভের জন্য যত্ন করে। খাসিয়ারা কাহারও সম্পূর্ণ বাধ্য হয় না। খাসিয়ার জাতীয় রাজা নামমাত্র রাজা। খাসিয়ার যুদ্ধক্ষেত্রের পরিচালক বা সেনাপতিও নামমাত্র সেনাপতি। খাসিয়া সরদার বা প্রধানেরাই এই নামমাত্র সেনাপতির কাজ করেন। খাসিয়ারা নিজেদের ইচ্ছানুসারেই তাঁহাদের কথা শুনিয়া পরিচালিত হয়। আজ খাসিয়া-প্রধান মতি রায় এবং জীবন রায় খাসিয়াদের এই নামমাত্র সেনাপতি ও পরিচালক হইয়াছেন। খাসিয়া প্রকৃতিতে সরল শিশু। বাঙ্গালীর সুশিক্ষিত সরলা মেয়ে পাষাণী আপনার সুকোমল স্নেহ-মমতা ভরা পবিত্র হৃদয়ের আধিপত্যে সরল শিশু খাসিয়ার মা হইয়াছেন। খাসিয়ার সংসর্গে বাঙ্গালীর মেয়ের হৃদয়ের পূর্ণ বিকাশ হইয়াছে—জগতে অতুলনীয়া, সাধ্বী, সরলা হিন্দু-রমণীর স্বর্গীয় মাহাত্ম্য ফুটিয়াছে। হিন্দু আজও হিন্দু, রমণী-মাহাত্ম্যে। হিন্দুর আর কিছুই নাই। এখনও হিন্দুর ভাঙ্গা ঘরে অরুন্ধতী, গার্গী, সীতা, সাবিত্রী ও দময়ন্তীর ঘোর অন্ধকারাবৃত ছায়া পড়িয়া আছে। যদি হিন্দু কোন দিন পুনরায় প্রকৃত হিন্দু হয়, কেবল এই ছায়াকে আদর এবং যত্ন করিয়া স্বর্গের আলোকে আলোকিত করিতে জানিলেই হইবে। মা নাই সন্তান আছে, এওকি কখনও সম্ভবপর হইতে পারে? এস ভাই, আমরা মাকে পূজা করিতে শিখি।

মতিরায় আর জীবনরায় চীৎকার করিয়া খাসিয়া-কথায় উপস্থিত খাসিয়াদিগকে সন্ন্যাসিনী মার অনুরোধ জানাইয়া বলিয়াছেন, "সন্ন্যাসিনী মা তোমাদিগকে তাঁহার একটী অনুরোধ জানাইতে বলিয়াছেন। তোমরা স্থির হইয়া শুন। তিনি বলিয়াছেন, "সন্ন্যাসী, দণ্ডী এবং পরিব্রাজক, বিনা রক্তপাতে যাহাতে খাসিয়ার সম্মান বজায় থাকিয়া ইংরেজগভর্ণমেণ্টের সঙ্গে এই বিবাদ মিটিয়া যায়, তাহার জন্য খাসিয়াদিগকে আপনাদের প্রকৃত দোষ স্বীকার করিয়া ইংরেজের নিকট মাপ চাহিতে বলিয়াছিলেন এবং সোবারপুঞ্জি ও বুড়ীর হাটের অপরাধী খাসিয়াদিগকে উপযুক্ত শাস্তি দিয়া ইংরেজদিগকে জানাইতে বলিয়াছিলেন। তোমরা তাহাতে এতদিন

কিছুতেই সম্মত হওনাই। এখন শুনিয়াছ,তোমাদের মঙ্গল সাধন করিতে গিয়া, সন্ন্যাসী, দণ্ডী এবং পরিব্রাজক ইংরেজ-হস্তে বন্দী হইয়াছেন। তোমরা এই সংবাদ শুনিয়া যেরূপ প্রাণের গভীর ব্যথায় ব্যথিত হইয়াছ, তাহাতেই তোমাদের আন্তরিক কৃতজ্ঞতার প্রচুর প্রমাণ পাওয়াগিয়াছে। যাঁহারা তোমাদের মঙ্গলের জন্য বন্দী হইয়াছেন, তাঁহারা তোমাদের নিকট কিছুই চাহেন না। তোমরা নিজেদের সরল প্রাণের পরিচয় দিয়া নিজেরাই ধন্য হইয়াছ। আর এই দুর্ঘটনার পর হইতে এত সমরপ্রিয় জাতি হইয়াও যে, তোমরা সমস্ত উপস্থিত খাসিয়া নর নারী ইংরেজের কাছে প্রকৃত দোষের জন্য মাপ চাহিয়া, সন্ন্যাসী, দণ্ডী এবং পরিব্রাজকের উদ্ধারের উপায় করিতে সম্মত হইয়াছ এবং স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়াই আজ সন্ধ্যার পরে আমাকে তোমাদের মনের ভাব তোমাদের প্রধান দুই ব্যক্তি দ্বারা জানাইয়াছ, তাহাতে আমার আত্মীয়দের বিপদ্‌ঘটিত সমস্ত দুঃখ যন্ত্রনা ভুলিয়াগিয়াছি। এখন আমার আর একটী শেষ কর্ত্তব্য আছে। তোমাদিগকে এই ঘোরতর বিপদের সময়ে তাহা খুলিয়া বলিব না। ফল মুহূর্ত্ত পরেই জানিতে পারিবে। এখন বিপক্ষেরা হটিয়া অন্যত্র গিয়াছে। যদিও আবার মুহূর্ত্ত পরেই তাহারা আসিতে পারে এবং তাহাই তাহাদের অদ্যকার যুদ্ধের লক্ষ্য, তথাপি চারিদিকে উপযুক্ত সংখ্যক লোককে পাথর গড়াইয়া ফেলিবার ও পাহারা দিবার ভার দিয়া অবশিষ্ট সকলে একস্থানে মিলিত হইয়া তোমাদের রক্ষক "ওব্‌লাই"কে ডাক। তিনি প্রসন্ন হইলে, এখনই তোমাদের সমস্ত বিপদ কাটিয়া যাইবে। তোমরা এখন বিপক্ষকে একটীও তীর ছুঁড়িতে পারিবে না। তোমাদের নিকট এই আমার কাতর ও শেষ প্রার্থনা। সকলে একবার "ওব্‌লাই"য়ের নাম করিয়া উচ্চস্বরে জয়ধ্বনি কর।" এইরূপ ঘোষণা করিয়া, মতি রায় এবং জীবন রায় নীরব হইবামাত্রই, উপস্থিত তিন চারি হাজার সশস্ত্র খাসিয়া নর নারী চীৎকার রবে আকাশ পাতাল কাঁপাইয়া "ওব্‌লাই"য়ের নামোচ্চারণপূর্ব্বক জয়ধ্বনি করিয়া স্থিরভাবে দাঁড়াইল। দূর হইতে তখনও মধ্যে মধ্যে হঠাৎ সিপাহীদের দুই একটা বন্দুকের গুলি আসিয়া এই নিস্পন্দ, স্থির-সমুদ্রতরঙ্গবৎ তিন চারি হাজার খাসিয়ার ভিড়ের মধ্যে পড়িতেছিল এবং প্রতিবারেই দুই একজন করিয়া আহত বা মৃত হইয়া পাথরের উপরে পড়িয়া যাইতেছিল। আর পশ্চাতে অনবরত সেই

"গুড়ুম্ গুম্—" কামানের বজ্রশব্দ, বন্দুকের শব্দ, ইংরেজের রণবাদ্য, রণ-ভেরীর উন্মাদকর রব, রণোন্মত্ত সিপাহীদিগের সেই "হীপ্—হীপ্ হুর্‌রে—" শব্দ এক সঙ্গে মিশিয়া, যেন সেই আঁধারভরা আকাশ ভাঙ্গিয়া চুরিয়া প্রলয়কালের ভীষণ ভাব ছড়াইতেছিল। ভাবোন্মত্ত রণবেশধারী খাসিয়ার মুখে তবুও শব্দ নাই। মধ্যে মধ্যে মশালের পরিবর্ত্তে ঝাউ-জাতীয় সরল কাষ্ঠের জ্বলন্ত ডাল সকল তুলিয়া ধরাতে, চারিদিকের ধূমান্ধকারের মধ্যে সেই গম্ভীর মুখগুলির উপরে কেবল সামান্য মাত্র আলো ছড়াইয়া পড়িয়া কাঁপিতেছিল।

অতঃপর কি ঘটনা ঘটিবে, এই তিন চারি হাজার, বন্দুক, বল্লম এবং তীর ধনুকধারী, যুদ্ধার্থ প্রস্তুত, সরল শিশুর মত সরল-প্রাণ, ভাবোন্মত্ত, নির্ব্বাক খাসিয়া নর নারী বা খাসিয়া-প্রধান ক্ষিতি রায় এবং জীবন রায় ভুলক্রমেও তাহা বুঝিতে পারিতেছিলেন না। কিন্তু এই ঘোর বিপদের দিনে হঠাৎ খাসিয়া-জাতির রক্ষাকর্ত্তা "ওব্‌লাই"য়ের নামের সেই ব্যাকুলতাপূর্ণ উচ্চ জয়ধ্বনি উঠিয়া দূর দূরান্তরের সহস্র সহস্র পর্ব্বতশৃঙ্গে প্রতিহত হইয়া সহস্র সহস্র প্রতিধ্বনি তুলিয়া যেন খাসিয়াগণকে এক-বারে মন্ত্রমুগ্ধ করিয়া ফেলিল। বিপক্ষের সেই ঘোর যুদ্ধোদ্যমের প্রলয়-কালের ভীষণ শব্দ, ভীষণ ভাবও যেন সেই জয়ধ্বনিতে মিশিয়া গিয়া ক্ষণ-কালের জন্য খাসিয়ার কর্ণকে মহান্ "ওব্‌লাই"য়ের জয় ঘোষণায় পরিপূর্ণ করিল। এমন সময় একি হইল? সন্ন্যাসিনীমা সহসা আসিয়া ভাবে বিভোর হইয়া, ধূমান্ধকার-মধ্যে সেই অস্পষ্ট আলোকে যেন উপস্থিত সমস্ত খাসিয়া-নরনারীর সকলগুলি মুখ একবারে, একসঙ্গে দেখিবার জন্যই একখানি অপেক্ষাকৃত উচ্চ পাথরের উপরে উঠিয়া স্থিরভাবে দাঁড়াইলেন। সেই তিন চারি হাজার নর নারী সকলেই এক সঙ্গে দেখিল, সেই গৈরিক-বাসাচ্ছাদিত, অলঙ্কার-শূন্য, নিরাড়ম্বর, লাবণ্য-প্রতিমাখানির পশ্চাৎভাগ গভীর মেঘান্ধকার-রাশিতে ঢাকিয়া বিপুল কেশভার দুই কাঁধ আচ্ছাদন করিয়া জঙ্ঘার নিম্ন পর্য্যন্ত ছড়াইয়া পড়িয়াছে। কিন্তু সে প্রভাতের গোলাপ-বিনিন্দিত মুখে, সে কোটি কোটি পূর্ণিমার ভরা পূরা সোণার চাঁদের শোভা-বিনিন্দিত শোভারাশির উপরে আর সেই সরল চল চল সদা উচ্ছ্বসিত হাসির ঘটা নাই, তৎপরিবর্ত্তে কেবল গাম্ভীর্য্য, কেবল মধুর প্রশান্তভাব, কেবল ভাবরাশি, তেজোরাশি

ছড়াইয়া রহিয়াছে। যেন খাসিয়ার কাতর প্রার্থনায়—সেইতিন চারি হাজার খাসিয়া-নরনারীর কাতর চীৎকারে, জ্যোতির্ম্ময় "ওব্লাই" তাঁহার ভুবন-প্রকাশক জ্যোতি ও তেজে আবৃত করিয়া খাসিয়ার রক্ষার্থ এখনই স্বর্গ হইতে এই মূর্ত্তিমতী জীবন্ত করুণারাশি এই স্থিরতরঙ্গময় সমুদ্র তুল্য খাসিয়াদিগের ভিড়ের সম্মুখে নিজেই স্থাপিত করিয়া অন্তর্য্যামীরূপে সকলের অন্তরে মিলাইয়া গেলেন। প্রতিমার হস্তে একটী শান্তির শাদা নিশান উত্থিত হইয়া বায়ুভরে পত পত শব্দে উড়িতেছে। খাসিয়ারা হঠাৎ এই দৃশ্য সম্মুখে দেখিয়া, মুহূর্ত্তের মধ্যে আবার সেই তিন চারি হাজার কণ্ঠে চীৎকার করিয়া, "ওব্লাই"য়ের নামের জয়ধ্বনিতে আকাশ পাতাল কাঁপাইয়া তুলিল। মুহূর্ত্তের মধ্যে যেন সেই মহাদেবীর জ্যোতির্ম্ময়ী প্রতিমাখানি সর্ব্বসম্মুখে দাঁড়াইয়া এক সঙ্গে, একবারে, সেই তিন চারি হাজার খাসিয়া নর নারীর চখে, মুখে, প্রাণে নীরবে গাম্ভীর্য্যপরিপূর্ণ ছল ছল, ঢল ঢল, অশ্রুপূর্ণ দৃষ্টিতে রাশি রাশি স্নেহ মমতা ঢালিয়া দিয়া তড়িতরাশিবৎ প্রস্থান করিলেন। তখন সকলে কেবল চকিতের ন্যায় পথ ছাড়িয়া সরিয়া দাঁড়াইল। সকলেই দেখিল, তাহাদের সন্ন্যাসিনী মা সেই মেঘের মত আজঙ্ঘা লম্বিত, কাঁধ ঢাকা, পিঠ ছাওয়া, কোমর ছাওয়া, চুলের রাশি উড়াইয়া, গৈরিক বসনের সুন্দর আঁচল উড়াইয়া, হাতের শাদা নিশান উড়াইয়া, জ্বলন্ত বিজলী-প্রবাহের মত নিমিষে সেই ঝাঁকে ঝাঁকে প্রভাত সূর্য্যের ন্যায় রক্তবর্ণ বজ্রনাদী কামানের জ্বলন্ত গোলা, বন্দুকের গুলি অবহেলা করিয়া, ভেদ করিয়া, ধূমান্ধকার-রাশির মধ্য দিয়া, বিপক্ষদিগের অধিকৃত পাহাড়ের দিকে ছুটিয়াছেন এবং ছুটিয়া গিয়া মুহূর্ত্তের মধ্যেই নিম্নস্থ গাঢ় অন্ধকারপূর্ণ গুহাভ্যন্তরে অদৃশ্য হইয়া পড়িলেন! সন্ন্যাসিনী এই আট বৎসরকাল অনবরত স্বাধীনভাবে পাহাড়ে চলিয়া চলিয়া পাহাড়ের উপর দিয়া তাড়াতাড়ি চলা ফিরা করিতে খুব অভ্যস্ত হইয়াছিলেন। সুতরাং নিমিষে অন্তর্দ্ধান হইলেন। সেই তিন চারি হাজার খাসিয়া নর নারী এই অচিন্তনীয়পূর্ব্ব ঘটনায় কেবল বিস্মিত এবং চকিত হইয়া নীরবে দাঁড়াইয়া রহিল। কিন্তু তখন হঠাৎ সম্মুখে একটা উচ্চ কান্নার স্বর উঠিল। সে স্বর এই, "ও দিদী বাবু—, ও দিদী বাবু—, কি করিলে—? কোথায় যাও—? কোথায় যাও—? ফের—। দোহাই তোমার ফের—। হায়! কি হো'ল রে—! হায়! কি হো'ল রে!" সরস্বতী কাঁদিয়া কাঁদিয়া

চীৎকার পূর্ব্বক এই কথাগুলি বলিতে বলিতে সন্ন্যাসিনীর পিছে পিছে ছুটিল। সম্মুখে কামানের শব্দ হইতে লাগিল, "গুড়ম্ গুম্—" তাহাতে বন্দুকের শব্দ, সিপাহীদের "হীপ্—হীপ্—হুর্‌রে—!" রব, রণবাদ্যের শব্দ, "বিউগল্"এর শব্দ মিশিয়া, অতি ভয়ঙ্কর হইল। বন্দুক ও কামানের মুখের পুঞ্জ পুঞ্জ ধূমরাশির অন্ধকারে চক্ষু দৃষ্টি হীন হইল। বারুদের ও গন্ধকের গন্ধে নিশ্বাস রোধ হইতে লাগিল। অন্ধকারে সেই প্রভাতের সূর্য্যের মত রক্তবর্ণ জ্বলন্ত কামানের গোলা, বন্দুকের গুলি ঝাঁকে ঝাঁকে এ পাশ ও পাশ দিয়া ছুটিয়া যাইতে লাগিল। সরস্বতী ভয়ে ভয়ে কাঁপিতে কাঁপিতে কিছু দূরে গিয়াই, চমকিয়া প্রাণ ভয়ে ফিরিয়া আসিল। সরস্বতীর সঙ্গে সঙ্গে জুনও ছুটিয়াছিল, কিন্তু সে আর ফিরিল না। সন্ন্যাসিনী মা তখনও চুল উড়াইয়া, আঁচল উড়াইয়া, হাতে শান্তির নিশান উড়াইয়া বিদ্যুৎ-প্রবাহের মত ছুটিয়া যাইতেছিলেন। এদিকে সরস্বতীর কান্নায় চমক ভাঙ্গিলে, দলে দলে খাসিয়া স্ত্রী পুরুষেরা তীর ধনুক এবং লম্বা লম্বা তীক্ষ্ণ ধার খাসিয়া-দা, বল্লম ও বন্দুক নিয়ে সন্ন্যাসিনী মার সঙ্গে সঙ্গে যাইবার জন্য তড়িতবেগে ছুটিয়াছিল। সন্ন্যাসিনী পথের মধ্যে এক দল খাসিয়াকে দেখিয়া, খাসিয়া-কথায় বলিলেন, "এইরূপ করার চেয়ে আমার কথা প্রতিপালন করিলেই, এই সময় যথার্থ কৃতজ্ঞতা প্রকাশ পাইবে। তোমরা কতটী?" খাসিয়ারা চীৎকার করিয়া বলিল, "আমরা অনেক। পিছে আরও আসিতেছে।" সন্ন্যাসিনী তখন কেবল গম্ভীর মধুর অথচ সকরুণ স্বরে বলিলেন—পূর্ব্বাপেক্ষাও বেগে ছুটিতে ছুটিতে চীৎকার করিয়া বলিলেন, "ফের—! আর এক পাও এ'সো না— দোহাই তোমাদের "ওব্‌লাই"য়ের, ফের—! সকলকেই ফিরাইয়া নেও। কাজ ভাল কর নাই। আরও সম্মুখে আসিলে আরও ভাল হইবে না। ফের—!" এই বলিয়াই, সন্ন্যাসিনী ছুটিয়া গিয়া সম্মুখের পাহাড়ের নিকটে আরও গভীর অন্ধকারগর্ভে এবং অগ্নিবর্ণ গোলাগুলির স্রোতের মধ্যে ঝাঁপ দিয়া পড়িলেন। দলবদ্ধ খাসিয়ারা এই ঘটনা দেখিয়া, সকলে সমস্বরে বারম্বার হাহাকার করিয়া ফিরিয়া আসিল। ফিরিতে এবং সম্মুখে যতটুকু গিয়াছিল, তাহাতেই শত শত খাসিয়া স্ত্রী পুরুষ আহত ও হত হইয়া গুহাশায়ী হইল, কেহ বা সম্মুখের পাথরের উপরে পড়িয়া রক্তে ভাসিতে লাগিল, অনেকে ফিরিয়া আবার দণ্ডীর পাহাড়ে উঠিল। কিন্তু তাহাদের

মধ্যেও অনেকে আহত হইয়াছিল। জুন সন্ন্যাসিনীর পিছে পিছেই ছুটিয়া গেল। সে আর কিছুতেই ফিরিল না। সরস্বতী বন্দুকের গুলিতে একটী বিষম আঘাত পাইয়াছিল। সে দৌড়াইয়া কুটীরে ফিরিয়া গিয়া ধূলা মাটীর মধ্যে পড়িয়া ছট্ ফট্ করিতে লাগিল। রক্তে ঘরের মে'ঝে ভাসিয়া যাইতে লাগিল। খাসিয়ারা পথের মধ্যে বিপক্ষের অধিকৃত পর্ব্বতের নিকটে যেরূপ রাশি রাশি পুঞ্জ পুঞ্জ ঘন ধূমান্ধকারে অগ্নিময় জ্বলন্ত গোলা-গুলি-বৃষ্টির মধ্যে সন্ন্যাসিনী মাকে ঝাঁপ দিতে দেখিয়াছিল, তাহাতে তাহারা নিঃসন্দেহে বুঝিয়াছিল, খাসিয়াদিগের ভালবাসার প্রতিদানের জন্য, খাসিয়া-জাতির কোন গূঢ় মঙ্গল সাধন করিতে গিয়া, সন্ন্যাসিনী মা সেই ভয়ঙ্কর অগ্নি-বৃষ্টিপূর্ণ গুহায় ঝাঁপদিয়া আত্ম বিসর্জ্জন করিয়াছেন। এই ভাবিতে ভাবিতে সেই তিন চারি সহস্র খাসিয়া নর নারীর বুক বহিয়া নীরবে জলের ধারা পড়িতে লাগিল। কৃতজ্ঞ খাসিয়ারা ভালবাসার এইরূপ প্রতিদান দেখিয়া, সন্ন্যাসিনী মার জন্য শোকে উন্মত্ত হইয়া কাঁদিতে লাগিল। যেন সম্মুখস্থ বিপক্ষের সেই ভীষণ রণোদ্যম ভুলিয়া সকলে হতবুদ্ধি হইয়া পড়িল।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ।

ইংরেজের ভদ্রতা।

সন্ন্যাসিনী যখন সন্ধ্যার পরে প্রথম রাত্রিতে চাঁদের আলোকে কুটীরের সম্মুখের ফুল বাগানে বসিয়া একখানি শাদা কাপড় কাটিয়া একটী নিশান তৈয়ার করিতেছিলেন, তখন সরস্বতী ছোট ছোট গাছগুলি হইতে শাদা শাদা বেল ও যুঁই ফুল তুলিয়া তুলিয়া একটী মালা গাঁথিতেছিল। সন্ন্যাসিনী অতি সুমধুর গুন্ গুন্ স্বরে কি যেন একটী গান গাইতে গাইতে একটু গম্ভীর হইয়া চুলগুলি পিঠে ছড়াইয়া পা মেলিয়া বসিয়া নিশান শেলাই করিতে করিতে, এক এক বার মুখ তুলিয়া তুলিয়া সরস্বতীর এই কাণ্ড দেখিতেছিলেন। থাকিয়া থাকিয়া, মনে মনে একটু আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া, শেষটা গান গাওয়া ছাড়িয়া ধীরে ধীরে বলিলেন, "সরস্বতি দিদি, তুমি ও কি করিতেছ ভাই?"

সরস্বতী।—"জানকি দিদীবাবু, আজ সমস্ত দিনটাই কাঁদিয়া কাঁদিয়া

চোক ফুলাইয়াছি। কিছুই যেন ভাল লাগিতেছে না। তুমিই ত দেখিয়া আসিলে, দাদাবাবুর ধরা পড়িবার খপর শুনিয়া অবধি আমি মাটীতে আঁচল পাতিয়া শুইয়া শুইয়া কাঁদিতেছিলাম। কাঁদিতে কাঁদিতে বাহিরে আসিয়া দেখিলাম, তুমি যেন আপন মনে গুন্ গুন্ করিয়া গাইতে গাইতে কি করিতেছ। তাই আমারও একটা কাজ করিতে ইচ্ছা হইল। আর কি করিব? তোমারই একগাছি সূতা নিয়ে এই ফুলের মালাটী গাঁথিতেছি। দেখ দিদীবাবু, এ ফুলের মালাটীও আমার চোখের জলে ভিজিয়া গিয়াছে। তুমি কাল সারা রাত কাঁদিয়াছ। কিন্তু আজ সকাল থেকে যেন প্রাণটীকে কঠিন কো'রে, কেবল মুখ খানি ভার করিয়া আছ। দিদীবাবু, আমি কিন্তু আর দুই চোখে কিছুই দেখিতেছি না। তুমি ও নিশানটী তৈয়ার করিতেছ কেন দিদি?"

সন্ন্যাসিনী দেখিলেন, সত্য সত্যই চোখের জলে সরস্বতীর হাতের মালা ভিজিয়া গিয়াছে। কিন্তু সরস্বতীর কথার কোন উত্তর না দিয়া বলিলেন, "আমার সঙ্গে যাবে ত?"

সরস্বতী।—"সে কি দিদীবাবু, কোথায় যাবে? আমরা তবু কাল পেত্নী মানুষ। একটু বয়সও বেশী হইয়াছে। তোমার কি এ মুলুক ছাড়িয়া আর কোথাও যাওয়া ভাল? এদেশ সোণার দেশ। যেখানে খুষী সেখানে যাই, কেউ কিছু বলে না। এরা জঙ্গ্‌লা মানুষ বটে কিন্তু আমাদের দেশের লোকের চেয়ে অনেক ভাল। তোমার বাঙ্গ্‌লা দেশের মুখে ছাই। পথে বাহির হইলে যেন মিন্‌ষে গুলি, বাজা'রে কাক-চিলের মত বজ্জাতি করে। এদের পায়ের ধূলা চাটিয়া খাওয়া তাদের উচিত।"

সন্ন্যাসিনী তাড়াতাড়ি জিভ্ কাটিয়া সলজ্জভাবে বলিলেন, "ছিঃ—, সরস্বতি, মানুষকে গালি দেও কেন ভাই? আমি সন্ন্যাসিনী, আমায় কে কি বলিবে? আমার কে কি করিবে?"

সরস্বতী।—"গেরুয়া কাপড় পরিলে আর চুল এ'লো কো'রে রাখিলেই যদি সন্ন্যাসিনী হ'য়ে সব দায় থেকে বাঁচা যায়, তবে কেই বা ভাবিত?"

সন্ন্যাসিনী।—"সত্যি কথা, তাহো'লে কেউ ত ভাবিতই না।"

সরস্বতী এবার আর একটীও কথা না বলিয়া কেবল ধীরে ধীরে উঠিয়া মুখখানি ভার করিয়া কুটীরের মধ্যে চলিয়া গেল। সরস্বতী ঘরে গিয়া অনেক দিনের একটী পুরাতন পেটরা খুলিয়া তাহার মধ্য হইতে তাড়া তাড়ি

একখানি আর্শি বাহির করিল। আয়না খানি বাহির করিয়া তাহার ঢাকনী খুলিয়া প্রদীপের কাছে রাখিয়াই, বাহিরে চলিয়া আসিল। এবার আসিয়া দেখিল, সন্ন্যাসিনী নিশানটী, তৈয়ার করিয়া, তাহা এক খানি লাঠির আগায় বাঁধিয়া, একভাবে ধ্যান করিয়া কি যেন দেখিতেছেন আর ভাবিতেছেন। সরস্বতী তাড়া তাড়ি সন্ন্যাসিনীর কাছে আসিয়া হাত ধরিয়া বলিল, "দিদীবাবু, পায়ে পড়ি, একবার এস না ভাই। একবারটী ঘরের ভিতরে এস। হাতের কাজটী ফেলিয়া একবারটী, লক্ষ্মীটী, দিদীবাবুটী, এস না ভাই। এস দিদীবাবু।"

সন্ন্যাসিনী সরস্বতীর কাকুতি মিনতিতে কিছুই না বলিয়া কেবল উঠিয়া পূর্ব্ববৎই কি যেন ভাবিতে ভাবিতে ঘরের ভিতরে চলিয়া গেলেন। সরস্বতী সন্ন্যাসিনীর হাত ধরিয়া ঘরে লইয়া গিয়া তাড়া তাড়ি সেই প্রদীপের আলোর কাছে খোলা আয়না খানির সম্মুখেই তাঁহাকে দাঁড় করিল এবং আঁচলের খোঁটে চোখের ফোঁটা ফোঁটা জলের ধারা মুছিতে মুছিতে একটু একটু মুখ টিপিয়া টিপিয়া হাসিয়া হাসিয়া বলিল, "দেখত আয়নার মধ্যে ও কি?" সন্ন্যাসিনী একটু বিরক্ত হইয়া সরস্বতীর হাত ছাড়াইতে ছাড়াইতে বলিলেন, "ও তোমার মাথা।" এই বিষাদ এবং বিপদের অন্ধকারেও পাষাণী এক মুখ হাসিয়া ফেলিয়া, সরস্বতীর মুখ-পানে তাকাইতে তাকাইতে তাহার হাত হইতে ধীরে ধীরে হাত খানি খুলিতে লাগিল। সরস্বতীর চোকদিয়া তখনও ঝর্ঝর্ করিয়া জল ঝরিতেছিল, তখনও বাদলার রাত্রির বিজলীর মত মুখের কোণে, চোখের কোণে, হাসি ফুটিয়া ফুটিয়া নিবিয়া নিবিয়া যাইতেছিল, অধরোষ্ঠ ধীরে ধীরে কাঁপিতেছিল। সরস্বতী কাঁদিয়া, হাসিয়া, লাল লাল ঠোঁট দুইখানি কাঁপাইয়া, পাষাণীর মুখের দিকে ঈষৎ বক্র কটাক্ষে তাকাইয়া রাগের ভাণ করিয়া বলিল, "এ আগুন কি গেরুয়া কাপড়ে, এ'লো চুলে ঢাকা প'ড়েছে?"

সন্ন্যাসিনী।—"তোমার মাথা হইয়াছে।"

সরস্বতী।—"কোথায় যাবে বলত?"

সন্ন্যাসিনী।—"তা না শুনিয়াই এত করিতেছ যে?"

সরস্বতী।—"তুমিই কেন ভাঙ্গিয়া বল নাই?"

সন্ন্যাসিনী।—"বোধ হয় এতক্ষণ হটন সাহেব সিপাহী নিয়ে পৌছিয়াছেন। এখনই সাহেবদের লোক দণ্ডীর পাহাড় চড়াও করিবে।"

সরস্বতী এই কথা শুনিয়া কাঁপিতে কাঁপিতে পাষাণীর আঁচল ধরিয়া অস্পষ্টস্বরে বলিয়া উঠিল, "ও দিদীবাবু, কি হবে? আমাদের কি হবে গো?"

পাষাণী।—"দেখ নাই কি আজ সারাদিনটা ভ'রে এই পাহাড়ের উপরে তিন চারি হাজার খাসিয়া স্ত্রীলোক পুরুষ জমা হইয়াছে?"

সরস্বতী।—"দে'খেছি ত্। তারা ও ছাইয়ের তীর, ধনুক, দা, কুড়ুল নিয়ে কি করিবে? তুমিই না বো'লেছ, সিপাহীরা মেলাই বন্দুক কামান নিয়ে আসিতেছে।"

পাষাণী।—"তা এরাও অনেক কাজ করিতে পারিবে। পাহাড় থেকে বড় বড় পাথর গড়াইয়া গড়াইয়াই সিপাহীদিগকে তাড়াইয়া দিবে।"

সরস্বতী।—"তবু বাঁচলুম্।"

পাষাণী।—"না ভাই তোমার ভাঙ্গা পোঁড়াটী কিছুতেই সিপাহীরা নিতে পারিবে না। তুমি নির্ভয়ে নাকে সরিষার তেল দিয়ে ঘুমাইতে পার। কিন্তু—"

পাষাণী এতদূর বলিয়াই, আর কিছু না বলিয়া একটুকু একটুকু হাসিতে লাগিল। সরস্বতী ব্যস্ততার সহিত সাতিশয় ব্যগ্র হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কিন্তু" কি দিদীবাবু? বল না দিদীবাবু? তুমি কিন্তু বড় শক্ত মেয়ে ভাই। আমি কিন্তু এখনও তোমারই দিকে তাকাইয়া ধৈর্য্য ধো'রে আছি। নৈলে কি হো'ত জানি না।"

পাষাণী।—"আমি যে পাষাণী। বিধাতা পাথর দিয়ে গড়িয়েছেন্, জান সরস্বতী? বুড়াকর্ত্তা সাধ করিয়া কি এ নামটা রাখিয়াছিলেন্?"

সরস্বতী।—"দিদীবাবু, এখনও হাসি ঠাট্টা করিতেছ? দেখ, আমার বুক দুড়্ দুড়্ করিতেছে, গায়ে ঘাম দিয়েছে। কথাটা ভাঙ্গিয়া বল না ভাই?"

পাষাণী।—"কেন বলত?"

সরস্বতী—"জান? তুমি ভাই আমাদের মত হাস, খেল বটে কিন্তু ভাই তুমি বড় শক্ত মেয়ে মানুষ। তুমি যে আজ সমস্ত দিনটা ভ'রে কাঁদ কাট নাই, কেবল গুম্ ধো'রে আছ, তাতে আমার মনটা যেন কেমন কেমন করিতেছে। আবার মুখ খানি কেমন করিয়া যেন বলিতেছিলে, "কিন্তু"। বলিতে বলিতে বলিলে না, তাই ভয় হইতেছে। "কিন্তু" কি বল না দিদীবাবু? পায়ে পড়ি, তোমার দুটী পায়ে পড়ি, বল দিদীবাবু। বল না ভাই, "কিন্তু" কি?"

পাষাণী।—"কিন্তু আমি এক বার হটন সাহেবের সঙ্গে দেখা করিতে যাব।"

সরস্বতী চমকিয়া বলিল, "সে কি মা! কখন্ গো?"

পাষাণী।—"যখন পাহাড় চড়াও করিবে।"

সরস্বতী কাঁদিতে কাঁদিতে অত্যন্ত ভয়ে ভয়ে অস্পষ্টস্বরে বলিতে লাগিল, "ও দিদীবাবু, দিদীবাবু গো, তা হবে না গো, তা হবে না! তোমায় আমি যে'তে দেব না। আমার কি হবে গো—! আমার কি হবে গো—! ও দিদীবাবু, তোমার দুইটী পায়ে পড়ি গো—! যে'তে পাবে না। কি হবে গো আমার—! কি হবে—!"

সন্ন্যাসিনী এবার মুখখানি ভার করিয়া ধীরে ধীরে বলিলেন, "ভয় কি তোমার সরস্বতি? ভয় কি তোমার দিদি? আমার সঙ্গে চল। আমি তোমাকে ত ফেলিয়া যাইতেছি না? আর আমি যে ফিরিব না, এমনওত নয়? তবে যদি গোলা গুলি গায়ে লাগিয়া মরিয়া যাই বা আমায় আর আসিতে না দেয় তবে সে ভিন্ন কথা। তুমিত জান, আমাদের জীবনের মূলমন্ত্র কি? মরণ বা বন্ধন কিছুরই ভয় করি না। ভগবান্ যাহা বলেন, তাহা না করিয়া থাকিতে পারি না।"

সরস্বতী তদ্রূপই কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল, "কৈ দিদীবাবু, আমায় ত ভগবান্ কখনও কিছুই বলেন না? তোমায় এ সর্ব্বনেশে কথা কি কো'রেই বা বলেন! তুমি কিছুতেই যে'তে পাবে না।"

সন্ন্যাসিনী।—"এই সমস্তগুলি লোক যাহাতে বাঁচে তেমন একটা কিছু তোমার মনে হইলে, না করিয়া পার?"

সরস্বতী এবার পূর্ব্ববৎ কাঁদিতে কাঁদিতেই দক্ষিণ হস্তের তর্জ্জনী দ্বারা গাল টিপিয়া ধরিয়া কি যেন ভাবিতে লাগিল। ভাবিয়া, ভাবিয়া, ভাবিয়া শেষটা ধীরে ধীরে বলিল, "তাও ত বটে। কিন্তু আমি যাব না। কি বল? অ্যাঁ—?"

এমন সময় দশদিক্ কাঁপাইয়া, অতি কাছেই যেন শব্দ হইল, "গুড়ুম্—গুম্—গুম্—ফট্, ফট্ ফট্—!"

"ওগো—, ও দিদীবাবু—, ও কি গো—! ও কি গো—! ও কি গো—! কি হবে গো—! কোথায় যাব গো—!" সরস্বতী এবার আবার এই সকল কথা বলিয়া একরূপ অস্পষ্ট চীৎকার করিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে সন্ন্যাসিনীকে

তাড়া তাড়ি দুই হাতে জড়াইয়া ধরিল। সন্ন্যাসিনী ধীরে ধীরে সরস্বতীর হাত ছাড়াইয়া তাহাঁকে সম্মুখে দাঁড় করাইয়া গদগদস্বরে বলিলেন, "ভয় নাই সরস্বতি, ভয় নাই দিদি, ভগবানকে ডাক। ভয় বারণে এ জীবন ঢালিয়াছি, কিসের ভয়? কি ভয়? তুমি এই খানেই একটু দাঁড়াও দিদি, আমি মতিরায় ও জীবনরায়কে একটা কথা বলিয়া এখনই ফিরিয়া আসিতেছি। তুমিও এখন আমার সঙ্গে যাবে।"

সরস্বতী।—"না গো—! আমি সঙ্গে যাব না গো—! তুমি কোথায় যাও গো—? ও গো দিদীবাবু গো—! তুমি যে'ও না গো—!"

পাষাণী সরস্বতীর কান্না দেখিয়া নিজেও কাঁদ কাঁদ হইয়া, সেই ছোট-বেলার মত দুই হাতে অতি ধীরে ধীরে ধীরে সরস্বতীর গলা জড়াইয়া ধরিয়া মুখের উপরে সেই ছল ছল, চল চল দৃষ্টিটী স্থাপন পূর্ব্বক ধীরে ধীরে আঁচলে তাহার মুখ খানি মুছাইয়া ধীরে ধীরে মুখের উপর মুখ খানি রাখিয়া একটী চুম খাইল। বলিল, "সরস্বতি দিদি, দিদি, তুমি একটুকু দাঁড়াও, আমি এখনই ফিরিব। তোমাকেও সঙ্গে যেতে হবে।" সরস্বতী এবার আর কিছুই না বলিয়া, কেবল আঁচলে মুখ ঢাকিয়া, চোক ঢাকিয়া কাঁদিতে লাগিল। সন্ন্যাসিনী তখন ধীরে ধীরে সরস্বতীর গলা ছাড়িয়া দিয়া প্রস্থান করিলেন। যাইবার কালে কি যেন ভাবিতে ভাবিতে মুখ খানি ভাঁর করিয়া, ফোঁটা ফোঁটা চোখের জল আঁচলে মুছিতে মুছিতে চলিলেন। কিন্তু আবার অর্দ্ধ দণ্ড পরেই ছুটিয়া সরস্বতীর কাছে ফিরিয়া আসিলেন। সরস্বতী তখনও সেইখানেই সেই ভাবেই দাঁড়াইয়া কাঁদিতে-ছিল। সন্ন্যাসিনী এবার সাতিশয় ব্যস্ত হইয়া ফিরিয়া আসিয়াছিলেন। এবার সেই নিশানটী হাতে করিয়াই আসিয়াছিলেন। ঘরে আসিয়া সরস্বতীর কাছে দাঁড়াইয়া বলিলেন, "তুমি এখনও কাঁদিতেছ? চল, আর দেরি করিব না। ভগবানের নাম করিয়া চল।"

সরস্বতী নীরবে কেবল সেই সজল-নেত্রে সন্ন্যাসিনীর দিকে তাকাইল। দেখিল, সন্ন্যাসিনীর এবার আর এক ভাব। সেই গৈরিক-বসনা, এলো-কেশী, লাবণ্যময়ী আজ তেজোময়ী হইয়া সুশুভ্র নিশান হস্তে সম্মুখে দাঁড়াইয়া আছেন। ক্ষীণ প্রদীপ-রশ্মি তাঁহার সর্ব্বগাত্রে ও নিশানের উপরে পড়িয়া কাঁপিতেছে। বাহিরে এবার যেন আরও জোরে জোরে চারি দিকের পাহাড় পর্ব্বত কাঁপাইয়া, ভাঙ্গিয়া চুরিয়া, সহস্র সহস্র বজ্র-

শব্দের মত অত্যন্ত ঘন ঘন শব্দ হইতেছিল, "গুড়ুম্—গুম্—গুম্—! ফট্, ফট্, ফট্—!" আবার তাহার সঙ্গে ইংরেজ-রণবাদ্যের গভীর নিনাদ, "বিউগল্"এর শব্দ, শত শত কণ্ঠের "হীপ্—হীপ্—হুর্‌রে—" রব মিশিয়া সত্য সত্যই একটা মহাপ্রলয়কর ব্যাপার ঘটাইতেছিল। সরস্বতী এরূপ ব্যাপার কখনও শুনে নাই, কখনও দেখে নাই। কেবল হতজ্ঞান হইয়া কাঁপিতে কাঁপিতে কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল, "না। আমি যাব না।"

সন্ন্যাসিনী এবার আবার কাঁদ কাঁদ হইলেন। আবার আঁচল তুলিয়া চোক মুছিলেন। তবুও চক্ষের জল থামিল না। তখন সেই সজলনেত্রেই ঢল ঢল, ছল ছল চাহনীতে সরস্বতীর মুখ পানে তাকাইলেন। বলিলেন, "একান্তই না যাইতে পার, থাক। আমি আর দেরি করিতে পারিব না।" সন্ন্যাসিনী এই কয়েকটী কথা বলিয়াই ছুটিয়া অন্তর্দ্ধান হইলেন। সরস্বতী অবাক্ হইয়া দেখিল, সন্ন্যাসিনীর অশ্রুপ্লাবিত মুখে কি যেন এক অপূর্ব্ব তেজ খেলা করিতেছে। সন্ন্যাসিনী ঘরের বাহিরে গিয়াও আঁচলে চোখ মুছিতে মুছিতে গেলেন। সরস্বতীও মুহূর্ত্তকাল নিস্তব্ধভাবে দাঁড়াইয়া কাঁদিয়া কাঁদিয়া শেষটা হতচেতনের মত ছুটিয়া বাহিরে আসিল। ছুটিয়া, যেখানে তিন চারি হাজার খাসিয়া স্ত্রীলোক ও পুরুষ অবাক্ হইয়া সন্ন্যাসিনীর সেই অদ্ভুত বেশ, অদ্ভুত কার্য্য দেখিতেছিল, সেই খানেই উপস্থিত হইল। কিন্তু শিহরিয়া দেখিল, সন্ন্যাসিনী চুল উড়াইয়া, আঁচল উড়াইয়া, হাতে নিশান উড়াইয়া, বিদ্যুৎরাশিবৎ সম্মুখের ধূমান্ধকারপূর্ণ পর্ব্বত গুহার মধ্যে অদৃশ্য হইয়া গেলেন। অন্ধকারে প্রভাত-সূর্য্যের মত রক্তবর্ণ জ্বলন্ত কামানের গোলা, বন্দুকের গুলি ঝাঁকে ঝাঁকে ছুটিয়া আসিয়া পাহাড়ের গায়ে পড়িয়া বড় বড় পাথরগুলি ভাঙ্গিয়া চূরিয়া ফেলিতেছে আর সেই সহস্র সহস্র বজ্রনাদে শব্দ হইতেছে, "গুড়ুম্—গুম্—গুম্—! ফট্, ফট্, ফট্—!" তাহার সঙ্গে "হীপ্—হীপ্—হুর্‌রে—" রবে আকাশভেদী শত শত কণ্ঠের চীৎকার, রণবাদ্যের মেঘ গর্জ্জনের মত শব্দ এবং "বিউগল্"এর রব মিশিয়া এক ভীষণ ব্যাপার হইতেছে। সরস্বতী, সন্ন্যাসিনীর পিছে পিছে কিছু দূরে গিয়াই ভয়ে ফিরিল এবং পায়ে আঘাত পাইয়া কুটীরে গিয়া শুইল। এদিকে সন্ন্যাসিনীর পশ্চাদ্ধাবিত হতাবশিষ্ট খাসিয়ারা দলে দলে ফিরিয়া আসিলে, সেই তিন চারি হাজার স্ত্রী পুরুষ সম্মুখের সকল বিপদ এবং ভয় ভুলিয়া সন্ন্যাসিনী মার জন্য অনেকক্ষণ নীরবে কাঁদিল। সন্ন্যাসিনী

সেই অগ্নিসমুদ্র-মধ্যে ঝাঁপ দিয়া পড়িয়া অন্তর্দ্ধান হইলেন। কাজুন ফিরিল না। এ সকল কথা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। এই সকল ঘটনার কিছুক্ষণ পরেই সেই নিস্তব্ধ রোরুদ্যমান খাসিয়াগণ দেখিল, যেন হঠাৎ বিপক্ষের সমস্ত যুদ্ধোদ্যম একবারে শেষ হইয়া গিয়াছে। আর একটীও কামানের শব্দ, বন্দুকের শব্দ, রণবাদ্যের বা "বিউগল্"এর শব্দ কিম্বা সিপাহীদের চীৎকার রব শুনা যাইতেছে না। চারিদিক্ যেন ঝটিকার বিরামকালের মত সহসা নিস্তব্ধ, নিস্পন্দ হইয়াছে। মতি রায় আর জীবন রায় তখন গদ গদ স্বরে চীৎকার করিয়া সম্মুখের সকলকে বলিলেন, "তোমরা আর একবার "ওব্লাই"কে স্মরণ করিয়া জয়ধ্বনি কর। বোধ হয় সন্ন্যাসিনী মা বিপক্ষদিগের নিকটে নিরাপদে উপস্থিত হইয়াছেন। বোধ হয় তাঁহারই হাতে শান্তির নিশান দেখিয়া হটন সাহেব, সিপাহীদিগকে যুদ্ধ করিতে নিষেধ করিয়াছেন।"

মতি রায় ও জীবন রায়ের এই কথার পরে সেই তিন চারি হাজার সশস্ত্র বলবান খাসিয়া স্ত্রী পুরুষ চীৎকার পূর্ব্বক পুনরায় "ওব্লাই"য়ের নামের জয়ধ্বনি করিল। যেখানে যুদ্ধ-পর্য্যবেক্ষণ-কার্য্যে বিরত অশ্বারোহী হটনের কাছে সন্ন্যাসিনী রক্তাক্ত হস্তে শান্তির শুভ্র নিশান উড়াইয়া দাঁড়াইয়া আছেন, শব্দ সেখানেও পৌছিল। পক্ককেশ বীরাকৃতি বৃদ্ধ হটন, হঠাৎ সম্মুখে অপূর্ব্ব নবীন-সন্ন্যাসিনী-বেশে, শান্তির শুভ্র নিশান হস্তে এক জন বঙ্গ-বাসিনী স্ত্রীলোককে খাসিয়ার দূতরূপে এই বৃষ্টিধারার মত জ্বলন্ত গোলাগুলি বর্ষণের মধ্যে প্রসন্নচিত্তে দণ্ডায়মান দেখিয়া কিছু বিস্ময়ান্বিত হইলেন এবং তৎক্ষণাৎ ঘোড়া হইতে নামিয়া যুদ্ধ-নিবারণ-সূচক সঙ্কেত করিলেন। হটন সাহেবের ঘোড়া হইতে নামিবার কিঞ্চিৎপরেই খাসিয়ারা "ওব্লাই"য়ের নামের সেই ধ্বনিতে দশ দিক্ কাঁপাইয়া তুলিল। হটন ঘোড়া হইতে নামিয়া এক হস্তে বলবান্ অশ্বের বল্গা ধরিয়া, অপর হস্তের তর্জ্জনী দংশন করিতে করিতে ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া কি যেন ভাবিতে ভাবিতে সহসা দূরে খাসিয়াদের সহস্র সহস্র কণ্ঠের সেই চীৎকার শুনিয়া ঈষৎ অন্যমনস্কভাবে বলিলেন, "ও কি?" হটন আপনার মাতৃ-ভাষা ইংরেজিতেই কথাটা বলিলেন। সম্মুখ হইতে সন্ন্যাসিনী উত্তর দিলেন, "কিছু না। খাসিয়ারা জয়ধ্বনি করিল।" হটন বহুদিন এদেশে আছেন বলিয়া

বাঙ্গালী, হিন্দুস্থানী কি আসামী দেখিলেই চিনিতে পারেন। হটন এদেশের অনেক খবর রাখেন। এদেশের নানা প্রাদেশিক ভাষাও কিছু কিছু জানেন।

হটন দেখিলেন, স্ত্রীলোকটী যে হাতে নিশান ধরিয়াছেন সে হাত খানি দর দর ধারায় পতিত রক্তস্রোতে ভাসিয়া যাইতেছে। সাহেব দেখিয়াই বুঝিলেন, হাড ভেদ করিয়া একটী বন্দুকের গুলি চলিয়া গিয়াছে। কিন্তু যুবতীর সে দিকে কিছুমাত্রও দৃক্‌পাত নাই দেখিয়া, হটন আর তৎসম্বন্ধে কিছুই বলিলেন না। কেবল জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনি কে?"

সন্ন্যাসিনী।—"আমি খাসিয়াদের দূত।"

হটন।—"এ অগ্নি বৃষ্টির মধ্যদিয়া কি করিয়া আসিলেন? আপনি বোধ হয় বাঙ্গালী?"

সন্ন্যাসিনী।—"হ্যাঁ, আমি বাঙ্গালী।"

হটন।—"আপনি কি চান?"

যুবতী।—"খাসিয়ারা নিজেদের দোষ স্বীকার করিয়া মাপ চাহিতে প্রস্তুত আছে। শান্তি স্থাপন করুন্। আপনারা খ্রীষ্টধর্ম্মাবলম্বী। অসভ্য খাসিয়াকে ক্ষমা করিতে আপনাদের আপত্তি অবশ্যই হইবে না। আমি জানি আপনারা মানুষকে ভাই মনে করেন। "মানুষকে ক্রুর মনে করা পাপ" ইহাই আপনাদের শাস্ত্রের আদেশ।"

হটন গম্ভীরভাবে বলিলেন, "সোবার পুঞ্জি এবং বুড়ীর হাটের অপরাধী খাসিয়াদিগকে ইংরেজ-গভর্ণমেণ্টের হাতে সমর্পণ করিয়া এই যুদ্ধের ক্ষতিপূরণ করিতে স্বীকৃত আছি" এই মর্ম্মে যদি খাসিয়ারা এবং খাসিয়া-প্রধানেরা বিশেষরূপে ক্ষমা চাহিয়া গভর্ণমেণ্টকে চিঠি লিখে, আর চিঠির উত্তর আসা পর্য্যন্ত আমরা এখানে অপেক্ষা করিলে, আমাদের প্রতি যদি তাহারা কোনরূপ অত্যাচার না করে, তবেই এখন যুদ্ধে নিরস্ত হইতে পারি। কিন্তু এই প্রতিজ্ঞা প্রতিপালনের জন্য প্রতিভূস্বরূপে এখনই অন্তত কয়েকজন খাসিয়া-প্রধানকে আমাদের শিবিরে নজরবন্দীরূপে থাকিতে হইবে। ভবিষ্যতে খাসিয়ারা আমাদের লোক বা প্রজার প্রতি কোন অত্যাচার করিতে পারিবে না, ইহাও প্রতিজ্ঞা পত্রে লিখা থাকিবে।"

সন্ন্যাসিনী।—"খাসিয়ারা এতগুলি কঠিন প্রতিজ্ঞা করিবে বা করিয়াও প্রতিপালন করিতে পারিবে, ইহা আশা করা যায় না। তথাপি আর এক

হটন।—"আমি বেশ বুঝিয়াছি; খাসিয়ারা সমুচিত শাস্তি না পাইলে জব্দ হইবে না। তুমি আর ফিরিয়া যাইতে পারিবে না।"

সন্ন্যাসিনী হটনের কথার সমস্ত অর্থ এবং মনের প্রকৃত ভাব বুঝিয়া ভ্রূকুঞ্চনপূর্ব্বক এবার মুখরার মত ঘৃণার স্বরে গম্ভীরভাবে বলিলেন, "তোমরা ভীরু! ধর্ম্ম তোমাদের নিকট কথার কথা মাত্র। দূতকে বন্দী করা কোন্ ধর্ম্মের কথা? ধিক্ তোমাদের সভ্যতায় এবং ধর্ম্মের অভিমানে। জানিও, এই সকল অধর্ম্মের ফলে তোমাদের সিংহত্ব শীঘ্রই জগতের নিকট ঘৃণাস্পদ শৃগালত্বে পরিণত হইবে। বুঝিলাম, ধর্ম্মের কথা, উদারতার কথা তোমাদের ভাণ মাত্র। স্বার্থই তোমাদের মূল মন্ত্র এবং সার। বিচারে তোমাদের পক্ষপাত, বাণিজ্যে তোমাদের মিথ্যা চাতুরি, প্রজার উপরে তোমাদের অযথা ঘৃণা ও অসদ্ব্যবহার, যুদ্ধে তোমাদের এই প্রকারের শত শত অধর্ম্মাচরণ তোমাদিগকে শীঘ্রই এমন এক স্থানে উপস্থিত করিবে, যেখানে দাঁড়াইয়া আর অল্প দিন পরেই পৃথিবীর যে সকল নর নারীর প্রতি তোমরা বিবিধ প্রকারে অত্যাচার করিতেছ, সেই অত্যাচারের প্রতি বিন্দুর জন্য কাঁদিয়া কাঁদিয়া তাহাদেরই চরণে তোমাদিগকে ক্ষমা প্রার্থনা করিতে হইবে। বন্দী করা কেন? ইচ্ছা হয়, তোমরা সকলে মিলিয়া এই দেহ কামানের গোলায় উড়াইয়া দেও বা খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেল। মৃত্যুকে হিন্দু রমণী পুষ্পমালা মনে করে। অথবা দেখ, আমি দুর্ব্বল বা ভীরু নই।" এই বলিয়া সন্ন্যাসিনী বিদ্যুতের মত হটনের কোমর হইতে বলপূর্ব্বক কিরিচ্ কাড়িয়া লইয়া পলকে নিষ্কোষিত করিয়া দাঁড়াইলেন। হটন কিঞ্চিৎ অপ্রতিভ হইয়া তৎক্ষণাৎ সিংহ-প্রতাপে সন্ন্যাসিনীর হাত হইতে তরবারি পুনর্গ্রহণ করিতে উল্লম্ফন করিলেন। সন্ন্যাসিনী নিমেষে ঈষৎ হাসিয়া স্থিরভাবে আপনা হইতেই হটনের হাতে তরবারি খানি প্রত্যর্পণ করিলেন। বলিলেন, "বীর, এই তলোয়ার আমিই তোমার হাতে খুলিয়া দিলাম, ইচ্ছা হয় ইহা দ্বারা এখনই আমার মাথা কাটিয়া ফেল।"

পক্বকেশ বৃদ্ধ হটন রমণীর এই শৌর্য্য, ধৈর্য্য এবং তেজ দেখিয়া একবারে অবাক্ এবং স্তম্ভিত হইলেন। গম্ভীরভাবে রমণীর দিকে চাহিয়া বলিলেন, "ব্রিটিশ সিংহ কখনও স্ত্রীজাতিকে বন্দী বা তাঁহাদের প্রতি অত্যাচার করেন না। তোমাকে কেবল এ অঞ্চল হইতে স্থানান্তরিত

করা হইবে। নীচে গিয়া যেখানে ইচ্ছা সেই খানে যাইতে পারিবে। আমার বিশ্বাস, এ অঞ্চলে থাকিয়া তোমরা কেবল চক্রান্ত করিতেছ। আর বাঙ্গালীর মেয়ে হইয়াও তুমি যেরূপ সাহস এবং তেজ দেখাইলে, তাহাতে এ সন্দেহ আমার মনে আরও দৃঢ় হইয়াছে। তোমাদের আরও তিন জন পুরুষ বন্দী হইয়াছে। এখনকার শিক্ষিত বাঙ্গালীর উপরে আমাদের বিশ্বাস নাই।" এই বলিয়াই হটন পুনরায় অশ্ব-পৃষ্ঠে চড়িয়া বসিলেন। ঘোড়ায় চড়িবার কালে হটন সাহেব সম্মুখের একজন সিপাহীকে সেই সাহেবি হিন্দীতে বলিলেন, "এ জানানাকো কয়াদ্ কোর।" সন্ন্যাসিনী আর হটনের সমস্ত কথাবার্ত্তাই আপনার আপনার মাতৃভাষায় হইতেছিল। উভয়ই উভয়ের কথা বুঝিতেছিলেন—হটন কষ্টে বুঝিতেছিলেন।

সিপাহী, সাহেবের কথা শুনিয়া সন্ন্যাসিনীর হাত ধরিতে উদ্যত হইলে, হটন সিপাহীকে কর্কশ স্বরে নিষেধ করিয়া বলিলেন, "হাওয়ালদারকো বোলাও—।" সিপাহী তখনই দৌড়াইয়া হাওয়ালদারকে ডাকিল। হাওয়ালদার ব্যস্ততার সহিত সাহেবের কাছে আসিয়া শেলাম করিয়া দাঁড়াইল। সাহেব ঘোড়ার উপর হইতে ঈষৎ মস্তক অবনত করিয়া হাওয়ালদারকে কি যেন চুপি চুপি বলিলেন। মুহূর্ত্ত-পরেই একজন সিপাহী দুইজন বাহক সহ পীড়িত ও আহত সৈন্যদিগকে বহিয়া নিবার উপযোগী এক খানি ডুলী আনিয়া উপস্থিত করিল। বৃদ্ধ হাওয়ালদার তখন সন্ন্যাসিনীর কাছে আসিয়া আধ বাঙ্গালা আধ হিন্দী কথায় বলিল. "তুমিলোক মাই, হামি মালুম্ কোর্‌ছে বাঙ্গালী। নাহি মাই ?"

সন্ন্যাসিনী।—"হ্যাঁ, আমি বাঙ্গালী।"

হাওয়ালদার —"তুমিলোক যতি হোয় মাই ?"

সন্ন্যাসিনী।—"না। গৃহস্থের মেয়ে।"

হাওয়ালদার।—"ঝুট্ মুট্ বোলেন কাহে ?"

সন্ন্যাসিনী।—"আমরা ঝুট্ মুট্ বলি না।"

হটন হাওয়ালদারকে বেশী কথা বলিয়া দেরি করিতে দেখিয়া, মনে মনে বড়ই বিরক্ত হইতেছিলেন। সাহেব তখন একটুকু বিরক্তির স্বরে ডাকিলেন, "হাওয়ালদার—।" হাওয়ালদার চমকিয়া তাড়া তাড়ি সাহেবের দিকে তাকাইয়া বলিল, "হুজুর—।" হটন বাঁ হাতে ঘোড়ার মুখের দড়ী ধরিয়া ডান হাতের তর্জ্জনীর পৃষ্ঠ দংশন করিতে করিতে অত্যন্ত কর্কশ স্বরে

বলিলেন, "ডেরি মট্ কোর্—। ডেরি মট্ কোর্—। জলডি কোর্—" হাওয়ালদার, সাহেবের কথায় এবার তাড়াতাড়ি ভয়-ত্রস্তভাবে ডুলী দেখাইয়া, সন্ন্যাসিনীর মুখ-পানে তাকাইয়া বলিল, "মাই, এমে উ'ঠে বো'ছ। তুমিলোককে আস্পাতালমে যানে হোবে। সাহেবের হুকুম্।"

সন্ন্যাসিনী।—"কেন আমার ত কোন অসুখ হয় নাই ?"

হাওয়ালদার সন্ন্যাসিনীর কথায় বিরক্ত হইয়া বলিল, "কি ক্রোর্বি মাই ? সাহেবের এসাই হুকুম্। তুমি লোকের হাত্তসে লহু গিরিছে। বন্দুককা গুলি লাগা মাই ? উ'ঠে বো'ছে কথা বোল্‌বে। সাহেব রুষ্ট্ হোগা।"

"এ সামান্য আঘাত। বন্দুকের গুলিই লেগেছে বটে।" হাওয়ালদারকে সংক্ষেপে এই কথা বলিয়াই সন্ন্যাসিনী পুনরায় অশ্বপৃষ্ঠস্থ হটনকে বলিলেন, "মহাশয়, আমার একজন সঙ্গিনী আছে।" হাওয়ালদার ব্যস্ততাবশত কথা বুঝিতে না পারিয়া বলিতে লাগিল, "আরে মাই, তুমি লোক কি বোকে ! উ'ঠে বোছ না ?" হটন হস্তস্থিত ছড়ী দ্বারা হাওয়ালদারকে নিষেধ করিয়া স্বকীয় দেবভাষায় গম্ভীরভাবে বলিলেন, "সঙ্গিনী থাকে, তাঁহার বন্দোবস্ত আমরাই করিব। তুমি এখন আমার আদেশ রক্ষা কর। দেরি করিও না।"

হটনের কথা শেষ হইলে সন্ন্যাসিনী একটী দীর্ঘ নিশ্বাস ছাড়িয়া সম্মুখের ডুলীতে চড়িয়া বসিলেন। বাহকদ্বয় ডুলী ধরাধরি করিয়া তখনই কাঁধে তুলিল। এমন সময় একজন যুবতী স্ত্রীলোক আসিয়া তাড়াতাড়ি ব্যস্ততার সহিত খাসিয়া কথায় বলিল, "ডুলী একটু থামাও।" বাহকেরা যুবতীর কথা কিছুই বুঝিল না। হাওয়ালদার কেবল বাহকদিগকে তর্জ্জন গর্জ্জন করিয়া বলিল, "চালাও—!" হটনও ঘোড়ার উপর হইতে ডুলী চালাইতেই বলিলেন। সুতরাং যুবতীর অনুরোধ অবহেলা করিয়া, ডুলী নিয়ে বাহকেরা তখনই ছুটিয়া চলিল। সন্ন্যাসিনী দেখিলেন, যুবতী একজন খাসিয়া-রমণী। দেখিয়াই চিনিলেন, যুবতী, জুন। সন্ন্যাসিনী ভয় ও বিস্ময়ের সঙ্গে আরও দেখিলেন,জুনের একখানি হাত তোপে উড়িয়াগিয়াছে। তবুও জুন অম্লানবদনে দৌড়াইয়া আসিয়া অপর হস্তে ডুলী ধরিয়াছিল। জুনের হাত ছাড়াইয়া বাহকেরা ডুলী হাঁকাইলে, জুন সেই এক খানি হাতেই কোমর হইতে একটী নেকড়ার ছোট গেঁজে ছিঁড়িয়া তাড়াতাড়ি ডুলীর মধ্যে

ছুড়িয়া ফেলিয়া তখনই পশ্চাতে অদৃশ্য হইয়া পড়িল। গেঁজেটী হাতে করিয়াই সন্ন্যাসিনী বুঝিলেন, গেঁজেতে কয়েকটী টাকা আছে। বুঝিলেন, তিনিই মধ্যে মধ্যে জুনকে যে দুই একটী টাকা দিতেন, জুন তাহা খরচ না করিয়া জমা করিয়া রাখিয়াছিল। জুন গেঁজেটী ডুলীতে ছুড়িয়া ফেলিয়াই বিদ্যুতের মত ছুটিয়া চলিয়াগেল। একজন সিপাহী দৌড়াইয়া জুনকে ধরিবার উদ্যোগ করিলে, হটন, সিপাহীকে নিষেধ করিয়া ভৎসনা করিলেন। সন্ন্যাসিনী দেখিলেন, জুনের সর্ব্ব শরীর ছিন্ন বাহুমূলের রক্তে ভাসিয়া যাইতেছে। তথাপি জুন মুহূর্ত্তে অম্লান-বদনে এত কাণ্ড করিয়া চলিয়া গেল। গুলির আঘাতে সন্ন্যাসিনীর হাতও প্রায় দুই ফাঁক হইয়া যাওয়াতে রক্তে তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ ভাসিতেছিল। সন্ন্যাসিনী এতক্ষণ পরে বেদনায় কাতর এবং দুর্ব্বল হইয়া পড়িলেন। ডুলীতে বসিয়া বসিয়া এখনও হটন সাহেবের মহত্ত্ব এবং জুনের ধৈর্য্যের কথা ভাবিতে ভাবিতে যাইতে লাগিলেন। মুহূর্ত্ত-মধ্যেই আবার "বিউগল্"এর ধ্বনির সঙ্গে সঙ্গে ইংরেজ-রণ-বাদ্য বাজিয়া উঠিল। আবার সিপাহীদিগের কামান এবং বন্দুক ঘন ঘন গর্জ্জিয়া দশদিক্ কাঁপাইয়া তুলিল। মধ্যে মধ্যে সেই "হীপ্—হীপ্—হুররে—" শব্দে পুনরায় ঘন ঘন জয়-ধ্বনি উঠিতে লাগিল। এদিকে জুনের মুখে সন্ন্যাসিনী মার বন্দী হইবার খপর পাইয়া খাসিয়ারাও এবার রণরঙ্গে উন্মত্ত হইল। জুন তখন একখানি পাথরের উপরে একাকী শুইয়া শুইয়া রক্তে ভাসিতে ভাসিতে প্রাণত্যাগ করিল। জুনের আত্মা, যদি স্বর্গাপেক্ষা কোন মহৎ এবং উচ্চ স্থান থাকে, তবে সেই দেশেই চলিয়া গেল।

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ।

দয়ালু পুরুষ।

ঘোরতর ঝড়, তুফান, বাদলার পরে নির্ম্মল আকাশে চাঁদ উঠিয়াছে। বাদাঞ্চলের লবণাক্ত জোয়ারের জল প্রকাণ্ড নদীর পাড় কূল ভাসাইয়া থৈ থৈ করিতেছে। জলে চন্দ্রের দিগন্তব্যাপী উজ্জ্বল জ্যোৎস্না পড়িয়া ছোট ছোট ঢেউয়ের গায়ে, ভাঙ্গা ভাঙ্গা স্রোতের আবর্ত্তে মাখিয়া, যেন রাশি

রশ্মি জ্যোতির ফুল ফুটাইয়া নদীর সুন্দর বুক ছাইয়া ফেলিয়াছে। যেন নীল আকাশের বুক হইতে নৈশ স্তব্ধতার মধ্যে তারাগুলি খসিয়া খসিয়া নদীর বুকে পড়িয়া আকর্ণ ডুবাইয়া সাঁতার খেলিতেছে অথবা নক্ষত্র বৃষ্টির পরে নদীর জলে রাশি রাশি জ্বলন্ত তারা ভাসিতেছে। নদী-তীরের এবং চারিদিকের ঘাসের পাতায়, জঙ্গলের গায়ে ফোঁটা ফোঁটা বৃষ্টির জল জ্বলিতেছে। অখণ্ড নিস্তব্ধতার মধ্যে স্রোতের জল তীরে তীরে কূলে কূলে আঘাত করিয়া অনবরতই কুল কুল, কল কল, তর তর শব্দে ছুটিতেছে। চারিদিকে একখানিও নৌকা বা একটীও মানুষের সাড়া শব্দ নাই। কোথায়ও পশু পক্ষীর শব্দ শুনা যাইতেছে না। কেবল নদীর জলে তীরের ধারে একখানি প্রকাণ্ড বজরা দুই গলুইতেই নঙ্গর করিয়া রহিয়াছে। তদ্ভিন্ন মোটা মোটা কাছী দিয়া তীরের উপরে বড় বড় খুঁটার সঙ্গে বজরা খানিকে আরও দৃঢ়তর করিয়া বাঁধা হইয়াছে। পর্ব্বতাকার প্রকাণ্ড বজরার তলায় ও পাশে পাশে স্রোতের জল আঘাত করিয়া, শব্দ করিয়া ছুটিতেছে। এত রাত্রিতেও বজরার গর্ভে গ্রন্থ-রাশিতে বেষ্টিত হইয়া একজন পরিণত-বয়স্ক শ্মশ্রুধারী পুরুষ নীরবে প্রদীপের সম্মুখে বসিয়া পড়া শুনা করিতেছেন। পুরুষ একজন জর্ম্মাণ-দেশীয় অগাধ বিদ্যাবিশারদ আস্তিক দার্শনিকের এক খানি বড় গ্রন্থ প্রগাঢ় মনোযোগের সহিত পাঠ করিতেছেন। পুরুষের চারিদিকে অনেক সংস্কৃত ও ইংরেজি গ্রন্থ স্তূপাকার করা রহিয়াছে। তাঁহার সম্মুখস্থ প্রদীপের দুই একটী রশ্মি নৌকাগর্ভ হইতে নদী-জলে পড়িয়া ক্রীড়া করিতেছে।

পুরুষ বজ্‌রার মধ্যে বসিয়া পাঠ করিতেছেন, এমন সময় ভৃত্য আসিয়া বলিল, "বাবু, শীঘ্র বাহিরে আসুন্। দেখুন্ এসে কি ব্যাপার!" পুরুষ ভৃত্যের কথায় চকিতের ন্যায় উঠিয়াই তাড়া তাড়ি বজ্‌রার সম্মুখের দিকে ছৈয়ের বাহিরে আসিয়া সেই দিগন্তব্যাপী ফুট্‌ ফুটে জ্যোৎস্নার আলোকে দাঁড়াইলেন। ভৃত্য তখন তাড়া তাড়ি তীরের দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া, বিস্ময় ও ভয়বিকৃতস্বরে বলিল, "দেখুন, ওটা কি!" ভৃত্যের অঙ্গুলীর সঙ্গে সঙ্গেই পুরুষের দৃষ্টি ফিরিল। পুরুষ দেখিলেন, একটী শব-দেহ জোয়ারের বানের আঘাতে তীরের উপরে উঠিয়াছে। শবের পায়ের কতকাংশ এখনও জলে পড়িয়া আছে। জলের

স্রোত তাহার উপর দিয়া ত্বরিতগতিতে ছুটিয়া ধাইতেছে। শবের মুখের উপরে চাঁদের কিরণ ভাঙ্গিয়া পড়িয়া, সেই স্তব্ধ ঘুমন্ত প্রকৃতির কোলে যেন এক উদাসময় চিত্র আঁকিয়া রাখিয়াছে। পুরুষ এই ব্যাপার দেখিয়াই, এক লাফে বজ্‌রার গলুইয়ের উপর হইতে নদীর তীরের উপরে নামিয়া, একবারে শবের কাছেই গিয়া দাঁড়াইলেন। ভৃত্য তাড়া তাড়ি মাঝী-দিগকে ডাকিতে উদ্যত হইলে পুরুষ ভৃত্যকে নিষেধ করিয়া বলিলেন, "থাক্‌ হ'রে, এখন মাঝীদিগকে জাগাস্‌নে।" পুরুষ, ব্রহ্মচারী ভবানীশঙ্কর।

ভবানীশঙ্কর ধীরে ধীরে শবের কাছে দাঁড়াইয়া দেখিলেন, শব একটী পরমসুন্দরী পূর্ণবয়স্কা যুবতী স্ত্রীলোকের। শবের রাশি রাশি সুদীর্ঘ কেশ-ভার চারিদিকে ছড়াইয়া কর্দ্দমে লুণ্ঠিত হইতেছে এবং মৃত মুখে যেন ফুটন্ত ফুল-রাশির মত রূপরাশি চাঁদের কিরণে উজ্জ্বলতর হইয়া ঘুমাই-তেছে। ভবানী তখন তাড়া তাড়ি শবের মুখের কাছেই বসিয়া পড়িলেন। প্রথম বারে ভবানীশঙ্করের দেহের ছায়ায় শবের সেই সুন্দর নির্ব্বাণ শোভা-রাশি-ভরা মুখখানি ঈষৎ অন্ধকারে ঢাকা পড়িল। ভবানী সরিয়া বসিলেন। এবার সেই জগদ্ব্যাপী জ্যোৎস্নায় শব-দেহের সহিত শবের মুখমণ্ডল পুনরায় আলোকিত হইল। ভবানী মাথা হেঁট করিয়া, শবের মুখের কাছে মুখ নিয়ে কি যেন দেখিতে লাগিলেন। দেখিতে দেখিতে ভবানীশঙ্করের মনে হঠাৎ কেন যেন প্রশ্ন উঠিল, "একি মৃত শব? মৃত?" মনে প্রশ্নোদয় হইবা মাত্রই ভবানীশঙ্কর আপনার দক্ষিণ করের পৃষ্ঠদেশ শবের নাসিকাগ্রে সংলগ্ন করিয়া ক্রমে এক, দুই, তিন বার পরীক্ষা করিলেন। ক্রমেই যেন ভবানীর মুখ-শ্রী পরিবর্ত্তিত হইতে লাগিল। ভবানীশঙ্কর তাড়া তাড়ি শবের নাকের সম্মুখ হইতে হাত সরাইয়া কপালে স্থাপন করিলেন। কপাল বরফের মত ঠাণ্ডা বোধ হইল! কপাল হইতে হাত তুলিয়া শবের বাঁ হাতের শিরা পরীক্ষা করিলেন। দেখিলেন, শিরা এখনও যেন ধিকি ধিকি চলিতেছে! তাড়া তাড়ি শবের হৃদ্‌পিণ্ডে কর্ণ স্থাপন করিয়া দেখিলেন, এখনও রক্তাধার ধুক্‌ ধুক্‌ করিতেছে। তখন ভবানীশঙ্কর হ'রেকে ডাকিয়া বলিলেন, "হরে, মাঝীদিগকে তাড়া তাড়ি জাগাত। জাগাইয়া তাড়া তাড়ি পাড়ের উপরে একটা শুক্‌না যায়গা দেখিয়া আগুন জ্বালিতে বল। স্ত্রীলোকটী বোধ হয় এখনও মরে নাই।"

হ'রে ভবানীশঙ্করের কথায় তাড়া তাড়ি মাঝীদিগকে জাগাইয়া আগুন জ্বালাইতে বলিয়া, নিজে একটা লণ্ঠনে একটা মোটা চর্‌বির বাতি জ্বালাইয়া পুনরায় ভবানীশঙ্করের কাছেই আসিয়া দাঁড়াইল। হ'রে তাড়া তাড়ি ভবানীশঙ্করের সম্মুখস্থ শবের মুখের কাছে লণ্ঠনের আলো ধরিয়া মাথা হেঁট করিয়া কি যেন দেখিয়া দেখিয়া বলিল, "বড় বাবু, ইনি কে চিনেছেন ?"

ভবানী।—"চুপকর্। চিনেছি।"

হ'রে।—"আমাকে দেখিলেই চিনিবেন কিন্তু?"

ভবানী।—"আগে বাঁচান যা'ক্ত। তেমন তেমন দেখিস্ত তুই সো'রে যা'স্! আমাকে চিন্‌বে কি ?"

হ'রে।—"বোধ হয় না। আপনার চেহারা অনেকটা বদ্‌লে গিয়েছে। আগে এ লম্বা লম্বা দাড়ী গোঁপ্ ছিল না, এ-ভাবও ছিল না, এ পোষাকও ছিল না। তার উপরে আবার চুল দাড়ীর প্রায় অর্দ্ধেক পাকিয়া যাওয়াতে, আপনাকে এই বয়সেই যেন বুড়া বুড়া বোধ হয়। আপনাকে বোধ হয় চিন্‌বেন না।"

এদিকে হ'রের কথামত মাঝীরা কাঠ সংগ্রহ করিয়া লণ্ঠনের আগুনে আগুন জ্বালিয়া বলিল, "বাবুজি মশাই, আগুন জ্বালিয়াছি।"

ভবানী।—"হ'রে তুই স্ত্রীলোকটীর পেট ঠিক মাথার উপরে রাখিয়া ধীরে ধীরে ঝাঁক্ দে।"

হ'রে ভবানীশঙ্করের কথায় স্ত্রীলোকের শব মাথায় করিয়া কয়েকবার মাত্র ঝাঁকিতেই শবের মুখ, নাক, কাণ দিয়া হড়্ হড়্ করিয়া জল পড়িতে লাগিল।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ।

ক্ষুদ্র তরণী-বক্ষে।

ভবানীশঙ্করের অনবরত চেষ্টা ও শুশ্রূষার্তে মৃতপ্রায় স্ত্রীলোকটীর দেহে পুনরায় জীবনের সম্পূর্ণ লক্ষণ প্রকাশিত হইয়াছে। যুবতীকে সকলে ধরাধরি করিয়া বজরার গর্ভে ভবানীশঙ্করের বিছানার উপরেই আনিয়া

শোওয়াইয়া রাখিয়াছে। প্রদীপের আলোকে ভবানীশঙ্কর অপর একখানি আসনে যুবতীর শিওরের কাছে বসিয়া তাঁহারি সম্বন্ধেই নানা কথা ভাবিতে ছিলেন। যুবতী ধীরে ধীরে বলিলেন, "আমি এখন কোথায় ?"

ভবানী।—"আপনি কি আপনাকে এখন সম্পূর্ণ সুস্থ বোধ করিতেছেন ?"

যুবতী।—"হ্যাঁ, আমি এখন বেশ সুস্থ হয়েছি। আমি এখন কোথায় ?"

ভবানী।—"আপনি এখন বারশাল জেলার অন্তর্গত বীরখালির কাছারির ঘাটে।"

যুবতী।—"এটা কি কোন জমিদারের কাছারি ? কাছারি কার ? আমি বৈদ্যির বাজার থেকে কত দূরে আসিয়াছি ?"

ভবানী।—"আপনি এখন অধিক কথা বলিবেন না। পারেন ত উঠিয়া কাপড় ছাড়ুন। আপনার পরিধেয় বস্ত্রে অনেক কাদা ও মাটী লাগিয়াছে।"

এই বলিয়াই ভবানীশঙ্কর একটী ছোট "ট্রঙ্ক" বা চর্ম্মাবৃত সিন্দুক হইতে আপনার একখানি শাদা ধব্ ধবে কাপড় বাহির করিয়া, যুবতীর সম্মুখে রাখিয়া ধীরে ধীরে বাহিরের দিকে চলিয়াগেলেন। আবার কতক্ষণ পরে যুবতীর অনুমতি নিয়ে প্রকোষ্ঠ-মধ্যে ফিরিয়া আসিলেন। এবার দেখিলেন, যুবতী শাদা ধব্ ধবে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন কাপড় খানি পরিয়া চুলের রাশি পিঠে ছড়াইয়া বিছানার উপরে বসিয়া আছেন। ভবানীশঙ্কর কাছে আসিয়া পুনরায় আসনে বসিলে, যুবতী সরল দৃষ্টিতে তাঁহার মুখ-পানে তাকাইয়া বলিলেন, "মহাশয়, আপনি আমায় জীবন দান করিলেন।" এই বলিয়াই যুবতী আর কিছু বলিতে পারিলেন না। ভবানীশঙ্কর যুবতীর মুখের ভাব ভঙ্গী দেখিয়া বুঝিলেন, কৃতজ্ঞতায় তাঁহার প্রাণ মন পরিপূর্ণ হইয়াছে। কিন্তু ভবানীশঙ্কর কিছুক্ষণ নীরবে থাকিয়া, শেষটা একটু সলজ্জভাবে ধীরে ধীরে বলিলেন, "আমি একজন সামান্য মানুষ। ভগবান্ ভিন্ন কেহ কাহারও জীবন রক্ষা করিতে পারে না। আমি তাঁহার যন্ত্রমাত্র। আপনার যত কিছু কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিবার থাকে, তাঁহারই কাছে করুন। আমি আমার কর্ত্তব্য কাজ করিয়াছি। তবে একটী কথা আমাকে বলুন, আপনি নদীতে কি করিয়া পড়িলেন ? যদি বেশী কষ্ট হয়, তবে নাও বলিতে পারেন। কিন্তু এই রাত্রির মধ্যেই আপনাকে আমি স্থানান্তরে না পাঠাইয়া সুস্থ হইতে পারিতেছি না। এখানকার কর্ম্মচারীদিগের অত্যা-

চারে পুরগন্নার সমস্ত প্রজা বিদ্রোহী হইয়াছে। আমি, এখানে পৌঁছিয়াই, কর্ত্তব্য-বোধে প্রথমেই দুষ্ট কর্ম্মচারীদিগকে কাজ হইতে অবসর দিয়েছি। তাহারাই এখন আবার বিদ্রোহীদের সঙ্গে যোগ দিয়া আমার বিরুদ্ধে ঘোর চক্রান্ত করিতেছে। আজ দিনে দুইবার বিদ্রোহীরা তাহাদের উত্তেজনায় আমার নৌকা চড়াও করিতে আসিয়াছিল। ঈশ্বর কৃপায় এইরূপ দুষ্কার্য্য সম্পন্ন করিতে তাহারা সাহস পায় নাই। কিন্তু ভবিষ্যতে কোন্ মুহূর্ত্তে কি ঘটিবে বলিতে পারি না। আমার ইচ্ছা, নির্ব্বোধ গরিব প্রজাদিগকে বুঝাইয়া শান্তি স্থাপন করিব। তাহাদের উপরে অত্যাচার করিয়া বা তাহাদের বিরুদ্ধে গভর্ণমেণ্টের সাহায্যার্থী হইয়া তাহাদিগকে ক্ষতিগ্রস্ত করিব না। তবে এই উত্তেজনার সময়ে চক্রান্তকারীদের মিথ্যার জাল ভেদ করিয়া, প্রকৃত ঘটনা এবং আমার অভিপ্রায় তাহারা বুঝিতেছে না। মা; আমি এই গরিবদের মধ্যে শান্তি-স্থাপনের জন্য এখন কেবল ভগবানকেই দিন রাত ডাকিতেছি। এস্থান এখন ছাড়িয়া পলাইলে আরও ক্ষতি হইবার সম্ভাবনা। কর্ত্তব্যের অনুরোধে এই চারিদিকে বিপদে বেষ্টিত হইয়াও আমাকে এখানেই এখন থাকিতে হইতেছে। কিন্তু আপনি স্ত্রীলোক। আপনাকে আমি আর এক মুহূর্ত্তও এখানে রাখিতে সাহস পাইতেছি না। আপনি কোথায় যাইতে ইচ্ছা করেন বলুন।

যুবতী।—"এখন আর কথা বলিতে আমার বিন্দুমাত্রও কষ্ট হইতেছে না। আপনাকে আমার সকল বৃত্তান্ত সংক্ষেপে বলিতেছি। আমি আমার মাতামহ ঠাকুরের সঙ্গে খাসিয়া-পর্ব্বতে বিজন-বাস করিতেছিলাম। খাসিয়াদের সঙ্গে ক্রমে ক্রমে আমাদের বড়ই আত্মীয়তা হইয়াছিল। সংপ্রতি খাসিয়াদের সঙ্গে ইংরেজ গভর্ণমেণ্টের বিবাদ উপস্থিত হইয়াছে। মেজর হটন্ নামক এক জন সাহেব সিপাহী নিয়ে খাসিয়া-পর্ব্বত চড়াও করিয়াছেন এবং আমার আত্মীয়দিগকে বন্দী করিয়াছেন। হটন্ সাহেবের লোকেরাই আমাকে কয়েক দিন হইল, শ্রীহট্টজেলার অন্তর্গত ছাতক পর্য্যন্ত পৌঁছাইয়া দিয়া বিদায় করিয়াছে। সাহেবের আদেশ ছিল, আমাকে ঢাকা পর্য্যন্ত পৌঁছাইয়া দেওয়া হয়। কিন্তু লোকেরা তাহা করে নাই। আমার সঙ্গে কিছু টাকা ছিল। তাহা দিয়া একখানি নৌকা করিয়া ঢাকায় যাইতেছিলাম। সেখান হইতে তুলসী গ্রামে যাইতে ইচ্ছা ছিল। তুলসীগ্রাম আমার জন্ম ভূমিমাত্র। কিন্তু সেখানে আমার কেহ নাই।

আমি তুলসী গ্রামে থাকিব ঠিক্ করি নাই। কলিকাতায় আমার মাতামহ ঠাকুরের একজন বন্ধু আছেন। আমার ইচ্ছা, তাঁহার সাহায্যে আমার আত্মীয়দিগের মুক্তির জন্য গভর্ণমেণ্টের নিকট প্রার্থী হইব। তাঁহারা সম্পূর্ণ নির্দ্দোষে বন্দী হইয়াছেন। আমার নিকট এখনও টাকা আছে। টাকার গেঁজেটী আঁচলের খোঁটেই বাঁধা ছিল। কাপড় ছাড়িতে এখন আবার পাইয়াছি। আপনি কেবল কৃপা করিয়া আমাকে একখানি নৌকা আনাইয়া দিন। পথে আজ সন্ধ্যার পরে ঝড়ে হঠাৎ আমার নৌকার নঙ্গর উঠিয়া যাওয়াতে, নৌকাখানি অন্ধকারে ঢেউয়ের উপরে চড়িয়া ঝড়ের আগে আগে ছুটিতে লাগিল। নৌকা কোথায় আসিয় ডুবিয়াগেল, কিছুই বলিতে পারি না। আমি একটী বালিশ ধরিয়া ভাসিতেছিলাম। শেষটা হাত অবশ হইয়া বালিশ কখন্ ছুটিয়া গিয়াছে, কখন্ আসিয়া আমার মৃত-প্রায় শরীর তীরে ঠেকিয়াছে, কিছুই জানি না। ঝড় বোধ হয়, অনেকক্ষণ ব্যাপিয়া হইয়াছে।

ভবানী।—"উঃ! এই কয়েকটীমাত্র ঘণ্টায় আপনি প্রায় পাঁচ ছয় দিনের রাস্তায় ভাসিয়া আসিয়াছেন। বোধ হয় জোয়ারের সময় বানের জলে আপনার মৃতপ্রায় শরীর তীরের গায়ে আসিয়া ঠেকিয়াছিল। যাহোক্, আমি আপনাকে এখনই আমার সঙ্গের ছোট পান্সীতেই পাঠাইতেছি। দুই জন ভাল মাঝী আছে আর একজন বৃদ্ধ আছে। বৃদ্ধকেও সঙ্গে দিতেছি। মাঝীরা আমার চেনা লোক এবং বিশ্বাসী। কিন্তু আমার কয়েকটী কাতর অনুরোধ আপনাকে রক্ষা করিতে হইবে।"

যুবতী মাথাটী হেঁট করিয়া বলিলেন, "আপনি আমাকে জীবন দিয়েছেন। সঙ্গত হইলে, আপনি যে অনুরোধ করিবেন, অতি কষ্টকর হইলেও, তাহা প্রতিপালন করিতে চেষ্টা করিব।"

ভবানী।—"তুলসী গ্রামে গিয়া আপনাকে ভবানীশঙ্কর রায়ের বাড়ী উঠিতে হইবে। আমার সঙ্গে পুনরায় সাক্ষাতের পূর্ব্বে কোথায়ও যাইতে পারিবেন না। আমার এই কাতর অনুরোধ আপনাকে অবশ্যই প্রতিপালন করিতে হইবে। তোমার এবং তোমার আত্মীয়ের নিকট আমি—"

ভবানীশঙ্কর এই পর্য্যন্ত বলিয়াই, আর কিছু বলিতে পারিলেন না। কথা বলিতে বলিতে যেন কণ্ঠরোধ হইয়া আসিল। দুইটী চোক্ জলে ভাসিয়া উঠিল। ভবানী বলিতে বলিতে মাঝখানটীতেই কথা বন্ধ করিয়া

উঠিয়া তাড়াতাড়ি দূরে সরিয়া গেলেন। যুবতী এই অবসরেই দেখিলেন—দেখিয়া শিহরিলেন; দেখিলেন, দয়ালু পুরুষের চোখের ফোঁটা ফোঁটা জল গড়াইয়া গড়াইয়া শ্মশ্রুরাশির উপরে পড়িয়া দীপালোকে জ্বলিতেছে। কিন্তু কারণ জিজ্ঞাসা করিবার পূর্ব্বেই পুরুষ হঠাৎ কথা বন্ধ করিয়া দূরে সরিয়াগেলেন। ভবানীশঙ্কর বলিতেছিলেন, "তোমার এবং তোমার আত্মীয়ের নিকট আমি বড় অপরাধী।"

যুবতী এতক্ষণ পুরুষকে চিনিতে কোনই চেষ্টা করেন নাই। এখন "পুরুষের চোখের জল দেখিয়া এবং হঠাৎ পুরুষের মুখে "আপনি" "আপনি" বলার পরিবর্ত্তে "তোমার" কথা ফুটিল শুনিয়া, একবারে যেন তাড়িতাহতের মত চমকিয়া উঠিলেন। যুবতী এবার বিছানার উপরে সেই দুর্ব্বল শরীর লইয়া কাঁপিতে কাঁপিতে দাঁড়াইলেন। কিন্তু পুরুষ মুখের কথা শেষ না করিয়াই হঠাৎ সরিয়াগেলেন দেখিয়া, আবার তখনই সন্দেহ-দোদুল্যমান-চিত্তে বসিয়া পড়িলেন। যুবতীর মাথা এখনও ঘুরিতেছিল, মনে একটা প্রবল আন্দোলন চলিতেছিল। আন্দোলিত মনে থাকিয়া থাকিয়া প্রশ্ন হইতে লাগিল, "ইনি কে? এ দয়ালু পুরুষ কে? কেমন সাম্য মূর্ত্তি! দেখলেই বোধ হয় যেন পরোপকারব্রতে জীবন ঢাকিয়াছেন। ইনি কি বড় মামা? ভবানীশঙ্কর?"

এদিকে ভবানীশঙ্কর বাহিরে আসিয়াই, ক্ষুদ্র পান্সীখানিতে যুবতীর জন্য একখানি বিছানা করিয়া, সমস্ত প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি তুলিয়া দিতে বলিলেন। ভবানী নিজে সমস্ত দেখিয়া দিলেন এবং মাঝীদিগকে অনেক করিয়া বলিয়া দিলেন, যেন বহুযত্নে যুবতীকে তুলসীগ্রামে পৌঁছাইয়া দেওয়া হয়। আরও বলিলেন, যেন ডাকা'তে বাসদেবপুরের কাছে অতি সাবধানে যাওয়া হয় এবং দিনে দুপরেই যেন সেস্থানটা ছাড়াইয়া যাওয়া হয়। কারণ, বরিশাল জেলার সর্ব্বত্রই একটু একটু ভয় থাকিলেও, আজ কাল মধ্যে মধ্যে ওখানটাতেই বেশী ডাকা'তি হইবার খবর পাওয়া যায়। হরানন্দ ব্রহ্মচারীর দলই আজ কাল সুন্দর-বনাঞ্চলের নানা স্থানে ডাকা'তি করিয়া বেড়ায়। পরে বৃদ্ধ মাঝী ও দীনুমাঝীকে চুপি চুপি বিশেষ করিয়া বলিয়া দিলেন, "যেন পথে কোন রকমেই যুবতী আমার পরিচয় জানিতে পারেন না। জিজ্ঞাসা করিলেও তোমরা কিছু বলিও না। প্রহ্লাদ-মাঝী ছে'লে মানুষ, তাহাকেও সাবধান করিয়া দিও।" ভবানীশঙ্কর এই

প্রকার নানা সাবধানতার কথা বলিয়া মাঝীদিগকে বিদায় করিয়া দূরে সরিয়া গেলেন। মাঝীরা যুবতীকে নৌকায় তুলিয়াই, নৌকা জোয়ারের প্রবল স্রোতে ছাড়িয়া দিবা মাত্র, তীরেরবেগে ছুটিয়া চলিল। হ'রে যুবতীর চৈতন্য সঞ্চারের প্রথম অবস্থাতেই অদৃশ্য হইয়াছিল। এবার ভবানীশঙ্করও অদৃশ্য হইলেন। যুবতী গাঢ় ইচ্ছাসত্বেও দয়ালু পুরুষের সঙ্গে আর সাক্ষাৎ করিতে পারিলেন না। সুতরাং যুবতীর মনে পূর্ব্ববৎই এক অবিশ্রান্ত স্রোতে সেই আন্দোলন চলিতে লাগিল। যুবতী, পাষাণী।

উপসংহার।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

সুন্দরবনে ডাকা'তের বাড়ী।

"The Sunderbuns having been ordinarily regarded as the natural harbour of dacoits, &c. &c." (১)

বাঙ্গালার দক্ষিণপ্রান্তে আজও চব্বিশ-পরগনা, যশোর এবং বরিশাল জেলার কতকাংশ ব্যাপিয়া সমুদ্রোপকূলভাগ পর্য্যন্ত সমস্ত স্থান জনসমাগম-শূন্য গভীর অরণ্যে ঢাকা রহিয়াছে। এই জন-শূন্য অরণ্যময় প্রদেশই সুন্দরবন নামে বিখ্যাত। সুন্দরবনের জমি সকল সাতিশয় নিম্নতল। জোয়ার ও বানের সময় লোণাজলে অধিকাংশস্থলই ডুবিয়া যায়। জলে বড় বড় কুম্ভীর, হাঙ্গর, মকর ও কচ্ছপ বাস করে। নদীতটের অরণ্যে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড জ'টো বাঘ, বড় বড় অজগর সর্প, দলে দলে হরিণ ও বন্য মহিষ দিনে দ্বিপ্রহরেও স্বেচ্ছামত সর্ব্বস্থানে চরিয়া বেড়ায়। এই ব্রিটিসসিংহের রামরাজ্যের সুশাসন সময়েও অদ্যাবধি এই অঞ্চলে ভয়ানক চোর ও দস্যু-

---

(১) কোর্ট্ অব্ ডিরেক্টর্স (Court of Directors) এর নিকট লিখিত ভারত গভর্ণমেণ্টের ১৮১৪ খৃষ্টাব্দের ২৯শে নবেম্বরের চিঠি হইতে সঙ্কলিত।

ভয়ে জলপথের পথিকদিগকে সর্ব্বদাই শঙ্কিত থাকিতে হয়। যাঁহারা বরিশাল জেলার দক্ষিণ অঞ্চলে আজও ভ্রমণ করিতে যান, তাঁহারা সকলেই জানেন, জলে সর্ব্বদা জল-পুলিসের নৌকা ডঙ্কা দিয়া, কাটা নিশান উড়াইয়া ছুটাছুটি করিতেছে। স্থলে, অল্প অল্প দূরেই থানা ও ফাঁড়ির বন্দোবস্ত রহিয়াছে। তথাপি দস্যুতার বিরাম নাই, চুরির বিশ্রাম নাই। তথাপি রাত্রিকালে নৌকাযোগে একস্থান হইতে স্থানান্তরে যাইবার সুবিধা হয় না। জল-পুলিস সন্ধ্যা সময়েই যাত্রীদিগের পান্‌সী ও মাল বোঝাই নৌকা সকলকে নদী-তীরে বহর বাঁধিয়া নঙ্গর করিতে বাধ্য করে। এই অঞ্চলের লোক সকল সাধারণতই অসমসাহসী। নদীগুলি সর্ব্বস্থানেই শতমুখে দূর দূরান্তরে ধাইয়া ছুটিতেছে। এক মাইল যাইতে না যাইতে তিন চারি বার নদীর মোহানার সঙ্গে সাক্ষাৎ না হইয়া যায় না। এক এক স্থলে অন্যূন পাঁচ সাতটী কিম্বা দশটী নদী একত্র মিশিয়া, নানা দিকে ধাবিত হইয়া এক একটী মোহানার সৃষ্টি করিয়াছে। *দস্যুগণ প্রায়ই মোহানার সম্মুখে ডাকা'তি করিয়া* স্বেচ্ছাক্রমে কোন অনির্দ্দিষ্ট দিকে চলিয়া গিয়া সুন্দরবনের বিজন অরণ্যে আশ্রয় গ্রহণ করে। তখন জল-পুলিস বা স্থল-পুলিস কেহই তাহাদিগের সন্ধান করিতে পারে না। এ অঞ্চলের দস্যুরা প্রায়ই ছোট ছোট দ্রুতগামী ছিপে চ'ড়িয়া ডাকা'তি করিয়া থাকে। অনেকে বলেন, সুন্দরবন চিরদিনই এইরূপ অরণ্যময় নিম্নভূমি ছিল না। এক সময়ে বাঙ্গালার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সমৃদ্ধিশালী জনপদ এই অঞ্চলেই ছিল। এই কথা নিতান্ত অমূলক বলিয়াও বোধ হয় না। এখনও সুন্দরবনের স্থানে স্থানে প্রাচীন পুরীর ও দেবমন্দিরের ধ্বংশাবশেষ সকল পড়িয়া রহিয়াছে। কোন কোন স্থানে দ্বিতল, ত্রিতল ইষ্টকালয় সম্পূর্ণ বা কতকটা করিয়া মাটীর নীচে প্রোথিত হইয়া গিয়াছে। এই সকল জঙ্গলাকীর্ণ প্রাচীন পুরীর মধ্যে দস্যুগণ নির্ব্বিঘ্নে আপনাদের লুণ্ঠন-লব্ধ দ্রব্যাদি সারিয়া রাখিয়া নিশ্চিন্তমনে সর্ব্বত্র অত্যাচার করিয়া বেড়ায়। এখন নানাদিক্ হইতে লৌহপথ খোলাতে সুন্দরবনী বা বাদাঞ্চল দিয়া পূর্ব্বের মত আর অধিক যাত্রীর নৌকা বা মালবোঝাই বড় বড় ভড় যাতায়াত করে না। এই জন্য ডাকাইতির সংখ্যা ক্রমেই কমিয়া আসিতেছে। কিন্তু অদ্যাবধিও এই প্রদেশ বিঘ্ন ও ভয়শূন্য হয় নাই। যে সময়ের কথা বলিতেছি, তখন ডিংসাই বংশোদ্ভব ৺ভীমরায় নামক ক্ষুদ্র জমিদার ও দস্যুদলপতির একমাত্র আদরের উপযুক্ত জামাতা

হরদেব বাঁড়ুয্যেই এ প্রদেশের প্রধান দস্যুদলপতি ছিলেন। নিজ-গুণে হরদেব অতি অল্পদিনের মধ্যেই এ অঞ্চলের দস্যুসমাজে বিশেষ খ্যাতি প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছিলেন। অল্প বয়সেই হরদেবের পত্নী একটীমাত্র পুত্রসন্তান রাখিয়া ইহলোক ত্যাগ করেন। হরদেব তদবধি ব্রহ্মচারীর পোষাক পরিয়া হরানন্দ ব্রহ্মচারী নাম ধারণ করিয়াছিলেন। হরানন্দ ব্রহ্মচারী সাতিশয় ইন্দ্রিয়াসক্ত ও দুশ্চরিত্র লোক হইলেও ইতরশ্রেণীর মানুষদের নিকট দৈববলে বলীয়ান বলিয়া বিখ্যাত হইয়াছিলেন। দস্যুতাকার্য্যে অসাধারণ সাহস ও চাতুর্য্যই হরানন্দের এইরূপ সম্মান লাভের উপযুক্ত কারণ ছিল। তান্ত্রিক সাধনার ভাণ করিয়া মদিরাপানে উন্মত্ত হইয়া ব্রহ্মচারী অল্পদিনেই অনেক নিরাশ্রয় স্ত্রীলোকের সতীত্বভূষণ বলপূর্ব্বক অপহরণ করিয়াছিলেন। দস্যুগণ পথিকদিগের অন্যান্য দ্রব্যের সঙ্গে ব্রহ্মচারীর বর্ণিত ও আদেশানুযায়ী সুলক্ষণাক্রান্ত স্ত্রীলোক পাইলেই, লুণ্ঠন করিয়া প্রস্থান করিত। বাসুদেবপুর বা ডাকা'তে বাসদেবপুরে হরানন্দ ব্রহ্মচারীর শ্বশুর ৺ভীমরায়ের ভদ্রাসন ছিল। কিন্তু সুন্দরবনের একটী গুপ্ত পোড়'বাড়ীতেই দস্যুতালব্ধ দ্রব্যাদি সমস্ত রক্ষিত হইত। এই প্রাচীন ভগ্নপুরীতে একখানি প্রস্তরময়ী ডাকা'তে শ্মশানকালীর প্রতিমা বহুকাল হইতে প্রতিষ্ঠিত ছিল। ৺ভীমরায়ের পরে হরানন্দ ব্রহ্মচারীই এই কালীর পূজক হইয়া ছিলেন। হরানন্দের তান্ত্রিক সাধনার স্থানও এই শ্মশান কালীর মন্দিরেই ছিল। হরানন্দ ভীমরায়ের সমস্ত সম্পত্তিরই অধিকারী হইয়াছিলেন।

পাঠককে এখন একবার গ্রন্থারম্ভের কথা স্মরণ করিতে অনুরোধ করিতেছি। আজ——এখানে আজের অর্থ পাঠককে ঘটনার সময় বুঝিয়া লইতে হইবে——আজ তিন মাস হইল, বীরখালি হইতে তুলসী গ্রামে যাইবার কালে পথে বাসদেবপুরের সম্মুখের নদীর বক্ষ হইতে সন্ধ্যার সময়ে সেই ক্ষুদ্র পান্সীর আরোহী পরমসুন্দরী এলোকেশী সন্ন্যাসিনীকে ডাকা'তেরা ছিপে করিয়া হরানন্দ ব্রহ্মচারীর সুন্দরবনের গুপ্ত আবাসে আনিয়া বন্ধ করিয়া রাখিয়াছে। সেই সুন্দরী যে পাষাণী, একথা এখানে আর বিশেষ করিয়া বলা নিষ্প্রয়োজন বোধ হইতেছে। পাষাণী আজ তিন মাস পর্য্যন্ত ডাকা'তের সরদার হরানন্দের চক্রান্তে এই বিজন অরণ্যের মধ্যস্থিত পোড়' প্রাচীন পুরীতে বন্দি-ভাবে দিন কাটাইতেছে। যেন ক্রোধোন্মত্ত বন্য মহিষ, জ'টো

বাঘ এবং অজগর সর্পের ভয়েই এই নিবিড় উচ্চ সুন্দরী বৃক্ষের অরণ্য ভেদ করিয়া, দিবসে সূর্য্যের রশ্মি, জ্যোৎস্না রাত্রিতে চাঁদের কিরণ এবং বাতাস পর্য্যন্ত প্রবেশ করিতে সাহস পায় না। কেবল দুর্দ্দান্ত দস্যুরাই সর্ব্বদা আপনাদের লুণ্ঠনের জিনিষাদি নিয়ে, এই ভীষণ দুর্গম জঙ্গলে অতি সতর্ক ভাবে যাতায়াত করে। পাষাণী যে আজ তিন মাস পর্য্যন্ত সেই ভয়ঙ্কর প্রাচীন ভগ্ন পুরীতে বন্দী হইয়া কষ্টে দিনপাত করিতেছে, ইহা কেবল হরানন্দ এবং হরানন্দের বিশ্বস্ত কয়েকজন দস্যু ব্যতীত এ পৃথিবীর আর কেহই জানে না। সেই তিন মাস পূর্ব্বে সন্ধ্যাসময়ে দস্যুরা যখন সন্ন্যাসিনীকে নিয়ে ছিপ ছাড়িয়া সেই অল্প অল্প আঁধারে গা ঢাকিয়া বাজ পক্ষীর মত শাঁ শাঁ করিয়া ছুটিয়া চলিয়া গেল, তখন সেই আঠার উনিশ জন বলবান্ দস্যুর মধ্য হইতে কয়েকজনমাত্র সাহসী লোক হঠাৎ ক্ষুদ্র পান্‌সীর উপরে লাফাইয়া পড়িল। অবশিষ্টেরা মুহূর্ত্ত মাত্র অপেক্ষা না করিয়া সন্ন্যাসিনীকে লইয়া প্রস্থান করিল। যে ডাকা'তের গুপ্তচর কালী-সাধনার পক্ষে সর্ব্ব সুলক্ষণাক্রান্ত এই যুবতী-রত্নের সংবাদ দিয়া, ব্রহ্মচারীর নিকটে প্রচুর পুরস্কার পাইবার জন্য এবং আজ হইতে তাঁহার বিশেষ প্রিয় পাত্র হইতে পারিবে মনে করিয়া আনন্দে উৎফুল্ল হইতেছিল, সে মানুষটীও, যে কয়েকজন লোক ক্ষুদ্র পান্‌সীর দ্রব্যাদি লুণ্ঠন করিতে রহিয়া গেল তাহাদেরই সঙ্গে রহিল। সে নৌকায় দাঁড়াইয়াই পান্‌সীর উপরিস্থিত অপর ডাকা'তদিগকে বলিল "দেখ ভাই, একটা কাজ বড় ভাল হয় নাই। এই নৌকায় তিন জন মাঝী ছিল। বোধ হয় তাহারা পাড়ে উঠিয়া পলাইয়াছে।" এই কথা শুনিয়া, আর এক ব্যক্তি বলিল, "আমি দে'খেছি, দুইজন মাঝী নৌকা ফেলিয়া সাঁতরাইয়া পাড়ের দিকে গিয়াছে। কিন্তু আর একজনকে দেখি নাই।"

চর।—"একজন বুড়া। তাকে কো'রে কিছু ভয় নাই। সে হয়ত সাঁতরাইতেই জলে ডুবিয়াছে। কিন্তু যে দুই বেটার ছে'লে পলাইয়াছে, তাদিগকে এখনই ধরিয়া খুন করা উচিত।"

চরের কথা শেষ হইতে না হইতেই দস্যুরা ক্ষুদ্র পান্‌সীখানিকে তীরের কাছে লইয়া গিয়া দুইজনকে লাঠি সহ তৎক্ষণাৎই পলাতক মাঝীদিগের অনুসন্ধানে পাঠাইল। অবশিষ্টেরা তখনই তাড়াতাড়ি পান্‌সীর খানা-

তল্লাসিতে প্রবৃত্ত হইল। কিন্তু পান্সীতে যৎসামান্য তৈজসপত্র এবং খাদ্য দ্রব্য বই আর কিছুই না পাইয়া ক্ষুণ্ণমনে সকলে মিলিয়া তখনই নৌকা খানিকে নদীর ঠিক্ মধ্যস্থলে ডুবাইয়া দিয়া সাঁতরাইয়া তীরে উঠিল। এক জন নৌকামধ্যে প্রাপ্ত জিনিষ লইয়া অগ্রেই তীরে নামিয়া প্রস্থান করিয়াছিল। সেই বৃদ্ধ মাঝী এতক্ষণ পূর্ব্বভাবেই নৌকার দড়ি ধরিয়া তলে গিয়া নাক ভাসাইয়া কোন প্রকারে আত্মগোপন করিতেছিল। কিন্তু যখন দস্যুরা তাড়া তাড়ি নদীর মধ্যস্থলে নৌকা ডুবাইয়া প্রস্থান করিল, তখন বৃদ্ধও ভয়ে ভয়ে সেই দড়ী ধরিয়া নৌকার সঙ্গে সঙ্গেই ডুব দিল। কিন্তু সে আর সেই গভীর জলের মধ্য হইতে জীবিত থাকিতে উঠিতে পারিল না। এ দিকে যে দুইজন দস্যু পলাতক দিগের অনুসন্ধানে প্রকাণ্ড দুইখানি লাঠি কাঁধে ফেলিয়া ছুটিয়া গিয়াছিল, এই অবসরে তাহারা ফিরিয়া আসিয়া অপর দস্যুদিগকে চুপি চুপি বলিল, "ভাই, কাজ ত শেষ করিয়াছি, এখন লাস দুইটার কি হবে?" এই কথার পরে লাস সারিতে পলকে সকলে মিলিয়া ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটিল। এই ঘটনার তিন চারি দিন পরে জল-পুলিসের লোকেরা সেই বৃদ্ধের পচা, মাছ ও কচ্ছপের ভুক্তাবশিষ্ট, কাকে ঠোকরান, বিকৃত মৃত দেহ ভাসমানাবস্থায় বাসদেবপুরের পাঁচ ছয় মাইল ভাটিতে জলের মধ্যে পাইয়া থানায় চালান করিল। তখন শব দেখিয়া আর মানুষ ঠিক করিবার সুবিধা ছিল না। পচা শবটী কার্য্যদক্ষ কর্ম্মঠ পুলিস-কর্ম্মচারীদিগের উদ্যোগে কিছুদিন নদীতীরে একখানি টং বা ছোট উঁচু বাঁশের মাচার উপরে শায়িতাবস্থায় পচিয়া, গলিয়া, কাক ও শকুনিদের উদর পূর্ত্তির বিশেষ বন্দোবস্ত করিল এবং শেষটা প্রকৃতির নিয়মে মাটী, জল ও বায়ুতে মিশাইয়া গেল। থানার এবং জলপুলিসের গোলামালি কনষ্টেবল, পাঁচু চৌকিদার ও মিঞাজান নৌকার মাঝী হইতে ফণিভূষণ বড় দারগা এবং পুলিসের জেলাস্থ বড় সাহেব জ্যাক্শন পর্য্যন্ত সকলেই দস্যু-দলপতি হরানন্দ ব্রহ্মচারীর ভেট ও নজরে বিশেষরূপ বিমোহিত। তবে বুড়া মাঝী মিন্সের বিট্‌লে শবটা নেহাত নাছোড়বন্দা মত পচিয়া, ফুলিয়া, ভাসিয়া ভাসিয়া বেড়াইতে আরম্ভ করাতেই তাহার সম্বন্ধে একটা কিছু উচিত বিধান করিতে হইয়াছিল। তাই পুলিস নিতান্তই বাধ্য হইয়া শেষটা ডঙ্কা দিয়া, নিশান উড়াইয়া, গলিতাবশিষ্ঠ শবটীকে তুলিয়া আনিয়া টঙে সাজাইয়া রাখিয়াছিল। কার্য্যদক্ষ, সুকর্ম্মঠ পুলিসের কর্ত্তব্য কার্য্য ইহার অপেক্ষা আর অধিক কি আশা করা যাইতে পারে?

ভবানীশঙ্কর বীরথালি হইতে যখন দশ বার দিন পরে পূর্ব্ব-লিখিত চিঠির প্রত্যুত্তরে জানিলেন, তদবধিও পাষাণীর নৌকা তুলসীগ্রামে পৌঁছে নাই, তখন বড়ই চিন্তিত হইলেন। কিছু দিন পরে পরে আরও বাড়ীর প্রধান কর্ম্মচারীর অনেকগুলি চিঠি পত্র পাইয়া অবগত হইলেন, পাষাণীর নৌকা এখনও তুলসীগ্রামে যায় নাই। তখন মহারাজা ভবানীশঙ্কর রায় বাহাদুর বিষম বিপদ গণিয়া, নানা প্রকার অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইলেন। টাকা ব্যয় হইল, সময় গেল, কিন্তু ফল কিছুই হইল না। এইরূপে দেখিতে দেখিতে এক, দুই করিয়া তিন মাস গত হইয়া গিয়াছে। পাষাণী এখনও সেই ডাকা'তের অন্ধকার কারাগারে বন্দি-দশায় রহিয়াছে। কিন্তু ভবানীশঙ্কর আজও তাহার পুনঃপ্রাপ্তি বিষয়ে একবারে নিরাশ হন নাই। কেন?

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

অপূর্ব্ব দৃশ্য।

দস্যুরা পাষাণীকে সুন্দর বনের যে গুপ্ত আবাসে বন্দী করিয়া রাখিয়াছে, সেটী একটী ভগ্ন প্রায় উচ্চ প্রাচীর-বেষ্টিত প্রাচীন ত্রিতল ইষ্টকালয়। তাহার চারিদিকের প্রাচীরের কোন কোন অংশ, দেওয়াল ও ছাদ ভাঙ্গিয়া পড়িয়া রাশি রাশি ইষ্টক-স্তূপ প্রস্তুত হইয়াছে। সেই স্তূপের উপরে বড় বড় সুন্দরী গামারী প্রভৃতি বাদা বনের নানা রকম গাছ, গিলা ও নাটার নিবিড় অরণ্য রচিত হইয়াছে। কিন্তু এই উচ্চ প্রাচীরবেষ্টিত নিবিড় কণ্টকাবৃত অন্ধকারাচ্ছন্ন বনের মধ্যস্থিত বাটীটীর কোন কোন অংশ এখনও বাসের উপযোগী আছে। এই ত্রিতল ইষ্টকালয়ের প্রায় অর্দ্ধেক মাটীর নীচে প্রোথিত হইয়াছে। অর্থাৎ সমস্ত একতল এবং দ্বিতলের প্রায় অর্দ্ধাংশ মাটীর নীচে বসিয়া গিয়াছে। দ্বিতলের অপরাংশ এবং সমস্ত ত্রিতল গৃহ একটী সিঁড়ী-ঘরের সহিত বনের প্রায় মাথায় মাথায় উঁচু হইয়া রহিয়াছে। বাহির হইতে একটী আঁধার সুড়ঙ্গ দ্বারা সর্ব্বনিম্ন তলের গৃহে প্রবেশ করিতে হয়। এ স্থান দিবসেও অমাবস্যার ঘোর অন্ধকারাপেক্ষা নিবিড়তর অন্ধকারে আচ্ছন্ন যেন বহুকালের আঁধার এখানে জমাট বাঁধিয়া রহিয়াছে। বড় মশালের আলো নিয়ে প্রবেশ করিলে,

বোধ হয় যেন সেটী একটী অনেক ঘর দরজা বিশিষ্ট প্রকাণ্ড পাতালপুরী। এই পাতালপুরীরই এক কোণে ঊর্দ্ধতল সমূহে উঠিবার সিঁড়ী-ঘর এবং অপর একস্থানে সেই পাষাণময়ী ডাকা'তে শ্মশান কালীর প্রকাণ্ড মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত। দেবীর সম্মুখে পূর্ণ কলস এবং অল্প দূরে নরবলী ও ছাগবলিদানার্থ হাঁড়ী-কাঠ প্রোথিত রহিয়াছে। আবশ্যক হইলে, মায়ের নিকটে ডাকা'তগণ নারীবলিও দিয়া থাকে। ডাকা'তদের বিশ্বাস, কালীই তাহাদিগকে দস্যু-তার সময়ে বাহুতে বল, মনে সাহস দান করেন এবং বিপদে রক্ষা করেন। এই কালীকে ব্রহ্মচারী সিদ্ধিবলে হস্তগত করিয়াছেন বলিয়া দস্যুদিগের দৃঢ়বিশ্বাস। কালীর প্রকোষ্ঠের চতুর্দ্দিকস্থ অপরাপর প্রকোষ্ঠে ডাকা'তদের লুণ্ঠনের জিনিস পত্র থাকে। আবশ্যক হইলে, বন্দীদিগকেও এই স্থানে লুকাইয়া রাখা হয়। বাহির হইতে এই পাতালপুরীতে প্রবেশের সেই ক্ষুদ্র স্থড়ঙ্গ পথের প্রবেশদ্বার এমনই একটী নিবিড় জঙ্গলাকীর্ণ স্তূপের গায়ে খোদিত এবং তাহা এমনই কৌশলে একখানি ইষ্টক-নির্ম্মিত দৃঢ় পুরাতন দেওয়ালখণ্ডে সর্ব্বদা ঢাকা থাকে যে, ব্রহ্মচারীর দস্যুগণ ব্যতীত অপর কেহই তাহার সন্ধান পাইতে পারে না। দস্যুরা সর্ব্বদা এমনই ভাবে জঙ্গলে এবং পুরীতে প্রবেশ করে যে, কোথাও তাহাদের একটীও পায়ের দাগের সুস্পষ্ট চিহ্ন পড়িতে পারে না। ঊর্দ্ধতলের দ্বার ও গবাক্ষগুলিও এক এক খণ্ড প্রাচীন কালের অতি শক্ত, ভারি ও বড় বড় দেওয়ালখণ্ডে সর্ব্বদা ঢাকা থাকে। দেখিয়া স্পষ্টই বোধ হয়, গৃহের ছাদ ও ভিতরের দেওয়াল গুলি যেন পড়িয়া গিয়া দ্বার ও গবাক্ষগুলিকে বন্ধ করিয়া গৃহটীকে শুধু একটী ভয়ানক অজ-গর সর্পাদির অন্ধকার আবাসে পরিণত করিয়াছে। এখানে যে মানুষ বাস করিতে পারে, ইহা কাহারও কল্পনায়ও আসে না। পরন্ত এই হিংস্রপূর্ণ বিশাল নিবিড় কণ্টকাবৃত জঙ্গলে কখনও কোন মানুষ যাতায়াত করে না। কাঠরিয়াগণও এ জঙ্গলে কখনও কাঠ কাটিতে ভয়ে পদার্পণ করে না। এই বনের বড় বড় প্রাচীন সুন্দরী ও অপরাপর উচ্চ উচ্চ বৃক্ষের শ্রেণী দেখিলে, আপনা হইতেই ইহা সকলের হৃদয়ঙ্গম হয়। প্রাচীন বাটীটীর সিঁড়ী-ঘরের ছাদের উপর হইতে দূরে নীলাম্বু রাশিপূর্ণ বঙ্গ-সমুদ্রের অনন্ত প্রসার দেখিতে পাওয়া যায়। বহু সংখ্যক ছোট, বড়, সোজা, টেরচা, শাদা ধব্ ধবে পাল তুলিয়া, নীল আকাশের বক্ষঃস্থিত বহুপক্ষধারী প্রকাণ্ড পক্ষীবিশেষের মত মধ্যে মধ্যে এক এক খানি জাহাজ হঠাৎ

ঢেউয়ের উপর দিয়া নাচিতে নাচিতে দুলিতে দুলিতে যেন আকাশের ধূমময় প্রান্ত হইতে বাহির হইয়া আবার দূর দূরান্তরে গিয়া অপর প্রান্তস্থিত ধূম-রাশির মধ্যেই অদৃশ্য হইয়া পড়ে! এ স্বপ্নময়, উদাসময়, কবিত্বময় দৃশ্য এখান হইতে প্রায় সর্ব্বদাই দেখা যায়। একটী বহু দিনের পুরাতন গিলার প্রকাণ্ড লতা এমনই ভাবে পড়িয়া আছে যে, ইচ্ছা হইলেই সহজে ইহার উপরদিয়া ধীরে ধীরে সিঁড়ী-ঘরের ছাদের উপরে উঠিয়া দাঁড়ান যায়। পাষাণী সকালে, সন্ধ্যায়, দ্বিপ্রহরে, জ্যোৎস্না রাত্রির গভীর নিস্তব্ধ সময়ে প্রায় সর্ব্বদাই সিঁড়ী-ঘরের এই জঙ্গলাবৃত ক্ষুদ্র ছাদটীতে উঠিয়া, সেই সুদীর্ঘ চুলের রাশি পিঠে ছড়াইয়া, একমনে একভাবে দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া এক দৃষ্টিতে এই শোভা দেখে, আর যেন হতচেতনবৎ কত কি সুদূর সপ্নের কথা ভাবিয়া ভাবিয়া এক একটী দীর্ঘ নিশ্বাস ছাড়ে। উপরের দিক্ হইতে নিম্ন তলে যাইবার সিঁড়ীর দরজাগুলি এমনই ভাবে সর্ব্বদা বন্ধ করা থাকে যে, উপর হইতে কোন ক্রমেই তাহা খুলিয়া পলায়নের সুবিধা হয় না। এই জন্য দস্যুরা বন্দী স্ত্রীলোকদিগকে ছাদ প্রভৃতিতে যাইতে দিতে কদাপি সন্দেহ বা আপত্তি করে না। পাষাণী এই ছাদ পাইয়াই যেন সংসার ভুলিয়া গিয়াছে। এই ভয়ঙ্কর কারাগারও যেন পাষাণীর নিকটে সুখের ভবন হইয়াছে। এই ছাদ হইতে কেবল যে দূরের নীলাম্বুরাশি-ভরা সমুদ্রের বুকই দেখা যায়, তাহা নহে, তদপেক্ষাও সুন্দর, চতুর্দ্দিকস্থ সীমা-শূন্য, হরিৎ সাগরের মত বনের দৃশ্যও দেখা যায়। যখন ধীরে ধীরে দূরের নীলাম্বুরাশির জ্বলন্ত গর্ভ হইতে ভাসান. বৃহৎ সোণার কলসীটীর মত প্রভাত কালের অরুণ উদিত হয়, সন্ধ্যা-সময়ে আবার সেই ভাবেই প্রশান্ত সাগর-বক্ষে জ্বলন্ত সূর্য্যমণ্ডলটী বিলীন হইয়া যায়, নীল জলরাশির স্থির বুকে কিম্বা বাতাসের দিনে তরঙ্গের উপরে যখন চাঁদের বিমল ঘুমন্ত জ্যোৎস্না ছড়াইয়া পড়ে, তখন পাষাণী দেখে, যেন তাহার চক্ষুর সম্মুখে ধীরে ধীরে নীরবে সৌন্দর্য্যের ও কবিত্বের এক মধুময়, স্বপ্নময়, অনন্ত রাজ্যের দ্বার খুলিয়া গেল। আবার যখন শিশির-স্নাত, মুক্তা-খচিত, সীমাশূন্য কানন রাজির পত্রে পত্রে, ফুলে ফুলে, ফলে ফলে,—হরিৎ-সমুদ্রের সর্ব্বাঙ্গে, স্থির বক্ষে. কিম্বা বায়ুচালিত তরঙ্গময় বুকে প্রভাতের কিরণ, গোধূলির আভা, চাঁদের জ্যোৎস্না ভাঙ্গিয়া পড়ে, তখন প্রতি পলে পলে যেন নূতন নূতন অনন্ত শোভা, কবিত্ব, স্বপ্ন, সুখ, শান্তি, উদাস, স্মৃতি উছলিয়া উঠিতে

থাকে। আবার সেই শোভার কোলে পাখী ডাকে, ভ্রমর গুঞ্জরে, বাতাস ছুটে, আকাশ ভাসাইয়া নীলিমায় মিশিয়া পাপিয়া ডাকিয়া ডাকিয়া বিশ্ব ভাসায়, আর পাষাণী ভাবে আমি কারাগারে নই, দস্যু-হস্তে নই, স্বর্গে আছি—অনন্ত নন্দনে বাস করিতেছি। এক এক দিন যায়, আর যেন পাষাণীর এক একটী সুখের যুগ চলিয়া যায়। বাধাশূন্য বিজন বিরল পাইয়া পাষাণী কখনও কখনও আপনা ভুলিয়া, সংসার ভুলিয়া, গলা ছাড়িয়া, পাখীদের কণ্ঠে কণ্ঠ মিলাইয়া সুমধুর সঙ্গীতধারায় নিস্তব্ধ আকাশ সুধা-প্লাবিত করে। পাষাণী এক এক দিন গান গাইতে গাইতে আপনার গানে আপনি মজিয়া আহার নিদ্রা ভুলিয়া যায়। পাষাণী দস্যুদের নিকটে চাহিয়া একটী বাঁশীও সংগ্রহ করিয়াছে। কখনও কখনও ইচ্ছা হইলে, সেই বাঁশীটীও বাজাইয়া গান করে।

পাষাণী আজ সন্ধ্যার পূরেই সিঁড়ী-ঘরের ছাদে উঠিয়া চন্দ্রের আকাশ-ভাসান জ্যোৎস্নায় দাঁড়াইয়া, দূরের সেই নীলাম্বুরাশিরদিকে একদৃষ্টে তাকাইয়া ধ্যান করিয়া একটী কথা ভাবিতেছিল—অনেক দিনের একটী কথা ভাবিতেছিল। ভাবিতেছিল, "আহা! যখন আমার বার বছর বয়স পূরে নাই, তখন একদিন ঐ সাগরের নীল জলরাশির উপর দিয়া ঠাকুরদাদা মহাশয়ের সঙ্গে ভাসিতে ভাসিতে সেই সুদূর আরাকানের দিকে গিয়াছিলাম। কিছুদিন পরে আবার ফিরিয়া কলিকাতার দিকে আসিয়াছিলাম। এই সমুদ্রের বাধা-শূন্য নির্ম্মল বাতাসে দিন দিনই ঠাকুরদাদা মহাশয়ের অসুখ সারিতে ছিল, ধীরে ধীরে শরীর ভাল হইতেছিল আর আমার মনে তখন কতই আনন্দ হইতেছিল। আমি তখন এক সঙ্গে যেন দুইটী সমুদ্রের কোলে ভাসিতেছিলাম। একটী বাহিরের এই সমুদ্র আর একটী ঠাকুরদাদা মহাশয়ের সেই ভালবাসার সাগর। দুইটীই ভাষা-শূন্য, তরঙ্গময়, প্রভাতের আলো ও পূর্ণিমার জ্যোৎস্না মাখা, স্বপ্নময়। তেমন দিন কি আর হবে? হবে কেন? যেমন যায় তেমন কি আর হয়?"

পাষাণী ভাবিতেছে, এমন সময় নীচের বড় ছাদের উপরে দাঁড়াইয়া কে যেন ডাকিল, "সন্ন্যাসিনী মা—! সন্ন্যাসিনী মা—!" সন্ন্যাসিনী ডাক শুনিয়াই তাড়া তাড়ি সিঁড়ী-ঘরের ছাদ হইতে সেই বড় ছাদের উপরেই নামিয়া আসিলেন। বলিলেন, "কেন মা?" যিনি ডাকিতেছিলেন, তিনি বৃদ্ধা। আর একটী নবীনা বিধবা আলুথালু বেশে, সেই দিগন্ত ভরা

জ্যোৎস্নায় ছাদের এক পার্শ্বে বসিয়া গালে হাত দিয়া এক দৃষ্টে চাহিয়া চোখের জলে ভাসিতেছিলেন। দস্যুরা পাষাণীকে আনিবার কিছুদিন পূর্ব্বেই এই দুইটী ভদ্র রমণীকেও ধরিয়া আনিয়াছিল। এখন পাষাণী আর ইহাঁরা এক সঙ্গেই বাস করিতেছেন। পাষাণীর মত ইহাঁদেরও এই বিপদের কথা পৃথিবীর আর কেহই জানে না।

পাষাণী একদিন গল্পে গল্পে বৃদ্ধাকে বলিয়াছিলেন, "আমি খাসিয়া-পর্ব্বতে থাকিতে খাসিয়ারা আমাকে সন্ন্যাসিনী মা বলিয়া ডাকিত।" বৃদ্ধা সেই অবধি পাষাণীকে সন্ন্যাসিনী মা বলিতে আরম্ভ করিয়াছেন। ক্রমে ক্রমে এখানেও এখন পাষাণীর নামই সন্ন্যাসিনী মা হইয়া গিয়াছে। ডাকা'তেরাও সকলেই পাষাণীকে সন্ন্যাসিনী মা বলিয়া ডাকে। কেবল বিধবা যুবতী পাষাণীকে দিদী বলে। সন্ন্যাসিনীর কথার উত্তরে বৃদ্ধা কাঁদ কাঁদ হইয়া বলিলেন, "শুনেছ মা, ব্রহ্মচারী নাকি বাসদেবপুরে ফিরেছেন। আপদ এতদিন দূরে দূরে ছিল, তবু একটু নির্ভাবনায় ছিলাম মা। আমাদের আসিবার পরেও ব্রহ্মচারী এখানে দুই দিন এ'সেছিলেন। তখন শুনেছিলাম, মোকদ্দমায় ব্যস্ত আছেন বলিয়া আজ কাল যোগ সিদ্ধি করিবেন না। শুধুই এসে এসে ফিরে যেতেন। এক দিন কেবল আমাদিগকে দেখিয়া গেলেন। মা, আমার কুমুদ তাঁকে দে'খেই কাঁদিতে আরম্ভ করিল। কিন্তু ব্রহ্মচারীটা কিছু না বো'লে কেবল মুখ ভার ক'রে চো'লে গেল। তাকে দে'খে আমারও বুকটা দুড় দুড় করিতেছিল। তোমার আসিবার পর দিনই আপদ বরিশালে চলিয়া গিয়াছিল। শুনিলাম, মোকদ্দমা পরিষ্কার হইয়া গিয়াছে। কয়েক জন ডাকা'তের সঙ্গে ব্রহ্মচারীকেও নাকি আড়াই মাস হাজতে থাকিতে হইয়াছিল। হাইকোর্টের হুকুমে মা, এপাপ আবার খালাস পাইয়াছে। মোকদ্দমায় পড়িলেই শু'নেছি, দুই হাতে টাকা খরচ করে। মা, এ ব্রহ্মমূর্ত্তি নাকি আজ পর্য্যন্ত একবারও মেদ খাটে নাই। কি বো'লব মা, ওর ও যোগ সিদ্ধিত না; শুধু বদমায়েসী। এই কো'রে কো'রে নাকি দু'টী স্ত্রীলোকের সর্ব্বনাশ কো'রেছিল। তারা দুইজনই মনের কষ্টে মরিয়া গিয়াছে। আমার কুমুদ ত ব্রহ্মচারী বাসদেবপুরে এসেছে, শু'নে অবধি কেঁদেই অস্থির হ'য়েছে। কি হবে মা? তুমিই কিন্তু আমাদের ভরসা। কি হবে মা, জানি না।"

বৃদ্ধার কথায় সন্ন্যাসিনীর মলিন মুখের উপরে যেন একখানি গাঢ় মেঘ

ছড়াইয়া পড়িল। সন্ন্যাসিনী ভাবিয়া ভাবিয়া ভাবিয়া, বলিলেন, "মা, আশা, ভরসা সবই ভগবান। যিনি আমাদিগকে এই কয় মাস এই ভয়ানক বিপদে রক্ষা কো'রেছেন, তিনিই এখনও রক্ষা করিবেন। আমার জন্য ত আমি ভাবিই না। আপনাদের জন্যও আমার ভাবনা হইতেছে না।"

বৃদ্ধা।—"মা, তোমার উপরেই ত এবার ব্রহ্মচারীর সব রাগ। তুমি তার যে ক্ষতি কো'রেছ! তুমিই ত বো'লে বো'লে দশ জন ডাকা'তকে এ কাজ-থেকে ক্ষান্ত কো'রেছ। আমি শুনেছি, আরও অনেকে নাকি ডাকা'তি ছাড়িয়া এখন হইতে চাষ বা ব্যবসায় করিয়া খাবে। তোমার উপরে মা ডাকা'তদের বড় ভাল ভাব। তারা আমার কাছে বো'লেছে, "সত্যি সত্যিই সন্ন্যাসিনী মার মত এমন মেয়ে আমরা কখনও দেখি নাই। ইনি সাক্ষাৎ দেবতা। ব্রহ্মচারী যদি এঁকে ছেড়ে না দেন, তবে ভাল হবে না।" এই বলিয়াই, তাহারা নিজেরা নিজেরা পরস্পর মুখ চাওয়া-চাওয়ি করে।"

সন্ন্যাসিনী।—"মা, ভগবান এমন দিনই আনুন, যেন ডাকা'তেরা সকলেই ডাকা'তি ছাড়িয়া নিজেরা চাষ বা ব্যবসায় করিয়া খাইতে আরম্ভ করে। তাহাতে ব্রহ্মচারী আমার মাথা নিলেও, আমার সুখ বই দুঃখ হবে না। ভগবান ব্রহ্মচারীকেও সুপথে আনুন।"

বৃদ্ধা।—"মা, পাষণ্ড কেবল মাথা নিয়ে ক্ষান্ত হ'লে ভয় ছিল না। আমার কুমুদ ত রোজই জান, এই ছাদথেকে প'ড়ে মরিতে চায়। তুমিই তাকে কত বুঝিয়ে রাখ। মা, মেয়ে মানুষের মাথার উপরে যা, পিশাচ তাই আগে নিতে যায়।"

সন্ন্যাসিনী এবার একটু হাসিয়া বলিলেন, "মা, ব্রহ্মচারী ত মানুষই। তার কি বুকে ক'ল্জে নাই? তার কি প্রাণে ভয় নাই? এত আস্পর্দ্ধা?" এই বলিয়াই, সন্ন্যাসিনী কুমুদের কাছে গিয়া, হাত ধরিয়া কুমুদকে কাছে দাঁড় করিয়া, মলিন আঁচলখানিতে কুমুদের চোখের জল মুছাইতে মুছাইতে ধীরে ধীরে বলিলেন, "কুমুদ, দিদি, কাঁদ কেন? ভগবান আছেন। ভয় কি?" বৃদ্ধা দেখিলেন, সন্ন্যাসিনী মা হাসিয়া হাসিয়া কথা বলিতেছেন বটে, কিন্তু সেই হাসির নীচে যেন একটা আগুন জ্বলিতেছে। অধর যেন দন্তে চাপা পড়িয়া, গ্রীবা যেন আপনিই বক্র হইয়া যাইতেছে, পিঠের পিঠ-ছাওয়া চুলগুলি যেন ফুলিয়া উঠিতেছে। সন্ন্যাসিনী মা যত্নে সে ভাব প্রাণে চাপিয়া, ধীর শান্তভাবে হাসিয়া হাসিয়া কথা বলিতেছেন, হাসিয়া

হাসিয়া কুমুদের চোখের জল আঁচলে মুছাইতেছেন। কিন্তু সেই সঙ্গে সঙ্গেই সন্ন্যাসিনীরও হু'টী চোখের কোণ হইতে সেই দিগন্তব্যাপী জ্যোৎস্নার কোলে দুই এক ফোঁটা জল অজ্ঞাতসারে ঝরিয়া ঝরিয়া ছাদের বুকে পড়িয়া শুষিতেছিল। বৃদ্ধা তাহাও দেখিলেন, দেখিয়া, মুখ আরও মলিন করিয়া বলিলেন, "সন্ন্যাসিনী মা, তোমারও মুখখানি কিন্তু শুকিয়ে গিয়েছে। তোমার যে কয়টী টাকা ছিল, তাই খরচ কো'রে এই তিন মাস আধপেটা খেয়ে দিন কাটিয়েছ। মা, এখন ত তাও ফুরিয়ে গেল। এখন ত ডাকা'তদের চা'ল ডা'ল খেতে হবে? নৈলে কি করিবে?"

সন্ন্যাসিনী।—"না খাইয়া মরিব। প্রথম প্রথম এসেও ত তিন চারি দিন খাই নাই। আবারও খাব না। ডাকা'তেরা ডাকা'তি কো'রে যা আনে, তা কখনই খাব না। কিন্তু আমার বিশ্বাস, ভগবানের রাজ্যে মা, অনাহারে কেহ মরে না।"

বৃদ্ধা।—"মা, তুমি যে ডাকা'তদের খাবার জিনিষ না রাখিয়া ফিরাইয়া দিয়েছ, তাতেই কিন্তু ডাকা'তেরা তোমাকে ভক্তি করিতে আরম্ভ কো'রেছে। আর সেই হেঁ'তেই যেন যে দশজন ডাকা'ত ডাকা'তি ছেড়েছে, তাদের মনে নিজেদের কাজের উপরে একটু একটু ঘৃণা হো'তেছিল। তুমি জিনিষ ফিরাইবার কালে, যে মিষ্টি মিষ্টি কথাগুলি বলিতে, তাতেই আরও এই রকম হ'য়েছে।"

সন্ন্যাসিনী এবার বৃদ্ধার কথার কোনই উত্তর না দিয়া কেবল কুমুদের হাত ধরিয়া সেই চারিদিকের অসীম বনের শোভা দেখিতে দেখিতে এক মনে কি যেন ভাবিতে লাগিলেন। বৃদ্ধাও এবার নীরব হইলেন। কুমুদও নীরব। সকলেরই বেশ মলিন, শরীর শীর্ণ। সকলেই অবাক হইয়া সেই দিগন্তব্যাপী জ্যোৎস্নার মধ্যে সেই প্রাচীন জীর্ণ অট্টালিকার ছাদে দাঁড়াইয়া রহিলেন। এমন সময় হঠাৎ একটা ব্যাপার ঘটিল। সকলেই হঠাৎ এক সঙ্গে চন্দ্রালোকে দেখিলেন, ছাদের নিকটের একটা শুপারি গাছের মত সরু গাছ ধীরে ধীরে হেলিয়া ছাদের গায়ে আসিয়া ঠেকিয়া গেল। গাছের ছায়া ক্রমে ছাদের উপরে ছড়াইয়া পড়িল। ডালগুলি ছাদের বুকে লুণ্ঠিত হইল। তখন সেই গাছের উপর হইতে ধীরে ধীরে নিঃশব্দে একজন ঘুটঘু'টে কালপানা, ঝাপ্‌সা চুলা, খর্ব্বাকৃতি, বলবান পুরুষ নামিয়া, ছাদের উপরে দাঁড়াইল এবং গাছটীকে বলপূর্ব্বক

ধরিয়া ছাদে সংলগ্ন করিয়া রাখিল। এইরূপে গাছ হইতে ক্রমে ক্রমে ধীরে ধীরে মুহূর্ত্ত-মধ্যে আরও চৌদ্দ পনর জন বলবান লোক নামিয়া, সেই দিগন্তব্যাপী ফুট্ ফু'টে স্তব্ধ চন্দ্রালোকে শ্রেণীবদ্ধ হইয়া দাঁড়াইল। বৃদ্ধা চমকিয়া উঠিলেন। কুমুদ চীৎকার করিতে করিতে চাপিয়া গেল। সকলেই দেখিলেন, ছাদে যে পনর ষোল জন লোক আসিয়াছে, ইহারা সকলেই চেনা মানুষ—ইহারা সকলেই দস্যু। সন্ন্যাসিনী প্রথম ব্যক্তিকে দেখিয়াই চিনিয়াছিলেন। দেখিলেন, যে মানুষটা মধ্যে মধ্যে তাঁহার খাবার ডা'ল চা'ল ফুরাইলে, তাঁহারই পয়সা দিয়া পুনরায় তাঁহাকে ডা'ল চা'ল আনিয়া দেয়, সেই মানুষটাই হঠাৎ গাছ হইতে নামিয়া গাছটাকে ছাদে সংলগ্ন করিয়া রাখিল। মানুষটার নাম, অর্জ্জুন সরদার। অর্জ্জুন চণ্ডাল বংশ-সম্ভূত। অপর চৌদ্দ পনর জনের মধ্যে কেহ চণ্ডাল, কেহ কায়েত, কেহ হাড়ী। কেবল একজন লোক বাগ্‌দীজাতীয়। সন্ন্যাসিনী, বৃদ্ধা, কুমুদ, সকলেই এই ষোলজন লোককে চিনেন। কিন্তু এই ষোলজন ডাকা'ত কি জন্য এইভাবে এত রাত্রিতে আসিয়াছে, তাহার কিছুই কেহ বুঝিলেন না। বৃদ্ধা আর কুমুদের বুক ভয়ে ও সন্দেহে দুড় দুড় করিতে লাগিল। সন্ন্যাসিনী অত্যন্ত কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া ধীরে ধীরে কুমুদের হাত ছাড়িয়া দিয়া একবারে ডাকা'তদের কাছেই গিয়া দাঁড়াইলেন। বৃদ্ধা তখন সন্ন্যাসিনী মার আঁচল ধরিয়া টানিতে টানিতে ভয়ে ভয়ে অস্পষ্টস্বরে বলিয়া উঠিলেন, "ওগো ডাকা'তদের মেয়ে ও কি কর? সো'রে এস না মা? এস না পালাই? বাছা, তোমার কি সাহস গো! তুমি, মেয়ে বটে!"

বৃদ্ধার কথা শেষ হইতে না হইতেই, ডাকা'তেরা অস্পষ্ট স্বরে চুপি চুপি এক সঙ্গে গোলমাল করিয়া বলিল, "ওগো মা ঠাকুরণ, চুপ কর, চুপ কর, আমরা সন্ন্যাসিনী মাকে নিতে এসেছি।" ডাকা'তেরা বৃদ্ধাকে এইরূপ বলিয়াই, সন্ন্যাসিনীকে বলিল—সেইরূপে সকলেই এক সঙ্গে গোলমাল করিয়া বলিল, "সন্ন্যাসিনী মা, তোমাকে আমরা নিতে এ'সেছি। যে দশ জন লোক ডাকা'তি ছাড়িয়া দিয়েছে, তাহারা ব্রহ্মচারীর ভয়ে এ অঞ্চল থেকে পলাইয়া গিয়াছে। আমরাও মনে কো'রেছি, এই কুকাজ আর করিব না মা। চাষ বা ব্যবসা' কো'রে খাব। না হয় মজুর খেটে খাব, সেও আমাদের ভাল। তবুও মা, সব সময়েই হাতে প্রাণ রেখে এই কুকার্য্য কো'রে আর দিন কাটাব না। মা, তোমার এত

দিনের কথায় আমাদের জ্ঞান হো'য়েছে। আর এ কুকাজ করিব না ঠিক কো'রেছি। তবে আমরা বাসদেবপুর অঞ্চলে থাকিতে পারিব না। ব্রহ্মচারী টের পে'লে আর আমাদিগকে আস্ত রাখিবে না। এই ভয়ে আমাদের-ও স্ত্রী পরিবার আগের ভাগেই সরাইয়াছি। মা, তুমি যতি—তুমি দেবতা। তোমাকে আমরাই নৌকা থেকে ধরিয়া আনিয়াছিলাম। কেবল আমাদের মধ্যে তিনজন এখনও ডাকা'তি ছাড়িবে না বলিয়াছে। মা, তোমার মন্ত্রিত্বে আমাদের বংশে বাতি দিতে কেউ থাকিবে না। তোমাকে যখন মা বো'লেছি, তখন আমরা তোমার পেটের ছে'লে মা। তোমাকে এখান থেকে সরাইয়া না গেলে, ভগবান্ আমাদের উপরে রাগ করিবেন। মা, আমাদের তা হো'লে কখনই ভাল হবে না। মা, তুমি মানুষ না। তুমি দেবতা। তুমি সত্যি সত্যিই যতি সন্ন্যাসী।"

সন্ন্যাসিনী।—"কি কো'রে নেবে?"

একজন ডাকা'ত।—"আমরা একখানি ডুলী এ'নেছি। এই ডুলীতে কো'রে তোমাকে নিয়ে কতকটা দূর পর্য্যন্ত জঙ্গলে জঙ্গলে গিয়ে পরে নৌকায় যাব। নৈলে, ব্রহ্মচারীর লোকেরা এখনই ধরিয়া ফেলিবে।"

আর একজন ডাকা'ত একটা দড়ী-বাঁধা শিকা দেখাইয়া বলিল, "মা এই শিকায় চো'ড়ে বো'স। আমরা তোমাকে ছাদ থেকে নামাইয়া আবার এই গাছ ধো'রেই নামিব। আর দেরি কো'র না মা। ব্রহ্মচারীর শরীর কাতর। অসুখ সারিলেই তিনি এখানে আসিবেন। তিনি টের পেয়েছেন যে, তুমি তাঁর দশ জন ডাকা'তকে ভাঙচি দিয়ে ভাগিয়েছ। আবার আমরাও পলাইতেছি। এবার মা, ব্রহ্মচারীর যত রাগ তোমারই উপরে। তবে সকলে বো'লেছে, তুমি দে'খতে বড়ই ভাল। তাতেই ব্রহ্মচারী তোমাকে দিয়ে যোগ সিদ্ধি না কি যেন করিবেন বো'লেছেন। নৈলে, এতদিন তোমাকে আস্ত রাখিতেন না। আজ্ঞে, ৺ভীমরায় মশাইয়ের চেয়েও ব্রহ্মচারী দুরন্ত লোক। ব্রহ্মচারীর এক দল লোক এখনই নদীতে ছিপ ও পানসী নিয়ে এসে নঙ্গর কো'রেছে। দেরি কো'র না মা।"

সন্ন্যাসিনী।—"আমি যাব না। তোমরা এই খুড়াঠাকুরুণকে আর কুসুমকে নিয়ে যাও। একখানা ডুলীতেই এঁরা কোন রকমে বো'সে যাবেন। আমি ইঁহাদিগকে ফে'লে যাব না।"

সন্ন্যাসিনী মার এই কথা শুনিয়া সেই পনর ষোল জন লোক নীরবে কেবল পরস্পর মুখ চাওয়া-চাওয়ি করিতে লাগিল। কিন্তু তাঁহাদের মুখে যেন আর একটীও কথা ফুটিতেছিল না।

সন্ন্যাসিনী ডাকা'তদের মনোগত ভাব বুঝিয়া আবার বলিলেন, "আমি কিছুতেই যাব না। আমার জন্য তোমরা বৃথা সময় নষ্ট করিতেছ। এঁদের দুই জনকেই নিয়ে যাও। আমি ইহাতেই বেশী খুসী হইব। যদি আমাকে তোমরা ভাল বাস, তবে এইরূপই কর।"

এমন সময় হঠাৎ বিপরীত দিকে নীচে অনেকগুলি মানুষের অস্পষ্ট কথার ফিস্ ফিস্ শব্দ শুনা যাইতে লাগিল। তখন সেই পনর ষোল জন ডাকা'ত আবার এক সঙ্গে চুপি চুপি অস্পষ্ট স্বরে গোলমাল করিয়া বলিযা উঠিল, "ঐ রে—! আজ সেই ডাকা'তিটা কো'রে ব্রহ্মচারীর লোকেরা অনেক জিনিষপত্র পাইয়াছে। এখন তাই নিয়েই এখানে দলে দলে আনা গোনা করিতেছে। চল, যা হয় একটা কো'রে তাড়া তাড়ি চো'লে যাওয়া যাক্। টের পাইলে আস্ত রাখিবে না।"

সন্ন্যাসিনী—"আমি যা বলিলাম, তা-ই কর। এঁদের দুইজনকে নিয়ে যাও। আমি ইহাঁদিগকে এই ডাকা'তের হাতে ফে'লে কিছুতেই যাব না।"

ডাকা'তগণ।—"মা, তোমার বড় বিপদ ঘটিবে। এর পরে আর আমরা আসিতে পারিব না। তোমাকে এখানেই থাকিতে হইবে।"

সন্ন্যাসিনী।—"যা হবার তা হবে। তাতে তোমাদের কোনই দোষ নাই বাছা। আমার জন্য তোমাদের যা করিবার ছিল, করিয়াছ। এখন আমার কথা মত কাজ করিয়া শীঘ্র পালাও। দেরি করিলে, সব দিক্ যাবে।"

ডাকা'তেরা অগত্যা বিষণ্ণমুখে বুড়াঠাকুরুণ আর কুমুদকে একে একে শিকায় তুলিল এবং নীচে নামাইয়া ডুলীতে ভরিয়াই প্রস্থান করিল। কুমুদ আর বুড়াঠাকুরুণ প্রথমটা এই রকমে সন্ন্যাসিনীর বদলে নিজেরা যাইতে অল্প অল্প আপত্তি করিয়াছিলেন। কিন্তু শেষটা সন্ন্যাসিনীমার একান্ত ধরা বাঁধাতে সম্মত হইলেন। সন্ন্যাসিনী নিজের পরিবর্ত্তে কুমুদ আর বুড়া-ঠাকুরুণকে এই ভয়ঙ্কর দস্যুদের হাত হইতে মুক্ত করিয়া, জানিয়া শুনিয়াই আপনাকে পূর্ব্বের চেয়েও ভীষণ বিপদরাশিতে ঢালিয়া দিলেন। সন্ন্যা-সিনী স্পষ্টই বুঝিলেন, অতঃপর এই সকল ঘটনা প্রকাশ পাইলে, ব্রহ্মচারী আমাকে আর কিছুতেই আস্ত রাখিবেন না। ডাকা'তেরা জিজ্ঞাসা

করিলেই, এ সকল কথাই আমাকে সত্যের অনুরোধে খুলিয়া বলিতে হইবে। এত বুঝিলেন, তথাপি সন্ন্যাসিনীমা বিষণ্ণ হইলেন না। কেবল আবার সিঁড়ী-ঘরের ছাদে উঠিয়া দিগন্তব্যাপী চন্দ্রালোকে একাকী সেই দূরস্থ সমুদ্র দেখিতে লাগিলেন। সেই জ্যোৎস্না-ধৌত অনন্ত-প্রসার বনরাজির উপর দিয়া পত্রগুলি হেলাইয়া দোলাইয়া সমুদ্রের শীতল পরিষ্কার বাতাস অল্পে অল্পে আস্তে আস্তে আসিয়া গায়ে লাগিতে লাগিল। বাতাসে পাষাণীর পিঠ-ভরা, কোমর-ছাওয়া, আজন্মালম্বিত চুলের রাশি ধীরে ধীরে উড়িয়া উড়িয়া মুখ'পরি ছড়াইয়া পড়িতে লাগিল। পাষাণী আবার সেই স্মৃতিময় দৃশ্যের সৌন্দর্য্য-স্বপ্নে ধীরে ধীরে ডুবিয়াগেল।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

কর্ম্ম-ফল।

আজ মঙ্গলবার, অমাবস্যার রাত্রি, তান্ত্রিক সাধনার অতি প্রশস্ত দিন। হরানন্দ ব্রহ্মচারীর শরীর আজও ভাল করিয়া সুস্থ হয় নাই। ব্রহ্মচারীর পীড়া এবার সাংঘাতিক হইয়াছিল। যে সকল ডাকা'তদের হাতে গুপ্ত আবাসের বন্দীদিগকে দেখিবার ভার ছিল, তাহারা ভয়ে ভয়ে ব্রহ্মচারীর নিকট কুমুদ আর কুমুদের মার পলাইয়া যাইবার খবর গোপন করিয়া বলিয়াছে, "সাংঘাতিক রোগে তাহারা দুইজনই এক সঙ্গে মারা পড়িয়াছে।" কিন্তু পঁচিশ ছাব্বিশ জন ডাকা'ত ডাকা'তি ছাড়িয়া একবারে বাসদেবপুর অঞ্চল হইতে স্ত্রী পরিজন লইয়া পলাইয়া গিয়াছে, এ খবর আর গোপনে নাই। নূতন আনীত পরমসুন্দরী যুবতী স্ত্রীলোকটীই ডাকা'তদিগকে ভাঙ্চি দিয়েছে, ব্রহ্মচারী রোগ-শয্যায় শুইয়া শুইয়া একথাও শুনিয়াছেন। [illegible]র শ্রেণীর ডাকা'তদের মুখে শুনিয়া কথাটায় বিশ্বাসও করেন নাই, অবিশ্বাসও করেন নাই, কেবল গম্ভীরভাবে শুনিয়াছেন। দুই একজন ডাকা'তকে ব্রহ্মচারী বলিয়াছেন, "আচ্ছা দেখিব—ব্যামোটা সারিলেই গিয়ে দেখিব, তোদের সন্ন্যাসিনী মাটা কি ব্যাপার।" এতদ্ভিন্ন তখন আর কাহাকেও কিছুই বলেন নাই। আজ ব্রহ্মচারী স্বয়ংই রাত্রি প্রায় এক প্রহরের সময়ে আসিয়া গুপ্ত আবাসের সেই পাতাল পুরীতে প্রবেশ করিয়াছেন।

এখন রাত্রি প্রায় দ্বিপ্রহর। অন্ধকার প্রস্তর ফলকের মত চারিদিকের সকল ঢাকিয়া রাখিয়াছে। কোথায়ও কোন শব্দ নাই। কেবল সেই পাতাল পুরীর গর্ভে মধ্যে মধ্যে থাকিয়া থাকিয়া ছোট ছোট শব্দে ঢং ঢং করিয়া একটী ঘণ্টা বাজিতেছিল। একজন বলবান পুরুষ নীচের দিক্ হইতে হঠাৎ সিঁড়ীর দ্বার খুলিয়া উপরে আসিয়া সন্ন্যাসিনীকে বলিল, "মা, ব্রহ্মচারী তোমাকে নীচে ডাকিয়াছেন।" সন্ন্যাসিনী দস্যুর কথায় নীরবে উঠিয়া তাহারই পিছে পিছে ধীরে ধীরে সিঁড়ী বহিয়া বরাবর পাতালপুরীতে নামিতে লাগিলেন।

সন্ন্যাসিনী অনেক বার কালীর ঘর ও কালীকে দেখিয়াছেন। সুতরাং আজ আর কালীর ঘরে প্রবেশ করিয়া অপর কিছুই নূতন দেখিলেন না। কেবল দেখিলেন, পূজান্তে রক্তচন্দনে জড়িত হইয়া ফুল, বিল্বপত্র, দূর্ব্বাদল ও অর্ঘ্যতণ্ডুল সকল কালীর সম্মুখস্থ পূর্ণ-কলসের উপরে এবং চারিদিকে স্তূপাকাররূপে ছড়ান রহিয়াছে। ধূনচীতে ধূনা এবং গুগ্‌গুল জ্বলিতেছে। দীপাধারে ঘৃতের প্রদীপ জ্বলিতেছে। এক দিকে উৎসর্গীকৃত নৈবিদ্য সাজান রহিয়াছে। একটী রক্তাক্ত ছিন্ন কৃষ্ণবর্ণ ছাগমুণ্ড উৎসর্গীকৃত হইয়া পূর্ণ-কলসের নিম্নে শোভা পাইতেছে। ছাগমস্তকের উপরে একটী জ্বলন্ত সলিতা ধীকি ধীকি করিয়া জ্বলিয়া জ্বলিয়া পুড়িয়া ছাই হইতেছে। হাড়ি-কাষ্ঠ এবং তাঁহার নিম্নস্থ কক্ষাতল ছাগরক্তে প্লাবিত হইয়াছে। সমস্ত ঘরটীই প্রদীপের আলোকে আলোকিত। কিন্তু সর্ব্বাপেক্ষা একটী নূতন ব্যাপার দেখিলেন। দেখিলেন, বেদীস্থিত প্রমাণ হস্তের তিনহস্ত-পরিমিত পাষাণময়ী প্রতিমার উপরেও এক হাত উর্দ্ধে মস্তক তুলিয়া কাল মেঘের মত প্রকাণ্ড দেহধারী এক পুরুষ একহাতে ধীরে ধীরে ঘণ্টা বাজাইতে বাজাইতে অপর হস্তে ঘৃত-জ্বালিত পঞ্চ-প্রদীপ লইয়া দেবীর পূজান্ত-কালীন আরতি করিতেছেন। পুরুষের পরিধানে একখানি গেরুয়া কাপড়। কিন্তু কাপ-ড়ের রঙ্ খুব গাঢ় রক্তাক্ত। গলায় একছড়া ছোট ছোট রুদ্রাক্ষের মালা। মস্তকস্থিত শিখাগ্রে রক্তপুষ্প বাঁধা। শাদা ধব্ ধবে একগোছা পৈতার সঙ্গে একখানি গৈরিক উত্তরীয় বস্ত্র বক্ষ ও কক্ষ-দেশ বেষ্টন করিয়া শোভিত রহিয়াছে। পুরুষের দেড় হস্ত-পরিমিত এক যোড়া শ্রীচরণ একখানি সুন্দরবনের জ'টো বাঘের ছালের উপরে যুগলভাবে স্থাপিত হইয়াছে। পাষাণী মনোযোগের সহিত কিছুক্ষণ দেখিয়াই পুরুষকে

ছিনিল। দেখিল, পুরুষ বা হরানন্দ ব্রহ্মচারী, পূর্ব্ব পরিচিত ধরণীশর্ম্মা! পাষাণী মনে মনে "ভয় বারণে এ জীবন ঢালিয়াছি, কিসের ভয়? ভয় কি?" এই মহামন্ত্র জপিতে জপিতে সিঁড়ী দিয়া দস্যুর পিছে পিছে নামিয়া আসিতেছিল। কিন্তু এবার দস্যুর নির্দ্দেশানুসারে কালীর ঘরের এক পার্শ্বে মুহূর্ত্তকাল দাঁড়াইয়াই সম্মুখে এই ব্যাপার দেখিয়া অতি ভক্তির সঙ্গে মনে মনে ভগবান্‌কে একটী গড় করিল এবং ক্ষণকালও অপেক্ষা না করিয়া, হর্ষে, বিষাদে, বিস্ময়ে একবারে অভিভূত হইয়া, স্বপ্নাবিষ্টের মত তখনই ডাকিল—গদ গদ স্বরে বলিল, "মামা, তুমি? তুমি এখানে কোথা থেকে?"

হরানন্দ ব্রহ্মচারী হঠাৎ গৃহের পার্শ্বে এই কণ্ঠস্বর এবং ডাক শুনিয়া চকিতের মত সেই পঞ্চ-প্রদীপ ও ঘণ্টাসহ পাষাণীর দিকে ফিরিয়া দাঁড়াইলেন এবং ফিরিয়াই দেখিলেন—সেই গৃহের প্রদীপের আলোর সঙ্গে মিশ্রিত হস্তস্থিত পঞ্চ-প্রদীপের আলোকে স্পষ্টই দেখিলেন, গৃহের পার্শ্বে মলিন-বেশে যে পরম সুন্দরী তরুণী দাঁড়াইয়া আছে, সে পরিচিত,—পূর্ব্বপরিচিত সেই এ'লোকেশী সরলা পাষাণী! তখন কেবল হরানন্দের মর্ম্মস্থল ভেদ করিয়া অন্তরে নীরবে এই কথা ফুটিল, "এঁ্যা—! এঁ্যা—! একি সর্ব্বনাশ!"

হরানন্দ তুলসী গ্রামে থাকিতে পাষাণীকে অনেক সময়েই কুন্তলা বলিয়া ডাকিতেন। ইচ্ছামত কখনও কখনও পাষাণীও বলিতেন। কুন্তলাকে পাড়ার আপামর সাধারণের মত হরানন্দও ভালবাসিতেন—অত্যন্ত ভালবাসিতেন। ধরণীধরের অপর একটী নাম হরদেব। ধরণীর পিতা মাতা নামকরণের সময়ে হরদেব এবং ধরণীধর এই উভয় নামই রাখিয়াছিলেন। ধরণীধর ওরফে হরদেব বাঁড়ুযো ব্রহ্মচারীরূপে এখন হরানন্দ নাম গ্রহণ করিয়াছেন। ধরণীধর নামটী এখানে অপ্রকাশিত। হরানন্দ এখন সুস্পষ্ট-রূপেই দেখিলেন, গৃহের পার্শ্বে সেই কুন্তলাই দাঁড়াইয়া! দস্যুদলপতি সাহসী হরানন্দ ফিরিয়া সম্মুখে চিরপরিচিত পাষাণীকে দেখিয়াই, যেন বজ্রাহতের মত স্তম্ভিত হইলেন। হরানন্দের মুখে এবার একটীও কথা ফুটিল না। কেবল মনে মনে সেই মর্ম্মভেদী স্বরে বলিতেছিলেন, "এঁ্যা—! এঁ্যা—! একি সর্ব্বনাশ!" কিন্তু অনেক দেরিতে অস্পষ্ট শব্দে বলিলেন, "আমি হরানন্দ ব্রহ্মচারী।" পাষাণী এবার অত্যন্ত দৃঢ়তার সঙ্গে বলিল, "না—তুমি আমার মামা। ধরণীধর বাঁড়ুয্যে। মামা তুমি এমন হো'য়েছ? তুমি এখানে?"

এবার আর হরানন্দের মুখে একটীও কথা ফুটিল না। কেবল কেন যেন আপনা হইতেই হরানন্দের হাত কাঁপিতে লাগিল। হাত হইতে কিছুক্ষণ পরে কেবল ঠন্—ঠন্—টং—ঢং—ঠং—রবে বিশাল শব্দ করিয়া ঘণ্টাটী কঠিন শাণের মে'ঝায় পড়িয়া ফাটিয়া গেল। হরানন্দ দেখিলেন, কুন্তলার সেই রাশি রাশি সরলতা মাখা, ভালবাসা মাখা, প্রশান্ত লাবণ্যরাশির উপরে আজ যেন কেমনই একটা আগুন জ্বলিয়া উঠিয়াছে। তাহার তেজ যেন আর চোখে সহিল না। কেবল সজোরে বুক কাঁপিয়া উঠিল। প্রাণ থর থর করিয়া কম্পিত হইল। হরানন্দ এবার কেবল কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ়ের মত হতচেতন হইয়া ধীরে ধীরে ধীরে অতি ধীরে হাতের পঞ্চ-প্রদীপটী কক্ষাতলে নামাইয়া রাখিলেন। এমন সময় আর এক ব্যাপার ঘটিল।

হরানন্দ ব্রহ্মচারী ওরফে ধরণী শর্ম্মা হাত হইতে পঞ্চ-প্রদীপ নামাইয়া মাথা তুলিবার পূর্ব্বেই সবেগে একজন সশস্ত্র ভদ্রবেশধারী বীরাকৃতি শ্বেতাঙ্গ পুরুষ যেন স্বর্গীয় দূতের মত হঠাৎ সেই পাতালপুরীর মধ্যে উপস্থিত হইয়াই স"বুটে" হরানন্দের কক্ষদেশে একটী গুরুতর পদাঘাত করিলেন। পদাঘাতে হরানন্দের অসুস্থ দুর্ব্বলতর দেহ-পর্ব্বতটী কালীর প্রতিমার উপরেই পড়িয়া বিশাল শব্দে পতিত হইল। পাষাণ-প্রতিমার ঘাত প্রতিঘাতে হরানন্দের দেহের নানা স্থানে জখম হইল এবং রক্ত দেখা দিল। তথাপি হরানন্দ তাড়া তাড়ি উঠিয়াই সাহেবকে লক্ষ্য করিয়া সবলে ঘুসী তুলিলেন। সাহেব হাতে ঘুসীটী ফিরাইতে গিয়া সাংঘাতিক আঘাত পাইলেন। কিন্তু তখনই বলপূর্ব্বক হরানন্দকে দুই হাতে জড়াইয়া ধরিলেন। এবার হরানন্দ সাহেবের হাত ছাড়াইয়া পলাইবার জন্য যাই বল প্রয়োগ করিতেছিলেন, অমনি পিপীড়ার সারির মত দলে দলে সশস্ত্র পুলিসের লোক আসিয়া হরানন্দকে ধরিয়া ফেলিল। হরানন্দ সাহেবকে দেখিয়াই চিনিয়াছিলেন—চিনিয়াছিলেন, "ইনি বরিশালের ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব।" পুলিসের লোকেরা তৎক্ষণাৎ চারিদিক হইতে হরানন্দের পিঠে ও কক্ষে দুম্ দুম্ করিয়া রুলের আঘাত করিতে আরম্ভ করিল। হরানন্দ তখন দশচক্রে ভগবান ভূত হইয়া কাতর-স্বরে বলিতে লাগিলেন, "দোহাই হুজুরের, দোহাই ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবের, দোহাই মহারাণীর, মারিতে নিষেধ করুন। দোহাই হুজুরের নিষেধ করুন।" হরানন্দের এ কাতর প্রার্থনা আর কে শুনিবে? পুলিসের লোকেরা মারিতে মারিতে হরানন্দকে

অচেতন করিয়া ফেলিল। তখন দূর হইতে তাড়া তাড়ি একটী ভদ্র বেশ-ধারী, বলিষ্ঠ-দেহ, সুলক্ষণাক্রান্ত বাঙ্গালী যুবক সেই পুলিসের উন্মত্ত-প্রায় লোকের ভিড় ঠেলিয়া সাহেবের নিকটে গিয়া সাহেবের ভাষাতেই সাহেবকে বুঝাইয়া বলিলেন, "কি করিতেছেন? অনুগ্রহ পূর্ব্বক নিষেধ করুন। দস্যু যখন বশ্যতা স্বীকার কো'রেছে, তখন আর ওকে মা'র কেন?" সাহেব তখন সরোষে বাঙ্গালী যুবকের প্রতি কট মট করিয়া তাকাইয়া বলিলেন, "তুমি নিজের কাজে যাও। আমার কর্ত্তব্য কি আমি জানি।" যুবক সাহেবের এ কথায়ও নিরস্ত না হইয়া দৃঢ়তার সঙ্গে বলিলেন, "জানেন বটে। কিন্তু এখন ক্রোধে অন্ধ হইয়া ভুলিয়া গিয়াছেন। কাজ ভাল হইতেছে না।" সাহেব এবার চীৎকার পূর্ব্বক প্রহারকারী পুলিসের লোকদিগকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, "মার ম'ট।" অতঃপর পুলিসের লোকেরা মা'র ক্ষান্ত করিয়া, হরানন্দের হাতে ও পায়ে লৌহময় হাতকড়ী এবং বেড়ী পরাইতে লাগিল। এদিকে পাতাল পুরীর বাহিরে অনবরত "দুম্ দুম্" শব্দে ডঙ্কা পড়িতেছিল। হরানন্দের দলের ডাকা'তেরা প্রধান ব্যক্তির এই বিপদ দেখিয়া আগের ভাগেই ছুটিয়া চারিদিকের জঙ্গলে পলাইতেছিল। পুলিসের লোকেরা তাহাদের দুই এক জনকে মাত্র ধরিতে সমর্থ হইল। অবশিষ্ট ডাকা'তেরা সেই বিজন বনের মধ্যে কোথায় ছুটিয়া লুকাইল, কিছুই ঠিক করিতে পারিল না। দস্যুদের কয়েকখানা ছিপ এবং পানসীও পুলিসের হস্তগত হইল।

পাষাণী এই গোলমালের সময়েও কালীর ঘরের এক পার্শ্বে দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া অবাক্ হইয়া এই আকস্মিক বিস্ময়জনক ব্যাপার দেখিতেছিল। যে সাহাসী বাঙ্গালী যুবক পুলিসের লোকের ভিড় ঠেলিয়া সাহেবের কাছে আসিয়াছিলেন, তিনি মুহূর্ত্ত পরে পুনরায় সেই ভিড় ঠেলিয়াই গোল-মালের বাহিরে আসিলেন। তখন পাষাণী সেই ঘরের এক পার্শ্ব হইতেই পুলিসের লোকের হাতের জ্বলন্ত মশালের আলোতে দেখিল—স্বপ্নের দৃশ্যের মত দেখিল, সেই সুলক্ষণাক্রান্ত যুবক অপর কেহ নয়, শশাঙ্ক-শেখর! প্রথম বারে পাষাণী, যুবককে দেখিতে পায় নাই, এবার প্রথম দেখিল। প্রথম বারে পাষাণী মনে করিল, বুঝি অপর কাহাকেও শশাঙ্কশেখর বলিয়া তাহার ভ্রম হইয়াছে। এই জন্য দুই এক পা সম্মুখে সরিয়া গিয়া আবার ভাল করিয়া দেখিল। এবারও দেখিল—সেইরূপ

স্বপ্নের দৃশ্যের মতই দেখিল, যুবক শশাঙ্কশেখর। শশাঙ্কশেখর এখন যেখানে দাঁড়াইয়া ছিলেন, সেখানেও অল্প অল্প লোকের ভিড় ছিল। ভিড়ের মধ্যে যেন সম্মুখের দিক্ হইতে কাহারও আগমনাশায় বারম্বার ব্যস্ততার সঙ্গে ব্যগ্র হইয়া কেবল পথ-পানে তাকাইতেছিলেন। পাষাণী ধীরে ধীরে ভিড় ঠেলিয়া ঠেলিয়া ক্রমে ক্রমে শশাঙ্কশেখরেরই পার্শ্বে আসিয়া উপস্থিত হইল। কিন্তু তবুও শশাঙ্কশেখর তাহাকে দেখিলেন না। এমন সময় একজন বৃদ্ধা স্ত্রীলোক একটা যুবতীর হাত ধরিয়া দুইজন পুলিসের লাল পাগড়িওয়ালা লোকের সঙ্গে আসিয়া, যেন আরও অধিকতর ব্যস্ততার সহিত সেই পাতালপুরীর ভিড়ের মধ্যে চীৎকারপূর্ব্বক কাঁদ কাঁদ স্বরে বলিতে লাগিলেন, "ওগো আমার মাকে পেয়েছ? যাঁর জন্য আমরা এই পনর ষোল দিন, দিন রাত এত কষ্ট কো'রেছি, তাঁকে পেয়েছ ত?" একজন পুলিসের লোক চোক লাল করিয়া রুষ্টভাবে বৃদ্ধার দিকে তাকাইয়া বলিল, "এ—মাই—চিল্লাও ম'ত্। আভি সব হোগা।" তখন পুলিসের লোকের কথায় বৃদ্ধা ভয়ে ভয়ে অগত্যা চীৎকার ত্যাগ করিয়া ফিস্ ফিস্ শব্দে চুপি চুপি বলিতে লাগিলেন, "ওগো কি হবে গো? কি হবে? আমার মা কোথায় গো?"

এদিকে পাষাণী শশাঙ্কশেখরের পার্শ্বে আসিয়া ধীরে ধীরে তাঁহার গায়ের উড়নীর খোঁট ধরিয়া দাঁড়াইল। তবুও শশাঙ্কশেখরের বিন্দু-মাত্রও চেতনা নাই। ইহা দেখিয়া পাষাণী মুখ টিপিয়া টিপিয়া একটু একটু হাসিতে লাগিল। শশাঙ্কশেখর আগত বৃদ্ধা এবং তরুণ-বয়স্কা বিধবা যুবতীকে হাত ধরা ধরি করিয়া দুই জন পুলিসের লোকের সঙ্গে আসিতে দেখিয়াই সেইদিকে ছুটিয়া যাইতে উদ্যত হইলেন। কিন্তু এক পা না এগু'তেই গায়ের চাদরে জোরে টান পড়িল। শশাঙ্কশেখর তখন হঠাৎ চমকিয়া ফিরিয়া দেখিলেন, পার্শ্বে পাষাণী চাদর ধরিয়া দাঁড়াইয়া আছে। পাষাণী তখন শশাঙ্কশেখরের মুখের উপরে সেই চির সরলতা-পূর্ণ চল চল দৃষ্টি স্থাপন করিয়া চারিদিকের এই হুলস্থুল ব্যাপারের মধ্যেও সকল ভুলিয়া এক মুখ হাসিয়া ফেলিল। শশাঙ্কশেখর যে পা তুলিয়াছিলেন, তাহা প্রত্যাহার করিলেন। আর কোথায়ও যাইবার প্রয়োজন হইল না। আর সে ব্যস্ততা বা ব্যগ্রতাও রহিল না। কেবল অবাক্ হইয়া পাষাণীর মুখ-পানে তাকাইয়া রহিলেন। এবার

দুইটী সুন্দর নয়নে সমতুল্য দুইটী সুন্দর নয়ন যেন এক সূত্রে গ্রথিত হইয়া স্থিরভাবে রহিল। পাষাণীর মুখভরা ফুটন্ত হাসি। কিন্তু শশাঙ্কশেখর সেইরূপ মলিন বেশে ঈষৎ কৃশাঙ্গ ও লোকেশী সন্ন্যাসিনীকে তদ্রূপ অবস্থায় সম্মুখে দেখিয়া হাসিলেনও না, কাঁদিলেনও না, কেবল মনে মনে যেন এক মধুময়, স্মৃতিময়, বিষাদের ঈষৎ যন্ত্রণাময়, আনন্দপূর্ণ সুখ-স্বপ্ন দেখিতে লাগিলেন। দেখিতে দেখিতে দেখিতে যেন আজ আবার সংসার ভুলিয়া গেলেন। সম্মুখস্থ সেই লোকের ভিড়, সাহেব, ভয়ঙ্কর দস্যু হরানন্দ, বৃদ্ধা এবং বিধবা যুবতী সকলই যেন ক্ষণকালের জন্য নির্ব্বাণপ্রাপ্ত হইল। যুবক এত দিন পরে হঠাৎ আবার আপনা হারাইলেন, আবার কি আসিয়া যেন তাঁহার মন প্রাণ ধীরে ধীরে ধীরে অতি ধীরে দুর্ব্বলতর করিয়া ফেলিতে লাগিল। পুলিসের হিন্দুস্থানী "কনেষ্টবল"গণ এদিকে দৃক্‌পাতও না করিয়া, দস্যু-প্রধান হরানন্দ ধৃত হইয়াছে, এই আনন্দেই মত্ত হইয়া সাহেবের চক্ষুর পলকের সঙ্গে সঙ্গে সূত্রবদ্ধ পুত্তলবৎ এদিক্ ওদিক্ ছুটাছুটি করিতেছিল। কিন্তু এমন সময় বৃদ্ধা আর তরুণী বিধবা যুবতী হঠাৎ সন্ন্যাসিনী মাকে তদবস্থায় সম্মুখে দেখিয়াই, জড়াইয়া ধরিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। সন্ন্যাসিনীও সহসা এই ব্যাপারে ভাবান্তরিত হইয়া দুই হাতে এক সঙ্গে কুমুদ আর কুমুদের মাতার গলা ধরিয়া কাঁদিয়া ফেলিলেন। তখন শশাঙ্কশেখরও আর না কাঁদিয়া থাকিতে পারিলেন না। তিনিও কোঁচার খোঁট তুলিয়া ফোঁটা ফোঁটা চোখের জল মুছিতে লাগিলেন। এই অবসরে হঠাৎ সাহেব কাছে আসিয়া, শশাঙ্ক-শেখরকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন,—নিজের সেই দেবভাষায় বলিলেন, "বাবু, তোমার আত্মীয় কে এখানে বন্দী আছে, দেখাইয়া দেও।" সাহেব সম্মুখস্থ কুমুদ আর কুমুদের মাকে দেখাইয়া বলিলেন, "ইহাদিগকে দেখাইয়া দিতে বল।"

সাহেবের কথায় শশাঙ্কশেখর চমক-ভাঙ্গা হইয়া বলিলেন—সাহেবের দেশীয় ভাষাতেই সম্মুখস্থিত পাষাণীকে দেখাইয়া বলিলেন, "এই যে আমাদের আত্মীয়াকে পাইয়াছি। এখনই আমরা আপনার সঙ্গে যাইতে প্রস্তুত আছি।" সাহেব যুবকের কথার উত্তরে কেবল বলিলেন, "বেশ হ'য়েছে। আর দেরির দরকার নাই।" এই বলিয়াই পুলিসের লোক-দিগকে, হাতে পায়ে হাত কড়ী ও বেড়ী পরান হরানন্দকে এবং কুমুদ, কুমুদের মা আর সন্ন্যাসিনীকে নিয়ে প্রস্থান করিতে আদেশ করিলেন।

আদেশ করিয়াই নিজেও জলন্ত "পাইপে" ধূম পান করিতে করিতে পাতালপুরী হইতে দস্যুদের সেই সুড়ঙ্গ-পথেই বাহিরে আসিয়া নৌকাভিমুখে যাত্রা করিলেন। সাহেবের অগ্রে অগ্রে পশ্চাতে পশ্চাতে কয়েক জন লোক ছুটিয়া চলিল। মুহূর্ত্ত পরেই সেই পাতালপুরী শূন্য হইল। সেখানকার সমস্ত মালও পুলিসের হস্তগত হইল। শশাঙ্কশেখর সন্ন্যাসিনী, বৃদ্ধা এবং কুমুদের সঙ্গে বরিশালে গেলেন।

সুযোগ্য মাজেষ্ট্রেট্ ব্রাউন সাহেব স্বয়ং কিছুকাল অপেক্ষা করিয়া অল্প কয়েক দিনের মধ্যেই বাসদেবপুর অঞ্চল খালি করিয়া সমস্ত ডাকা'ত ধরিয়া ধরিয়া বরিশাল চালান করিলেন। পুলিসের অদক্ষতা এবং উৎকোচের লোভ বশত এতদিন পর্য্যন্ত ব্রিটিশ-সিংহের রাম রাজ্যের এই একটী প্রধান জেলার নানা অঞ্চলে যে ভয়ানক ডাকা'তের অত্যাচার ছিল, তন্মধ্যে একটী অঞ্চলের দৌরাত্ম্য এই হইতেই অনেক পরিমাণে কমিয়াগেল। কয়েক মাস বা কয়েক দিন পূর্ব্বেও যে হরানন্দের দস্যু-দলের ভয়ে যাত্রীদিগকে সর্ব্বদা শঙ্কিত থাকিতে হইত, কত ভদ্রমহিলাকে গুপ্ত আবাসে বন্দী থাকিয়া যে পাষণ্ডের পাপ-প্রবৃত্তির কথা স্মরণ পূর্ব্বক দিন রাত কাঁপিতে হইত, সে কণ্টক আজ উৎসারিত হইল।

দস্যুদের সাহায্যে কুমুদ আর কুমুদের মা পলাইয়া বীরখালী হইয়া বরাবর বরিশালে গিয়াছিলেন। এবং একবারে মাজেষ্ট্রেট্ সাহেবের এজলাসেই গিয়া উপস্থিত হইয়াছিলেন। সেখানে কাঁদিয়া কাঁদিয়া আপনাদের সমস্ত দুঃখ কষ্টের কথা ও হরানন্দ ব্রহ্মচারীর আদ্যোপান্ত কাহিনী বলিয়াছিলেন। আর সন্ন্যাসিনী মা যে, তখনও ডাকা'তদের পাতালপুরীতেই বন্দী ছিলেন, তাহাও বলিয়াছিলেন। এবং যাইবার কালে বীরখালীর কাছারিতেও সব কথা জানাইয়া, জমিদার বাবুকে শীঘ্র শীঘ্র খবর দিতে বলিয়া গিয়াছিলেন। এই সুযোগে ব্রাউন সাহেব দলে বলে সজ্জিত হইয়া সত্বরই বাসদেবপুর অঞ্চলে গিয়া সমস্ত বাদা-বন ছাঁকিয়া দলে দলে ডাকা'ত ধরিয়া ফেলিলেন। কিন্তু আজও বরিশাল জেলার সর্ব্বস্থান হইতে এই ভীষণ অত্যাচার নির্ম্মূল হয় নাই। বরিশালের দক্ষিণাঞ্চলে এখনও চোর ও ডাকা'তের ভয় আছে। প্রত্যেক মাজেষ্ট্রেটই যদি সখের মৃগয়া ত্যাগ করিয়া ব্রাউন সাহেবের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিতেন, তবে এ ভয় এত দিন কিছুতেই থাকিতে পারিত না।

যাহা হউক, অল্প দিনের মধ্যেই ডাকা'তদিগকে চালান করিয়া ব্রাউন সাহেব বরিশালে ফিরিলেন। কয়েক দিনের মধ্যেই বিচার-কার্য্যও শেষ হইল। এবার বিচারে ধরণী শর্ম্মা'র যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর দণ্ড হইল।

ধরণীধর যে দিন মরিসসের কারখানার প্রধান অধ্যক্ষ ও লোকদিগকে কাটিয়া পলাইল, তাহার কয়েক দিন পূর্ব্বেই এক দিন রাত্রিযোগে চুপি চুপি কয়েকটী বড় বড় কলাগাছ কাটিয়া একত্র বাঁধিয়া সমুদ্রকূলে একটী জঙ্গলের মধ্যে রাখিয়া দিয়াছিল। ধরণীশর্ম্মা সেই ঝড় তুফান ও অন্ধকারের মধ্যে কারখানার লোকেরা গোলমালে ব্যস্ত থাকিতে থাকিতেই সেই কলাগাছের ভেলায় চড়িয়া সেই ভীষণ তরঙ্গাকুল সাগরে ঝাঁপদিয়াছিল। ভেলা ছাড়িবামাত্র তরঙ্গের মাথায় উঠিয়া বিদ্যুৎ-বেগে কোথায় যে ছুটিয়া চলিল, ধরণী অন্ধকারে তাহার কিছুই ঠিক করিতে পারিল না। কেবল দুর্জ্জয় সাহসে ভর করিয়া শরীরের সমস্ত বল প্রয়োগ পূর্ব্বক ভেলা ধরিয়া রহিল। ঈশ্বরেচ্ছায় এই মৃত্যুর গর্ভে ঝাঁপদিয়াও ধরণীধর সে বারে মরিল না। তৎপর দিবস প্রভাতের আলোকে ধরণীধর দেখিল, তাহার ভেলা আসিয়া একটা দ্বীপে ঠেকিয়াছে। ধরণী তখন তাড়া তাড়ি নামিয়া একটা জঙ্গলে লুকাইয়া লুকাইয়া কেবল সমুদ্রগামী জাহাজের যাতায়াত লক্ষ্য করিতে লাগিল। দুই দিন পরে ভাগ্য-ক্রমে ধরণী, একখানি জাহাজ তাহার নিতান্ত কাছ দিয়াই যাইতেছে দেখিয়া, তাড়া তাড়ি পুনরায় ভেলায় চড়িয়া এবার আপনার কাপড়ের এক অংশ খুলিয়া হাতে ধরিয়া উড়াইয়া উড়াইয়া চীৎকার করিতে লাগিল। ধরণী মরিসসের কারখানার জাহাজ গুলি সমস্তই চিনিত। সুতরাং সম্মুখের জাহাজ যে মরিসসের কারখানার জাহাজ নয়, তাহা দূর হইতে দেখিয়াই চিনিয়াছিল। জাহাজের লোকেরা বিপন্ন ধরণীকে দেখিয়াই পা'ল নামাইল এবং ডিঙ্গী পাঠাইয়া তখনই তাহাকে তুলিয়া লইল। জাহাজখানি লঙ্কাদ্বীপের বাহির দিয়া আরকানাভিমুখে যাইতেছিল। এখানি ফরাসী দেশীয় একজন বণিকের মাল বোঝাই করা জাহাজ। জাহাজ লঙ্কাদ্বীপে বা মান্দ্রাজ সহরে লাগিল না। জাহাজের কাপ্তান সাহেব অল্প অল্প হিন্দী জানিতেন। ধরণী তাঁহাকে কোন রকমে হিন্দীতে বুঝাইয়া বলিয়াছিল, "আমার বাড়ী বাঙ্গলা দেশে। ডেমারারা দ্বীপের একটা কাফির কারখানাতে কুলীর সরদার ছিলাম। কয়েক বৎসর পরে

ছুটি নিয়ে দেশে চলিয়াছি। যে জাহাজে যাইতেছিলাম, সে দিনকার তুফানে সে জাহাজ ডুবিয়া গিয়াছে, অন্য সকলে কোথায়ও ভাসিয়া গিয়াছে কি মরিয়াছে, কিছুই জানি না। আমি সমুদ্রে ভাসমান এই ভেলাটী ধরিতে পারিয়া ভগবানের কৃপায় এই দ্বীপে উঠিয়া বাঁচিয়াছি। বাঙ্গলা দেশের কোন স্থানে নামিতে পারিলেই আমার পক্ষে ভাল হয়। নতুবা ভারতবর্ষের কোন স্থানে নামাইয়া দিলেই হইবে।" কাপ্তান সাহেব তদনুসারে জাহাজ সুন্দর বনের কাছে আসিলে, ডিঙ্গীতে করিয়া ধরণীধরকে বাদার মধ্যে নামাইয়া দিয়াছিলেন। ধরণী কিছুদিন সুন্দরবনাঞ্চলে ঘুরিয়া ঘুরিয়া শেষটা ভীমরায়ের ডাকা'তদলে মিশিয়া ডাকা'তি করিতে আরম্ভ করিল। অল্প দিনেই ধরণীধর ভীমরায়ের প্রিয়পাত্র এবং ডাকা'তের একজন প্রধান সরদার হইয়া উঠিল। ধরণী এখানে মরিসস্ গমনের ব্যাপার গোপন করিয়া হরদেব বাড়ুয্যে নামে পরিচয় দিয়াছিল। ভীম রায় হরদেবের কুলমর্য্যাদা জানিয়া এবং দস্যুতা-কার্য্যে দক্ষতা দেখিয়া আপনার একমাত্র কন্যাকে অবশেষে হরদেবেরই হস্তে সমর্পণ পূর্ব্বক হরদেবকে সমস্ত সম্পত্তি দিয়া পরলোকে গমন করিলেন। সুতরাং হরদেবই তৎপরে বাসদেবপুর অঞ্চলের ডাকা'তদলের প্রধান ও পরিচালক হইয়া উঠিয়াছিলেন। ধরণীশর্ম্মা এইরূপে দ্বীপান্তর হইতে ফিরিয়াও আবার নিজের দুষ্ট কার্য্যের ফলে কয়েক বৎসর পরেই কঠিনতর দ্বীপান্তরে চির জীবনের জন্য প্রেরিত হইল। এই হইতে আর ধরণীশর্ম্মার কোনই খপর পাওয়া যায় নাই! ধরণীর এই পরিণাম স্মরণ করিয়া মধ্যে মধ্যে পাষাণী দীর্ঘ নিশ্বাস ছাড়িয়া অশ্রু মোচন করিত!

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

তরী আজ ডুবু ডুবু বিষম তুফানে !

সুন্দর বন হইতে পাষাণী, কুমুদ আর কুমুদের মা পৃথক একখানি নৌকায় পুলিসের লোকদের নৌকার বহরের সঙ্গে সঙ্গে বরিশালে আসিয়াছিলেন। শশাঙ্কশেখর অপর একখানি ছোট পান্সীতে তাঁহাদেরই সঙ্গে সঙ্গে আসিতেছিলেন। বরিশালের ঘাটে আসিয়া স্ত্রীলোকদিগকে

নৌকায় রাখিয়া শশাঙ্কশেখর তাড়া তাড়ি পাড়ে গিয়া সর্ব্বাগ্রে একটী বাসা ঠিক করিলেন এবং এক দ্বিপ্রহর ব্যাপিয়া কয়েক দিনের মত খাবার দ্রব্যাদি ও অন্যান্য দরকারী জিনিষাদি সংগ্রহ করিলেন। পরে একখানি পাল্‌কী পাঠাইয়া দুই বারে স্ত্রীলোকদিগকে বাসায় তুলিলেন। কিন্তু শশাঙ্কশেখরের সঙ্গে স্ত্রীলোক্দের কাহারও আর সাক্ষাৎ হইল না। বাদাবন হইতে আসিবার কালেও শশাঙ্কশেখরের নৌকা দূরে দূরে আসিতেছিল। নৌকার বহর কোন স্থানে লাগিলে, শশাঙ্কশেখর নিজের নৌকা বহর ছাড়িয়া মাঝীদিগকে কিছু দূরে রাখিতে বলিতেন। কিন্তু বরিশালের ঘাটে শশাঙ্কশেখরের নৌকাই আগে লাগিয়াছিল। স্ত্রীলোকদের নৌকা একটু দূরে থাকিতেই শশাঙ্কশেখর তীরে নামিয়া নিজের নৌকার মাঝীদিগকে বলিলেন, "স্ত্রীলোকদের নৌকার মাঝীদিগকে ডাকিয়া নৌকা তোমাদের নৌকার কাছে লাগাইতে বল। আমি বাসার অনুসন্ধানে যাইতেছি। পাল্কী না আসা পর্য্যন্ত স্ত্রীলোকদিগকে নৌকায়ই অপেক্ষা করিতে বলিবে।" এই বলিয়া শশাঙ্কশেখর একটু আড়ালে তীরের উপরে দাঁড়াইয়া, যতক্ষণ না স্ত্রীলোকদের নৌকা তীরে লাগিল, ততক্ষণ অপেক্ষা করিলেন। নৌকা তীরে লাগিলে, চলিয়া গেলেন। শশাঙ্কশেখরের সঙ্গে সেই ভয়ঙ্কর রাত্রিতে পাতালপুরীর মধ্যে অল্পক্ষণের জন্য ভিন্ন আর পাষাণীর একদিনও দেখা সাক্ষাৎ হইল না। কিন্তু স্ত্রীলোকদিগের জবানবন্দি শেষ না হওয়া পর্য্যন্ত শশাঙ্কশেখর অপর একটী বাসায় থাকিয়া পরোক্ষে পরোক্ষে সর্ব্বদাই তাঁহাদিগের তত্ত্বাবধান করিতেছিলেন। সাক্ষ্যগ্রহণের পর দিনই শশাঙ্কশেখরের উদ্যোগে আবার দুই খানি ভাড়া'টে নৌকা বরিশালের একটী নির্জ্জন ঘাটে নদীর লহরীর উপরে বুক রাখিয়া নঙ্গর-বদ্ধ হইয়া তীরের নিকটে ভাসিতে লাগিল। নৌকা দুই খানির মধ্যে একখানি পান্সী। ইহাতে সর্ব্বসমেত পাঁচ জন মাঝী। দ্বিতীয় খানি ছিপের মত লম্বা ও গোল ছৈ বিশিষ্ট নৌকা। কিন্তু ইহার বাহক তের জন। এই নৌকার এক এক পার্শ্বে ছয়টী করিয়া বারটী দাঁড় বাঁধা রহিয়াছে। যথাসময়ে পাল্কীতে আসিয়া স্ত্রীলোকগণ নৌকায় চড়িলেন। স্ত্রীলোকদিগের জন্যই পান্সীখানি নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল। যখন স্ত্রীলোকগণ নৌকায় চড়িলেন, তখন সন্ধ্যার অতি প্রাক্কাল। সম্মুখের ভাটাতে নৌকা আজ বরিশালের দক্ষিণে একটী বন্দরের নিকটে গিয়া থাকিবে স্থির হইয়াছে। এ অঞ্চলে জোয়ার ভাটার

অনুসারে নৌকা চালাইতে হয়। আজ রাত্রির প্রথমভাগে দেড় প্রহরের জ্যোৎস্না। শশাঙ্কশেখর ছিপ নৌকাখানিতে চড়িলেন। নৌকা ছাড়িতে সন্ধ্যা হইল। আস্ত এই সন্ধ্যার আলোকে জল-পথে পৃথক্ পৃথক্ নৌকার উপরে দাঁড়াইয়া আবার শশাঙ্কশেখরের সঙ্গে পাষাণীর সাক্ষাৎ হইল। জ্যোৎস্না-ধৌত পশ্চিমাকাশে অর্দ্ধচন্দ্র উদিত হইয়াছে। চন্দ্রের ঠিক সমার্দ্ধ উদিত হয় নাই। পরিষ্কার দিন, পরিষ্কার আকাশ বলিয়া চন্দ্রমণ্ডলের অপরাংশেরও-আঁধার-মাখা অস্পষ্ট ছায়া দেখা যাইতেছে। অর্দ্ধচন্দ্রের নিম্নের আকাশে গোধূলি-ললাটের প্রধান রত্নস্বরূপ জ্যোতির বড় গোলাপ ফুলটীর মত শুক্রতারা জ্বলিতেছে। নদীর লহরী-বন্ধুর বুকে থরে থরে চন্দ্র-বিম্ব ও শুক্রতারার ছায়া পড়িয়া ধীরে ধীরে কাঁপিতেছে। জলে একটু নাড়া পাইবামাত্রই যেন চকিতের মত সে স্নিগ্ধ প্রদীপ্ত লাজুক ছায়া ভয়ে ভয়ে লুকাইতে গিয়া নদীর লহরীতেই মিশিয়া যাইতেছে। কিন্তু তবুও তরঙ্গ-বক্ষে লুকান দীপ্তি দর্শকের চক্ষে ধরা পড়িতেছে। দীপ্তি কি কেহ কখনও লুকাইতে পেরে'ছে? লজ্জাশীলা কত যত্নে বরাঙ্গ-দীপ্তি-বস্ত্রে আচ্ছাদন করেন। কিন্তু সে পোড়া দীপ্তি আরও যেন শত গুণ মনোহর হইয়া মানব-চক্ষে ধরা দেয়। গুণী বিনয়বস্ত্রে প্রাণের দীপ্তি যত লুকান, ততই যেন উজ্জ্বল হইতে উজ্জ্বলতর, উজ্জ্বলতম হয়। নবীন-প্রেমিক প্রেমের নব জ্যোতি মর্ম্মের ভিতরে লুকাইতে গিয়াই প্রণয়ীর চক্ষে অতি শীঘ্র ধরা পড়েন। তাই বলি, দীপ্তি কি লুকান থাকে?

ভাটার সময় জল নামিয়া পড়াতে নদীর দুই পার্শ্বে সবুজ ঘাস ও ছোট ছোট লোণাঞ্চলের গাছ পালার নীচে কতকদূর পর্য্যন্ত এক রকম সর-পড়া কাদা জমা হইয়া চন্দ্রালোকে দীপ্তি পাইতেছিল। কাদারাশির মধ্যে ছোট ছোট গর্ত্ত প্রভৃতিতে জল জ্বলিতেছিল। তাহা দেখিয়া, বোধ হইতেছিল, যেন আকাশ হইতে তারাগুলি খসিয়া খসিয়া নদীর দুই তীরের কাদার উপরে পড়িয়া চিক্ চিক্ করিতেছে। নদীর বুকে যাত্রীদিগের নৌকাগুলি দূরে দূরে ভাটার স্রোতে বুক রাখিয়া নিঃশব্দে সা'র বাঁধিয়া ভাসিয়া যাইতেছিল। বরিশাল-সহর ছাড়াইয়া নৌকা একটু দূরে আসিতে না আসিতেই পাষণী কুমুদের হাত ধরিয়া ছৈয়ের বাহিরে নৌকার বুকে দাঁড়াইয়া দূরের জ্যোৎস্নামাখা কাল পল্লীর রেখা, জঙ্গলের শোভা, নদী-তট ও নদী-বক্ষের সৌন্দর্য্য দেখিতে দেখিতে ভাসিয়া চলিল।

নৌকা কোথায় যাইতেছে, কোথায় গিয়া থামিবে, কুমুদ, কুমুদের মা বা পাষাণী কেহই জানেন না। পাষাণী সেই পাতালপুরীতে দেখা হইবার পর হইতেই মনে করিয়াছিল, এত দিন পরে হয় ত শশাঙ্কশেখরের কাছে কতই মনের কথা ও দুঃখের কাহিনী বলিতে পারিবে। কিন্তু শশাঙ্কশেখর তৎপরে একদিন এক মুহূর্ত্তের জন্যও পাষাণীর সঙ্গে দেখা করিলেন না। বরিশালে থাকিতে থাকিতে পাষাণী শশাঙ্কশেখরকে লোক দ্বারা অনুসন্ধান করিয়া ডাকিয়াছিল। শশাঙ্কশেখর তবুও পাষাণীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করিলেন না। "কেন?" পাষাণীর মনে রোজই এই প্রশ্ন উঠিতেছিল—প্রশ্ন হইতেছিল, "দাদা আর আমার সঙ্গে দেখা করেন না কেন? কেন? কি হো'য়েছে?" পাষাণী এক এক সময় ধ্যান করিয়া সেই পাহাড়ের উপরে এক দিন জ্যোৎস্না-ভরা রাত্রিতে যাহা যাহা ঘটিয়াছিল, সুদূর-স্বপ্নের মত সেই সকল চিত্র মনশ্চক্ষুর সম্মুখে আঁকিয়া কি যেন ভাবিতে বসিত। কত ক্ষণ ভাবিয়া ভাবিয়া শেষটা কাঁদিয়া ফেলিত। পাষাণীর মনের গাঢ় আঁধারে আজও আলো ফোটে নাই। কিন্তু সেই ধোয়া পাকলা পরিষ্কার জ্যোৎস্নাভরা মনে সেই দিন হইতেই—সেই পাহাড় পর্ব্বত ভাসান দিগন্তব্যাপী চাঁদের আলোতে কি যেন এক গাঢ় আঁধারের সৃষ্টি হইয়াছিল। সে আঁধারে এখনও জ্যোৎস্নার রেখা পড়ে নাই—পাষাণী এত দিনেও কিছুই মীমাংসা করিতে পারে নাই। এ এক রকম পুর'ণ কথা।

পাষাণী আজ নৌকায় চড়িবার কালে মনে করিয়াছিল, এখন অবশ্যই দাদার সঙ্গে একবার দেখা সাক্ষাৎ হইবে। কিন্তু স্ত্রীলোকদের নৌকা ছাড়িবার পরে শশাঙ্কশেখর নৌকায় উঠিয়া ছৈয়ের মধ্যে বসিলেন। সুতরাং এবারও পাষাণীর সঙ্গে শশাঙ্কশেখরের দেখা হইল না। বরিশালে সেই এক দিন শশাঙ্কশেখরকে ডাকিয়া পাঠাইলেও, শশাঙ্কশেখর না আসাতে, পাষাণী মনে মনে অভিমান করিয়াছিল। মনে মনে ভাবিয়াছিল, আর দেখা করিতে বলিব না। আজও আবার পাষাণী ঠিক করিল, প্রাণ বাঁধিব, দেখা করিতে আর ব্যাকুলতা প্রকাশ করিব না। মানুষের মনই ত? কত সয়? কিন্তু আবার অভিমান এক একবার মস্তক হেঁট করিয়া বলিতেছিল, "কিন্তু দেখা দিলে একবারটী মাত্র পায়ে পড়িয়া জিজ্ঞাসা করিব, "কেন দেখা দেও না?" পাষাণীর মনের অন্তস্তল দিয়া এইরূপ চিন্তার এক উষ্ণ স্রোত অনবরত বহিয়া যাইতেছিল। পাষাণী কুমুদের হাত ধরিয়া তীরস্থ গ্রামের রেখা ও

বন জঙ্গলের শোভার দিকে এক দৃষ্টে তাকাইয়া অতি নিমগ্ন-চিত্তে কি যেন ভাবিতেছিল। কিন্তু কোন দৃশ্যই যেন চক্ষু দিয়া এখন আর তাহার মনে প্রবেশ করিতেছিল না। মনের দ্বার রোধ করিয়া কেবল সেই উষ্ণ স্রোতে প্রাণের অন্তস্তলে বহিতেছিল, "দেখা দিলে এখনই পায়ে পড়িয়া জিজ্ঞাসা করিব, কেন দেখা দেও না?" কুমুদ জিজ্ঞাসা করিল, "দিদি, আমরা এখন কোথায় যাইতেছি?" পাষাণী কোনই উত্তর দিল না। কুমুদ আবার জিজ্ঞাসা করিল, "দিদি আমরা এখন কোথায় চলিয়াছি?" পাষাণী এবারও কুমুদের কথার উত্তর দিল না। কুমুদ দিদীকে আর বিরক্ত না করিয়া নৌকার মধ্যে আসিয়া মাকে জিজ্ঞাসা করিল, "মা কোথায় চলিয়াছ?" বৃদ্ধা বলিলেন, "তোমার দিদী আর তোমার দাদাই জানেন। আমাদের আর কে আছে মা? এঁরা যেথানে নিয়ে যাইবেন, সেইখানেই যাইব।" মায়ের কথায় কুমুদ চুপ করিয়া আবার দিদীর পার্শ্বে আসিয়া তাহার হাত ধরিয়া দাঁড়াইল। এবারও পাষাণীর চমক ভাঙ্গিল না। এমন সময় পশ্চাৎ হইতে শশাঙ্ক-শেখরের নৌকা আসিয়া স্ত্রীলোকদের নৌকার পার্শ্বেই উপস্থিত হইল। শশাঙ্কশেখর মাঝীদিগকে বাহিতে নিষেধ করাতে দুইখানি নৌকা এবার পাশা পাশী হইয়া শুধু স্রোতে ভাসিয়া চলিল। নৌকা দুইখানির মাঝে দশ বার হাত মাত্র ফাঁক রহিল। শশাঙ্কশেখর নৌকার বক্ষে অনাবৃত স্থানে দাঁড়াইয়া ডাকিলেন, "পাষাণ।" পাষাণী শশাঙ্কশেখরের মুখে এই নূতন মিষ্ট ডাক শুনিয়া চমকিল। শশাঙ্কশেখর পাষাণীকে কখনও নাম নিয়ে ডাকেন নাই। জীবনে এইরূপ ডাক, এই-ই প্রথম। বড়ই নূতন, বড়ই মধুর বোধ হইল। পাষাণী তিলেকে অভিমান পায়ে ঠেলিয়া বলিল, "কেন?"

শশাঙ্ক।—"এখন তোমাদিগকে নিয়ে তুলসী গ্রামে যাইতেছি। ভবানীশঙ্কর বীরথালিতে তোমাকে জীবন দান করিয়া—"

পাষাণী বাধা দিয়া বলিল, "কি তিনি ভবানীশঙ্কর! বড় মামা! সেই দয়ালু পুরুষ তিনি?"

শশাঙ্ক।—"হাঁ্যা, তিনি ভবানীশঙ্কর। ভবানীশঙ্কর এখন দেশে ব্রহ্মচারী ভবানীশঙ্কর নামে পরিচিত। ভগবানের কৃপায় এখন তিনি ধর্ম্মের অমৃত পানে মৃত্যুকে জয় করিয়াছেন। এখন তিনি মহাপুরুষ।

তাঁহারই উদ্যোগে এবং কৃপায় আমরা সকলেই কারামুক্ত হইয়াছি। তোমার মুখে সেই রাত্রিতে বজ্‌রার মধ্যে শুনিয়াছিলেন, তোমার আত্মীয়গণ কারারুদ্ধ হইয়াছেন। তোমাকে তিনি চিনিয়াছিলেন।"

পাষাণী।—"সন্ন্যাসী এবং ঠাকুর দাদা মহাশয় এখন কোথায় আছেন ?"

শশাঙ্ক।—"এখন কোথায় আছেন কিছুই বলিতে পারি না। কারা-মুক্তির পরে আমরা সকলেই এক সঙ্গে তুলসী গ্রামে আসিয়াছিল্যম। জেলে আমাদের উপরে শারীরিক পরিশ্রমের কোন ভার ছিল না। আমরা শুধু বন্দীর মত ছিলাম। তিন জনই এক স্থানে থাকিতে অধিকার পাইয়াছিলাম। দিন রা'ত হরি-গুণ-গানে অতিবাহিত হইত। কয়েদীদিগেব মধ্যে এই অল্প দিনেই অনেকের জীবনে অল্প অল্প পরিবর্ত্তনের লক্ষণ প্রকাশ পাইতেছিল। জেলের কর্ম্মচারীরা বৃদ্ধ দু'টীকে বিশেষ ভক্তি শ্রদ্ধা করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। ভবানীশঙ্করকে আমাদের কারামুক্তির জন্য বিশেষ চেষ্টা করিতে হয় নাই। আমাদের সম্বন্ধে জেলাধ্যক্ষের মত জানিয়াই কর্ত্তৃপক্ষের মন নরম হইয়াছিল।"

পাষাণী।—"তাঁহারা তবে এখন কোথায় আছেন ?"

শশাঙ্ক।—"কারামুক্তির কিছুদিন পরে সাধকগণ সুধাময় হরি-গুণ গান করিতে করিতে হরিদ্বারের দিকে চলিয়া গিয়াছেন। যে কয় দিন তাঁহারা তুলসীগ্রামে ছিলেন, সে ক'টী দিন, রা'ত দিন নাম-গানে আকাশ যেন সুধায় প্লাবিত হইতেছিল। নিকটবর্ত্তী গ্রামসমূহের শাক্ত, বৈষ্ণব, হাড়ি, চণ্ডাল, মুসলমান, খ্রীষ্টান সকলেই যেন সেই প্রেমের বানে উন্মত্ত-প্রায় হইয়া মতামত ভেদাভেদ ভুলিয়া, চণ্ডালে ব্রাহ্মণে গলাগলি কোলাকোলি করিয়া সংসারের দুঃখ ক্লেশ ভুলিয়া গিয়াছিল।"

পাষাণী।—"নব্য-ভারতের সমস্ত মঙ্গলের বীজ এই মহা মিলনের মধ্যে। সাধকগণ আর্য্য প্রেম ভক্তিতে পাশ্চাত্য সেবা ও সাম্যের ভাব মিল্যইয়া নিজেদের জীবনদ্বারা নব্য-ভারতের ভিত্তি-প্রস্তর স্থাপন করিয়া গিয়াছেন মাত্র। ব্রহ্মচারী ভবানীশঙ্কর তাঁহার বিপুল সম্পত্তির কিরূপ বন্দোবস্ত করিয়া গিয়াছেন ?"

শশাঙ্ক।—"ভবানীশঙ্কর সমস্ত বিষয় সম্পত্তি তোমার নামে উইল করিয়া গিয়াছেন। আমাদের তুলসী গ্রামে আসিবার পর দিনই দান-পত্র লিখা হয়। তখনও তোমার কোনই খপর পাওয়া যায় নাই।

তথাপি তোমার নামে উইল করিয়া আমাকে প্রতিনিধি নিযুক্ত করিয়াছিলেন। কি আশায় জানি না। যাহোক্, সাধকদিগের অনুরোধে আপাতত আমি এই রূপ গুরুতর ভার নিতে সম্মত হইয়াছিলাম। কিন্তু মনে করিয়াছিলাম, বিশেষ অনুসন্ধানের পরেও তোমার কোন খবর না পাইলে, শেষটা তোমার নামে কতকগুলি সাধু অনুষ্ঠানের উদ্যোগ করিয়া সমস্ত ভার গবর্ণমেণ্টের হাতে দিয়া চলিয়া যাইব। কিন্তু ইতিমধ্যেই বীরথালির চিঠিতে ডাকা'তের হাতে তোমার শোচনীয় বন্দি-দশার কথা শুনিলাম। ভবানীশঙ্কর তখন আমার উপরে সমস্ত ভার দিয়া যাত্রার উদ্যোগ করিয়াছিলেন। আমি তোমার খপর পাইয়া আর দেরি করিতে পারিলাম না। সাধকদল অপেক্ষা না করিয়া যথাসময়ে চলিয়া গিয়াছেন। তুমি তুলসী গ্রামে ফিরিয়া যাও। আমি আর ফিরিব না।"

এই পর্য্যন্ত বলিয়া শশাঙ্কশেখর আর কথা বলিতে পারিলেন না। যেন কণ্ঠ-স্বর ধীরে ধীরে জড়িত হইতে হইতে শেষটা হঠাৎ রুদ্ধ হইয়া আসিল। পাষাণী শশাঙ্কশেখরের কথা শুনিতে শুনিতেই বুঝিয়াছিল, শশাঙ্কশেখর কাঁদিতেছেন। কথা বন্ধ হইবামাত্রই পাষাণী বলিল, "তুমি কাঁদিতেছ?"

শশাঙ্কশেখর প্রথমবারে কিছুই বলিলেন না। কেবল নিজের নৌকার মাঝীদিগকে স্ত্রীলোকদের নৌকার সঙ্গে নৌকা সংলগ্ন করিতে বলিলেন। পাষাণী ক্ষান্ত না হইয়া আবার জিজ্ঞাসা করিল, "দাদা, তুমি কাঁদ কেন?"

এবার নৌকায় নৌকা সংলগ্ন হইয়া চন্দ্রালোক-মধ্যে জল-স্রোতে ভাসিতেছিল। শশাঙ্কশেখর চক্ষু মুছিয়া বলিলেন, "কেন, বলিব না।"

পাষাণী।—"আমি রাগ কো'রেছিলাম। তুমি আমার সঙ্গে একদিনও আর দেখা কর নাই বলিয়া রাগ করিয়াছিলাম। ভাবিয়াছিলাম, কথা বলিব না। কিন্তু হঠাৎ বো'লে ফে'লেছি। কেন কাঁদিতেছ, না বলত এবার সত্যি সত্যি রাগ করিব?"

শশাঙ্ক।—"বলিব।"

পাষাণী।—"বল।"

শশাঙ্ক।—এখন না। আজও না। কালও না।"

পাষাণী।—"কবে?"

শশাঙ্ক।—"বলিব।

কথা বার্ত্তা শেষ হইতে না হইতেই পূর্ব্ববৎই নৌকার গায়ে নৌকা সংলগ্ন হইয়া শুধু স্রোতে ভাসিতে ভাসিতে নদীর আর একটী বাঁক অতিক্রম করিল। সুন্দর যুবক সুন্দরী যুবতী এখনও অদম্য আবেগ হৃদয়ে ধরিয়া সেই অনাবৃত আকাশের নীচে চন্দ্রালোকে একত্র সংলগ্ন পৃথক পৃথক নৌকার বক্ষে মুখ-মুখী হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন। শশাঙ্কশেখর তখনও মুখ হেঁট করিয়া কোঁচার খোঁটে চোখের অবিরল জলের ধারা মুছিতেছিলেন। কিন্তু কথা শেষ হইবামাত্রই হঠাৎ পাষাণী শশাঙ্কশেখরের পায়ের উপরে পড়িয়া গেল এবং দুই হাতে শশাঙ্ক-শেখরের দুইখানি পা জড়াইয়া ধরিবা চোখের জলে ভিজাইতে ভিজাইতে বলিল, "বল, তোমার কি হ'য়েছে?"

শশাঙ্কশেখর এবার তাড়া তাড়ি ব্যস্ততার সহিত পাষাণীর হাত ছাড়াইয়া পা সরাইতে গিয়া একবারে চমকিয়া উঠিলেন। হাতে হাত ঠেকিবামাত্রই দেখিলেন, এই অল্পমাত্র সময়ের মধ্যেই পাষাণীর হাত যেন একবারে হিম এবং শক্ত হইয়া গিয়াছে। শশাঙ্কশেখর তখন কেবল শুষ্ক-মুখে একবার কুমুদের মার মুখের দিকে তাকাইলেন। কুমুদের মা অগ্রেই পাষাণীকে জড়াইয়া ধরিয়াছিলেন। দিদী জলে পড়িয়া যাইবে, এই ভয়ে কুমুদও ব্যস্ত হইয়া দিদীকে ধরিয়াছিল। তাহার উপরে শশাঙ্কশেখর ধরিয়াছিলেন। কুমুদের মা পাষাণীর সমস্ত শরীর হিম ও শক্ত হইয়া গিয়াছে দেখিয়া এবং শশাঙ্কশেখরের সেই অভরসা-সূচক চাহনিতে একবারে চেঁচিয়া কাঁদিয়া উঠিলেন। কুমুদও তখন কাঁদিয়া উঠিল। শশাঙ্কশেখর অতি যত্নে নিজের চোখের জল এবং তাঁহাদের কান্না থামাইয়া, এবার স্ত্রীলোকদের নৌকায় আসিয়া তাড়া তাড়ি ধরা ধরি করিয়া পাষাণীকে অনাবৃতস্থানেই শোওয়াই-লেন। চন্দ্র-কিরণ পাষাণীর মুখের উপরে ভাঙ্গিয়া পরিল। শশাঙ্কশেখর স্থির হইয়া পাষাণীর শিরা পরীক্ষা করিলেন। দেখিলেন, শিরা ধিকি ধিকি চলিতেছে। কিন্তু রোগীর গাঢ় মূর্চ্ছার অবস্থা। তখন কুমুদ, কুমুদের মা এবং শশাঙ্কশেখর তিন জনেই সমভাবে শুশ্রূষা করিতে লাগিলেন। তাঁহাদের বহুক্ষণের অবিশ্রান্ত শুশ্রূষায় প্রথমে রোগীর কিঞ্চিৎ চেতনা হইল। কিন্তু পরমুহূর্ত্তেই পুনরায় মূর্চ্ছা হইল এবং এইরূপে কিছু ক্ষণ পরে পরেই মূর্চ্ছা ভাঙ্গিয়া পুনঃপুন মূর্চ্ছা হইতে লাগিল। সমস্ত রাত্রি গেল, পর দিন সমস্ত দিন গেল, আবার রাত্রি আসিল, পুনরায়

দিন হইল, এইরূপে ক্রমে তিন দিন চলিয়া গেল। চতুর্থ দিন অনবরত শুশ্রূষার ফলে রোগীর অবস্থা খুব ভাল বোধ হইতে লাগিল। শশাঙ্কশেখরের অনুরোধে কুমুদ এবং কুমুদের মা এই কয় দিন মধ্যে মধ্যে আহার ও বিশ্রাম করিয়াছেন। কিন্তু শশাঙ্কশেখর একভাবেই পাষাণীর পার্শ্বে বসিয়াছিলেন। কুমুদ এবং কুমুদের মাতাকর্ত্তৃক বারম্বার অনুরুদ্ধ হইয়াও বিনয় এবং কাতরতার সঙ্গে তাঁহাদিগের নির্ব্বন্ধ অতিক্রম করিয়া প্রায় অনাহারে, অনিদ্রায় দিন রা'ত রোগীর শুশ্রূষা করিয়াছেন। পাষাণীর অবস্থা আজ ভাল দেখিয়া শশাঙ্কশেখরের মুখে মেঘভাঙ্গা রৌদ্রের মত হর্ষের ছায়া পড়িল বটে, কিন্তু হৃদয়ের এক কোণে অপর দিকে একখানি কাল মেঘ সাজিল। অনেক সময় নানা দুঃখ, কষ্ট, শোক ও বিপদের মধ্যেও মানুষের প্রাণে অজ্ঞাতসারে অপার সুখ এবং আনন্দের ঢেউ উঠিতে থাকে। গাঢ় নিদ্রিতাবস্থার স্বপ্নের মত মানুষ তাহা ঈষৎ ঈষৎ অস্পষ্ট অস্পষ্ট অনুভব করে মাত্র। কিন্তু সেই দুঃখ কষ্টময় বিপদের ঘোর ভাঙ্গিয়া গেলে, তখন আবার ইচ্ছা হয়, সেই অজ্ঞাত স্বপ্নসুখে চির দিনের তরে ডুবিতে পারিলে বুঝি, বড়ই ভাল হইত। ঘটনা অত্যন্ত দুঃখকর এবং বিপজ্জনক হইলেও, দিন রাত্রি জাগিয়া অনাহারে পাষাণীর শুশ্রূষা করিতে শশাঙ্কশেখরের বড়ই ভাল লাগিতেছিল। কিন্তু রোগীর আরোগ্যের সঙ্গে সঙ্গে সে আনন্দের পরিবর্ত্তে যেন একখানি গভীর নিরাশার বিচ্ছেদান্ধকারময় কাল মেঘ শশাঙ্কের প্রাণের এক পার্শ্বে দেখা দিল। অপর পার্শ্বে শ্রম সার্থক হইল এবং প্রিয় বস্তু পাষাণ সারিয়া উঠিল বলিয়া মেঘভাঙ্গা সোণালি রৌদ্র ছড়াইয়া পড়িল। এক দিকে রৌদ্র, এক দিকে বৃষ্টি—সুখ-দুঃখের বিবাহ হইল।

শশাঙ্কশেখর আজ আবার স্ত্রীলোকদের নৌকা পরিত্যাগ করিয়া নিজের নৌকায় গেলেন। কিন্তু সমস্ত দিনই নৌকা কাছে কাছে রাখিলেন এবং ঘণ্টায় ঘণ্টায় কুমুদের মাকে জিজ্ঞাসা করিয়া রোগীর অবস্থা জানিতে লাগিলেন। মধ্যে মধ্যে এক এক বার আসিয়া স্বচক্ষে রোগীকে দেখিয়াও গেলেন। কিন্তু সে দেখা প্রায়ই পাষাণীর নিদ্রার সময়ে ঘটিল। শশাঙ্কশেখর ইচ্ছা করিয়াই এইরূপ করিতেছিলেন।

এ কয় দিন নৌকা বড় বেশী চালাইতে পারে নাই। কিন্তু আজ সমস্ত দিনই মাঝিরা খুব পরিশ্রম করিয়া নৌকা চালাইয়াছে। রাত্রিতে নৌকা

দুইখানি একটী বন্দরের নিম্নে একটা বহরের সঙ্গে নঙ্গর করিয়া রহিল। প্রভাতে আবার নৌকা চলিতে লাগিল। আজ পা'ল-ভরে নৌকা দুইখানি দ্রুতগামী পক্ষীর মত ছুটিল। পাষাণী দেড় প্রহরের মধ্যেই পথ্য করিয়া শুইল। শশাঙ্কশেখরের নৌকা আজ আবার দূরে দূরে চলিতেছিল। যেখানে বলাসিয়া বা মধুমতীর সঙ্গে ভৈরবনদী মিশিয়া এক হইয়াছে, নৌকা দু'খানি সেই স্থানে উপস্থিত হইলে, শশাঙ্কশেখরের অনুমতিক্রমে প্রথম রাত্রির মত আবার দুইখানি নৌকা গায়ে গায়ে সংলগ্ন হইয়া শুধু স্রোতে ভাসিয়া চলিতে লাগিল। আজ পাষাণী নিদ্রিতাবস্থায়। শশাঙ্কশেখর পূর্ব্বেই কুমুদের মাকে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিয়াছিলেন, পাষাণী পথ্য করিয়া সুস্থ শরীরে ঘুমাইতেছে। এবার কেবল শশাঙ্কশেখর কুমুদ আর কুমুদের মাকে ধীরে ধীরে চুপি চুপি ডাকিয়া তাঁহাদের হাতে একখানি বহুমূল্য কাগজ দিলেন। এই কাগজ ভবানীশঙ্কর-কৃত পাষাণীর নামের দান-পত্র। শশাঙ্কশেখর স্ত্রীলোকদ্বয়কে ইহা বুঝাইয়া বলিয়া, পাষাণীর ঘুম ভাঙ্গিলে তাহাকে কাগজ-খানি দিতে বলিলেন। পরে মাঝীদিগকে পুনরায় নৌকা তফাত্ করিয়া চালাইতে বলিলেন। এই সঙ্গে তাহাদিগকে চুপি চুপি আরও কি যেন বলিলেন। এবার স্ত্রীলোকদিগের নৌকা তুলসী গ্রামে যাইবার জন্য ভৈরব বহিয়া চলিল। কিন্তু শশাঙ্কশেখরের সেই বার দাঁড়ের ছিপের মত নৌকা খানি শোঁ শোঁ শব্দে তড়িত্-বেগে মধুমতীর বক্ষ আন্দোলিত করিয়া ছুটিল। কুমুদ আর কুমুদের মা তখনও পান্সীর ছৈ ধরিয়া বাহিরেই দাঁড়াইয়াছিলেন। তাঁহারা চমকিয়া দেখিলেন, তাঁহাদের সঙ্গের নৌকা তাঁহাদিগকে ছাড়িয়া ভিন্ন পথে মধুমতীনদী বহিয়া চলিয়া গেল। শশাঙ্ক-শেখর কেবল তখন সেই নক্ষত্র-বেগে ধাবমান নৌকা-বক্ষে দাঁড়াইয়া দূর হইতেই কুমুদের মাকে প্রণাম ও মুকুন্দকে বিদায়-সূচক নীরব সম্ভাষণ জানা-ইলেন। স্ত্রীলোকেরা তাহার প্রত্যুত্তর জানাইতে আর ক্ষণমাত্রও অবসর পাইলেন না। কারণ শশাঙ্কশেখরের নৌকা তৎক্ষণাৎ-ই অদৃশ্য হইয়া পড়িল। কিন্তু তাঁহারা উভয়ই দেখিলেন, সর্ব্বশেষ মুহূর্ত্তেও শশাঙ্কশেখর কোঁচার খোঁট তুলিয়া তুলিয়া অনবরত চোখের জল মুছিতেছিলেন। এই আকস্মিক ব্যাপারে কুমুদ ও কুমুদের মা অবাক্ এবং স্তম্ভিত হইয়া কেবল উভয় উভয়ের মুখ-পানে তাকাইতে লাগিলেন। তাঁহাদের মুখ দেখিয়া বোধ হইতে লাগিল, যেন পাষাণী জাগিলে তাহারা তাহাকে

এ সংবাদ কি করিয়া দিবেন, ইহা ভাবিয়াই ব্যাকুল হইতেছেন; কিন্তু কিছুক্ষণ পরেই পাষাণী জাগিয়া যখন অল্প সময়ের মধ্যেই জানিল, শশাঙ্ক-শেখর তাহাদিগকে ছাড়িয়া চলিয়া গিয়াছেন, তখন সত্য সত্যই বিপদ ঘটিল। কাঁদিতে কাঁদিতে আবার পাষাণী মূর্চ্ছিত হইল। এবার পীড়া আরও ভয়ানক বলে রোগীকে আক্রমণ করিল। কুমুদ আর কুমুদের মা এবার কেবল পাষাণীকে কোলে করিয়া বিহ্বলের মত চক্ষুর জলে তাহার মাথা সিক্ত করিতে লাগিলেন। বরিশাল হইতে যাত্রা করিয়া সেই প্রথম রাত্রিতেও পাষাণীর হাতে দান-পত্র দিয়া বিদায় চাহিবার জন্যই শশাঙ্কশেখর মাঝীদিগকে বলিয়া নৌকা দুই খানি একত্র সংলগ্ন করিয়াছিলেন। আজ পাষাণীর সঙ্গে শেষ দেখা না করিয়াই চিরবিদায় গ্রহণ করিলেন। অপার মনোদুঃখের তুফানে পড়িয়া পাষাণীরূপ সৌন্দর্য্যময়ী তরুণী-তরী ডুবু ডুবু হইল! শশাঙ্কশেখরের মনের কথা কি জানি না। কেননা তিনি কাহাকেও কিছু বলিয়া গেলেন না। কিন্তু পাষাণী বুঝিয়াছিল, এই বিদায়ই শশাঙ্কশেখরের শেষবিদায়—এ জীবনের জন্য চির বিদায়! এ গুরুতর দুঃখভার পাষাণীর কোমল হৃদয়ের পক্ষে বড়ই ক্লেশকর হইল!

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

শান্তি-ধামে।

"অমৃতেন তৃপ্তস্য পয়সা কিং প্রয়োজনম্।"

উত্তর গীতা।

পর্ব্বতের উপরে একখানি কুটীর। কুটীর খানি পাতায় ছাওয়া, ক্ষুদ্র, পুরাতন এবং জীর্ণ। ঝড় তুফান শীলাবৃষ্টির মধ্যে অন্ধকার রাত্রিতে কুটীরে আজ প্রদীপ জলিতেছে। রাত্রি গভীর। কুটীরের নিম্নেই পর্ব্বত-মূলে পূর্ণ বর্ষাকালের উচ্ছ্বসিত-বক্ষা জাহ্নবী আবর্ত্তময় জলে তরঙ্গ তুলিয়া ছুটিতেছে। অন্ধকারে দশদিক্ আচ্ছন্ন। কেবল আকাশে মেঘের বুকে মধ্যে মধ্যে বিজলী প্রকাশ পাইতেছে আর বজ্রশব্দে এক এক বার পৃথিবী কাঁপিয়া উঠিতেছে। ঝড়ের প্রতি উচ্ছ্বাসেই আশঙ্কা হইতেছিল, কুটীর খানি বুঝি এবারেই সমূলে উৎক্ষিপ্ত হইয়া উড়িয়া যাইবে। কুটীরের ভাঙ্গা

বেড়া দিয়া ঘরের মধ্যে বৃষ্টির ঝাপট্ আসিতেছিল। চাল দিয়াও স্থানে স্থানে জল পড়িতেছিল। জলে মে'ঝের কতক স্থান সম্পূর্ণ প্লাবিত হইতেছিল। কিন্তু কুটীর-বাসীদের সেদিকে দৃক্‌পাতও নাই। কুটীরের যে স্থানটুকু শুষ্ক আছে, সেখানে এক থানি মৃগ-চর্ম্মের বিছানার উপরে একজন পক্ককেশ বৃদ্ধ সন্ন্যাসী শুইয়া আছেন। ইনি রোগী। ইহাঁর ভস্ম-লিপ্ত নগ্ন-প্রায় দেহ সাতিশয় ক্ষীণ এবং জীর্ণ হইয়া গিয়াছে। শ্বাসাদির প্রক্রিয়া দেখিয়া বোধ হইতেছিল, যেন রোগীর অত্যন্ত যাতনা হইতেছে। কিন্তু তাঁহার নির্ব্বাণ-প্রায় প্রশান্ত মুখ-শ্রী হইতে এখনও আনন্দ উছলিয়া পড়িতেছে। দ্বিতীয় ব্যক্তি পূর্ণ-বয়স্ক যুবক। ইনি কিছু বিষণ্ন। ভগ্ন গৃহের সমস্ত বৃষ্টির জল ইহারই মস্তকের উপর দিয়া বহিয়া যাইতেছে। যুবক আর্দ্র-বস্ত্রে আর্দ্র মৃত্তিকাতে বৃষ্টির জলে ভিজিতে ভিজিতে বিষণ্ন-মুখে মুমূর্ষু সন্ন্যাসীর পার্শ্বে বসিয়া আছেন। যুবকের দেহও সুস্থ বলিয়া বোধ হইতে ছিল না। কিন্তু তিনি আপনার অসুস্থতা যত্নে গোপন করিয়া দিন রাত্রি সম ভাবে সন্ন্যাসীর শুশ্রূষা করিতেছেন। প্রদীপটী গৃহের এক কোণে অতি যত্নে রক্ষিত হইয়াছে। কিন্তু তথাপি বাতাসে এক এক বার নিবু নিবু হইতেছিল। প্রদীপের রশ্মি কাঁপিয়া কাঁপিয়া সন্ন্যাসীর মুখের উপরে পড়িতেছিল। যুবক সন্ন্যাসীর মুখের নিকটে মুখ নত করিয়া ধীরে ধীরে জিজ্ঞাসা করিলেন, "বড় কষ্ট হইতেছে? একটু জল দিব?"

সন্ন্যাসীর চক্ষু যদিও নিমীলিত নয়, তথাপি তিনি গম্ভীর ভাবে কি যেন চিন্তা করিতেছিলেন। সুতরাং প্রথম বারে যুবকের কথার কোনই উত্তর না দিয়া কেবল চোক দুইটী তাঁহার মুখের উপরে স্থাপন করিয়া এক দৃষ্টিতে তাকাইয়া রহিলেন। যুবক পুনরায় অধিকতর আগ্রহের সহিত কাতরস্বরে বলিলেন, "বাবা, আপনার বড় কষ্ট হইতেছে?" সন্ন্যাসী এবার ভ্রূ আকুঞ্চন করিয়া ঈষৎ স্ফূরিতাধরে বলিলেন, "বড় আনন্দে আছি।" কিন্তু যুবকের চোক দিয়া ফোঁটা ফোঁটা জল পড়িতেছিল। যুবক চোক মুছিতে, সন্ন্যাসী তাহা দেখিলেন। দেখিয়া গম্ভীর-ভাবে মৃদুস্বরে বলিলেন, "বাবা, শশাঙ্ক, সামান্য কারণে তোমার মত সাগরে আমি তরঙ্গ দেখিতে চাই না। আমার বিচারে তোমার কর্ত্তব্যের কোনই ত্রুটি হয় নাই। তবে আমি এসংসার ছাড়িয়া যাইতেছি বলিয়া বোধ হয় তোমার ক্ষোভ হইতেছে। কিন্তু তুমি কি

জান না, যেথানে যাইতেছি তাহা মানবমাত্রেরই গম্যস্থান এবং অনন্ত জীবনের আনন্দ-ধাম? অনন্তদেবের অনন্ত আনন্দময় রাজ্যের সামান্ত পণ্যবীথিকামাত্র এই সংসার। ইহার পর পারে ক্রমশই উন্নততর, উন্নততম অসংখ্য আনন্দের হাট বাজার রহিয়াছে। সে সকলের দর্শন-সুখে বঞ্চিত হইয়া পিঞ্জর-বদ্ধ পাথীর মত এ সামান্ত স্থানে কি চির জীবনের তরে বন্দী থাকিতে ইচ্ছা হয়? "উঃ—! জল দেও—! বাবা, জল দেও—! কেঁদ না। অশ্রু-প্লাবিত চক্ষু কেবল আনন্দময়ে অবিশ্বাসের কথা প্রচার করে। জল দেও—! তোমার কর্ত্তব্যের কোন ত্রুটি হয় নাই। জল দেও—!"

শশাঙ্কশেথর তাড়া তাড়ি সন্ন্যাসীর শুষ্ক মুখে জল দিলেন। সন্ন্যাসী কিঞ্চিৎ সুস্থ হইলে, যুবক অত্যন্ত কাতর ভাবে আরও অধিকতররূপে অশ্রুজলে অভিষিক্ত হইতে হইতে বলিলেন, "মহারাজ, আপনি একটী রাজ্যের স্বাধীন রাজা ছিলেন।" বলিতে শশাঙ্কশেথরের কণ্ঠ-রোধ হইতেছিল। তবুও কিছুক্ষণ অপেক্ষা করিয়া আবার বলিতে উদ্যত হইলেন। কিন্তু এবারও কথা বলিতে জোরে কান্না আসিতে লাগিল। সুতরাং অতি সংক্ষেপে বলিলেন, "আমার কর্ত্তব্য? আমার কর্ত্তব্য কিছুই হইল না। আমি আপনার কুপুত্র।" এই বলিয়া শশাঙ্কশেথর নত-মুখে আবার ঘন ঘন চক্ষু মুছিতে লাগিলেন।

সন্ন্যাসী এতক্ষণ কেবল শশাঙ্কশেথরের অশ্রু-প্লাবিত মুখের দিকে তাকাইয়াছিলেন। শশাঙ্কশেথর কথা শেষ করিয়া পূর্ব্বাপেক্ষাও অধিকতর ব্যাকুলতার সঙ্গে কাঁদিতে আরম্ভ করিলে, পুনরায় পূর্ব্ববৎ ধীর গম্ভীর মৃদুস্বরে বলিতে লাগিলেন—কিন্তু এবার স্বর আরও ক্ষীণতর বোধ হইতেছিল, সেই ক্ষীণ কণ্ঠেই বলিতে লাগিলেন, "ধূলা খেলাতে শুধু ছেলেদেরই আমোদ। মানুষ যখন জানে, তাহারও অতীত কিছু করিবার আছে, তখন আর সে সেই ছোট বেলার খেলা ঘরের দিকে একবার ফিরিয়াও চায় না। বাবা, যতক্ষণ না মন সংসারের যৎসামান্ত ভোগ-সুখের অতীত কিছু আছে বলিয়া জানে, ততক্ষণই গুটীপোকার মত তাহাতেই বদ্ধ থাকে। কিন্তু ভগবৎ-করুণা পক্ষস্বরূপ হইয়া যখন এই বদ্ধ জীবকে প্রেমময়ের প্রেমাকাশে উড়াইয়া লইয়া যায়, তখন কি আর সে সেই বদ্ধাবস্থার জন্ত লালায়িত হইয়া থাকে? না সেই যৎসামান্ত সুখকে তাহার সুখ বলিয়া বোধ হয়? পূর্ব্বে বদ্ধ থাকিতে, ঘুমাইতে এবং

অন্ধকারে ডুবিতেই তাহার সুখ হইত। কিন্তু উড়িবার নাম শুনিলেই ভয়ে গা কাঁপিয়া উঠিত। এখন তাহার উড়িতেই সুখ, আলোকেই আনন্দ, জাগরণেই শান্তি। দ্বিপ্রহরের রৌদ্র, ঝটিকার বজ্র, শীতের হিম, বনের হিংস্রজন্তুই তাহার এখনকার এই সুখময় নব জীবনের নিত্য-সহচর হয়। এ পৃথিবীর রাজত্ব এই গুটীপোকার অবস্থামাত্র। এ অবস্থায় সংসার-স্বার্থান্ধ মানুষের চাতুরীর অন্ধকারে ঢাকা থাকে। জীবনাকাশে খাটি মনের মানুষরূপ একটীও জ্যোতিষ্কের কিরণ-রেখা দেখিতে পাওয়া যায় না। রাজপদরূপ ক্ষুদ্র অন্ধকার-পূর্ণ বাসাতে বদ্ধ থাকিয়া সমস্ত বিচিত্র জগৎকে দূরে বিদায় করিয়া দিতে হয়। প্রাণের গান গুলি ফুটিলেও প্রাণ খুলিয়া গাওয়া যায় না! মনের কথাগুলি নিরাশ্রয় লতার মত সর্ব্বদাই অনাদরে শুকাইয়া যায়! বাবা, ভগবান্ আমাকে কৃপা করিয়া বহু দিন হইল, এই গুটীপোকার দুরবস্থা হইতে ভিতরে বাহিরে সমানরূপে উদ্ধার করিয়াছেন। উঃ—! জল!—জল দেও বাবা—! জিভ্ যায়—! অমৃতেন তৃপ্তস্য পয়সা কিং প্রয়োজনম্।”

শশাঙ্কশেখর মুমূর্ষুর মুখে জল দিয়া পূর্ব্ববৎই মস্তক অবনত করিয়া রহিলেন। জিহ্বা সরস হইলে, সন্ন্যাসী পুনরায় অধিকতর ক্ষীণ-স্বরে বলিলেন, “রাজা সাধারণের ভৃত্যমাত্র। কিন্তু যাঁহারা রাজ-পদে অভিষিক্ত হন, তাঁহারা ব্যবহারে ইহার সম্পূর্ণ বিপরীত আচরণ করেন। রাজারা মনে করেন, তাঁহাদের ভোগ-সুখের এক চাটিয়া অধিকার পূর্ণ করিতেই ভগবান্ তাঁহাদিগকে এই উচ্চপদে অভিষিক্ত করিয়াছেন। বস্তুত রাজ-পদে থাকিতে পদে পদে কত সহস্র সহস্র কর্ত্তব্যের ত্রুটি দেখিয়া সর্ব্বদাই হৃদয়ে দারুণ আঘাত পাইতাম। কিন্তু ঐশ্বর্য্যজাত ভোগ-সুখের কি যেন এক মোহিনী শক্তি আমাকে একবারে অভিভূত করিয়া ফেলিয়াছিল। এখন আমি পক্ষীর মত আকাশে উড়িয়াছি। কিন্তু এক দিকে পূর্ব্বের সেই অসংখ্য কর্ত্তব্যের ত্রুটি, অন্যদিকে গভর্ণমেণ্টের সেই হৃদয়-শোণিত-উষ্ণকারী, স্বার্থ-দোষিত, পক্ষপাত-পূর্ণ অযথা শাসন, এই দুই-ই আমার প্রাণে আজও যেন জাগ্রত রহিয়াছে। আমাদের গভর্ণমেণ্টের ধারের অন্ত নাই, অপব্যয়ের সীমা নাই, কিন্তু, তথাপি তাঁহারা দেশীয় রাজাদের সামান্য সামান্য ত্রুটি দেখিলেই গর্জ্জিয়া উঠেন। বস্তুত তাঁহারা নিজেরা দ্বিতীয় সিরাজ্-উদ্দৌল্লা হইয়া দেশীয় রাজাদিগের রাজ্যে শুধুই রামরাজ্য দেখিতে চান। সত্য কথা বলিতে

গেলে, একজন সাধারণ লোকের চেয়েও দেশীয় রাজগণ শতগুণে অধীনতা-পাশে বদ্ধ। জল দেও বাবা—! উঃ—! জল দেও—! মানুষ আবার মানুষের রাজা হইবে কেন? উঃ—! জল—! মানুষের রাজা স্বয়ং ভগবান্। জল দেও—! বুদ্ধ, চৈতন্য, খ্রীষ্ট, রামমোহন তাঁহারই অনুশাসন-প্রচারার্থ জগতে আসিয়াছিলেন। জল দেও বাবা—! যাহারা দস্যুতা ও চৌর্য্যবৃত্তি-দ্বারা সেই খোদ ভগবানের পদে আপনাদিগকে অভিষিক্ত করিয়া লোক-জগতে অশান্তি ও অত্যাচারের রাজ্য বিস্তার করিতেছে, স্বর্গের বিচারে তাহারা দণ্ডার্হ হইবে। জিভ্ যায়—! জল দেও—! আর কথা সরিতেছে না—! যাই—! বাবা, যাই—! ভগবানের শান্তিপূর্ণ কোলে যাই—! জল দেও—! পৃথিবীর অত্যাচার পৃথিবীতেই রহিল—! সময়ে ভগবান্ তাঁহার নূতন বিধান প্রেরণ করিয়া ইহার উপশম করিবেন। তিনি মঙ্গল-স্বরূপ। তাঁহার রাজ্যে অমঙ্গল চিরস্থায়ী হইবে না। রাজা এবং রাজ্য-ও তাঁহারই ভূত কালের বিধান। জল দেও—! ধর্ম্ম। ধর্ম্মই সার এবং সত্য বস্তু। ধর্ম্মের শান্তির মত আর সুখ নাই। জল দেও বাবা—! পৃথিবীর ঐশ্বর্য্য এবং রাজত্ব কিছুই না। ধর্ম্ম। ধর্ম্ম, সর্ব্বান্তঃকরণে প্রেম-ময়কে প্রেম করা—হৃদয়ে—প্রাণে—মর্ম্মের মর্ম্মতলে ডুবিয়া প্রেম করা—প্রেমে আত্ম বিসর্জ্জন করা। উঃ—! জল দেও—! নিরাড়ম্বর এবং গম্ভীর হইয়া প্রেম-সাগরে ডুবিয়া যাইতে হইবে। প্রেম-সাগর—ভগবৎপ্রেম, অতি গভীর—আরও গভীর—তাহার পরেও গভীর—কত গভীর, বলিবার ভাষা নাই। উঃ—! জল দেও বাবা! কিন্তু সে প্রেম কর্পূর বা মৃগনাভির মত বাহিরের আড়ম্বরের বাতাস লাগিলেই উ'বে যায়। জল—! ভগবান্, যুবতী নারীর অপেক্ষাও অভিমানী এবং লাজুক। তাঁহার প্রেম-রাজ্যে সর্ব্বদা পা টিপিয়া চলিতে হয়। আর না—! উঃ—! আর কথা সরে না—! আমি ক্রমেই যেন বাহ্য জগৎ ভুলিয়া যাইতেছি। কেমন আনন্দ—! কেমন শান্তি—! মৃত্যুর পর পারে গভীর আনন্দ, গভীর শান্তি! যিনি প্রেমিক তিনি, কুসুমে এবং বজ্রে, সুধায় এবং গরলে, আগুনে এবং সুশীতল জলানিলে, সুখে এবং দুঃখে, জীবনে এবং মরণে সমভাবে প্রাণবল্লভের আনন্দ-ঘন স্পর্শ অনুভব করেন। জীবনও তাঁর, মৃত্যুও তাঁর। সকলই তাঁহারি দত্ত প্রেমোপহার। আমাদের কিছু নাই। আমরা কিছু করি না। তিনিই সর্ব্বাধিকারী, সকল কার্য্য-সম্পাদক। আমরা কেবল

সর্ব্বাবস্থায়ই তাঁহাকে ভক্তি করিতে অধিকারী। মৃত্যু-মধ্যে তিনি চিদ্‌ঘন-আনন্দ পারাবার রূপে সদা উচ্ছ্বসিত। মৃত্যু শান্তি ও আনন্দ-ধামের সেতু। উঃ—! আর না। শান্তি শান্তি শান্তি।”

শশাঙ্কশেখর মুমূর্ষু পিতৃদেবের মুখে বারম্বার জল দিতেছিলেন আর মুখ হেঁট করিয়া এক সঙ্গে চোখের জলে বৃষ্টিরজলে ভিজিতে ভিজিতে পিতার শেষ কথা গুলি মনোযোগের সহিত শুনিতেছিলেন। সন্ন্যাসী অতি অস্পষ্ট ক্ষীণ-স্বরে শেষ কথা কয়টী বলিতে বলিতেই চক্ষু খাড়া করিলেন। রাজ-পুত্র যুবক শশাঙ্কশেখর বুঝিলেন, পিতৃদেবের সঙ্গে এ পৃথিবীর জন্য এই-ই শেষ দেখা—শেষ আলাপ। বুঝিয়া, চমকিয়া উঠিলেন। কেবল তখন পিতার মৃত্যুকালীন মুখখানি আর একবার ভাল করিয়া দেখিবার জন্য পার্শ্বস্থিত সেই ক্ষীণালোক প্রদীপটী ধীরে ধীরে তুলিলেন। প্রদীপ তুলিয়া আনিতেই নিবিয়া গেল। নির্ব্বাপিত দীপ শশাঙ্কশেখরের হস্তে রহিল। তখন সেই ঝটিকাপূর্ণ রাত্রির আকাশ-পাতাল-ব্যাপী গাঢ়-অন্ধকার-সাগরে পর্ব্বত-পৃষ্ঠস্থিত সেই জীর্ণ ক্ষুদ্র পর্ণ-কুটীর-বিন্দুটী যেন একবারে বিলীন হইয়া গেল। নিম্নে জাহ্নবী গর্জ্জিতেছিল। বাহিরে তখনও দূর দূরান্তর হইতে ঝটিকার বাতাস গর্জ্জিয়া গর্জ্জিয়া আসিয়া পাহাড় সকল কাঁপাইতেছিল। আর শীলা, বৃষ্টি, বিদ্যুৎ, বজ্র এক সঙ্গে মিলিয়া সেই ভয়ঙ্করী নিশার ভীষণভাব এবং গাম্ভীর্য্য আরও যেন বাড়াইতেছিল। সন্ন্যাসীর সাতিশয় ক্ষীণকণ্ঠ তখনও অস্পষ্টস্বরে বাজিতেছিল। শশাঙ্কশেখর অনুভব করিতে লাগিলেন, যেন পরলোকগামী মহাপুরুষ সেই বাহ্য সৃষ্টির অতীত আলোকময় দেশ হইতে বলিতেছেন, “গভীর—আরও গভীর—ধর্ম্ম—আনন্দ—শান্তি—প্রেম—বিশ্বমাতা—।” অতঃপর কণ্ঠ সম্পূর্ণ নিঃশব্দ হইল। শশাঙ্কশেখর অন্ধকারেই পিতৃদেবের বক্ষে কর-পল্লব স্থাপন করিলেন। কিন্তু স্পর্শমাত্রই বুঝিলেন, তাহা হিমময় এবং প্রাণশূন্য। তখন কিছু ক্ষণের জন্য কুটীর-গর্ভ গভীর স্তব্ধতায় পরিপূর্ণ হইল।

বিলাসখণ্ডাধিপতি উদাসীন হইয়া শিবির পরিত্যাগপূর্ব্বক পলায়ন করিয়াছিলেন। বস্তুত পাহাড়ীদের হাতে তৎকালে তাঁহার অপমৃত্যু ঘটে নাই। উহা কেবল ইংরেজ-কলঙ্ক দুশ্চরিত্র কাপ্তান হেন্‌রি রটনা করিয়াছিল। পরিব্রাজক শশাঙ্কশেখর ভারতবর্ষের নানা স্থান পরিভ্রমণ করিতে করিতে ঘটনাবশত পিতৃদেবের এই শেষ বসি-স্থানের নিকটে উপস্থিত হওয়াতে, পিতা পুত্রে হঠাৎ আশ্চর্য্য রূপে মিলন হইয়াছিল।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

শ্মশান-বাসী।

"জনম অবধি হাম রূপ নেহারলুঁ
নয়ন না তিরপিত ভেল।"
বিদ্যাপতি।

শশাঙ্কশেখর এবার পিতৃদেবের শ্মশান-ভস্ম গায়ে মাখিয়াছেন। বস্ত্রের পরিবর্ত্তে কৌপীন পরিয়াছেন। পিতৃদেবের শ্মশানের উপরে পত্র-কুটীর নির্ম্মাণ করিয়া তাহাতে বাস করিতেছেন। দীর্ঘকাল-ব্যাপী নানা অনিয়মে শশাঙ্কশেখরের স্বাস্থ্য-ভঙ্গ হইয়াছে। শরীর জীর্ণ ও শীর্ণ হইয়া গিয়াছে। প্রতি রাত্রিতেই শশাঙ্কশেখরের কম্প দিয়া ভয়ানক জ্বর হয়। এতদ্ভিন্ন বুকে ব্যথা আছে, কাশি আছে এবং কাশির সঙ্গে অত্যন্ত রক্ত পড়ে। ইহার উপরে আবার উদরাময় এবং অত্যন্ত অরুচি রোগ হইয়াছে। শশাঙ্ক যখন ভাল থাকেন, তখন অতি কষ্টে গঙ্গা হইতে কিছু জল তুলিয়া একমাত্র পৈত্রিক সম্পত্তি কমণ্ডলু পূর্ণ করিয়া রাখেন। কেবল পিপাসায় গলা শুকাইলেই, তাহা হইতে কিঞ্চিৎ জল পান করেন। এতদ্ভিন্ন শশাঙ্কশেখরের আহারের বড় বিশেষ প্রয়োজন হয় না। প্রয়োজন হইলেই, পাহাড়ের জঙ্গল হইতে পাখীর ভুক্তাবশিষ্ট, বৃক্ষতলে পতিত ফল সংগ্রহ করিয়া ভোজন করেন। বলিতে ভুল হইয়াছে, শশাঙ্কশেখর পিতার পরিত্যক্ত কমণ্ডলুটী ছাড়া একটী ঝুলী এবং মৃগচর্ম্মখানিও পাইয়াছিলেন। অত্যন্ত জ্বরের সময়ে মৃগচর্ম্মের উপরে শয়ন করেন আর কোন দ্রব্যের বিশেষ দরকার হইলেই এক এক বার ঝুলীটি তল্লাস করিয়া দেখেন। ঝুলীটীতে মহাদেবের ভিক্ষার ঝুলীর ন্যায় সন্ন্যাসীদের প্রয়োজনীয় অনেক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জিনিষ আছে। পিতৃদেবের জীর্ণ কুটীরখানি তাঁহার স্মরণার্থ শশাঙ্কশেখর পুনঃ সংস্কার করিয়া আজও রাখিয়া দিয়াছেন। যে পাহাড়ে শশাঙ্কশেখর এইরূপ নবীন সন্ন্যাসীর বেশে পিতৃদেবের শোক-প্রকাশার্থ নির্জ্জনে একাকী বাস করিতেছিলেন, ইহা এলাহাবাদের কয়েক ক্রোশমাত্র দক্ষিণে এবং স্বামীজির পাহাড় নামে অভিহিত। পাহাড়ের আড়াই ক্রোশ পূর্ব্বে জোগ্রাম। জোগ্রামই স্বামীজির পাহাড়ের নিকট-

বর্ত্তী জনপদ। জ্যোগ্রামে একটী ডাকঘর আছে। এলাহাবাদ হইতে একটী সরকারী রাস্তার উপর দিয়া ঘোড়া, গরুর গাড়ী, এক্কা অথবা শিল্লি-কায় কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই জ্যোগ্রামে পৌছাযায়।

শশাঙ্কশেখর যতক্ষণ কিঞ্চিৎ ভাল থাকেন, ততক্ষণ পিতৃদেবের শ্মশান-বক্ষে যোগাসনে বসিয়া সেই পার্ব্বত্য সূচিভেদ্য স্তব্ধতা এবং গভীর গাম্ভীর্য্যে বাহ্য চেতনা বিলীন করিয়া ধ্যান-নিমীলিত-নেত্রে কি যেন মহতী চিন্তায় নিমগ্ন থাকেন। আর যখন অবিশ্রান্ত জ্বরের উপরে পুনরায় কম্প দিয়া ভয়ানক বেগে জ্বর আসে, তখন সেই স্থানেই হতচেতন হইয়া পড়িয়া থাকেন। শশাঙ্ক বুঝিয়াছেন, এবার এ রোগ-যন্ত্রণা হইতে পুনর্ম্মুক্তি লাভ করা অসম্ভবপর। বুঝিয়া, কেনই যেন বিষণ্ণ বা ভীত হন নাই। শশাঙ্কশেখরের চক্ষুতে আজ পরকাল কেনই যেন বড়ই মধুময়। প্রতি পলে, প্রতি মুহূর্ত্তে কোথা হইতে যেন অতি ক্ষীণ কণ্ঠের অস্পষ্ট স্বরে নিঃশব্দে তাঁহার কাণে বাজিতেছে "মৃত্যুর পরপারে গভীর আনন্দ, গভীর শান্তি। শান্তি শান্তি শান্তি।" কিন্তু কখনও কখনও হঠাৎই কেন যেন সেই গম্ভীর প্রশান্ত সমুদ্র বিক্ষিপ্ত হইয়া উঠে। তখন শশাঙ্কশেখরের দুই গণ্ড প্লাবিত করিয়া অশ্রুর ঝরণা বহিতে থাকে, চক্ষুর দৃষ্টি সহসা স্থির ভাব ধারণ করে। যুবক শশাঙ্কশেখর তখন দেখেন,—একরূপ জাগ্রতস্বপ্নে দেখেন, তাঁহার সম্মুখ-ভাগ আলোকিত করিয়া যেন নবীন-মেঘ-বক্ষস্থিত এক বিদ্যুৎ-ময়ী প্রতিমা সহাস্য-বদনে দাঁড়াইয়া আছেন। কিন্তু তৎপশ্চাতেই সেই রাজর্ষি পিতৃদেবের প্রশান্ত ক্ষীণ মূর্ত্তি ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া দণ্ডায়মান। তিনি যেন অন্তর্যামী রূপে মনের গূঢ় খবর সকল জানিয়া ধীর গম্ভীর স্বরে বলিতেছেন, "হে শ্মশানবাসিন্, হে নবীন তপস্বিন্, তুমি এ স্থির-নেত্রে কি দেখি-তেছ? তোমার এমন গভীর সমাধির নিবিড়-মেঘ-বক্ষে কোথা হইতে এ বিদ্যুল্লতা ঘন ঘন চমকিয়া মন প্রাণ আন্দোলিত করিয়া হঠাৎ সরিয়া সরিয়া যায়? তোমার মর্ম্মতলের যে স্বর্ণময় দাগ এত বৈরাগ্যে, এত তপস্যায়, এত সমাধিতেও মুছিয়া গেল না, পর কালে গেলেই যে, সে দাগ মুছিয়া যাইবে, অথবা তুমি মুছিতে পারিবে, কে বলিল? ঐ আলুলায়িত-নিবিড়-সুদীর্ঘকেশী, সরলতাময়ী স্বর্ণ-প্রতিমা সদৃশ ছবিটী কাহার? ইহাই কি তুমি স্থিরনেত্রে দেখ? পরাশরাদি মহা মুনিগণের

গভীর ধ্যানের অন্ধকারেও যে বিদ্যুল্লতা মোহিনী দীপ্তি বিস্তারে সমর্থ হইয়াছিল, মহাযোগী মহাদেব যেখানে পরাজয় স্বীকার করিয়াছেন, তেমন স্থলে তোমার চিত্ত-চাঞ্চল্য ঘটিয়া থাকিলে তুমি তজ্জন্য গুরুতর অপরাধী নও। প্রকৃতির সংগ্রামে যাঁহারা জয়ী, তাঁহারাই পরাজিত। এই জন্য চির-উদাসীন সংসার ত্যাগ করিয়া জয়ী হইয়াও পরাজিত। পরাশর, মহাদেব, সকলেই এই জন্য পরাজিত। আবার মহা সংযমী শুকাদিও পরাজিত। যোগী তুমি—তুমিও পরাজিত। কেন না, বিন্দু হইতে সিন্ধুর সৃষ্টি, অণু হইতে ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি—সৃষ্টি, মিলনে—মিলন, একে একে দুইয়ে। দুই হইতে তিন, চারি, পাঁচ ইত্যাদি ইত্যাদি—সংখ্যা হইতে অসংখ্য—সীমা হইতে অসীম—অনন্ত। অনন্তের পরে নিত্যানন্দ, পূর্ণ-প্রেম-পারাবার স্বয়ং ভগবান। মিলনে ভগবান তুষ্ট। তাই সৃষ্টি, তাই শক্তি, তাই ভক্তি। যিনি ভগবানকে কৃষ্ণ কল্পনা করিয়া ভক্তকে রাধা কল্পনা করিয়াছিলেন, তিনি মহাজ্ঞানী। এই মিলনের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হওয়া আর উচ্ছ্বসিত সিন্ধুর সম্মুখে বালীর বাঁধ দেওয়া, উভয়ই সমান। নর আর নারীর পবিত্র সম্মিলন ভগবানে পৌঁছিবার আদি বা প্রথম সোপান-স্তর। প্রথম স্বামী এবং স্ত্রী। তৎপরে সন্তান। সন্তানের পরে অনাদ্যনন্ত বিশ্ব সংসার। তৎপরে পূর্ণব্রহ্ম আনন্দস্বরূপ প্রেমময়। ইহাই প্রেমের সাধন-সোপান। ভগবান এই পথের সন্ধিস্থলে মানুষকে দণ্ডায়মান করিয়াছেন। পথ ছাড়িয়া বিপথে গেলেই পরাজয়। তাই তুমি আজ পরাজিত। এ পরাজয়ে তুমি গুরুতর অপরাধী নও এই জন্য যে, এখানে তোমার পরিচালক তুমি নও, পরিচালক ঘটনা। কিন্তু এইরূপ স্থলেও মানুষ দায়িত্ব শূন্য নয়। কেন নয়? উত্তর গভীর সমস্যা-পূর্ণ অথবা ইহাই সৃষ্টিরহস্যের কুটিল প্রহেলিকা। কিন্তু এ বিশেষ স্থলে তোমাকে ক্ষমা এবং দয়ার চক্ষেই দেখিব। কারণ এখানে সংযমনেই পূর্ণ পুণ্য। কিন্তু তাহাতেও তুমি সম্পূর্ণ জয়ী হইতে অসমর্থ বলিয়া কৃপাপাত্র। তুমি ভস্মই মাখ, কৌপীনই পর, আর লোকালয় ত্যাগ করিয়া শ্মশানেই থাক, কিছুতেই কিছু হইবে না। ভগবৎ-কৃপা ব্যতীত মনের মলা আর কিছুতেই ধৌত হয় না—ইহ পরকালে কোথায়ও হয় না। আত্ম-বল ত্যাগ করিয়া ভগবৎ-বলে নির্ভর কর। এস বৎস, এস! এস, সেই দিব্য-ধামে তোমাকে আমি ভগবৎ-কৃপায় নির্ভর করিতে শিখাইব। তোমার

সাধনা শিক্ষা হয় নাই। আমি শিখাইব। এস, তোমার আর কে আছে? কাহার জন্য আর এখানে থাকিবে? এস, আমার সঙ্গে এস!" এই স্বপ্ন দেখিয়া যুবক আবার গম্ভীর ধ্যানে নিমগ্ন হন।

শশাঙ্কশেখর আজ অতি প্রত্যুষেই শয্যা ত্যাগ করিয়া প্রাতঃকৃত্য সমাপনান্তে কুটীর-দ্বারে বসিয়া আছেন। প্রাতঃকালের কোমল বায়ু এবং আলোক স্পর্শে মৃতবৎ রুগ্ন দেহেও স্ফূর্ত্তি এবং সুখানুভূতি হয়। শশাঙ্কশেখরও এই সময়ে আপনাকে অপেক্ষাকৃত সুস্থ বোধ করিতেছিলেন। একটা পাপিয়া আকাশে মিশিয়া পিউ—পিউ—গাইতেছিল। কুটীরের নিকটবর্ত্তী বৃক্ষ সমূহের শাখায় শাখায়, জঙ্গলের উপরে ও লতা কুঞ্জের আড়ালে আড়ালে নানা রকম পক্ষী ডাকিতেছিল, শীশ দিতেছিল। গঙ্গা-বক্ষে সুকোমল উষাসমীরে বীচিরব শুনা যাইতেছিল। চারিদিকের পর্ব্বতশৃঙ্গ সকল উদয়োন্মুখ আরক্তিম সৌরকরে মধুর মধুর মিটি মিটি হাসিতেছিল। গাছের পাতা গুলি হেলিয়া দুলিয়া নড়িয়া নড়িয়া কি যেন বলিতেছিল। বায়ু শন্ শন্ করিয়া কি যেন গাইতেছিল। ভ্রমর ভ্রমরী বৃক্ষ লতার ফুলে ফুলে গুন্ গুন্ রবে বীণার ঝঙ্কার করিতেছিল। আর শশাঙ্কশেখরের প্রাণ এই আনন্দময়ী প্রকৃতির নৃত্য গীতে ডুবিয়া কি যেন এক সুদূর-স্বপ্নময় কাহিনীর কথা ভাবিতেছিল। ভাবিতে ভাবিতে শশাঙ্কশেখর উঠিলেন। উঠিয়া ঝুলী তল্লাস করিয়া একটী বংশ-নির্ম্মিত কলম, এক খণ্ড তুলট কাগজ এবং একটী শুষ্কপ্রায়-মসীযুক্ত দোয়াত পাইলেন। আজ দেড় মাস হইল, শশাঙ্কশেখরের পিতৃদেবের মৃত্যু হইয়াছে। ইহার মধ্যে তিনি আর লিখা পড়ার কোনই কাজ করেন নাই। সুতরাংই মসীপাত্রাদির এইরূপ দুর্দ্দশা ঘটিয়াছে। শশাঙ্কশেখর মসীপাত্রাদি প্রস্তুত করিয়া আবার দ্বারদেশে বসিলেন। বসিয়া এক খানি চিঠি লিখিতে আরম্ভ করিলেন। এই সকল করিতে তাঁহার ক্লান্তি বোধ হইতেছিল, গা কাঁপিতেছিল। তথাপি ক্ষান্ত হইলেন না।

চিঠি লিখিতে আরম্ভ করিয়া শশাঙ্কশেখর আজ এক মহা বিপদে পড়িলেন। নদীর বাঁধ ভাঙ্গিলে জলের যেমন একটা হুড়াহুড়ী কাণ্ড উপস্থিত হয়, শশাঙ্কশেখরের যত্নে অবরুদ্ধ প্রাণের বাঁধ ভাঙ্গিয়াও ভাবের জগতে তদ্রূপই একটা ব্যাপার ঘটাইল। আগে কোন্ কথা, পরে কোন্ কথা লিখিবেন, অনেকক্ষণের মধ্যেও তাহা কিছুতেই যেন স্থির হইল না। যেন এত বিদ্যা, এত বিচক্ষণতা হঠাৎ গঙ্গার বানে ধুইয়া গিয়াছে। যেন সামান্য

চিঠিখানিও কলমে সরিতেছে না! যুবক অবাক্ এবং স্তব্ধ হইলেন। কলমে উদ্ধৃত কালিটুকু কলমেই শুকাইল। মনের জগতে আগুন লাগিলে পদে পদে এইরূপই ঘটে। বৃদ্ধ বালক হয়, পণ্ডিত মূর্খ হয়, জ্ঞানী অল্প-বুদ্ধি হইয়া যায়। কিন্তু প্রতিজ্ঞার কথা—সেই এক দিন বরিশাল হইতে ফিরিয়া তুলসী-গ্রামে যাইবার কালে অনাবৃত নৌকা-বক্ষে জ্যোৎস্না-প্লাবিত আকাশের নীচে দাঁড়াইয়া পাষাণীকে যে, বলিয়া ছিলেন, "বলিব," সেই প্রতিজ্ঞার কথা, যুবক ভুলিতে পারিতেছেন না। মনে মনে ঠিক্ করিয়াছেন, আজ চিঠি লিখিতেই হইবে।

"কি লিখিব? কি করিয়া এ দগ্ধ মনের আগুন সেই সুস্নিগ্ধ সরল প্রাণে ঢালিব? আহা! এত দিন যাহা এত যত্নে কলিজার ভিতরে চাপিয়া রা'ত দিন পুড়িয়া পুড়িয়া খাখ্ হইতেছিলাম, আজ তাহার ঢাকা খুলিয়া কি করিয়া জগৎকে দেখাইব? এ বিষ প্রাণে চাপিয়া চাপিয়া আমি যে বিষের নেশা-খোর হইয়াছি! নীল-কণ্ঠের মত আমার শুধু কণ্ঠে বিষ নয়, বুকের ভিতরে কলিজার নীচে বিষ! এ বিষ যে আমার আর উগরিতে ইচ্ছা হয় না! বিষে বিষে জরিত হইয়া বিষেই মিলাইতে বসিয়াছি! এখন যে এ বিষ আমার অন্তকে দেখাইতে ইচ্ছা হয় না! কিন্তু আর দিন নাই! দিনের কথা কি বলিতেছি? মুহূর্ত্তেও আমার বিশ্বাস নাই পর মুহূর্ত্ত কিভাবে আমাকে আলিঙ্গন করিবে, বলিতে পারি না যখন প্রতিজ্ঞা করিয়াছি, তখন তাহা প্রতিপালিত হওয়া উচিত— এখনই উচিত। কিন্তু তিনি যে স্বর্গের দেবী? আমি যে এখন পৃথিবীর কীট! আমি তাঁহাকে কি বলিয়া চিঠি লিখিব—এ দুর্ব্বল প্রাণের বিষ কি ভাষায় তাঁহার প্রাণে ঢালিব?" এই সকল কথা ভাবিতে ভাবিতে শশাঙ্কশেখরের দুই চক্ষে ধারা বহিতে লাগিল। যেন ভিতরের ভাব, ভিতরের আগুন দ্রব হইয়া বাহিরে স্রোত বহিয়া চলিল। শশাঙ্কশেখর আবার অশ্রুপরিপূর্ণ-নেত্রে চিন্তা-নিমগ্ন হইলেন। যেন এবার সেই নবীন-মেঘ-বক্ষস্থিত বিদ্যুৎ-ময়ী প্রতিমা তাঁহার সম্মুখভাগ রূপে আলো করিয়া সুহাস্য-মুখে দাঁড়াইলেন! তিনি তাঁহাকেই লক্ষ্য করিয়া প্রাণ-মধ্যে বলিতে লাগিলেন, "দেবি তুমি জান না, আমি কি হইয়াছি। আমি তোমার জন্য যে, ক্ষেপিয়াছি—মাটি হইয়াছি! আমি জানি, তুমি আমাকে যেরূপ ভাল বাস, তাহার তুলনায় আমি তোমাকে ভাল বাসি না। তোমার ভাল বাসা এত উঁচু যে, আমি

তাহা প্রাণের ক্ষুদ্র ইস্তে নাগা'ল পাই না—ধরিতে গিয়া অবাক্ হইয়া যাই! তবুও তুমি স্থির প্রশান্ত। কিন্তু আমি তোমার জন্য দিন রাত্রি অস্থির! দেখিয়া দেখিয়া যেন আর সাধ মিটে না! পাইয়া পাইয়া আমার আর যেন পিপাসা যায় না! ইচ্ছা হয়, আমার এই স্থূল অস্থি মাংস না থাকিলে, আমি তোমাতে এমনই ভাবে মিশিয়া যাইতাম যে, সংসার আর আমাকে খুঁজিয়া পাইত না! হায়! পৃথক্ থাকা কি যাতনা, কি কষ্ট, তাহা বোধ হয়, কেবল আমিই জানি। বেদান্তে 'সোঽহং' পড়িয়াছিলাম্। এখন বুঝিয়াছি, উহার অর্থ কি? "সোঽহং", "সোঽহং", "সোঽহং", "সোঽহং", ইহাই পুণ্য, ইহাই স্বর্গ, ইহাই পরিত্রাণ, ইহাতেই শান্তি, ইহাতেই অপার আনন্দ। দেবি, তুমি অনন্ত অনন্ত হও! অনন্ত নিবিড় অন্ধকারে সকল ঢাকিয়া যাউক্! আমি তোমাতে ঝাঁপ দিয়া মিশিয়া যাই! তুমি গভীর, গভীর, গভীর হও! আমি স্বর্গ চাহি না, পরিত্রাণ চাহি না, সুখ, শান্তি, আনন্দ কিছুই চাহি না! আমি শুধু তোমাকে চাহি! তোমাতে নিবিয়া তব সঙ্গে ভগবচ্ছায়ায় থাকিব, মনে এ আশা বড়ই প্রবল। কিন্তু আমি অসংযমী। এ পবিত্র অধিকার আমার নাই। আমি যে, তোমার সঙ্গে তোমার রক্ত মাংসও ভাল বাসি! তোমার সঙ্গে তোমার বাহিরের রূপের আগুনে পতঙ্গের মত ঝাঁপ দিতেও যে, আমার ইচ্ছা হয়! প্রেমের পবিত্র ব্রত এখানেই উল্লঙ্ঘিত হইয়াছে! তাই আমি প্রায়শ্চিত্তের প্রয়াসী। তুষানলে এ প্রায়শ্চিত্তের শেষ হইবে না! বুঝিয়াছি, মৃত্যুই ইহার প্রায়শ্চিত্ত! মৃত্যু ছাড়া উপায় নাই! উপায় নাই!"

ভাবিতে ভাবিতে যুবক সজল নেত্র মেলিয়া, আবার কলমে কালি তুলিয়া কাগজের উপরে ধরিলেন। কিন্তু আজ এই এ জীবনের শেষ চিঠিতে প্রাণের পাষাণকে প্রাণ খুলিয়া কি বলিয়া সম্বোধন করিবেন, তাহা এখনও ঠিক্ হয় নাই। ভাবপূর্ণ উষ্ণ প্রাণে কত কি উচ্ছ্বাস, কত কি তরঙ্গ উঠিয়াই নিঃশব্দে বিলীন হইতেছিল। তাহার এক একটী সাক্ষাৎ অমৃতের ঢেউ কিম্বা প্রফুল্ল পারিজাত ফুলের স্তবকস্বরূপ হইলেও, বাহিরে প্রকাশিত হইল না। শশাঙ্কশেখর ধীর এবং গম্ভীর-চিত্তে পূর্ব্ববৎ ভাবিতে ভাবিতে ভাবিত লিখিতে লাগিলেন—আকাশে তখনও পাপিয়া পিউ—পিউ—গাইতেছিল, ফুলে ফুলে তখনও ভ্রমর ভ্রমরী বীণায় ঝঙ্কার দিতেছিল, বায়ু শন্—শন্—রবে বাঁশী বাজাইতেছিল, পত্রকুল নড়িয়া

নড়িয়া মর্ম্মরিয়া কি যেন স্বপ্নের কাহিনী বলিতেছিল—শশাঙ্কশেখর ভাবোদ্বেলিত-চিত্তে একবার ঊর্দ্ধে অনন্ত নীল আকাশ-পানে আবার চারিদিকে শিশির-স্নিগ্ধ উজ্জ্বল প্রকৃতির শ্যামল শোভারাশিরদিকে তাকাইলেন, তাকাইয়া তাকাইয়া চক্ষু ফিরাইয়া সাশ্রুনেত্রে গম্ভীরভাবে লিখিতে লাগিলেন। কিছুক্ষণের মধ্যেই ছোট তুলট কাগজখানি ভরিয়া; চক্ষু-জলে মাখিয়া, চিঠি-লিখা শেষ করিলেন। শেষ করিয়া পড়িতে লাগিলেন,—

"দেবি,

আমার হাত অবশ, শরীর কম্প, মস্তিষ্ক ক্লান্ত, মন অবসন্ন। তাহাতে এ নীরব পর্ব্বতে থাকিয়া থাকিয়া ভাষা ভুলিয়া গিয়াছি! কি লিখিব?

এখানে কথা-শূন্য ভাষায় পাপিয়া গান করে, পাখী ডাকে, ভ্রমর গুঞ্জরে, বাতাস বহে, জাহ্নবীর জল ছুটে, ঝরণা ঝরে, উৎস উঠে। ফুল গুলি এখানে নীরবে ফোটে, নীরবে শুকায়। ফল গুলি নীরবে ফলে, নীরবে ঝরে। পাতা গুলি নীরবে দেখা দেয়, নীরবে পড়ে। স্তব্ধ আকাশ দিন রাত্রি নীরবে চাহিয়া আছে। আমি নীরব। কি লিখিব?

পর্ব্বতের অতল গুহার আঁধারে জাহ্নবী কল্ কল্ তর্ তর্ কুল্ কুল্ রবে দিন রা'ত বহে। আমি কখনও কখনও আঁধার কুটীরের আঁধারে মিশিয়া অৰ্দ্ধচৈতন্যাবস্থায় শুনি, যেন আমার মর্ম্মতলে যে উষ্ণ জাহ্নবী বহিতেছে, তাহারই ঐ প্রতিধ্বনি! সে ভাষা, কিন্তু কথা-শূন্য। কথা ভুলিয়া গিয়াছি, কি লিখিব?

যাহা মনে আছে, লজ্জায় যে তাহাও ফোটে না। লজ্জা তোমার কাছে নাই, লজ্জা করি আমাকে আমি। তুমি আমার পর নও। কিন্তু আমি যে আমার পর। মাথা মুণ্ড কি লিখিব?

একটী কথা না বলিয়া মরিলে বোধ হয়, অপরাধী হইব। আমার জীবনের শেষ যবনিকা ধীরে ধীরে পড়িতেছে। আঁধারে বিশ্ব ডুবু ডুবু, নিবু নিবু। এই-ই বলিবার সময়। বোধ হয়, আর সময় পাইব না!

আমি কাঁদিতাম, তোমাকে পাইতে!

চিঠিখানি পড়া হইলে, একটু আগুন জ্বালিয়া তাহাতে ফেলিয়া দিও। আমি সমস্ত অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত করিব।"

স্বামীজির পাহাড়, } অসংযমী
জোগ্রাম, এলাহাবাদ। } শশাঙ্কশেখর।

শশাঙ্কশেখর অতি কষ্টে চিঠি খানি জোগ্রামের ডাকঘরে পৌঁছাইয়া ফিরিয়া আসিলেন। চিঠিতে চক্ষু-জলের শত শত দাগ পড়িয়াছিল। চিঠি সেই অবস্থায়ই ডাকে প্রেরিত হইল।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

ভগ্ন-গৃহে।

ভবানীশঙ্কর দান-পত্রে পাষাণীকে কুন্তলাদেবী নামে অভিহিত করিয়াছিলেন। কারণ, দলিলাদিতে মূল নামই ব্যবহৃত হইয়া থাকে। সুতরাং এবার তুলসীগ্রামে আগমনের পরে. পাষাণী কুন্তলাদেবী নামেই পরিচিত হইয়াছে। জমিদারীর কাগজ পত্রে, গভর্ণমেণ্টের নিকটে এই নামই ব্যবহৃত হইতেছে। পাষাণী এখন সর্ব্বত্রই কুন্তলাদেবী নামে বিখ্যাত।

কুন্তলাদেবী তুলসীগ্রামে পৌঁছিয়া, প্রথম দিনই নৌকা হইতে একবারে হরগোবিন্দ রায়ের সেই পুরাতন ভদ্রাসনে উঠিলেন। শশাঙ্কশেখর বরিশাল হইতে যাত্রা করিবার দিনই কর্ম্মচারীদিগকে পত্র লিখিয়াছিলেন। সুতরাং অভিনব কর্ত্রীর অভ্যর্থনার জন্য কর্ম্মচারীগণ বিশেষ আয়োজন করিয়া ভবানীশঙ্করের রাজ-প্রাসাদ তুল্য ভদ্রাসনেই প্রস্তুত ছিলেন। দেবী তথায় না উঠিয়া হরগোবিন্দ রায়ের পড়ো' বাড়ীতে উপস্থিত হওয়ায়, সকলে ক্ষুণ্ণমনে তাঁহাকে আত্মনিবেদন জ্ঞাপন করিয়া পাঠাইলেন। দেবী কর্ম্মচারীদিগকে বিনয় ও স্নেহের ভাষায় প্রবোধ দিয়া জানাইলেন, "কার্য্যালয় প্রভৃতি যেখানে আছে সেখানেই থাকিবে। কিন্তু আমি কিছুতেই এই বাড়ী ভিন্ন অন্যত্র বাস করিব না" ইত্যাদি। বলা বাহুল্য যে, কুমুদ আর কুমুদের মার শুশ্রূষায় এবং জল-পথের সুনির্ম্মল শীতল বায়ু সেবনে কুন্তলা ধীরে ধীরে সুস্থ হইয়াছিল।

কুন্তলা, কুমুদ এবং বৃদ্ধাকে সঙ্গে করিয়া ঠাকুরদাদা মহাশয়ের প্রাচীন ভদ্রাসনে প্রবেশ করিল। দেখিল, কাল-দন্তে সকলই ধ্বংস প্রাপ্ত হইয়াছে। বাড়ীর চারিদিকের উদ্যান শ্রীভ্রষ্ট হইয়া অরণ্যে পরিণত হইয়াছে। বাহিরের কার্য্যালয়, অতিথিশালা, চিকিৎসালয় ও বিদ্যালয় প্রভৃতির সুন্দর সুন্দর ইষ্টকালয় গুলি একপ্রকার অদৃশ্য হইয়াছে। শুনিল সেগুলি

ভাঙ্গিয়া ইট কাঠ লইয়া গিয়া ভবানীশঙ্কর অন্য গৃহ নির্ম্মাণ করিয়াছেন। অবশিষ্ট দুই একটীর ধ্বংসাবশেষমাত্র পড়িয়া থাকিয়া পূর্ব্বস্মৃতি জাগাইতেছে!

কুন্তলা আর একটু অগ্রবর্ত্তী হইলে দেখিল, ঠাকুরদাদা মহাশয়ের কত যত্নে সংগৃহীত সেই প্রাচীন নির্ব্বাণ মূর্ত্তিগুলি বা প্রস্তর-ফলক ও স্তম্ভাদির একটীরও শেষ চিহ্নমাত্র নাই এবং তাহার নিজ-হস্তে প্রস্তুতীকৃত সেই ক্ষুদ্র ফুলের বাগানটী একবারেই বিনষ্ট হইয়া গিয়াছে। বাগানের সম্মুখস্থ পর্ব্বতাকার বাড়ীটীর গায়ে অনেক পুরু হইয়া কাল ছেঁৎলা পড়িয়াছে। সার্সী ও কপাটগুলি কেহ খুলিয়া নেওয়াতে বা একবারে বিনষ্ট হইয়া যাওয়াতে সমস্তগুলি দ্বার যেন হাঁ হাঁ করিতেছে! ছাদে ও দেওয়ালের গায়ে কদাচিৎ ছোট ছোট বটের বা অশ্বথের গাছ এবং বন জঙ্গল হইয়াছে। স্থানে স্থানে লোণা ধরিয়া চূণ-কাম খুলিয়া পড়াতে ইটের লাল লাল মাথা সকল বাহির হইয়াছে। অট্টালিকার শূন্য-গর্ভেও পুরু হইয়া শুষ্ক তৃণাদি এবং ধূলা মাটী জড়িত আবর্জ্জনা-রাশি জমা হইয়া রহিয়াছে। তাহাতে চড়ুই, চর্ম্মচটিকা, পারাবত, ছুঁচা ও ইঁদুরের পুরীষ-রাশি মিশিয়া একটা দুর্গন্ধময় ভীষণ ব্যাপার হইয়াছে। কুন্তলা মুহূর্ত্তে আপনার সেই পড়িবার ঘরটীর দিকে এবং ঠাকুরদাদা মহাশয় প্রত্যহ সকাল বেলায় প্রত্যূষে উঠিয়া যে বারান্দাটীতে বসিয়া দয়ার্দ্র-চিত্তে, সজল নয়নে নানা স্থান হইতে আগত দানার্থীদিগের কাতরোক্তিপূর্ণ চিঠি গুলি পড়িতেন আর পত্র-পৃষ্ঠে প্রচুর অর্থ-সাহায্যের অনুমতি লিখিতেন, তাহার দিকেও একবার তাকাইল। পলকে কত স্মৃতি, কত স্বপ্ন উষ্ণ তাড়িত-স্পর্শে প্রাণ আলোড়িত করিল। এবার সকলের অদৃষ্টে কুন্তলা আঁচলে চোক মুছিল। কুন্তলার আয়ত লোচন দুইটী ভাসাইয়া গোলাপস্তবক-বিনিন্দিত গণ্ডদ্বয়ে ফোঁটা ফোঁটা জল পড়িতেছিল। কুন্তলা, কুমুদ আর কুমুদের মাকে নিয়ে একটী ভগ্ন-প্রায় জীর্ণ দেউড়ী পার হইয়া শ্যালকাঁটা প্রভৃতির ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জঙ্গল ভেদ করিয়া অন্তঃপুরের একটী দ্বিতলস্থ গৃহে প্রবেশ করিল। উঠানের স্থানে স্থানে শৃগাল ও খট্টাস জাতির স্তূপীকৃত পুরীষ-রাশি জমা হইয়া আছে। যে সিঁড়ী দিয়া কুন্তলা সঙ্গিনীদ্বয়কে সঙ্গে করিয়া উপরে উঠিল, তাহাও ভগ্ন-প্রায় এবং আবর্জ্জনারাশিতে ঢাকা পড়িয়াছে। আর যে ঘরে প্রবেশ করিল, তাহা সুন্দর প্রশস্ত হইলেও, পূর্ব্ব-বর্ণিতানুরূপই অপরিষ্কৃত এবং দুর্গন্ধময়! এই দ্বিতলস্থ গৃহ বা সুপ্রশস্ত প্রকোষ্ঠই কুন্তলার শয়ন-গৃহ

ছিল। কুন্তলা আজ সর্ব্বাগ্রেই আপনার এই প্রিয়তম গৃহটীতে প্রবেশ করিল। অন্য মেয়ে হইলে, আজ উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিয়া মুহূর্ত্তে সমস্ত পাড়ার লোক একঠাঁই করিত। কিন্তু কুন্তলা ততদূর না করিয়া, কেবল ছল ছল চক্ষে, গদ গদ কণ্ঠে সঙ্গিনীদিগকে বসিতে বলিয়া, তখনই নিজ-হস্তে গৃহ-পরিষ্করণ-কার্য্যে ব্যস্ত হইয়া পড়িল। কুন্তলা বা কুমুদের সঙ্গে অধিক জিনিষাদি ছিল না। যে দুই একটী বস্ত্রাদির পুঁটলী ছিল, মাঝীরা তাহা আনিয়া কুন্তলার আদেশানুসারে সেই ঘরেই রাখিয়া বিদায় হইল। বলা বাহুল্য যে, কর্ম্মচারীরা তৎক্ষণাৎই তাহাদের ভাড়াদি এবং প্রার্থিত পুরস্কার চুকাইয়া দিল।

কুন্তলা অর্দ্ধ ঘণ্টার মধ্যেই রাশি রাশি পারাবতাদির পুরীষযুক্ত আবর্জ্জনা দূরীকরণ করিয়া গৃহটীকে পরিষ্কৃত করিল। দেয়াল এবং ছাদের গা হইতে অনেক ঝুল ও মাকড়সার জাল ফেলিয়া দিল। বহুতর আরসুলা, চর্ম্মচটিকা, চড়ুই ও পারাবত আশ্রয়-শূন্য হইয়া গৃহান্তরাভিমুখে ধাবিত হইল। অনেক মূষিক ও গন্ধ-মূষিকজাতি কুন্তলা এবং কুমুদের সম্মার্জ্জনীর তাড়নায় সুখের আবাস পরিত্যাগ করিয়া কিচ্ কিচ্ শব্দে যেন অভিসম্পাত করিতে করিতে পলায়ন করিল। কুমুদ সর্ব্ব প্রথমেই একটা দিবালোকান্ধ ছুঁচাকে সম্মার্জ্জনী তুলিয়া আঘাত করিতে উদ্যত হইয়াছিল। কুন্তলা তাহাকে নিষেধ করিয়া ঈষৎ হাসিয়া বলিয়াছিল, "যেতে দাও ভাই, যেমন অন্যের ঘরে অনধিকার প্রবেশ করিয়াছিল, তেমনই ওকে বনবাস দেওয়া হইল। উহাকে ক্ষুদ্র প্রাণে মে'রে শুধুই হাত গন্ধানে দরকার কি?" কুমুদ কুন্তলার প্রকৃতি জানে। কুন্তলা কথাটী হাসিয়া হাসিয়া বলিলেও, কুমুদ একটু লজ্জা পাইয়া তদবধি সতর্কতা অবলম্বন করিয়াছিল। সুতরাং বিপুল সম্ভাবনা-সত্ত্বেও ছুঁচা, ইঁদুর, আরসুলা ও চর্ম্মচটিকার মহলে কিছুতেই একটা মহামারি-কাণ্ড ঘটিতে পারিল না। কুমুদ, কুন্তলার নিষেধ সত্ত্বেও স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়াই গৃহপরিষ্করণে সহকারিণী হইয়াছিল। কর্ম্মচারীগণ তাহাদের অভিনব কর্ত্রীকে হরগোবিন্দ রায়ের ভগ্ন অট্টালিকায় প্রবেশ করিতে দেখিয়াই, ব্যস্ততার সহিত তাড়া তাড়ি দুই তিনটী পরিচারিকা পাঠাইয়াছিল। কুন্তলা তাহাদের মধ্যে একটী অর্দ্ধ-বয়স্কা পরিচারিকাকে উপরের ভাবভঙ্গি দেখিয়াই কাজের লোক এবং ভালমানুষ মনে করিয়া থাকিতে বলিল। কিন্তু অপর দুইজনকে তৎক্ষণাৎই "মিষ্ট" কথায়

প্রয়োজনাভাব জানাইয়া বিদায় দিল। পরিচারিকাদের মধ্যে যে থাকিল, তাহার নাম পদ্মমুখী। কুন্তলা, কুমুদ এবং কুমুদের মা এক সঙ্গেই পরিচারিকার নাম শুনিয়া, মনে মনে একটা বৃহৎ অট্টহাস্য সম্বরণপূর্ব্বক ভাবিলেন, কাণা ছেলের নাম পদ্মলোচন, এটা সত্যি সত্যিই একটা প্রবাদ বাক্যমাত্র নয়। কারণ পদ্মমুখীর গায়ের রঙ, যতদূর সম্ভবিতে পারে, ততদূর কাল—শ্রীহীন পাঁশুটে কাল। তাহার মার্জ্জার-চক্ষুবৎ কটাবর্ণের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র চক্ষু দুইটীর একটী সম্পূর্ণ অন্ধ এবং তজ্জন্য মুখখানি ঈষৎ ভঙ্গিযুক্ত। দাঁতগুলি বড় বড়। কপাল উঁচু। ভ্রূ দুইটী একরূপ লোম-শূন্য। চুলগুলি রুক্ষ, খাট এবং অৰ্দ্ধপক্ক। এক কথায় পদ্মমুখীর মত কুরূপা স্ত্রীলোক সচরাচর প্রায় দেখা যায় না। পদ্মমুখীর ডাক নাম, "পদ্ম।" কুমুদ জিজ্ঞাসা করাতে, পদ্ম টীকা-সহকারে আপনার নামের ব্যাখ্যা করিয়া বিনীতভাবে এক পার্শ্বে সরিয়া দাঁড়াইল। কিন্তু কুরূপা পদ্মের ছবিখানিতে যেন লিখা আছে, "ভালমানুষ।" পদ্ম তৎক্ষণাৎই কুন্তলার অনুরোধে পার্শ্বস্থ প্রতিবাসীদের বাড়ী হইতে ঝাঁটা প্রভৃতি গৃহ পরিষ্করণোপযোগী দ্রব্যাদি আনিয়া দিল এবং সঙ্গে সঙ্গে খাটিয়া অনবরত কর্ত্রীদিগের ফরমাইশ যোগাইতে লাগিল। আজ অনেকদিন পরে আবার কুন্তলার শয়ন-গৃহে সন্ধ্যার সময় প্রদীপ এবং ধূনা জ্বলিল। কিন্তু এ সকল চারি পাঁচ বৎসর পূর্ব্বের কথা।

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

চাঁদের হাট।

কুমুদ।—"দিদী আমার নিজে ফাঁকে থেকে শুধু অন্যের ঘাড়ে বোঝা চাপান। বুঝ্‌লে ত প্রফুল্ল দিদি?"

প্রফুল্ল।—"বোঝা হয়ত ঘাড়ে না নিলেই হো'ল। ঘাড়ত তোমার?"

দুই জনে হাসিতে হাসিতে কথা বার্ত্তা হইতেছিল। প্রফুল্লমুখীর কথায় কুমুদ লজ্জা-আরক্তিম-মুখে মৃদু মধুর হাসিয়া বলিল, "বো'ল্‌ছিলুম্, দিদী নিজে একটী বিয়ে করুন না কেন?"

কুন্তলা একটী প্রকাণ্ড পুষ্পোদ্যানের মধ্যে দাঁড়াইয়া, নিজ-হস্তে ফুটন্ত ফুল-ভরা একটী গন্ধরাজের ঝাড়ের গা হইতে পাকাপাতা ও বাসি ফুল

ছিঁড়িয়া ফেলিয়া গাছগুলিকে পরিষ্কার করিতেছিল। কুমুদের কথা শুনিয়া, কুন্তলা এবার নিজেই এক মুখ হাসিয়া বলিল, "কেন? আমি ত বিয়ে ক্যো'রেছি"।

কুমুদ।—"বটে? বর কোথায়?"

কুন্তলা, একটী ফুটন্ত ফুল-ভরা যুঁইয়ের ঝাড় দেখাইয়া বলিল, "সে কি গা! বর দেখ নাই! ঐ যে বর। দেখত, কেমন শাদা ধব্‌ধবে পোষাক পরা সুন্দর বরটী! জ্যোৎস্না-ভরা রাত্রিতে উহার কাছে দাঁড়াইয়া আমি কত আমোদ পাই।"

প্রফুল্ল।—"সেবা শুশ্রূষার ঘটা দেখে মনে করিতেছিলাম, বুঝি গন্ধরাজ-কেই বিয়ে কো'রেছ।"

কুন্তলা।—"না ভাই, যুঁইয়ের সঙ্গে অনেক দিন হইল, আমার বিয়ে হোয়েছে।"

চাঁদের উপরে যেন হঠাৎ একখণ্ড মেঘ ঢাকা পড়িল—কথাটা বলিতে সহসা কুন্তলার হাসিভরা সুন্দর মুখে কি যেন একটা বিষাদপূর্ণ চিন্তার ছায়া ভাঙ্গিয়া পড়িল। মুহূর্ত্তে কুন্তলা জাগ্রত-স্বপ্নবৎ দেখিল—দেখিল, মনোহর সমুচ্চ পর্ব্বতশৃঙ্গ—শৃঙ্গোপরি সুন্দর উদ্যান—উদ্যান-মধ্যে কয়েকখানি কুটীর ও গৃহ ছবির মত সজ্জিত রহিয়াছে। শৃঙ্গ-বক্ষ হইতে চতুর্দ্দিকে আকাশের সুনীল সীমারেখা অতিক্রম করিয়া বিমল জ্যোৎস্না-ধৌত অসংখ্য পর্ব্বতমালা দৃষ্টিপথে পতিত হইতেছে। দশদিক্ প্লাবিত করিয়া অনন্ত-জ্যোৎস্না-সিন্ধু উচ্ছ্বসিত। আকাশে পূর্ণিমার পূর্ণচন্দ্র। সম্মুখে সোণার চাঁদ সদৃশ একটী পূর্ণবয়স্ক পরমরূপবান্ যুবক-রত্ন দাঁড়াইয়া। তরুণ চম্পক-বৃক্ষের মূলে হরিণ-শাবক মঙ্গলা। পার্শ্বে সেই শাদা ধব্‌ধবে ফুল-ভরা যুঁইয়ের ঝাড়। ঝাড়ে আপনার আলুলায়িত কেশের রাশি জড়াইয়া গিয়াছে। শশাঙ্কশেখর ব্যস্ততার সহিত সেই চুল খুলিতে খুলিতে নীরবে চক্ষু-জলে ভাসিতেছেন। তৎপরে শশাঙ্কশেখরের অপসরণ ও তিরোধানাদি করিয়া সকল কথাই মনে পড়িল। কুন্তলা মুখ ফিরাইয়া ধীরে ধীরে ধীরে নীরবে অশ্রুমোচন করিল। পার্শ্ব-স্থিত কুমুদ ও প্রফুল্ল কিছু অপ্রতিভ হইয়া, কিংকর্ত্তব্য বিমূঢ়ের মত দাঁড়াইয়া পরস্পর মুখ চাওয়া-চাওয়ি করিতেছিল। কুন্তলা চোক মুছিয়া বলিল, "কুমুদ—বোন, বিয়ের কথা কি বলিতেছ?" যুবতী, তরুণী কুমুদ-বালার সঙ্গে বালিকার মত বাল্য-ক্রীড়া করিতেছিল। এবার সহসা গম্ভীর

হইল। মানুষের বালকত্ব এবং বৃদ্ধত্বের সীমা কোথায়? বাহিরে ইহা নির্ণয় করা কঠিন নহে। কিন্তু অভ্যন্তর-জগতে মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তেই পরিবর্ত্তন। মানুষ মনোরাজ্যে এক মুহূর্ত্তে বালক, পর মুহূর্ত্তে যুবক, অপর মুহূর্ত্তে বৃদ্ধ। যে অবস্থায়ই হউক্, বালকত্ব বড় মধুর। কুন্তলার জীবন এই মাধুর্য্যের বানোচ্ছ্বসিত নদী। কুন্তলা দণ্ডীর পাহাড়ের সেই যুঁই ঝাড়টীকেও বিয়ে করিয়াছিল বলিয়া, সরস্বতী এবং জুনকে মধ্যে মধ্যে হাসিয়া হাসিয়া উপহাস করিত। আজ আবার উপহাসচ্ছলে সেই যুঁই ঝাড়ের কথাই মনে পড়িল। যাহা হউক্, যুবতী এবার গম্ভীরভাবে বলিল, "বিয়ের কথা কি বলিতেছ? আমি যমবরা। শিশু কাল হইতে এই মন্ত্রে দীক্ষিত হইয়াছি, "যম আমার কাম্য বর, শ্মশান আমার বাসর-ঘর, আগুন আমার ফুলশয্যা, ভস্ম আমার পরিণাম!" অন্য প্রকার বিবাহ-মন্ত্রে আমার দীক্ষা বা শিক্ষা হয় নাই।"

কুমুদ।—"তবে অন্যকে বিয়ে দিতে দিদি, তোমার এত আমোদ হয় কেন?"

কুন্তলা।—"বিয়েটা আদবেই যে খারাপ জিনিষ, একথা আমার মনে কখনও হয় নাই। যাহারা বিয়ে করে তাহারা যে ভাল কাজ করে না, ইহা কখনও ভাবি নাই। বরং সকলেরই বিয়ে করা উচিত মনে করি। তাই তোমায় বিয়ে দিতে আমার এত আনন্দ, এত উৎসাহ।" কেমন রাঙা বরটী যুটাইয়াছি বলত? গোপাল বাবু আসিলে আজ বো'লে দিব, "কুমুদ আপনাকে বোঝা বো'লেছে।"

পোড়া মুখ আর কতক্ষণ ভার কো'রে রাখা যায়? যেটুকুই হউক্, পাপের ভোগ বইত নয়? কুন্তলা এবার আবার ঈষৎ হাসিয়া কথা বলিল। উত্তরে কুমুদ লজ্জাবনতমুখে বলিল, "কৈ গা, আমি তাঁকে আবার বোঝা বো'লুম্ কখন?"

কুন্তলা।—"প্রফুল্ল আমার সাক্ষী।"

প্রফুল্ল।—"ঠিকই ত' এই মাত্র না বো'লছিলে, "দিদী আমার নিজে ফাঁকে থেকে অন্যের ঘাড়ে বোঝা চাপান?"

কুমুদ কথাটা চাপা দিবার চেষ্টায় অন্য কথা পাড়িয়া বলিল, "দিদি একটী কথা বলিতে চাই। সভয়ে কি নির্ভয়ে বলিব?"

কুন্তলা।—"নির্ভয়ে বল।"

কুমুদ।—"দোষের কথা হো'লে ভাই, মাপ কো'র। বোধ হয়, ভুল বু'ঝেছিলুম্। কিন্তু শশাঙ্ক দাদার সঙ্গে তোমার বিয়ে হবে বো'লে আমার মনে একটা সন্দেহ ছিল। তোমার কথায় কিন্তু এখন বুঝিলাম, তুমি কখনও বিয়ে করিবে না। যা হোক্, তাঁকে ছাড়া তোমার যোগ্য বর দেখি না ভাই। এ সোণার প্রতিমা তাঁরই পাশে দাঁড় করিলে শোভা পাইতে পারে। বিয়ে কর ত ভাই তাঁকেই করিও। তিনি কিন্তু বোধ হয়, মনে মনে তোমাকে চান। মা, আমাকে সব প্রথমে এই কথাটী বলেন—সেই বরিশাল থেকে তুলসীগ্রামে ফিরিবার পথে বো'লেছিলেন। আর তুমি ত বল, ভগবান্ কাকেও যমবরা করেন নাই। এ সকল সমাজের অত্যাচার বই কিছুই নয়। যমবরাদেরও বিয়ে হওয়া উচিত। তবে তুমি বিয়ে করিবে না কেন?"

প্রফুল্ল হাসিতে হাসিতে হাতে তালি দিতে দিতে বলিল, "বুঝেছি ভাই, বুঝেছি—! কথাটা চাপা দিবার ইচ্ছা! তা ভয় নাই। আমরা গোপাল বাবুকে বলিব না। রাঙা বর হাত ছাড়া হবে না। বোঝা হোক্ ভার হোক্ আর কি এখন ফেলতে পার? জান কি কুমুদ, আমাদের দেশে একটা কালী-ভক্ত পাগ্‌লী ছিল। সে কথায় কথায়ই একটী গান গাইত।" এই বলিয়াই প্রফুল্ল, সুন্দর পদ্ম-হস্তখানিতে কুমুদের চিবুকটী ধরিয়া ঈষৎ-স্ফুরিতাধরে মিষ্ট গলায় গাইতে লাগিল,

'সাধ কো'রে ভেসেছি সই, তারা দে'খে দিব পাড়ী,
কূল ছেড়ে অকূলে এসে ডুবু ডুবু হোল তরী!
অসীমে বাজায়ে বাঁশী তারা করে ওই গান!
নীরব নীরব সইরে, পরাণ টানে বাঁশরী!
যত ভাবি যাব ফিরে, সাগর যেতেছে বেড়ে,
পার কূল নাহি মনে গিয়েছি পাশরি!
ফিরা ত হবে না সই, তারা ডাকে বিমানে!
ভেসেছি অকূলে আমি তারা দেখে ডুবে মরি!"

প্রফুল্ল গানটী শেষ করিয়া কুমুদের সুন্দর চিবুকখানি টিপিয়া হাসিতে হাসিতে বলিল, "আর কি তোমার ফিরিবার যো আছে ভাই? ঐ যে গোপাল ডাকে বিমানে না! ভুলেছি, পরাণে!"

কুমুদ লজ্জিত হইল। কুন্তলা, কুমুদের কথায় হঠাৎ চমকিয়া মনে

মনে ভাবিতেছিল; "এ্যা—! এ্যা—! এ আবার এ কি বলে গা—!" যেন কুন্তলার প্রাণের কোন গভীর স্বপ্নের ধাঁধা ভাঙ্গিয়া গেল! যেন হঠাৎ কোন কুটিল প্রহেলিকার পরিষ্কার অর্থ মনে ফুটিল! যেন দূরের কোয়াশার মধ্য-হইতে সহসা সূর্য্যোদয় হইল! এই-ই প্রথম—সর্ব্বপ্রথমে যেন একটা নূতন চিন্তা, কুন্তলাদেবীর মনে—প্রাণের অন্তস্তলে লুকান মর্ম্মের ভিতরে জ্বলিয়া উঠিল। যেন প্রাণের শুষ্ক অরণ্যে কুমুদের কথারূপ সামান্য অগ্নিস্ফুলিঙ্গস্পর্শ-মাত্র কুন্তলার ভিতরে এক বৃহৎ অগ্নিকাণ্ড উপস্থিত হইল। অনন্তের অযুত কণা হইতে গরল উদ্গারিত হইল, কোটি চন্দ্র হইতে সুধা ঝরিল, গরলে সুধায় মিশিয়া কুন্তলার প্রাণে সাগর বহিল। মর্ম্মে সুধাময় সুকোমলস্পর্শে মিশিয়া সহস্র বৃশ্চিক-দংশনের যাতনা অনুভব হইতেছিল। কুন্তলা এবার হাসিয়া কাঁদিয়া মর্ম্মের আগুনে চাপা দিয়া ধীরে ধীরে বলিল, "ছি:—! বিশ্বাস হয় না। তিনি দেবতা। দেবতায় এই রকম মানুষিক ভাব সম্ভবিতে পারে না।" কুন্তলা হাস্য-স্ফুরিতাধরে কথা কয়টী বলিল বটে কিন্তু চোক দিয়া টস্ টস্ করিয়া ফোঁটা ফোঁটা জল পড়িতেছিল। যে হাসিটুকু ফুটিল, তাহাও বাচালতাময় নয়, গাম্ভীর্য্য-পরিপূর্ণ। কথা শেষ করিয়া কুন্তলা আঁচলে চোক মুছিল।

কুমুদ।—"তবে তিনি তোমা হ'তে দূরে দূরে থাকিতেন কেন? তোমার কাছে আসিলেই তাঁহার মুখ যেন কেমন হইয়া যাইত—তিনি যেন অন্য-মনে কি ভাবিতে থাকিতেন। আবার তোমার সঙ্গে কথা বলিতে বলিতে তাঁহার চোক জলে ভাসিয়া যাইত। তত পীড়া পীড়িতেও তাহার কারণ তোমায় বলিলেন না কেন? আবার তোমার সঙ্গেই বা আসিলেন না কেন?"

কুন্তলা।—"তাঁহার তদ্রূপ করিবার কারণ কিছুই বুঝি নাই। হয়ত কোন মহদুদ্দেশ্যে ঐরূপ করিয়াছিলেন। হয়ত কোন মহা-সাধনে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। হয়ত আমা হইতে সেই সাধনার কোনরূপ বিঘ্নের সম্ভা-বনা থাকাতেই তিনি তাঁহার মনোদুঃখের কারণ বলেন নাই। তবে বুঝিয়াছিলাম, আমিই তাঁহার মনোদুঃখের কারণ। তাই আমি অধীর হইয়াছিলাম। বোধ হয়, আমার দুর্ব্বলতা দেখিয়াই তিনি আমাকে সঙ্গ ছাড়িয়াছিলেন। তিনি দেবতা। তাঁহাকে মানুষ ভাবিতে আমার কষ্ট হয়।"

কুমুদ।—"তিনি যদি তোমাকে বিবাহ করিতে চাহিতেন?"

কুন্তলা।—"সম্মত হইতাম না।"

কুমুদ।—"তিনি কি তোমার যোগ্য বর নন্?"

কুন্তলা।—"না। তিনি দেবতা। আমি মানুষী। তিনি আমার যোগ্য বর নন্। যাঁহাকে দেবতা ভাবিয়া সোণার বিগ্রহরূপে শিশুকাল হইতে হৃদয়-মধ্যে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছি, সমস্ত জীবন যাঁহাকে দেবতা মনে করিয়া পূজা করিলাম, তাঁহাকে মানুষ ভাবিতে আমার মর্ম্ম-গ্রন্থি সকল ছিন্ন হইয়া যায়!"

কুমুদ।—"তবে তোমার যোগ্য বর কে?"

কুন্তলা।—"কেন? বলিয়াছি ত, যম।"

কুমুদের চোক হইতে এবার ধারা বহিয়া জল পড়িতে লাগিল। কুমুদ চোক মুছিতে মুছিতে বলিল, "বুঝিয়াছি, তুমি বিয়ে করিবে না। তবে বল কেন সকলকেই বিয়ে করা উচিত, বিবাহ প্রেমের বীজমন্ত্র—অনন্ত জীবনের উন্নতি-সাধনার আদ্যক্ষর?"

কুন্তলা কুমুদকে কাঁদিতে দেখিয়া হাসিয়া বলিল, "মনে কর না কেন, প্রকৃত বিয়ে যা, তা আমার হোয়েছে।"

কুমুদ।—"সে কি গা! হাওয়ার সঙ্গে নাকি?"

কুন্তলা।—"যাহার সঙ্গেই হউক্ না কেন, বলিব না। কিন্তু সে বিবাহের সঙ্গে দেহ, রূপ বা ইন্দ্রিয়ের কোন সম্পর্ক নাই। দেহ, রূপ, ইন্দ্রিয়ের যোগ যে বিবাহে আছে, সে বিবাহের এক অঙ্গ প্রজা-বৃদ্ধি, অপর অঙ্গ আধ্যাত্মিক উন্নতি, তাহা সাধারণ বিবাহ—তাহা মানুষে মানুষে হয়। আমার বিবাহ দেবতার সঙ্গে হইয়াছে। সে বিবাহে স্বামী ভাই, স্ত্রী ভগিনী; স্বামী পিতা, স্ত্রী মাতা; স্বামী উপদেষ্টা, স্ত্রী উপদেষ্ট্রী; স্বামী প্রিয়তম সখা, স্ত্রী প্রিয়তমা সখী; উভয় উভয়ের শিক্ষা এবং দীক্ষার গুরু—ধর্ম্মপথের সহায়। এ বিবাহ বহুদিনে হয়, অনন্ত অনন্ত কাল থাকে। ইহার ঘটক, পুরোহিত, বরকর্ত্তা এবং কন্যাকর্ত্তা স্বয়ং ভগবান। এ বিবাহ স্বর্গে হয়, মর্ত্ত্য ইহার অমৃতময় ফলভোগ করে। শুনিলে ত কেমন অদ্ভুত বিবাহ। এ বিবাহের সমস্ত লক্ষ্যই আধ্যাত্মিক উন্নতি।"

কুমুদ।—"সব কথাই শুনেছি, কিন্তু বুঝি নাই দিদি, একটীও। শুধু বুঝেছি; তোমার বর মানুষ নন্। তবে বরটী ভালই যুটেছে বটে।"

কুন্তলা।—"না। তিনিত মানুষ নন্ই। আমার স্বামী দেবতা। তিনি পবিত্রতার বিগ্রহ, সাধুতা এবং পুণ্যের সুধাময় পুত্তল। আমি কি তাঁহাকে মানুষ ভাবিতে পারি? তিনি মানুষ, ইহা ভাবিতে যে আমার কলিজা ফাটিয়া যায়! যে বিবাহ তাঁহাকে মানুষ করিবে, তেমন বিবাহে আমি তাঁহার সঙ্গে মিলিতে প্রস্তুত নই।" কুমুদ, আমি প্রাণের এ কাহিনী কাহাকেও বলি না। তোমরা আর কাহাকেও বলিও না। সাধারণ লোকে ইহার তাৎপর্য্য বুঝিবে না।"

প্রফুল্ল সুর করিয়া "ভেসেছি অকূলে আমি তারা দেখে ডুবে মরি!" এই পদটী গাইয়া বলিল, "বরটী কোথায় গা?"

কথা বার্ত্তা শেষ হইতে না হইতেই পদ্মমুখী এক বোঝা ডাকের চিঠি আনিয়া কর্ত্রীর হাতে দিয়া বিনীতভাবে এক পার্শ্বে সরিয়া দাঁড়াইল। কুন্তলা একে একে চিঠিগুলির শিরোনাম পড়িতে লাগিল। কিন্তু একখানি চিঠির শিরোনামের হস্তাক্ষর দেখিয়াই তাড়া তাড়ি তাহা খুলিয়া ব্যগ্রতার সহিত পড়িতে প্রবৃত্ত হইল। বলা বাহুল্য, এ চিঠি শশাঙ্কশেখরের—সেই চিঠি। চিঠি একবার পড়িয়া কুন্তলা আরও একবার পড়িল। অবশেষে হঠাৎ পত্র পড়া শেষ করিয়া, কাহাকেও কিছু না বলিয়া, ধীরে ধীরে আপনার উদ্যান-মধ্যস্থিত কুটীরে প্রবেশ পূর্ব্বক ধীরে ধীরে তাহার দ্বার বন্ধ করিল। কুমুদ এবং প্রফুল্লমুখী তখনও সেই স্থানেই দাঁড়াইয়া ছিল। পদ্মমুখীও দাঁড়াইয়া ছিল। তাহারা সকলেই দেখিয়াছিল, চিঠি পড়িতে পড়িতে কুন্তলার মুখ গম্ভীর হইয়াছিল এবং দুই চোক জলে ভাসিয়া যাইতেছিল।

প্রফুল্লমুখী "সাধ কোরে ভেসেছি সই, তারা দেখে দিব পাড়ী!" এই গানটী আগা গোড়া পুনরাবৃত্তি করিয়া গাইতে গাইতে প্রস্থান করিল। প্রফুল্ল এ গানটী বড় ভালবাসিত। গাইতে তাহার বড় ভাব হইত। তাই একবার মনে হইলেই পুনঃ পুন গাইত। কুমুদ অবাক্ হইয়া প্রফুল্লেরই অনুসরণ করিল।

যুবতীত্রয় যে পুষ্পোদ্যান-মধ্যে দাঁড়াইয়া কথা বলিতেছিলেন, ইহা কুন্তলার সেই বাল্যকালের শয়ন-গৃহের সম্মুখবর্ত্তী। বাগানের অপর দিকে হরগোবিন্দ রায়ের সেই পর্ব্বতাকার প্রকাণ্ড দ্বিতল সৌধ। সৌধ সম্প্রতি কুন্তলাদেবীর উদ্যোগে পুনঃসংস্কৃত হইয়া নূতনবৎ শোভা পাইতেছে।

তাহার চারিদিকের বাগানও পুনঃসংস্কৃত হইয়াছে। সৌধ-গর্ভ আবার পূর্ব্ববৎ গ্রন্থরাশিতে পরিপূর্ণ হইয়াছে। দেওয়ালে পূর্ব্বের ন্যায় বহুসংখ্যক চিত্রপট ও ঘড়ী প্রভৃতি রক্ষিত হইয়াছে। গৃহের সম্মুখে পুনরায় সেইরূপই নির্ব্বাণমূর্ত্তি, প্রস্তরস্তম্ভ ও প্রস্তর-ফলকাদি সজ্জিত হইয়াছে। এবার সৌধের নাম পরিবর্ত্তন করিয়া "হরগোবিন্দ-পুস্তকালয়" রাখা হইয়াছে। শশাঙ্কশেখর, সিদ্ধেশ্বরী এবং ভবানীশঙ্করের নাম চিরস্মরণীয় করিতে তাঁহাদের নামেও নূতন নূতন চিকিৎসালয়, অনাথ-নিবাস ও বিদ্যালয় প্রভৃতি প্রতিষ্ঠিত করিয়া, পূর্ব্বের ন্যায় বহির্ব্বাটীতে বড় বড় অট্টালিকা সকল পুনর্নির্ম্মিত করা হইয়াছে। কুন্তলার শয়ন-গৃহটীও পুনঃসংস্কৃত হইয়া অবিকল পূর্ব্বের আকার ও শ্রী ধারণ করিয়াছে। কিন্তু কুন্তলা এখন আর সে গৃহে বাস করে না। তৎপরিবর্ত্তে পুষ্পোদ্যান-মধ্যে দুইখানি পর্ণ-কুটীর নির্ম্মিত হইয়াছে। তাহার একখানিতে কুন্তলার রন্ধনাদি হয়, অপর খানিতে কুন্তলা বাস করে। পদ্মমুখী আয়োজন করিয়া দেয়, কুন্তলা প্রতিদিন অতিথি সেবাদির পরে দিনান্তে একবার মাত্র নিজ-হস্তেই রাঁধিয়া খায়। কুন্তলা নিজ-ব্যয়ের জন্য জমিদারীর এক পয়সাও গ্রহণ করে না। হস্ত-নির্ম্মিত চিত্র ও শিল্পকার্য্য দ্বারা যে আয় হয়, তদ্দ্বারা পদ্মমুখীর বেতন দেয় এবং আপনার প্রয়োজনীয় ব্যয় নির্ব্বাহ করে। কুন্তলা মাটীতে একখানি মাদুর পাতিয়া শোয়। পূর্ব্বের মতই মোটা শাদা কাপড় পরে। কুটীরের চতুষ্পার্শ্বস্থ উদ্যানের গাছে জল-সেচন এবং তাহাদের পরিচর্য্যাদি কার্য্যও নিজ-হস্তেই সম্পাদন করে। এ কার্য্যে কুমুদ এবং প্রফুল্ল সর্ব্বদাই সহকারী হয়। কেবল মধ্যে মধ্যে মানুষ রাখিয়া বাগানের মাটী প্রভৃতি খোঁড়াইয়া এবং জঙ্গল পরিষ্কার করাইয়া নেওয়া হয়। কিন্তু তাহার ব্যয়ও কুন্তলা নিজেই বহন করে। কুমুদবালা এবং প্রফুল্লমুখীর জন্য স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র সুন্দর অট্টালিকা এবং বাড়ী প্রস্তুত হইয়াছে। কুমুদ মাকে নিয়ে এবং প্রফুল্ল পেঁচোর মাকে নিয়ে নিজ নিজ গৃহে বাস করে। কিন্তু দিনের প্রায় সকল সময়েই এবং অনেক রাত্রি পর্য্যন্ত ইহারা কুন্তলার কুটীরেই থাকে। সামান্য পর্ণ-কুটীর হইলেও, যুঁই, বেল, চামেলী, গন্ধরাজ, গোলাপ, রজনীগন্ধা, কামিনী, টগর, জবা, করবী, চাঁপা প্রভৃতি নানা প্রকার ফুলের ঝাড় এবং লতাকুঞ্জে বেষ্টিত হওয়ায় আর কুন্তলার দেবকন্যা-সুলভ অপূর্ব্ব স্বর্গীয় রূপ-লাবণ্য-

প্রভায় সর্ব্বদা শোভমান থাকায়, ইহা যেন শত শত রাজ-ভবন হইতেও সুখকর এবং আনন্দময় বোধ হয়। ইহার গর্ভ উজ্জ্বল করিয়া কুন্তলাদেবী কখনও সাক্ষাৎ সরস্বতীর মত গ্রন্থরাশি অধ্যয়নে প্রবৃত্ত হন, কখনও জমিদারী-সংক্রান্ত কাগজ পত্র দেখেন, কখনও অশ্রুপূর্ণ-নয়নে সাহায্য-প্রার্থীদের প্রার্থনাপত্র পাঠ করিয়া অকাতরে দানাজ্ঞা লিখিতে থাকেন। তখন সেই আজঙ্ঘা-লম্বিত আলুলায়িতকেশী অপূর্ব্ব স্বর্গীয় পবিত্র সৌন্দর্য্যময়ী দেবীকে সাক্ষাৎ বিশ্বমাতা অন্নপূর্ণা বলিয়া যেন ভ্রম হইতে থাকে। আবার দেবী কখনও সেতার বা বীণায় ঝঙ্কার দিয়া আকাশ কাঁপাইয়া সুমধুর স্বরে সঙ্গীত করিতে থাকেন।

কুন্তলা অনেক তল্লাসের পরে পূর্ব্ব পরিচিত কুটুম্বিনী, পরিচারিকা এবং আত্মীয়াদের মধ্যে কেবল প্রফুল্লমুখী ও পেঁচোর মাকে পাইয়াছেন। প্রফুল্লমুখী এখন যৌবনের প্রায় শেষ সীমায় পদার্পণ করিয়াছেন। এতদ্ভিন্ন নূতন নূতন অনেক উপায়-হীন অনাথ পরিবার এবং স্ত্রী, পুরুষকেও কুন্তলা আশ্রয় দিয়াছেন। এই সকল আশ্রিত স্ত্রীপুরুষের বাসের জন্য ভবানীশঙ্করের বাড়ীর সেই প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড মহল সকল ছাড়িয়া দেওয়া হইয়াছে। ইহা ছাড়া পূর্ব্বের ন্যায় বড় একটী অতিথিশালাও স্থাপিত হইয়াছে। অতিথিশালায় প্রতিদিন শত শত পথিক, সন্ন্যাসী এবং কাঙ্গাল দুঃখী লোক আহার করিয়া পরিতোষ প্রাপ্ত হয়। আর যে বিস্তীর্ণ মাঠের প্রান্তে নদী তীরে মধু ও সরমার রক্তাক্ত দেহ গভীর নিশীথ সময়ে ভস্মীভূত হইয়াছিল, সেই মাঠের মধ্যে দুইটী প্রকাণ্ড দীঘী কাটাইয়া দীঘীর পাহাড়ে রাজপুরীর মত সুন্দর ও সুবৃহৎ দুইটা উদ্যান-বেষ্টিত শুভ্রবর্ণ ইষ্টকালয় নির্ম্মিত করা হইয়াছে। ইষ্টকালয়দ্বয়ের সম্মুখস্থ দীঘী দুইটীর সুন্দর শুভ্রবর্ণ সুবিস্তীর্ণ ঘাটের উপরে শুভ্র প্রস্তর-ফলকে বড় বড় স্বর্ণময় অক্ষরে কি যেন লিখিত রহিয়াছে। তাহা পড়িলে জানা যায়, একখানি ফলকে "মধুসরোবর" আর একখানিতে "সরমাসরোবর" এই দুইটী নাম লেখা রহিয়াছে। প্রস্তর-ফলকের পশ্চাতে, বাড়ীর দেউড়ী বা দ্বারের সম্মুখে ক্রমান্বয়ে মধু ও সরমার দুইটী প্রস্তর-মূর্ত্তিও স্থাপিত হইয়াছে। মূর্ত্তি দুইটীর ভাব দেখিয়া বোধ হয়, তাহারা যেন বিষাদ-সাগরে ডুবিয়া ম্লানমুখে কাহাদিগকে সাদরে সম্ভাষণ করিতেছে। মধু সরোবরের উপরিস্থিত বাটী অনাথা বিধবাদিগের আশ্রয়ের জন্য এবং সরমা-

সরোবরের উপরিস্থিত বাটীটী বহুপত্নীক দুশ্চরিত্র স্বামীকর্ত্তৃক নির্য্যাতিত এবং পরিবর্জ্জিত চিরদুঃখিনী সতী রমণীগণের আশ্রয়ের জন্য নিয়োজিত হইয়াছে।

কুন্তলাদেবী এই পাঁচ বৎসরে আপনার জমিদারীর মধ্যে এবং বাহিরেও অনেক দীঘী ও পুষ্করিণী খনন, রাস্তা, ঘাট, নির্ম্মাণ; বিদ্যালয়, ঔষধালয়, অনাথাশ্রম, পান্থশালা এবং অতিথিশালা প্রভৃতি স্থাপন করিয়া বহুতর সৎকার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়াছেন। গভর্ণমেণ্ট কুন্তলার এইরূপ ভূরি ভূরি সৎকার্য্যে এবং অজস্র দানাদিতে আনন্দিত হইয়া কুন্তলাদেবীকে অযাচিত ভাবে মহারাণী উপাধি দিয়াছেন। কুন্তলাদেবী বারম্বার বিনয় ও দৃঢ়তার সঙ্গে সনন্দ পত্রখানি ফেরত দেওয়াতেও গভর্ণমেণ্ট অধিকতর আগ্রহের সহিত কাগজে, পত্রে ও গেজেটে কুন্তলাকে মহারাণী উপাধিতে ভূষিত করিয়া স্বাধ্বী-রমণীর সাধুতার পুরস্কার প্রদান করিয়াছেন। শ্রীশ্রীমতী মহারাণী কুন্তলাদেবীর অজস্র দানে দেশ প্লাবিত। প্রার্থনা এবং পাত্র উপযুক্ত বোধ হইলে, দান-শৌণ্ডা মহারারাণী কোনই প্রার্থীকে বঞ্চিত করেন না। বরং সকলেই আশার অতীত ফল পাইয়া তাঁহার গুণ কীর্ত্তন করে। দয়াবতী মহারাণীর অধিকারের প্রজাগণের ত সুখের সীমাই নাই। তাহাদের নিকট হইতে বাজে আদায় কিছুই হয় না। তদ্ভিন্ন খাজানার নীরিখও চতুষ্পার্শ্বের অপেক্ষা অত্যন্ত ন্যূন। ইহা ছাড়া তাহাদের শরীর, মন ও অবস্থার উন্নতি এবং সুখ শান্তি বৃদ্ধির জন্য প্রচুর আয়োজনের বিন্দুমাত্রও ত্রুটি নাই। কুন্তলা দেবী, নির্ম্মলচন্দ্র-ধন-ভাণ্ডার নামে একটি ধনাগার খুলিয়াছেন। তাহা হইতে সর্ব্বদাই দুঃস্থ প্রজাদিগকে বিনা সুদে ঋণ প্রদান করা হয় এবং কালে তাহাদের অবস্থার উন্নতি হইলে বিনা অত্যাচারে তাহাদের নিকট হইতে ঋণ পুনঃ গ্রহণ করা হয়। এইরূপে মহাত্মা হরগোবিন্দ এবং ব্রহ্মচারী ভবানী শঙ্করের অভাবেও শ্রীশ্রীমতী মহারাণী কুন্তলা দেবীর প্রসাদে তুলসীগ্রামে পুনরায় চাঁদের হাট বাজার বসিয়াছে।

কুন্তলা আজ অশ্রুপ্লাবিত-মুখে কুটীরের দ্বার বন্ধ করিয়া গভীর চিন্তা ও বিষাদ-সাগরে নিমগ্ন হইলেন। সমস্ত দিন গেল, সন্ধ্যা আসিল, তবুও কুটীরের দ্বার উন্মুক্ত হইল না। কুমুদবালা এবং প্রফুল্লমুখী বারম্বা

দ্বারে আসিয়া দ্বার খোলা না পাইয়া অবশেষে নিজ নিজ গৃহে কাঁদিতে বসিলেন। এ পৃথিবীর চাঁদের হাট বাজার এই রূপই!

নবম পরিচ্ছেদ।

অন্নপূর্ণা-রূপিণী।

দেখিতে দেখিতে তিন দিবস গত হইয়াছে। কুন্তলার জমিদারীর কাজ কর্ম্ম পূর্ব্বভাবেই চলিতেছে। দান ও সদনুষ্ঠানের স্রোত এক ভাবেই বহিতেছে। পূর্ব্বেই আভাস দিয়াছি, কুন্তলা পতিপুত্র-হীন হইলেও তাহার পরিবার সুবিস্তৃত। এই বিস্তীর্ণ পরিবারের নিত্য নৈমিত্তিক ভরণ-পোষণের সমস্ত আয়োজন অবাধেই চলিতেছে। ভবানী-শঙ্করের বড় বড় মহলগুলি যেন মৌ-চাকের মত সশব্দ পদার্থ-বিশেষ হইয়াছে। সর্ব্বদাই জনতার অস্পষ্ট কোলাহলে পরিপূর্ণ। ওখানে একদল ছোট ছোট ছেলে মেয়ে যুটিয়া দৌড়া দৌড়ি ছুটা ছুটী খেলিতেছে। কোন স্থানে ছোট ছোট মেয়ের দল মিলিয়া খেলা-ঘরে ধূলা খেলা করিতেছে। এখানে সংক্ষেপে ঘরসংসারের সমস্ত অভিনয়ই হইতেছে। ছোট ছোট ছেলেরা হাট বাজার করিতেছে। মেয়েগুলি ধূলার ভাত, পাতার তরকারি, কাদার পায়স রাঁধিয়া গাছ-পালারূপ অতিথিদিগকে অজস্র ভোজন করাইতেছে। কেহ বা ছোট দেহটুকু লইয়া ছুটিয়া গিয়া ছোট হাতে আপনার পিতা মাতাকে খেলা-ঘরের অন্নব্যঞ্জন খাইতে দিতেছে। তাঁহারা হাসিতে হাসিতে ধূলার ভাত পাতার ব্যঞ্জনে মাখিয়া কৃত্রিম আহারে ব্যস্ত হইয়া সন্তানকে খুসী করিতেছেন কোথায়ও একটা ছোট ছেলে কাঁদিয়া কাঁদিয়া খুন হইতেছে। কারণ, তাহার প্রসূতি একলা মানুষ। তিনি রান্না-ঘরে রাঁধিতে ব্যস্ত আছেন। কিন্তু তাঁহার কাণ সর্ব্বদাই এদিকে ছিল। ছেলের কান্না সে তীক্ষ্ণ কাণে পৌঁছিতে বিলম্ব হয় নাই। কিন্তু তিনি ডা'লে সম্ভার দিতে কড়ায় তেল চড়াইয় ফোড়ণ ছাড়িয়া দিয়াছেন। এখন আর নড়িবার যো নাই। কারণ, তাহ হইলে, তেল জ্বলিয়া উঠিবে। কোন প্রসূতি বা শিশুকে স্তন্য পা করাইতেছেন। তাঁহার মুখে যেন আনন্দময় স্বর্গধাম অবতীর্ণ। তিনি আবেশ-ভরে অর্দ্ধ-নিমীলিত-নেত্রে শুধুই শিশুর মুখ দেখিতেছেন। আবার

কোথায়ও দুই তিনটী ঝগড়াটে স্ত্রীলোক মিলিয়া ঝগড়া করিতেছে। তাহারা রাক্ষসীর মত শুধুই প্রতিদ্বন্দ্বিনীর বাপ, ভাই ও স্বামী পুত্রের মস্তক চর্ব্বণের কথা বলিতেছে। তাহাদের তৎকালীন উগ্রমূর্ত্তি এবং আলু থালু বেশ দেখিয়া পুতনা, তাড়কা ও শূর্পণখার কথাই মনে জাগিতেছে। কোন স্থানে একদল স্ত্রীলোক বসিয়া পরনিন্দারূপ মহানন্দে মত্ত হইয়া গল্পাদি করিতেছে। নিজেরা বাদে সংসারে যে একটা কুৎসিত পদার্থ যেন ইহা প্রমাণ করিতেই তাহারা ব্যস্ত। এক স্থানে একদল বৃদ্ধা ও অর্দ্ধ-বয়স্কা স্ত্রীলোক নিবিষ্টমনে একটী ছেলের মুখে কাশীদাসের মহাভারত-পাঠ শুনিতেছেন। ছেলেটী সুর করিয়া দুলিয়া দুলিয়া পড়িতেছে। কোথায়ও শুধু নির্দ্দোষ হাসি ঠাট্টার আমোদে একদল সমবয়স্কা যুবতী হাসিয়া হাসিয়া গলিয়া গলিয়া পড়িতেছে। কুন্তলা পূর্ব্ববৎ প্রত্যহই আসিয়া সকলকে দেখিয়া যাইতেছে। অতিথি-শালা প্রতিদিনই অতিথিদলে পরিপূর্ণ হইতেছে। দেবী সর্ব্বকার্য্যের উপরে স্বয়ং ভাণ্ডার-গৃহে উপস্থিত হইয়া বরাবর যেরূপ নিজ-হস্তে অতিথিদিগের চা'ল, ডা'ল প্রভৃতি খাদ্যাদি বণ্টন করিয়া থাকেন, এখনও তদ্রূপই করিতেছেন। অতিথি-শালাতেও চিরদিনের মতই নিত্যোৎসব, নিত্য-আমোদ চলিতেছে। ওখানে এক দল নবাগত কাঙ্গালী দাঁড়াইয়া প্রাণ মনের সঙ্গে চীৎকারপূর্ব্বক দয়াবতী মহারাণীর জয় ঘোষণা করিতেছে। এখানে এক দল সন্ন্যাসী তল্পী তাল্পা নামাইয়া ধূল-পায়ে বিশ্রাম করিতেছে। ইতিমধ্যেই তাহাদের কেহ কেহ গঞ্জিকা প্রস্তুত বা সেবন করিতে মজিয়া পড়িয়াছে। কোথায়ও বা বহুসংখ্যক অতিথি দলবদ্ধ হইয়া বা পৃথক্ পৃথক্ রূপে নিজ নিজ রন্ধনাদিতে ব্যস্ত রহিয়াছে। কেহ ডা'ল ব্যঞ্জন রাঁধিয়া ভাত রাঁধিতেছে। কেহ বা নিজের দরকার ও ইচ্ছানুসারে ভাতে ভাত রাঁধিয়া খাইতেছে। কেহ চুল্লিকা-মধ্যে কাষ্ঠাদি সজ্জিত করিয়া অগ্নি সংযোগ করিতে ব্যাকুল হইয়া পড়িয়াছে। কেহ স্নানে ব্যস্ত। কেহ আহারে ব্যস্ত। কেহ গমনোদ্যত। কেহ গান গাইতেছে। কেহ আহ্নিকান্তে উচ্চৈঃস্বরে স্তোত্রাদি পাঠ করিতেছে। কেহ ঘাটে বসিয়া ফুল বিল্বপত্র লইয়া পূজা করিতেছে। কেহ বা পূজা করিতে করিতে, যে কার্য্যে যাইতেছে, একাগ্র-চিত্তে শুধু তাহাই ভাবিতেছে। কোন জন বা জাগ্রত-স্বপ্নে রাজা হইতেছিল। সে তখন আপনার পরিধানের আর্দ্র ছিন্ন মলিন বস্ত্রের কথা ভুলিয়া সিংহাসনে বসিয়া রাজ্যের

মঙ্গলামঙ্গল ভাবিতেছিল। হঠাৎ যেন তাহার পাটরাণী স্বর্গভ্রষ্টা ইন্দ্রাণীর মত কাছে আসিয়া দাঁড়াইলেন। রাজা স্বপ্নের ঘোরেই সেই চাঁদপানা মুখখানি দেখিতে দেখিতে অর্দ্ধ পূজা শেষ না হইতেই অজ্ঞাতসারে এক টানে সম্মুখস্থ শিবটীকে জলে ফেলিয়া, চমক-ভাঙ্গা হইয়া সলজ্জ-চিত্তে নিজ-কার্য্য ভাবিতেছেন। কেহ তাহারই পার্শ্বে ভিজা গায়ে ভিজা কাপড়ে ফোঁটা ও তিলকাদির বন্দোবস্ত করিতে করিতে একটা খারাপ কথা ভাবিতেছে। এইরূপ লোক-চরিত্রের রঙ্গ-ভূমি অতিথিশালার কার্য্যও অবাধেই চলিতেছে। বিশেষ বিশেষ অতিথিকে দেবী নিজ-হস্তেই রন্ধনাদি করিয়া পরিতোষপূর্ব্বক ভোজন করান। এত মনোকষ্টের মধ্যেও এ সকল কাজে বিঘ্ন ঘটে নাই। কেবল কুন্তলার সুবিস্তীর্ণ পরিবারে কর্ত্রীর অজ্ঞাত মনোদুঃখের একটা মলিন ছায়া পড়িয়া সকলকেই কিঞ্চিৎ বিষণ্ণ করিয়াছে।

কুন্তলা আজ দুই দিন হইল, চারিটী পরিচিত সচ্চরিত্র ভদ্র লোককে আসিতে চিঠি লিখিয়াছে। তাঁহাদিগকে কেন আসিতে হইবে, তাহাও চিঠিতে সুস্পষ্টরূপে লিখিত হইয়াছে। আজ তাঁহাদের আসিবার দিন। এই তিন দিনের মধ্যে কুন্তলার স্নান নাই, আহার নাই, নিদ্রা নাই, অবসর মত কান্নারও বিরাম নাই। কাঁদিতে কাঁদিতে কুন্তলার চোখের পাতা দুইটী ফুলিয়া উঠিয়াছে। চক্ষুর্দ্বয় পদ্ম-পত্র-সদৃশ ঈষৎ রক্তাভ হইয়াছে। কুন্তলার পরিধানে মলিন বাস। আজঙ্ঘা-লম্বিত বিপুল কেশ-রাশি অস্নান ও অযত্ন-হেতু অধিকতর রুক্ষ হইয়া, পশ্চাতে, অংসোপরি এবং প্রভাতকালীন পূর্ণচন্দ্রসদৃশ মলিন মুখোপরি ছড়াইয়া এলাইয়া পড়িয়াছে। চিন্তা-নিমগ্ন কুন্তলা সর্ব্ব-কার্য্যান্তে আজ জমিদারী-সংক্রান্ত কতকগুলি চিঠি ও কাগজ পত্র দেখিতে ছিল। এ সকল দেখিতে অন্যান্য দিনাপেক্ষা দ্বিগুণ ত্রিগুণ অধিক সময় লাগিল। কুন্তলা ক্রমে ক্রমে ধীরে ধীরে কাগজ গুলি দেখিল, চিঠি গুলি পড়িল, যে কতক গুলি কাগজ স্বাক্ষর-জন্য আসিয়াছিল, তাহাতে একে একে স্বাক্ষর করিল। তৎপরে পদ্মমুখীর হাতে সমস্ত কাগজ পত্র গুলি ফেরত পাঠাইয়া, পুস্তকাধারের নিকটে দাঁড়াইয়া পড়িবার জন্য এক খানি পুস্তক খুঁজিতে প্রবৃত্ত হইল। প্রথমে এক খানি পুস্তক টানিল, এখানি সাংখ্য দর্শন—কাপিল সূত্র। প্রথম পাত উল্টাইয়াই পড়িল, "অথ ত্রিবিধদুঃখাত্যন্তনিবৃত্তিরত্যন্ত পুরুষার্থঃ।"

আবার একবারে কয়েক পাত উল্টাইয়া পড়িল, "স্থূলাৎ পঞ্চতন্মাত্রস্য।" ইত্যাদি ইত্যাদি। কিন্তু আজ এ সকল পুরুষ, প্রকৃতি, ত্রিতাপ, অহংতত্ত্ব, পঞ্চতন্মাত্র প্রভৃতি লইয়া ধুলা খেলা করিতে চিত্ত কিছুতেই রাজি হইল না। ভাল লাগিল না দেখিয়া, কুন্তলা ধীরে ধীরে আস্তে আস্তে সাংখ্য রাখিয়া, বেদ, উপনিষদ, স্মৃতি, পুরাণ, সাহিত্য, ব্যাকরণ, অভিধান, দর্শন, জ্যোতিষ, গণিত, কাব্য, নাটক, ইতিহাস অনেকের উপর দিয়া নিমেষে চক্ষু বুলাইল। সংস্কৃত ছাড়িয়া ইংরেজি গ্রন্থ সকল দেখিল। কাব্য, ইতিহাস; দর্শন অনেক চোখে ঠেকিল, কিন্তু কিছুই পড়িতে ইচ্ছা হইল না। তৎপরে পারসিক এবং আরবিক কাব্য গ্রন্থও দুই এক খানি নাড়িয়া নাড়িয়া রাখিয়া দিল। পড়িতে ইচ্ছা না হওয়ায় শেষটা একটী বীণা লইয়া কুন্তলা গান গাইতে বসিল। মুহূর্ত্তে সৌন্দর্য্যময় অঙ্গুলী-সঞ্চালনে অপূর্ব্ব শিক্ষা-নৈপুণ্যে বীণা সুমধুর শব্দে গর্জ্জিয়া নানাবিধ প্রকারে ঝঙ্কার করিতে লাগিল। সে ঝঙ্কারে তদধিক সুমধুর কণ্ঠ-স্বর মিশিয়া নিমেষে মনোহর সঙ্গীত-সুধা-বৃষ্টি আরম্ভ করিল। কিন্তু এক পদ দুই পদ গাইতে না গাইতেই বাষ্পভরে গায়িকার চক্ষু ও কণ্ঠ রোধ হইল। কুন্তলা এবার বীণাটী কোলে করিয়া একাগ্রচিত্তে কি যেন এক গভীর চিন্তায় নিমগ্ন হইল। কুন্তলা আজ কি ভাবিতে বসিল? ভাবিতে লাগিল, "কি! স্বর্গের দেবতারাও কি ইন্দ্রিয়াতীত নন!! শুনেছি, দেব-দেহ জ্যোতির্ম্ময়, ছায়াশূন্য। সে হৃদয় কোটি কোটি অকলঙ্ক পূর্ণিমার চাঁদের জ্যোৎস্নাময়। সুনির্ম্মল সুধা-নির্ঝরিণী মন্দাকিনীর পৃথক্ অস্তিত্ব কথার কথা মাত্র। দেব-হৃদয়ের সুপবিত্র ইচ্ছার এক একটী উচ্ছ্বাসই মন্দাকিনী, এক একটী ভাব-তরঙ্গই ফুটন্ত পারিজাত বৃক্ষ, এক একটী শক্তি-বিন্দুই কল্পতরু। দেবতারা পাপাসুর-দলকে দলন করিয়া চির-পুণ্য-সুধা-পানে অনন্ত জীবনের অধিকারী অমর নাম প্রাপ্ত হইয়াছেন। বিষয়ের কোলাহল, বাসনার অগ্নিময় উত্তপ্তস্রোত, ভোগ বিলাসের অন্ধকারময় ঝটিকা, দেবগণের পবিত্র নিঃশ্বাস-স্পর্শে বিলুপ্ত হইয়া যায়। তবে কিরূপে সেখানে রক্তমাংসপিণ্ড নরজাতি-সুলভ ভোগেচ্ছা বা ঐন্দ্রিক পিপাসা সম্ভবিবে? কখনই সম্ভবিতে পারে না। এ কথা বিশ্বাস করিতে পারি না। জিতেন্দ্রিয় শশাঙ্কশেখরে ঐন্দ্রিক ভাব! না, না। হইতে পারে না। তিনি দেবতা। আমি নরলোক-নিবাসিনী নারী বলিয়া তাঁহাতে এই মানুষোচিত ভাব আরোপ

করিতেছি। আমার অপরাধ হইতেছে। তবে তিনি আমাকে পাইতে কাঁদিতেন কেন? কেন? আমি ত তাঁহার তুল্য এ জগতে কাহাকেও ভাল বাসি নাই, ভাল বাসি না, ভাল বাসিতে পারিব না। যাকে পাওয়া বলে, তাহা ত এই-ই। তবে আবার পাওয়া কি? বোধ হয় আমি তাঁহাকে যেমন ভাল বাসি, তিনি আমায় তেমন ভাল বাসেন না। তাই তিনি আমাকে দূরে দেখিয়া থাকেন। তাই কি? কিন্তু এ কথা কি করিয়া বিশ্বাস করিব? না, আমি বিশ্বাস করিব না। বোধ হয়, আর তিনি এ জগতে নাই—এ রক্তমাংসময়, স্থূল-ইন্দ্রিয়-কোলাহলময় জগতে নাই। এখন তিনি তাঁহার উপযুক্ত ব্রহ্ম-লোকেই আছেন। আর এ পৃথিবীতে বসিয়া সে দেব পুরুষের কথা লইয়া তর্ক বিতর্কে ফল কি? অথবা দেবতার দোষ গুণ ভক্তের অবিচার্য্য। আমি তাঁহার ভক্ত, তিনি আমার দেবতা। ইহ-পরলোকে তাঁহাকে পূজা করাই আমার কার্য্য।" এবার কুন্তলার বুক ভাঙ্গিয়া যাইতে ছিল। হঠাৎ কান্নার শব্দ বাহিরে ফুটিল। কুন্তলা সেই বিষাদপূর্ণ ছবিখানি লইয়া দাঁড়াইয়া, ঊর্দ্ধমুখে জোড়করে বলিতে লাগিলেন, "দেব, হয়ত তুমি আজ দেবাদিদেবের সুধাময় কোলে বসিয়া অপার শান্তি ও আনন্দ ভোগ করিতেছ। আমি—মলিন, চির দুঃখী আমি এ পৃথিবীর ধূলায় মিশিয়া তোমার চরণে ক্ষমা চাহিতেছি। ক্ষমা করিবে কি? আমি কি করিয়াছি যে আমার জন্য তুমি এই ভীষণ প্রায়শ্চিত্ত করিয়াছ? বুঝিয়াছি, তোমার প্রায়শ্চিত্ত কি। আগে জানিলে যে, আমিই এ প্রায়শ্চিত্তের ভার লইয়া তোমার পথ নিষ্কণ্টক করিতাম!" এমন সময় পদ্মমুখী একখানি চিঠি হাতে করিয়া, কুমুদ এবং প্রফুল্ল ঠাকুরাণীর সঙ্গে কুটীরে প্রবেশ করিল। তাহাদের আগমন-মাত্রই কুন্তলা নীরব হইয়া আঁচলে চক্ষু মুছিল। পদ্ম কর্ত্রী ঠাকুরাণীর হাতে চিঠি খানি দিয়া দূরে দাঁড়াইয়া অপেক্ষা করিতে লাগিল। কুন্তলা ধীরে ধীরে চিঠি খুলিয়া পড়িয়াই বুঝিল, তৎকর্ত্তৃক আহূত দেবেন্দ্র বাবু, বনবিহারী বাবু, পার্ব্বতীমোহন বাবু এবং প্রসাদকুমার বাবু উপস্থিত হইয়া বাহিরে অপেক্ষা করিতেছেন। কুন্তলা আজ দুই দিন হইল, ইহাদিগকেই আসিতে পত্র লিখিয়াছিল। দেবেন্দ্র বাবু এবং বনবিহারী বাবু উভয়ই গণ্য মান্য জমিদার। পার্ব্বতীমোহন বাবু ব্যবহারাজীবের কার্য্য করেন। প্রসাদকুমার বিশ্ববিদ্যালয়ের এক জন অধ্যাপক।

দেবেন্দ্র এবং পার্ব্বতীমোহন পরিণতবয়স্ক পুরুষ। অপর দুইজনের বয়ঃক্রম চল্লিশের নীচে। কিন্তু চারিজনই, সাধুতা এবং সচ্চরিত্রতার জন্য দেশমান্য মহাত্মা ব্যক্তি। কুন্তলা চিঠি পড়িয়া সমাগত ব্যক্তি-চতুষ্টয়কে একবারে কুটীরে উপস্থিত করিবার জন্যই পদ্মমুখীকে অনুমতি করিলেন। পদ্ম তখনই সংবাদ দিয়া পুরুষদিগকে কুটীর মধ্যে আনিল। এই পাঁচ বৎসরের মধ্যে এ কুটীরে এই-ই প্রথম পুরুষ জাতির পদার্পণ হইল। কুন্তলার নিয়মানুসারে আবশ্যক মত দুই একটী মুটে মজুর শ্রেণীর লোক ভিন্ন পুষ্পোদ্যানের মধ্যে পর্য্যন্ত পুরুষ মানুষের সমাগম নিষেধ ছিল। কেবল বিশেষ প্রয়োজনবশতঃ বাহিরের নির্দ্দিষ্ট বৈঠকখানা ঘরে গিয়া কুন্তলা এই পাঁচ বৎসরের মধ্যে কয়েকটী দিনমাত্র কর্ম্মচারী প্রভৃতি ভিন্ন বাহিরের কোন কোন পুরুষের সঙ্গেও দেখা সাক্ষাৎ এবং আলাপাদি করিতে বাধ্য হইয়াছে। কিন্তু আজ আর কোন নিয়মই রক্ষিত হইল না।

কুন্তলার চিঠির মর্ম্মানুসারে পার্ব্বতীমোহন বাবু বাড়ী হইতেই এক খানি দান-পত্রের পাণ্ডুলিপি লিখিয়া আনিয়াছিলেন। আর প্রকৃত দান-পত্র লিখিবার জন্য একখানি বহুমূল্য কাগজও ক্রয় করিয়া আনিয়াছিলেন। পার্ব্বতীমোহন কুন্তলার আম্মোক্তার ও উকিল। স্থতরাং কুন্তলার পক্ষ হইয়া তিনি সমস্ত আইনানুযায়ী কার্য্য করিতেই অধিকারী। পার্ব্বতীমোহন বাবু পাণ্ডুলিপি খানি সর্ব্ব-সমক্ষে পড়িলেন। এই পাঁচবৎসরে কুন্তলাদেবী যে সকল সদনুষ্ঠান করিয়াছেন, তৎসমুদয় এবং পূর্ব্বের সমস্ত সদনুষ্ঠান-গুলিই যাহাতে জমিদারীর আয় দ্বারা অক্ষুণ্ণ ভাবে চিরদিনের জন্য স্থায়ীরূপে চলিতে পারে, এই দান-পত্রের প্রধান উদ্দেশ্য তাহাই। তৎপরে বিশ্ববিদ্যালয়ের শেষ পরীক্ষা-দানোপযোগী একটী নূতন বড় বিদ্যালয় স্থাপন, স্থানবিশেষে কতকগুলি নূতন দাতব্য চিকিৎসালয়, কোথাও বা জলাভাব দূরীকরণজন্য পুষ্করিণী খনন, অনাথনিবাস সংস্থাপন ইত্যাদি বহুতর নূতন নূতন সদনুষ্ঠানের কথাও দান-পত্রে লিখিত হইয়াছে। এই নূতন সদনুষ্ঠান গুলি সমস্তই কুমার শশাঙ্কশেখরের নামে কীর্ত্তিত হইবে। ইহা ছাড়া গোপাল বাবুর সঙ্গে কুমুদের বিবাহের কথা এবং বিবাহের পরে তাঁহারা একথণ্ড জমিদারীর স্বত্বাধিকারী হইবেন ও বিবাহের পূর্ব্বে কুমুদ ও কুমুদের মা, প্রফুল্লমুখী এবং পেঁচোর মা প্রভৃতির মত ভরণ পোষণের জন্য প্রচুর বৃত্তি পাইবে। প্রফুল্লমুখীকে অনাবশ্যক বিবে-

চনায় ভূসম্পত্তি দান করা হইল না। কিন্তু তিনি যাহাতে স্বচ্ছন্দে জীবন-কাল অতিবাহিত করিতে পারেন, তজ্জন্য বৃত্তি ছাড়া তাঁহাকে ত্রিশ হাজার টাকার একখানি কোম্পানির কাগজও দেওয়া হইবে। আর যদি কোন ঘটনাবশতঃ দুর্ভাগ্য ধরণীধর কখনও দ্বীপান্তর হইতে খালাস পাইয়া দেশে ফিরিয়া আসে এবং সদ্ভাবে জীবন যাপন করিতে চায়, তবে তাহাকেও একটী বৃত্তি দেওয়া হইবে। এই সকল কথাই বিশেষরূপে দান-পত্রে লিখিত হইয়াছে। দান-পত্রের মর্ম্মানুসারে কার্য্যকলাপ নির্ব্বাহ করিবার এবং জমিদারীর কার্য্য-সমাধার ভার একটী সভার হস্তে অর্পিত হইবে। পার্ব্বতীমোহন বাবু, দেবেন্দ্র বাবু, বনবিহারী বাবু এবং প্রসাদকুমার বাবু সেই সভার সভ্য হইবেন। পার্ব্বতীমোহন বাবু তাঁহাদের প্রতিনিধি বা আম্মোক্তার রূপে নিত্য নৈমিত্তিক কার্য্য চালাইবেন। সভ্যগণের মধ্যে কেহ লোকান্তর গমন-কালে নিজ-পদে তাঁহার এবং অপর সভ্যগণের মনোনীত ব্যক্তিকে নিযুক্ত করিতে পারিবেন। আর অদ্য হইতে তিন দিন পরে এই দান-পত্রের মর্ম্মানুযায়ী কার্য্য চলিবে। ইত্যাদি ইত্যাদি আইন-কানুন-ঘটিত আরও অনেক কথা পাণ্ডুলিপিতে লিখিত হইয়াছে। পার্ব্বতী-মোহন সর্ব্ব সমক্ষে পাণ্ডুলিপি পাঠ করিলে, কুন্তলার অনুরোধে তখনই মূল দান-পত্র লিখিত হইল। দান-পত্রে কুন্তলা প্রসন্ন চিত্তে স্বাক্ষর করিল এবং তাহা পাকা করিবার অবশিষ্ট সমস্ত কার্য্যভার পার্ব্বতীমোহনের হস্তে অর্পণ করিল। শ্রীশ্রীমতী মহারাণী কুন্তলা দেবী অকস্মাৎ কেন এই বিপুল সম্পত্তি পরিত্যাগ করিয়া সংসারের সঙ্গে নিঃসম্পর্ক হইতেছেন, আগন্তুকগণ ইহার গূঢ় কারণ কিছুই বুঝিলেন না। কেবল বিদায়-কালে সকলেই সন্দেহ-দোদুল্যমান-চিত্তে অশ্রু মোচন করিতে করিতে প্রস্থান করিলেন।

এদিকে কুন্তলা দেবী তৎপর দিবস প্রভাতেই দিগ্‌দিগন্ত হইতে দুঃখী, কাঙ্গালী ও সৎকার্য্যার্থ অর্থ-প্রার্থীদিগকে সংবাদ দিয়া একত্র করিতে লাগিলেন। দ্বিতীয় দিবসে বহুলোক একত্রিত হইলে, তাহাদিগকে দুই হাতে অর্থ ও স্বর্ণ রৌপ্য বিতরণ করিতে লাগিলেন। গৃহের বহুকাল-সঞ্চিত কত মূল্যবান্ ও মনোহর দ্রব্যাদি এবং অর্থরাশি অল্প সময়-মধ্যেই যথোচিতরূপে প্রার্থীদিগের মধ্যে বিতরিত হইল। গৃহ অর্থ ও দ্রব্য-শূন্য হইলে, পণ্ডিত এবং বিদ্যার্থী লোকদিগকে ডাকিয়া আপনার বক্ষের রুধিরসম প্রিয়তম, বহু যত্নে

অধীত মহার্ঘ সংস্কৃত, বাঙ্গালা, ইংরেজি, পারসিক ও আরবিক গ্রন্থ সকল দান করিলেন। মুহূর্ত্ত-মধ্যে কত সাহিত্য, ইতিহাস, স্মৃতি, পুরাণ, ব্যাকরণ, অভিধান, দর্শন, গণিত, জ্যোতিষ, বিজ্ঞান এবং কাব্যশাস্ত্র বিতরিত হইয়া হস্তে হস্তে শোভা পাইল। কত জন আজ এইরূপ অযাচিত ভাবে বহুমূল্য মহার্ঘ গ্রন্থ উপহার পাইয়া অশ্রুপূর্ণ-লোচনে প্রস্থান করিলেন, কে তাহার সংখ্যা করিবে? কুন্তলা দেবী গ্রন্থাদি দান করিয়া, আপনার ভোজন-পাত্র, জল-পাত্র, শয্যা এবং দ্বিতীয় বস্ত্র পর্য্যন্ত দান করিলেন। দান-কালে পরম বিদুষী, সৌন্দর্য্যের আদর্শ প্রতিমা শ্রীশ্রীমতী মহারাণী কুন্তলাদেবীকে দেখিয়া সকলেই ভাবিতে লাগিল, বুঝি এই কলিযুগে আবার অন্নপূর্ণারূপিণী বিশ্বজন-মাতা স্বয়ং ভগবতী এই দুঃখপূর্ণ ধরাধামের দুঃখ-বিমোচনার্থ অবতীর্ণ হইয়াছেন। কিন্তু তাহারা সহসা এই মহাদেবীকে সংসারসম্পর্ক-শূন্য হইতে দেখিয়া নীরবে চক্ষু-জল মোচন করিতে লাগিল। কুন্তলা এই পাঁচ বৎসরে স্বভাবগুণে এবং সদনুষ্ঠানবলে আপামর সাধারণ সকলেরই প্রিয়পাত্রী হইয়াছিলেন। সুতরাং কুন্তলার এই অজ্ঞাতকারণ আকস্মিক বিষম বৈরাগ্যে সকলেরই যেন বক্ষ বিদীর্ণ হইতেছিল এবং মুখে উচ্চ রবে রোদন ও বিলাপের ধারা বহিতেছিল। চতুর্দ্দিকে যেন কেবল এক তুমুল হাহাকার রব উঠিল!

তৃতীয় দিবস কুন্তলা কর্ম্মচারীগণ এবং কুমুদ, কুমুদের মা ও প্রফুল্লমুখী প্রভৃতি বিস্তীর্ণ পরিবারের সকলের কাছে বিদায় লইয়া এলাহাবাদে যাত্রার উদ্যোগ করিল। সকলে কারণজিজ্ঞাসু হইলে, উত্তরে কিছুই বলিল না। স্বোপার্জ্জিত যে যৎকিঞ্চিৎ অর্থ এখনও হস্তে ছিল, তদ্দ্বারাই যাত্রার উদ্যোগ করিল এবং তাহা হইতে কিঞ্চিৎ পদ্মমুখীকে পুরস্কার দিল। কিন্তু দেশের সর্ব্বসাধারণ লোক ও দেবেন্দ্র বাবু প্রভৃতির বিশেষ অনুরোধে এবং তাঁহাদের প্রদত্ত অর্থ বলে ও লোকজন সমভিব্যাহারে শেষটা কুন্তলাকে বিশেষ আয়োজনের সঙ্গেই যাত্রা করিতে বাধ্য হইতে হইল। তখন কুন্তলা, কুমুদের মাকেও সঙ্গে যাইতে অনুরোধ করিল। বৃদ্ধা কুমুদের মা বিষাদ ও আনন্দের সঙ্গে মহাতীর্থ প্রয়াগে যাইতে সম্মত হইলেন।

দশম পরিচ্ছেদ।

শোক-সাগরে।

বেলাপরাহ্নে যোলজন বাহক-বাহিত এবং আটজন প্রহরি-রক্ষিত দুইখানি শিবিকা এলাহাবাদ হইতে জোগ্রামের নিকটে একটী নির্জ্জন স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইল। শিবিকা-মধ্যে দুইটী স্ত্রীলোক আসিয়াছেন। একজন বৃদ্ধা, অপরা পরমা সুন্দরী যুবতী। রমণীদ্বয় শিবিকা হইতে নামিয়া বাহক ও সঙ্গের লোকদিগকে নিকটের বাজারে গিয়া পাল্কী প্রভৃতি নিয়ে অপেক্ষা করিতে বলিলেন। কর্ত্রীর আদেশে তাহারা প্রচুর কারণসত্ত্বেও একটীও প্রশ্ন না করিয়া তৎক্ষণাৎ গমন করিতে বাধ্য হইল। কর্ত্রী যুবতী। লোকেরা চলিয়া যাইবার কালে যুবতী তাহাদের মধ্য হইতে একজন বিশ্বাসী দ্বারবানকে ডাকিয়া তাহার হাতে কিছু টাকা দিয়া বলিলেন, “ইহাতে তোমাদের চারি পাঁচ দিন চলিবে। তুমি প্রত্যহ সকালবেলা ও সন্ধ্যাকালে একাকী এই স্থানে আসিয়া আমাদের জন্য অপেক্ষা করিও। আমাদের যদি বেশী দেরি হইবার সম্ভাবনা হয়, তবে শীঘ্রই খপর পাইবে।” এই সকল কথার পরে দ্বারবান কিঞ্চিৎ বিস্মিত হইয়া চলিয়া গেল। রমণীদ্বয় ধীরে ধীরে একটী জঙ্গলাকীর্ণ পথ ধরিয়া নিকটবর্ত্তী পাহাড়াভিমুখে যাত্রা করিলেন। স্ত্রীলোকদ্বয়ের মধ্যে পরমা সুন্দরী যুবতীকে অত্যন্ত নির্ভীকচিত্ত বলিয়া বোধ হইতেছিল। ইহার প্রতিভা এবং সরলতা-মাখা মুখ শ্রীতেই যেন এই ভাব ফুটিয়া রহিয়াছে। বৃদ্ধা কিঞ্চিৎ গ্রাম্যলোক-সুলভ ভীরু-স্বভাবা।

রমণীদ্বয় পথি-মধ্যে অনেক বার দাঁড়াইলেন, অনেক বার যে সকল লোকেরা কাষ্ঠাদি আহরণ করিয়া গৃহে ফিরিতেছিল, তাহাদিগকে পথ জিজ্ঞাসা করিলেন। হাঁটিতে হাঁটিতে অনেক বার বৃক্ষ-তলে আশ্রয় লইয়া বিশ্রাম করিলেন। বিশ্রামান্তে অঞ্জলি অঞ্জলি ঝরণার জল পান করিয়া আবার চলিতে লাগিলেন। এরূপ পথে চলিতে বৃদ্ধার অভ্যাস নাই, কিন্তু যুবতী বিশেষ অভ্যস্ত। তথাপি পার্ব্বত্য-পথে বন্ধুর প্রস্তরাদির উপর দিয়া বারম্বার নামিয়া উঠিয়া, ক্রমান্বয়ে উর্দ্ধদিকে যাইতে রমণীদিগের প্রায়

সমভাবেই কষ্ট হইতেছিল। কিন্তু সূর্য্যাস্তের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত তাঁহারা প্রাণ পণ করিয়া হাঁটিতে ত্রুটি করিলেন না। অবশেষে একটী তরুরাজি-ভূষিত নির্জ্জন, নিস্তব্ধ পর্ব্বত-শৃঙ্গ-বক্ষে একখানি সামান্য পর্ণ-কুটীরের সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। এখান হইতে তিন দিকে দৃষ্টির ধূম্রবর্ণ সীমা-রেখা পর্য্যন্ত বৃক্ষলতা শোভিত গিরি-শ্রেণীর গম্ভীর মনোহর শোভা দেখা যাইতেছিল। অপরদিকে পর্ব্বত-পাদমূল ধৌত করিয়া সন্ধ্যা-কিরণে অলক্ত-রঞ্জিত, প্রশস্ত-হৃদয়া ভাগিরথী প্রখরস্রোতে ধাইতেছিল। গঙ্গা-বক্ষে মৃদুল সান্ধ্য সমীরে রক্তজবা-গ্রথিত ভাসমান মালারাশির মত বীচি-ক্রীড়া দৃষ্ট হইতেছিল। মস্তকোপরি অনন্ত ঊর্দ্ধে নীলিমা-বক্ষে দুই একটী মন্দজ্যোতি ক্ষুদ্র নক্ষত্র এবং পূর্ণ-প্রায় চন্দ্রমণ্ডল হাসিতেছিল। পর্ব্বত-গাত্রের তরু-শাখায় পল্লব-মধ্যে কুসুম-কলিকা ফুটিতেছিল, ফল দুলিতেছিল। পশ্চিম গগনে অস্তমিত সূর্য্যের রক্তচন্দনাক্ত পদচিহ্ন এখনও দেখা যাইতেছিল। রমণীদ্বয় এই শান্তিপূর্ণ গম্ভীর মনোহর রাজ্যে, সেই পর্ণকুটীর-সম্মুখে ক্ষণকাল দাঁড়াইতে না দাঁড়াইতেই যেন অপার বিশ্রাম-সুখে ভাসিতে লাগিলেন। কিন্তু রমণীদিগের মনে শান্তি নাই।

স্ত্রীলোক দুইটী যে কুটীরের দ্বারে দাঁড়াইলেন, তাহার দ্বার অর্দ্ধোন্মুক্ত। চারিদিকের ভাঙ্গা বেড়ার ফাঁকদিয়া অভ্যন্তর-ভাগে চন্দ্রের রশ্মি ভাঙ্গিয়া পড়িতেছে। কুটীর-মধ্যে একদিকে একটী পুরাতন শ্মশান-চিহ্ন। এটীকে দেখিবামাত্রই শ্মশান বলিয়া প্রতীতি হইতেছিল। চিতা-চিহ্নের পার্শ্বেই অপর একটী নূতন শ্মশান সজ্জিত রহিয়াছে। তাহার উপরে শব নাই এবং কাষ্ঠ সকল অদগ্ধ। কেবল সজ্জিত চিতা-গাত্রে একখানি লিখিত ভূর্জ্জ-পত্র ঝুলিতেছে। তাহাতে বড় বড় অক্ষরে সংক্ষেপে লিখা আছে, "যদি কোন মহাত্মার এস্থানে আগমন হয়, তবে তিনি দয়া করিয়া পার্শ্বস্থ শবটীকে এই চিতার উপরে স্থাপন পূর্ব্বক অগ্নি সংযোগ করিবেন।"

যুবতী নিমেষ-মধ্যে এই সকল দেখিলেন। নিমেষ-মধ্যে চিতা-গাত্রের লিখিত-ভূর্জ্জ-পত্র-খণ্ড পড়িলেন। পড়িয়া, চমকিয়া কুটীরের অপর পার্শ্বের দিকে চাহিলেন। "এ—! এ—! এ—কি—!" চাহিবামাত্র যুবতীর প্রাণের অন্তস্তল হইতে হৃদ্‌কম্পের সহিত এই শব্দ উত্থিত হইল। যুবতী নিমিষে দেখিলেন, একটী মুমূর্ষু যুবকের কঙ্কালাবশিষ্ট শীর্ণ দেহ ধূলী-ধূসরিত হইয়া মৃত্তিকা-শয্যায় লুণ্ঠিত হইতেছে। দেখিয়াই বোধ হইল, যুবক

একজন নবীন সন্ন্যাসী। তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ ভস্মে লিপ্ত। ভাবে বুঝা যাইতে-ছিল, পার্শ্বস্থ পুরাতন শ্মশান-ভস্মেই লিপ্ত। পরিধানে সামান্য কৌপীন। মস্তকের কেশরাশি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জটাভারে পরিণত হইয়াছে এবং মুখমণ্ডল সুন্দর শ্মশ্রুমণ্ডিত। তাঁহার বিশাল বক্ষ ও পঞ্জরদেশের অস্থি সকল জাগিয়া উঠিয়াছে এবং নিঃশ্বাস প্রশ্বাসে থাকিয়া থাকিয়া ঈষৎ আন্দোলিত হইতেছে। আয়ত নয়নদ্বয় মুদ্রিত; দেখিয়া বোধ হইতেছিল, মুমূর্ষু যুবক নিদ্রিত রহিয়াছেন। অল্প অল্প মেঘাবৃত সৌর দীপ্তির ন্যায় তাঁহার সুগৌরাঙ্গের নিমজ্জমান তেজ ও কান্তি ভস্ম-মধ্য হইতে ফুটিয়া উঠিয়াছে। অভ্যাগত যুবতী এবং বৃদ্ধা ধীর অথচ কম্পিত, নিঃশব্দ, মৃদু পদসঞ্চারে আস্তে আস্তে মুমূর্ষু যুবকের পার্শ্বে উপস্থিত হইলেন। যুবককে চিনিতে যুবতীর কিঞ্চিন্মাত্রও বিলম্ব হইল না। বৃদ্ধা কিঞ্চিৎ চিন্তান্বিত হইয়া একবার মুমূর্ষুর দিকে আর একবার যুবতীর প্রভাত-চন্দ্রের মত ম্লান মুখ-পানে তাকাইলেন। যুবতী তাঁহাকে সঙ্কেতে কথা বলিতে এবং শব্দ করিতে নিষেধ করিয়া, কেবল অবসন্ন-দেহে গগনচ্যুত চন্দ্রমণ্ডলের ন্যায়; দেবহস্তচ্যুত পারিজাত রাশির ন্যায়, যুবকের পার্শ্বে বসিয়া পড়িলেন। বসিয়া, সুন্দর হস্ত খানি ধীরে ধীরে অতি ধীরে যুবকের ললাটে স্থাপন করিলেন। তাহাতেও মুমূর্ষু জাগিলেন না। তখন ললাটের হস্ত তুলিয়া বক্ষে রাখিলেন, ধীরে ধীরে ধীরে একটুকু ঠেলিলেন, তাহাতেও ঘুম ভাঙ্গিল না। যুবতী বুঝিলেন, এ ঘুম নয়, অনন্ত কালনিদ্রার সূচনা-মাত্র। যুবতীর বিশাল নয়নযুগল ভাসাইয়া তখন ধারা বহিয়া জল পড়িতে লাগিল। আঁচলে চক্ষু মুছিতে মুছিতে পার্শ্বস্থ বৃদ্ধার দিকে তাকাইয়া রুদ্ধকণ্ঠে বলিলেন, "মা, কাপড়ের পুঁটলীটা কোথায় রাখিলাম গা?" মা তাড়া তাড়ি কাপড়ের পুঁটলীটা আনিয়া কন্যার নিকটে দিলেন। কন্যা? না। বৃদ্ধা যুবতীর গর্ভধারিণী মা নন্। যুবতী ইঁহাকে মা বলেন। বৃদ্ধা যুবতীকে কন্যাই ভাবেন। পথে ঘাটে অপরিচিত লোকের কাছে পরিচয় দিয়া থাকেন, এটী আমার কন্যা। তাই বলিলাম, কন্যা। কন্যা পুঁটলী হইতে ক্ষিপ্রহস্তে একটী ক্ষুদ্র ঔষধের বাক্স বাহির করিয়া, একটুকু জল এবং একটী ক্ষুদ্র পাত্রের জন্য এদিক্ ওদিক্ তাকাইতে লাগিলেন। বৃদ্ধা অঙ্গুলী-সঙ্কেত করিলেন। যুবতী অঙ্গুলীনির্দ্দিষ্ট দিকে চাহিয়া একটী কমণ্ডলু দেখিতে পাইলেন। দেখিলেন, কমণ্ডলুতে জল আছে, তাহার নিকটে

একটী ক্ষুদ্র নারিকেলের মালা রহিয়াছে। যুবতী মালায় জল ঢালিয়া তখনই ঔষধ প্রস্তুত করিলেন। এ "হোমিওপ্যাথিক" ঔষধ। কিন্তু মুমূর্ষুর মুখে ব্যস্ততার সঙ্গে ঔষধ ঢালিতে গিয়া দেখিলেন, তাঁহার দাঁতে দাঁত আঁটিয়া গিয়া ঔষধ প্রবেশের পথ বন্ধ করিয়াছে। তখন যুবতী আবার অশ্রুপূর্ণ-চোখে বৃদ্ধার দিকে তাকাইলেন। বৃদ্ধা অতি কষ্টে যুবকের দাঁত একটু ফাঁক করিলেন। যুবতী সেই ফাঁক দিয়া অতি যত্নে ধীরে ধীরে অল্প অল্প করিয়া রোগীর মুখে ঔষধ ঢালিতে লাগিলেন। ঔষধ ঢালিবার কালে যুবতীর চোখের অজস্র ধারায় মুমূর্ষু যুবকের পাণ্ডুবর্ণ মুখ-মণ্ডল ভাসিয়া যাইতে লাগিল। ঔষধ কিছু উদরস্থ হইল, কিছু রোগীর মুখ বহিয়া পড়িয়া গেল।

একাদশ পরিচ্ছেদ।

দীপ-নির্ব্বাণ।

সমস্ত রাত্রি ও সমস্ত দিন অনবরত ঔষধ প্রয়োগ করাতে দ্বিতীয় দিন অপরাহ্নে রোগীর দেহে পুনরায় চেতনা সঞ্চার হইল। রোগী প্রথম প্রলাপ বকিলেন, পরে বারম্বার শূন্যদৃষ্টিতে, বিস্ফারিতনয়নে চারিদিকে তাকাইতে লাগিলেন। তখন স্পষ্টই বুঝা যাইতে লাগিল, যুবকের সে চাহনির কোনই অর্থ নাই, কোনই লক্ষ্য নাই। তৎপরে জিভ্ দেখাইয়া জল চাহিলেন। পার্শ্ববর্ত্তী যুবতী জলের পরিবর্ত্তে ঔষধ দিলেন। রোগী আবার জল চাহিলেন। এবার সত্য সত্যই জল প্রদত্ত হইল। রোগী জল পান করিয়া অপেক্ষাকৃত সুস্থ হইলেন। তাঁহার চোখের নিমজ্জমান দৃষ্টিশক্তি যেন বহুক্ষণে আবার ধীরে ধীরে ক্রমে ক্রমে ফিরিয়া আসিল। এবার দৃষ্টি স্থির লক্ষ্য যুক্ত হইল। পার্শ্ববর্ত্তিনী পরম সুন্দরী যুবতীর অকলঙ্ক পূর্ণচন্দ্র-সন্নিভ সুন্দর মুখমণ্ডলই প্রথম লক্ষ্য হইল। সর্ব্ব প্রথমেই রোগীর রোগ-ক্লিষ্ট চক্ষু দুইটী যুবতীর পদ্মপলাশায়ত লোচনে সম্মিলিত হইল। শুভ মুহূর্ত্তে যুবক যুবতীতে শুভ দৃষ্টি হইল। শুভ মুহূর্ত্তে? সম্পূর্ণ অভাবের পরিবর্ত্তে যৎকিঞ্চিৎই শুভ।

এবার যুবকের নয়নরূপ ভগ্ন-পক্ষ ভ্রমর দুইটী যেন যুবতীর অফুরন্ত

মধুর ভাণ্ডার প্রফুল্ল মুখপদ্মোপরি পড়িয়া আর নড়িতে চাহিল না। যুবতী কোমলস্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি হোয়েছে?" যুবক উত্তর দিলেন না। উত্তরের পরিবর্ত্তে চক্ষু মুদ্রিত করিলেন। মুদ্রিত নয়ন দুইটীর কোণ হইতে অদম্যবেগে দুইটী জলের ধারা পড়িয়া গণ্ডদ্বয় অভিষিক্ত করিল। যুবতী আপনার আঁচলে সে ধারা মুছাইতে লাগিলেন। যুবক তখন ধীরে ধীরে অতি কাতরতাপূর্ণ ক্ষীণ স্বরে বলিলেন, "তুমি কেন আসিলে?"

যুবকের কথা শুনিয়া যুবতী প্রথমে ঈষৎ স্ফুরিতাধরে একটু হাসিলেন, পরে মুখ অত্যন্ত ভার করিয়া বলিলেন, "দরকার আছে।"

যুবক।—"কি দরকার?"

যুবতী।—"শুনে কি হবে?"

যুবক।—"আচ্ছা তবে বো'ল না।"

যুবতী কিছু অপ্রতিভ হইলেন। লজ্জা-আরক্তিম-মুখে বলিলেন, "অপরাধ হয়েছে, মাপ কর। আমি এসেছি, বিশেষ দরকারে।"

যুবক।—"কি দরকারে?"

যুবতী।—"তোমায় প্রায়শ্চিত্ত করিতে দিব না।"

যুবকের রক্ত-হীন পাণ্ডুবর্ণ মুখে গাঢ় কালিমার ছায়া পড়িল। যুবক অত্যন্ত গম্ভীর হইয়া বলিলেন, "ইহাতে তোমার স্বার্থ কি?"

যুবতী।—"স্বার্থ, তোমার মঙ্গল।"

যুবক।—"কি মঙ্গল?"

যুবতী।—"তুমি লঘু পাপে গুরু প্রায়শ্চিত্ত করিতে বসিয়াছ। আমার ভরসা আছে; কৃপাসিন্ধুর কৃপায় এখন তোমার জীবন রক্ষা পাইলে, কালে মনও ভাল হইবে।"

যুবক।—"অসংযমনের অপেক্ষা গুরু পাপ নাই। ইহাই সকল পাপের বীজ। কৃপাসিন্ধুকে অনেক ডাকিয়াছি। তাহার উত্তর যাহা পাইয়াছি, তাহা আশাজনক নয়। বুঝিয়াছি, শ্মশানের জ্বলন্ত আগুনে ভিন্ন অন্য কোথায়ও আমার মঙ্গল নাই।"

যুবতী।—"ডাকের মত ডাক নাই। একবার মাত্র যাঁহার স্মরণে রাশি রাশি পাপ পলকে ভস্মীভূত হয়, তাঁহাকে ডাকিলে তোমার চিত্ত পবিত্র হইবে—অবশ্যই হইবে। মন পবিত্র কর। আত্মহত্যায় কি পাপ নাই?"

যুবক আরও গম্ভীর হইলেন। অত্যন্ত গম্ভীর ভাবে বলিলেন, "আত্ম-

হত্যা? যে অসংযমী সে-ই আত্মঘাতী। সুতরাং আমি বাঁচিলেও যদি মন পবিত্র না হয়, তবে প্রতি পলে পলে আত্ম-হত্যা-পাপে পতিত হইব। আর আমার এ মৃত্যু সাক্ষাৎ সম্বন্ধে আমার সম্পূর্ণ আত্ম-কৃত নয়। তবে অনেক দিন হইতেই জীবনটাকে নিতান্ত ধূলা খেলার মত মনে করিতেছিলাম। শরীরের প্রতি কিছুই যত্ন ছিল না। কর্ত্তব্য পাইলেই প্রাণ ভরিয়া খাটিয়াছি। তাহাতে মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে শারীরিক নিয়ম উল্লঙ্ঘিত হইয়াছে। তোমাকে অনেক দিন পূর্ব্বে লিখিয়া ছিলাম, "পিতৃদেবের সাক্ষাৎ পাইয়াছি।" তাঁহার মৃত্যু-সময়ে অনেক অনিয়ম হইয়াছিল। বোধ হয়, সেই অনিয়মের ফলই আমার এই অপমৃত্যু। এ মৃত্যু আমার কাছে দুই কারণে অমৃতের অপেক্ষাও মধুরতর বোধ হইতেছে। প্রথমত, শেষাবস্থায় পিতৃদেবের যৎকিঞ্চিৎ শুশ্রূষা করিতে পারিয়াছি। আমার এ ভারস্বরূপ তুচ্ছ প্রাণ তাঁহারই সেবার জন্য ব্যয়িত হইল, ইহা ভাবিতেও আত্মার অপার আনন্দ হয়। দ্বিতীয় কথা—"

দ্বিতীয় কথা বলিতে যুবকের মুখ আরও গম্ভীর হইল। যুবক কিছুক্ষণ নীরবে থাকিয়া, বলিতে লাগিলেন, "আমি মরিলে, তোমার মঙ্গল হইবে, তোমার পথ নিষ্কণ্টক হইবে, ইহা ভাবিতে যেন আমার প্রাণে সুখ ধরে না। দেখ, আমি তোমার নিকট আমার কান্নার ও মনোদুঃখের কারণ বলিতে প্রতিজ্ঞা-বদ্ধ হইবার পূর্ব্বে যদি মরিতাম, তবে আর তোমার কাণে সেই চিঠির মধ্য দিয়া সেই অবাঞ্ছনীয় কথা প্রবেশ করিতে পারিত না। জানি না, বাঁচিয়া থাকিলে আরও কি কি ঘটিবে। সুতরাং এ মৃত্যু আমার আত্ম কৃত না হইলেও বাঞ্ছনীয়। দেবি, আমি আমার চিত্তকে কিছুতেই বশীভূত করিতে পারিলাম না!" বলিতে লজ্জায় যুবকের রক্ত-শূন্য মুখেও আরক্তিম আভা ছড়াইয়া পড়িল। যুবক কিছুক্ষণ নীরবে সজল-নেত্রে ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া কি যেন ভাবিতে লাগিলেন। ভাবিতে ভাবিতে চক্ষু মুছিয়া আবার বলিতে লাগিলেন, "কি কো'রে আমার মনে এ আগুন লাগিল, কি কো'রে এ আগুন আমার প্রাণের প্রতি স্তরে স্তরে, ধমনীর প্রতি রক্ত বিন্দুতে ছড়াইয়া পড়িল, কিছুই জানি না। কেবল দাব-দগ্ধ অসহায় হরিণ-শিশুর মত আমি ধূমান্ধকারে ছুটিতেছি! পথ'ত কিছুতেই পাই না! কৃপাসিন্ধু ত আমায় কিছুতেই আলোক দিতেছেন না! তাঁহার কৃপা ভিন্ন আমার এমন কি শক্তি আছে যে, তদ্দ্বারা আমি এই অগ্নি-

সমুদ্র হইতে উদ্ধার পাইতে পারি? দেবি, আমি অসমর্থ বলিয়া নিতান্ত অনিচ্ছা-সত্ত্বে যে অপরাধ করিয়াছি, তজ্জন্য তোমার নিকটে ক্ষমা চাহিতেছি। আমি আর বাঁচিব না। আমি পরকালে চলিলাম বলিয়াই আগুনের হাত এড়াইতে পারিলাম না। কৃপাসিন্ধুর কৃপা ব্যতীত অনন্ত যুগেও আমার মনের এ-আগুন ঘুচিবে না। তবে তোমাকে আর জীবন-পথে হাঁটিতে হাঁটিতে এইরূপ বাধা বিঘ্ন সহ্য করিতে হইবে না, এই মাত্র ফল হইল। ইহাই আমার কাছে আজ যথেষ্ট রোধ হইতেছে।" তুমি সুখে থাকিলে, আমি পরকালে গিয়া নরকে গেলেও সুখী হইব। এই পর্য্যন্ত বলিতেই যুবকের কণ্ঠ রোধ হইয়া আসিতেছিল। তথাপি অতি কষ্টে বলিলেন—কথা আর ভাল করিয়া ফুটিল না, অতি ক্ষীণ-স্বরে অস্পষ্ট কথায় বলিলেন, "আমাকে এবার ইহকালের জন্য বিদায় দেও। আমার আত্মার কল্যাণের জন্য কৃপাসিন্ধুর নিকট প্রার্থনা করিও। তুমি এখানে আসিয়া ভাল কর নাই। আমায় শান্তিতে মরিতে দেও, পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিতে দেও!"

মুমূর্ষু যুবক শশাঙ্কশেখর। শশাঙ্কশেখর আর কথা বলিতে পারিলেন না। কেবল আর একবার পার্শ্ববর্ত্তিনী যুবতীর মুখ-পানে তাকাইলেন। সে দৃষ্টি একবারে শেষ বিদায় সূচক। যুবতী দৃষ্টি-বিদ্ধ হইয়া বাণ-বিদ্ধ হরিণীর মত ছট্ ফট্ করিতে করিতে হঠাৎ চীৎকারপূর্ব্বক কাঁদিয়া উঠিলেন। যুবতী কুন্তলা দেবী। কুন্তলাই কুমুদের মাকে সঙ্গে করিয়া এলাহাবাদের বাসা হইতে শিবিকারোহণে জোগ্রামে আসিয়া পদব্রজে স্বামীজির পাহাড়ে আসিয়াছিল। কুন্তলা যখন চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিল, তখন শশাঙ্কশেখরের বাহ্য ইন্দ্রিয় সকল ইহজগতের ব্যাপার বিস্মৃত হইয়াছিল। সুতরাং সে কাতর রোদন-ধ্বনি আর তাঁহার প্রাণের শান্তিকে বিনষ্ট করিতে পারিল না। তখন রোরুদ্যমানা কুন্তলা বাষ্পাকুল-লোচনে সেই নির্ব্বাণ সৌন্দর্য্যের পানে ব্যাকুলতার সহিত চাহিল—এ জন্মের মত শেষ দেখা দেখিবার জন্য চাহিল! দেখিল, কি অপূর্ব্ব স্বর্গীয় শোভাই উথলিয়াছে! শশাঙ্কশেখরের হস্ত দুইখানি অঞ্জলিবদ্ধ হইয়া যেন আপনিই বক্ষে স্থাপিত হইয়াছে। বিশাল চক্ষুর্দ্বয় নিমীলিত রহিয়াছে। তাহা হইতে গলিত ধারা দুইটী এখনও গণ্ডদ্বয় অভিষিক্ত করিয়া শোভা পাইতেছে। অথচ অধরোষ্ঠযুগল যেন ঈষৎ হাস্যবিকসিত। মুখ-মণ্ডলে

যেন প্রভাত-রবির-তরুণ-অরুণ আভা ছড়াইয়া পড়িয়াছে। কিন্তু ইন্দ্রিয় সকল স্থির এবং অচঞ্চল। চক্ষু যেমন জগতের শোভা দেখিতেছে না, কর্ণ যেমন বাহ্যশব্দ গ্রহণ করিতেছে না, নাসিকায় তেমনই নিশ্বাসবায়ু বহিতেছে না। বাহিরে এখনও নীড়াম্বসন্ধায়ী পক্ষিকুলের দিগন্তব্যাপী কলরবে যেন ধরা কাঁপিতেছিল। সান্ধ্য আকাশে পূর্ণিমার চাঁদ। চাঁদের কোলে অসীম নীলিমার বুকে ফুটন্ত এবং অস্ফুট-জ্যোতি নক্ষত্রের মালা। দিগন্তে, পর্ব্বতের চূড়ায় চূড়ায়, কানন-শিরে রাজত জ্যোৎস্নার হাসি-রাশি। সে হাসিতে ভগ্ন-বেড়াযুক্ত ক্ষুদ্র কুটীর-গর্ভ প্লাবিত। কুন্তলা দেখিল, যেন জ্যোৎস্নাসলিলে অবগাহন করিয়া মহাযোগী শশাঙ্কশেখর ভগবদ্ধ্যানে বিলীন হইয়াছেন। বাহিরের প্রকৃতি যেন তাই বাদ্যোদ্যমের সহিত পূর্ণচন্দ্র-প্রদীপ জ্বালাইয়া, নক্ষত্র-কুসুমের মালা গাঁথিয়া, ভগবৎ-পূজার আয়োজন করিতেছে। আহা! কি সুন্দর পূজা! আহা! কি নির্ব্বাণ সমাধি! আহা! মৃত্যু, তোমাকে কেহ বলে, কালসর্প; কেহ বলে, ফুটন্ত পারিজাত-মালা! তোমাকে কেহ ভাবে, গরলসাগর, নরকের অগ্নিময় সেতুবন্ধ, আর কেহ বা ভাবে, তুমিই ব্রহ্ম-ধামের পথ, অমৃতের সেতু! কিন্তু সঙ্গি-ভ্রষ্ট-বাণবিদ্ধ-কাতরপ্রাণা-কুরঙ্গীসম কুন্তলা আজ পলকের জন্য শশাঙ্কশেখরের সেই চন্দ্রকিরণদীপ্ত নির্ব্বাণ সৌন্দর্য্যময় মূর্ত্তি দেখিয়া ভাবিতেছিল, আহা! মৃত্যু, তুমিই জ্যোতির্ম্ময় ব্রহ্মধামরূপ পরম সমাধির অবস্থা! তোমাররূপ নির্ব্বাণাবস্থা প্রাপ্ত হইলেই মানুষ নিত্যানন্দস্বরূপ ভগবৎ-সত্বায় বিলীন হইয়া কৃতার্থ হইতে পারে! কিন্তু মুহূর্ত্ত পরেই আবার কুন্তলার শোকার্ত্ত-প্রাণ কাঁদিয়া উঠিল। প্রাণের সে কান্না পুনরায় বাহিরের উচ্চ শব্দে প্রকাশিত হইল। এবার সহচর-বিধুরা, শোক-দাবদগ্ধ হরিণী চীৎকার করিয়া অসহ্য যাতনায় মূর্চ্ছিত হইল। মূর্চ্ছা আর ভাঙ্গিল না! বৃদ্ধা কুমুদবালার মাতা এই অকূল বিপদ-সাগরে ভাসিতে ভাসিতে জ্ঞান-হারা হইয়াও অনেক রাত্রি পর্য্যন্ত কুন্তলার শুশ্রূষা করিতে ত্রুটি করিলেন না। মূর্চ্ছা কিছুতেই সম্পূর্ণরূপে ভাঙ্গিল না!

কুন্তলার মূর্চ্ছিত দেহ শশাঙ্কশেখরের মৃতদেহের পার্শ্বেই শায়িত রহিল। গৃহে-প্রবিষ্ট চন্দ্রকিরণে উভয় দেহই সমভাবে ভাসিতেছিল। বৃদ্ধা কুমুদ-বালার মাতা অবশেষে অবসন্নদেহে ক্লান্তমনে বসিয়া কেবল অশ্রু-ধারায় আপনার গণ্ড ও সম্মুখে শায়িত যুবক যুবতী মুখমণ্ডল ভাসাইতে

লাগিলেন। এ অসহায়াবস্থায় কি করা কর্ত্তব্য, বৃদ্ধা অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়াও তাহা ঠিক্ করিতে পারিলেন না। সুতরাং কেবল কান্নাই সম্বল করিলেন। কাঁদিয়া কাঁদিয়া ক্লান্ত হইয়াও আবার কাঁদিতে লাগিলেন!

আজ অসংখ্য রজত-শুভ্র কিরণ-বাহু প্রসারিত করিয়া আকাশের চন্দ্র তারা ডাকিতেছে, "এস—! শশাঙ্কশেখর, এস—! এই বাহু ধরিয়া মর্ত্ত্যলোক হইতে চলিয়া এস—! এস—! তুমি রাজপুত্র, আমাদের মত কোটি কোটি চন্দ্র-লোক, নক্ষত্র-লোক অতিক্রম করিয়া সেই রাজার রাজা—সম্রাটের সম্রাটের অখণ্ড শান্তিপূর্ণ জ্যোতির্ম্ময় কোলে চলিয়া যাও—! এস—! যে দেশের রাজ-পুত্র হইলে, বিমাতার প্রকোপে পড়িয়া প্রাণ-দায়ে দেশে দেশে ফকিরের বেশে ঘুরিতে হয় না, যে দেশের রাজাও ইন্দ্রিয়-পরায়ণ হইয়া নিজ-হস্তে বহুবিবাহরূপ আগুন জ্বালিয়া নিজের গৃহে অর্পণ করেন না, যে দেশে রাজার উপরে পর-রাজ্য-লোলুপ প্রবল পরাক্রান্ত অধার্ম্মিক রাজা নাই, যে দেশের পিতাকে অত্যাচারীর অত্যাচারে সিংহাসনচ্যুত হইয়া ফকির-বেশে মরিতে হইবে না, এবং যে দেশের পিতার শোচনীয় মৃত্যু দেখিয়া আর মর্ম্মদাহে জ্বলিতে হইবে না, এস—! ঐ জ্যোৎস্নাময় বিমান-পথে চলিয়া এস—! সেই পুণ্যময়, জ্যোতির্ম্ময় দেশে মহাযাত্রা করিতে এস—! একদিন হয়ত সেখানে চিরবাঞ্ছিত কুন্তলার নির্ম্মল পবিত্র সহবাস-সুখে নিত্য সুখী হইতে পারিবে। সেখানে ইন্দ্রিয়হীন মানব-প্রাণ সর্ব্বদাই ইন্দ্রিয়াতীত প্রেমের খনি। যিনি ইন্দ্রিয়াতীত ভালবাসায় মুগ্ধ হইয়া স্বর্গের দেবীর ন্যায় সরলপবিত্রপ্রাণে মনে মনে তোমাকেই প্রাণ মন সমর্পণ করিয়াছিলেন, যিনি তোমাকে সোদর-তুল্য ভাবে ভালবাসিয়াও অন্যপ্রকার প্রণয়াভিলাষ ত্যাগ করিয়া তোমাময়-প্রাণমন হইয়াছিলেন, তাঁহাকে ইন্দ্রিয়ের বিষয়রূপে—সংসারের স্ত্রীরূপে গ্রহণ করিতে তোমার প্রাণে বাসনার সঞ্চার হওয়াতেও, সত্য সত্যই তুমি অসংযমীর নিম্নপদে অবতরণ করিয়াছিলে। কিন্তু হে সাধু পুরুষ, তুমি সামান্য পতঙ্গের ন্যায় দুর্দ্দমনীয় বাসনার আগুনে ঝাঁপ দিয়া পাপ-ভস্মে লিপ্ত হও নাই! তুমি যুদ্ধে হারিয়াছ বটে, কিন্তু বীরের ন্যায় শত্রুদল নিষ্পেষিত করিয়া জীবন আহুতি দিয়াছ! ঐ শুন—! স্বর্গে দুন্দুভি বাজিতেছে! ঐ দেখ! তোমার প্রায়শ্চিত্ত দর্শনে সন্তুষ্টচিত্ত দেবগণ পথ পরিষ্কারপূর্ব্বক তোমাকে

অভ্যর্থনা করিতে স্বর্গদ্বারে দণ্ডায়মান! যাও—! দেব, যাও—! স্বর্গধামে যাও—!” চন্দ্র তারার সঙ্গে পর্ব্বত, কানন, নদী, বায়ু, পক্ষী সকলেই আজ সমকণ্ঠে নিজ নিজ ভাষায় বলিতেছে, “যাও—! দেব, যাও—! স্বর্গধামে যাও—! তথা হইতে তোমার এই দুঃখী জন্মভূমির মস্তকে আশীর্ব্বাদ বর্ষণ করিও! যেন এ দেশের যুবক যুবতীরা আপনার চরিত্র ও ধর্ম্ম বজায় রাখিতে তোমারই মত একান্ত-মনে পাপের সহিত সংগ্রাম্ করিতে সমর্থ হয়!”

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ।

পরিণাম।

কুমুদের মা যখন গভীর রাত্রিতে শশাঙ্কশেখরের মৃতদেহের পার্শ্বে কুন্তলার মূর্চ্ছিত দেহ কোলে করিয়া কাঁদিয়া কাঁদিয়া অবশেষে অবসন্ন-দেহে নিজেও ঢুলিতে ঢুলিতে ধূলা মাটীর মধ্যেই পড়িয়া ঘুমাইতেছিলেন, তখন তাঁহার অজ্ঞাতসারে এক চিন্তার অগোচর অপূর্ব্ব ঘটনা ঘটিল! সেই স্তব্ধ জ্যোৎস্না-ধৌত পর্ব্বত-পৃষ্ঠে সহসা তিনটী পুরুষ-মূর্ত্তি প্রকাশিত হইল! পুরুষদিগের প্রত্যেকেরই মস্তকের কেশ, শ্মশ্রু, গোঁপ ও ভ্রূ প্রভৃতির রোমাবলী পক্ক এবং শুভ্র। পরিধানে শুভ্র বস্ত্র। গাত্রে শুভ্র উত্তরীয়াবরণ। তাঁহারা প্রত্যেকেই বয়সে বৃদ্ধ ও প্রবীণ এবং দেখিতে সুপ্রশান্ত-মূর্ত্তি। দিগন্তব্যাপী চন্দ্রালোকে মূর্ত্তিত্রয় স্পষ্ট লক্ষিত হইতে লাগিল। পুরুষদিগের মধ্য হইতে একজন ধীরপদসঞ্চারে কুটীর-মধ্যে প্রবেশ করিলেন। তিনি সেখানে কিছুক্ষণ দাঁড়াইয়া, পক্ককেশ-মণ্ডিত মস্তক অবনত করিয়া গৃহ-প্রবিষ্ট জ্যোৎস্নালোকে ধীর এবং সতর্কভাবে কি যেন পরীক্ষা করিলেন। একবার শশাঙ্কশেখরের মৃতদেহের বক্ষে আর একবার কুন্তলার বক্ষে হস্ত স্থাপন করিলেন। পরীক্ষান্তে সুদীর্ঘ নিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়া পুনরায় পূর্ব্ব-ভাবেই ধীরপদ-সঞ্চারে কুটীরের বাহিরে আসিলেন। সুপ্রবীণ সঙ্গীদ্বয় গম্ভীর ভাবে তাঁহার অপেক্ষা করিতেছিলেন। পুরুষ বাহিরে আসিয়া তাঁহাদিগকে মৃদুস্বরে কি যেন বলিলেন। তৎক্ষণাৎ তিনজনের সমবেত চেষ্টায় কয়েক মুহূর্ত্তের মধ্যেই গৃহ-মধ্যস্থিত ব্যক্তিদিগের উপর হইতে ভগ্ন কুটীরের চাল ও বেড়া দূরে নিক্ষিপ্ত হইল। সেখানে যে কখনও কুটীর ছিল, এখন আর এমন

কোনই চিহ্নমাত্র রহিল না। তৎপরে আরও কয়েক মুহূর্ত্তের মধ্যেই কুন্তলার মূর্চ্ছিতদেহ-সহিত কুমুদের মা অতর্কিতরূপে স্থানান্তরিত হইলেন এবং শশাঙ্কশেখরের শবদেহ গঙ্গাজলে স্নাত হইয়া কুটীরের কক্ষাভ্যন্তরস্থিত সেই সজ্জিত-শ্মশান-বক্ষে স্থাপিত হইল। পুরুষদিগের সঙ্গে চকমকী প্রভৃতি আগুন জ্বালিবার সমস্ত উপকরণই ছিল। সুতরাং অল্পক্ষণ পরেই মৃতদেহ বেষ্টন করিয়া চিতার আগুন ধূ—ধূ—শব্দে জ্বলিতে লাগিল। সে আগুনের শিখা ক্রমে গগনব্যাপী জ্যোৎস্নারাশির বক্ষে শত শির তুলিয়া নাচিতে লাগিল। আকাশে থাকিয়া একদিন নিস্তব্ধ পূর্ণিমার চাঁদ সেই দণ্ডীর পাহাড়ে শশাঙ্কশেখরের কার্য্যের সাক্ষী হইয়াছিল, পাষাণীর নিষ্ফল অরণ্য-রোদন শুনিয়াছিল, আজ আবার শশাঙ্কশেখরের দারুণ প্রায়শ্চিত্তের শেষ ফল শ্মশানের আগুন দেখিয়া তাঁহার ইহজগতের শেষ কাজেরও সাক্ষী হইল—সন্ন্যাসিনী চিরদুঃখিনী কুন্তলার এত দিনের সুখ দুঃখময় জীবনের শেষ পরিণাম দর্শন করিল!

আহা! ইহ জগৎ এইরূপই মানবের ক্ষণকালীন লীলাভূমি মাত্র! এখানকার সুখ, দুঃখ, হাসি, কান্না, প্রণয়, অনুরাগ সকলই এইরূপ অস্থায়ী! আহা! এখানে এইরূপেই মুকুল অঙ্কুরিত অবস্থায় ঝরিয়া পড়ে এবং কালের অসীম আঁধারে মিলাইয়া যায়! হায়! এ দেশের সকলই সকলের পক্ষে কিছুদিন পরে এইরূপই পলকস্থায়ী স্বপ্নমাত্রে পরিণত হইবে! তবে এস! ভাই, এস—! সেই দেশের জন্য প্রস্তুত হই, যেখানকার আনন্দ অপার অনন্ত অনাদি চিদ্‌ঘন, যে দেশের আশা নিরাবিল এবং চিরপূর্ণ, যেখানে শান্তি অখণ্ড এবং প্রেম পূর্ণাবস্থ। এস—! এই মোহময় সংসারে থাকিয়া সেই দেশেরই জন্য সর্ব্বদা প্রস্তুত থাকিতে চেষ্টা করি। পুণ্যাত্মা সাধু শশাঙ্কশেখর ঐ আলোকিত বিমান-পথে আজ সেই দেশেই গমন করিয়াছেন! তদীয় বিয়োগ-বিধুরা কুন্তলাদেবীর কি হইল, এখন তাহাই শুন।

বৃদ্ধা কুমুদের মা এখনও মূর্চ্ছিতা কুন্তলার পার্শ্বে অনাবৃত পর্ব্বত-বক্ষে নিদ্রায় অভিভূত। তিনি নিদ্রার ঘোরে মধ্যে মধ্যে স্বপ্ন দেখিতেছিলেন। শেষবারে দেখিতেছিলেন, "যেন আজ দেবতারা স্বয়ং আসিয়া পুণ্যাত্মা শশাঙ্কশেখরের ভগবদানন্দ-মগ্ন সুবিমল আত্মা লইয়া মহা সমারোহে স্বর্গে যাইতেছেন। সেই উপলক্ষে স্বর্গে মহোৎসব এবং আনন্দ কোলাহল

হইয়াছে। স্বর্গীয় বাজনা সকল বাজিতেছে, কত সঙ্গীত গীত হইতেছে, কত জয়ধ্বনি এবং শঙ্খধ্বনিতে দশদিক্ ভাসিয়া যাইতেছে। আর শশাঙ্কশেখর যেন গম্ভীরভাবে ব্রহ্মানন্দ-সাগরে ডুবিয়া ধীরে ধীরে পুষ্পক রথে দেবগণ সঙ্গে স্বর্গে আরোহণ করিতে করিতেও অধোদিকে তাকাইয়া সেই ভূতল-শায়িতা মূর্চ্ছিতা কুন্তলাকে জ্যোৎস্নালোক-মধ্যে দর্শন করিতেছেন।" এমন সময়ে বৃদ্ধার শিওরে বসিয়া কে যেন ডাকিলেন, "ওগো—, আপনি কে—? উঠুন—!" সে ডাকে এক সঙ্গেই বৃদ্ধার স্বপ্ন, নিদ্রা এবং চমক ভাঙ্গিল। বৃদ্ধা এবার সাতিশয় ব্যস্ততার সহিত কম্পিত-শরীরে অকস্মাৎ একবারে উঠিয়া দাঁড়াইলেন। তৎসঙ্গে যিনি বৃদ্ধার শিওরে বসিয়া ডাকিতে-ছিলেন, তিনিও দাঁড়াইলেন। বৃদ্ধা কেবল উন্মত্তের মত বিকৃত কম্পিত-স্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনি কে?" পুরুষ বলিলেন, "আমি ভবানী-শঙ্কর।" হঠাৎ এবার বৃদ্ধার যেন সকল আতঙ্ক দূর হইল। বৃদ্ধা স্থির-ভাবে বলিলেন, "আপনাকে আমি কখনও দেখি নাই, কিন্তু চিনি। আপনি এখন কোথা হইতে আসিলেন, বলুন।" ভবানীশঙ্কর বৃদ্ধার কথার উত্তরে বলিলেন, "আমরা মহাপ্রস্থান হইতে আসিয়াছি। কুন্তলার চিঠি পাইয়া আসিয়াছি। আজই অপরাহ্নে এলাহাবাদে আসিয়া সেখান হইতে পদব্রজে আসিয়াছি।"

বৃদ্ধা।—"আপনি মহাপ্রস্থানে কি করেন?"

ভবানী শঙ্কর এবার সঙ্কেতে অনতি দূরস্থিত অপর দুইটী শুভ্র বেশধারী পুরুষমূর্ত্তি লক্ষ্য করিয়া মৃদুস্বরে বলিলেন, "ঐ দুই মহাত্মা পরমহংস পরোপকারে এবং ভগবৎ-সেবায় আত্ম সমর্পণ করিয়া পর্য্যটনব্রত অবলম্ব করিয়াছেন। মা, আমাদের দেশের লোক সকল মনুষ্যত্বের প্রধান উপকর ধর্ম্ম ভুলিয়া এখন কেবল আত্মদ্রোহিতার আগুন জ্বালিয়া তাহাতেই সর্ব্ব আহুতি দিতে বসিয়াছে। এই আগুনে প্রেমের শান্তি বারি সেচন কর ইঁহাদের জীবনের অন্যতর লক্ষ্য। আমি এই মহাত্মাদেরই সেবক ইঁহাদেরই সঙ্গে থাকি। মহাপ্রস্থানের মেলা দর্শন-জন্য তথায় গিয়াছিলাম আমাদের কোন নির্দ্দিষ্ট বাসস্থান নাই। কুন্তলাকে মধ্যে মধ্যে চিঠি লিখিয়া আমাদের সাময়িক ঠিকানামাত্র জানাইতাম।"

ভবানীশঙ্করের কথা শেষ হইলে, বৃদ্ধা চমকিয়া পার্শ্বে চাহিয়া আরও দুইটী শুভ্রবেশ ও শুভ্রকেশ-শ্মশ্রুধারী বৃদ্ধ পুরুষকে দেখিতে পাইলেন।

দেখিলেন, তাঁহাদের একজন কুন্তলার মূর্চ্ছিত দেহ পাঁজাকোলা করিয়া তুলিতেছেন। অপর ব্যক্তি জ্বলন্ত চিতা নিবাইয়া তাহা পরিষ্কার করিতেছেন। কয়েক মুহূর্ত্তের মধ্যেই চিতা পরিষ্করণকার্য্য সম্পন্ন হইল। তখন ভবানীশঙ্কর বৃদ্ধার কৌতূহল দূর করিবার জন্য স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়াই বলিলেন, "এই মহাত্মাদিগের মধ্যে একজন আপনাদের শ্রীশ্রীমতী মহারাণী কুন্তলাদেবীর মাতামহ ঠাকুর। তিনিই দেবীর মূর্চ্ছিত দেহ কোলে করিয়াছেন। অপর মহাত্মা সন্ন্যাসী নামে পরিচিত। বোধ হয়, ইহাঁকে আপনি চিনিবেন না। আমরা আর অপেক্ষা করিব না। আপনাকে কোথায় পৌছাইতে হইবে বলুন।"

বৃদ্ধা।—"জৌগ্রামের বাজারে আমাদের সঙ্গের লোক জন ও পাল্কী আছে। রাত্রি শেষ হইয়া আসিয়াছে। প্রাতে আমি একাই সেখানে যাইতে পারিব। আপনারা আমার মাকে কোথায় নিয়ে চলিলেন, বলুন। ইনি কি বাঁচিবেন ?"

ভবানীশঙ্কর বৃদ্ধার কথার আর কোনই উত্তর না দিয়া কেবল নীরবে ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া দূরে সরিয়া গেলেন। তখন অপর বৃদ্ধ পুরুষদ্বয় কুন্তলার মূর্চ্ছিত দেহসহ হাঁটিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। ভবানীশঙ্করও দ্রুতপদে গিয়া তাঁহাদের সঙ্গে মিলিত হইলেন। বৃদ্ধা কুমুদবালার মাতা তখনও অশ্রুজলে ভাসিতে ভাসিতে পরমহংস হরগোবিন্দের কোলে জ্যোৎস্নালোকে কুন্তলার ফুটন্ত রূপরাশিময় সুন্দর দেহ দেখিতেছিলেন। দেখিলেন, সে সুন্দর মুখে এখনও আকাশের পূর্ণ চন্দ্রের সৌন্দর্য্যের অপেক্ষা কোটি গুণাধিক শোভা সৌন্দর্য্য উছলিয়া পড়িতেছে! সে ফুটন্ত গোলাপরাশি-সদৃশ দেহে লাবণ্য-নদী বহিতেছে। চাঁদমুখের পশ্চাতে নবীন মেঘরাশির মত আলুলায়িত কেশ-রাশি মৃত্তিকায় ঝুলিয়া পড়িয়াছে। তাহা হইতে কদাচিৎ দুই একটী গুচ্ছ বায়ুভরে উড়িয়া উড়িয়া মুখ ও নিমীলিত নয়নোপরি ছড়াইয়া পড়িতেছে। তদুপরি গগন-বক্ষস্থিত পূর্ণচন্দ্রের নিস্তব্ধ উজ্জ্বল কিরণরাশি পড়িয়া যেন সে শোভা ও সৌন্দর্য্য আরও বাড়াইতেছে। পলকে সে দৃশ্যও ফুরাইয়া গেল! শুভ্র-বেশধারী মহাপুরুষগণ মূর্চ্ছিত কুন্তলার সেই লাবণ্যময়ী দেহ প্রতিমাখানির সহিত মুহূর্ত্ত-মধ্যেই দ্রুতপদে পর্ব্বতবক্ষস্থিত অরণ্যপথে অদৃশ্য হইলেন! কিন্তু যত দিন কুমুদের মা বাঁচিয়াছিলেন, ততদিন তাঁহার প্রাণে প্রস্তরাঙ্কিত ছবিখানির

মত কুন্তলার এই শেষ বারের জ্যোৎস্না-উদ্ভাসিত কেশ-শোভিত নির্ব্বাণ-প্রায় সৌন্দর্য্যপূর্ণ মুখখানি চিত্রিত রহিয়াছিল। পাঠক, পাঠিকে, আপনাদের মনে কি এ দুঃখিনীর শেষ চিহ্ন কিছু রহিল?

পরিশিষ্ট।

কিছুদিন পরে কুমুদের মা তুলসীগ্রামে ফিরিয়া আসলেন। তাহার অল্পদিন পরেই গোপাল বাবুর সঙ্গে কুমুদবালার বিবাহ হইল। এ যে, বিধবা বিবাহ, ইহা বিশেষ করিয়া খুলিয়া না বলিলেও সকলেই বুঝিবেন। কুমুদবালার স্বামী অত্যন্ত বৃদ্ধ ছিলেন। তিনি কুমুদবালার পাঁচ বৎসর বয়সের সময়ে তাহার পাণি পীড়ণ করিয়াছিলেন। এই সময়ে তাঁহার নিজের বয়স তিপ্পান্ন কি চুয়ান্ন বৎসর ছিল। ইহাও সম্বন্ধের সময়ে ঘটকের মুখে শুনা গিয়াছিল। সুতরাং এ হিসাবের মধ্যেও গোল থাকিবার সম্ভাবনা। যাহা হউক্, ইহা ছাড়া তাঁহার প্রকৃত বয়সের তালিকা সংগ্রহ করা সাধ্যায়ত্ত নয়। এই হিসাব মত তাঁহার বয়স যখন পঞ্চষষ্ঠী বৎসর অতিক্রম করিয়াছিল, তখন কুমুদের মা কুমুদকে নিয়ে তাঁহার কার্য্যস্থল সুন্দরবনাঞ্চলে উপস্থিত হইয়াছিলেন। এইরূপ ঘটনার কারণ এই যে, কুমুদের স্বামী বিবাহের পরে আর কখনও কুমুদকে তাঁহার বাটীতে বা কার্য্যস্থলে লইয়া গিয়া ঘর সংসার করেন নাই। কুমুদের মা অনুসন্ধানে জানিয়াছিলেন, কার্য্যস্থলের একটী স্ত্রীলোকের সঙ্গে পূর্ব্বাবধিই বৃদ্ধের ঘোরতর চরিত্রদোষ ছিল। কেবল দেশে লোকনিন্দার ভয়ে একটা বিবাহ করিয়াছিলেন। বিবাহের পরে কার্য্যস্থলে গেলে, তাঁহার পূর্ব্ব প্রণয়িনী তাঁহাকে আর দেশে ফিরিতে দিল না। শেষটা কুমুদের মা কন্যাকে সঙ্গে করিয়াই জামাতার কার্য্যস্থলে গিয়া উপস্থিত হইয়াছিলেন এবং তথা হইতে ফিরিবার কালে পথেই দস্যু-হস্তে জামাতা নিধন প্রাপ্ত হন। কিন্তু যে চারি পাঁচ দিনমাত্র কুমুদবালা স্বামীর দেখা পাইয়াছিল, সে কয় দিনও তাঁহার সহিত আলাপাদি করিতে সুযোগ পায় নাই। সত্য কথা বলিতে গেলে, কুমুদবালা মনে মনে তাঁহার সঙ্গে আলাপ করিতে ইচ্ছুকও ছিল না। যাহা-

হউক্, কুন্তলা কুমুদবালার এই ইতিহাস জানিত। কুন্তলার সমাজভয় ছিল না। কারণ, সমাজের সঙ্গে তাহার জীবনাবধি সম্বন্ধ মাত্র ছিল। সে জানিত, সমাজ তাহাকে নির্য্যাতন করিবার অবসর পাইবে না। সমাজ-ভয় থাকিলেও এইরূপ স্থলে কুন্তলা কি করিত, তাহা এখানে বলা নিষ্প্রয়োজন। স্থূল কথা, কুন্তলাই বিদ্যালয়ের একজন সুশিক্ষিত এবং সচ্চরিত্র শিক্ষক গোপাল বাবুর সঙ্গে কুমুদবালার বিবাহের সম্বন্ধ ঠিক করিয়াছিল। এখন বিবাহের পরে কুমুদবালা ও গোপাল বাবু নানা সামাজিক নির্য্যাতন-সত্বেও পরম সুখে দিন কাটাইতে লাগিলেন। প্রফুল্লাদিও যত দিন বাঁচিয়াছিল, সুখেই ছিল।

কুন্তলা বরিশাল হইতে দেশে ফিরিয়া সরস্বতী এবং খাসিয়াদিগের খবর জানিতে একবার খাসিয়া পাহাড়ে একজন বিশ্বস্ত লোককে পাঠাইয়া-ছিলেন। লোক ফিরিয়া আসিয়া বলিয়াছিল, "সরস্বতীর মৃত্যু হইয়াছে—সেই রাত্রি প্রভাতের পূর্ব্বেই তাহার মৃত্যু হইয়াছিল। জুনও মরিয়াছেন খাসিয়ারাজ মতিরায়ও সেই যুদ্ধেই হত হইয়াছিলেন। জীবনরায় এখনও জীবিত আছেন। তিনি ইংরেজের শরণ লইয়াছিলেন। খাসিয়ারা যুদ্ধ হারিয়া ইংরেজদের অনেকটা অধীন হইয়া পড়িয়াছে।" এই সংবাদ পাইয়া কুন্তলাদেবী বহুদিন পর্য্যন্ত মনোদুঃখে কাঁদিয়াছিলেন।

কুন্তীর কি হইল? হেন্‌রিকে বধ করিয়া সেই রাত্রিতে কুন্তী কো পলাইল, কেহই বলিতে পারে না। তবে বিলাসপুরের দুর্গ বা রাজবাটী যেখানে ছিল, কালে সেই স্থানে অট্টালিকাদির ধ্বংসাবশেষের উপরে বিজন গহন অরণ্য রচিত হইয়া নিকটবর্ত্তী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পর্ব্বতের অরণ্যে মিলিত হইয়াছিল। রাখাল, কৃষক বা পথিকেরা কখনও কখনও শঙ্কিত চিত্তে বিদ্যুৎ-চমকবৎ প্রেতিনীর মত একটা উন্মাদ-গ্রস্ত স্ত্রীলোকের আলুথালু মূর্ত্তি ভগ্ন দুর্গ-প্রাকারের উপর দিয়া ছুটিয়া অন্তর্হিত হইতে দেখিত! কখনও কখনও নিকটবর্ত্তী গৃহস্থেরা গৃহে শুইয়া শুইয়া গভীর রাত্রিতে ঘুমের ঘোরে চমকিয়া চমকিয়া শুনিত, কে যেন বামা-কণ্ঠ কাঁপাইয়া সপ্তমে সুর তুলিয়া গাইতেছে,

"এস মা, এস মা, ভীমে, ভৈরব-মোহিনি!
দেহি মা, দেহি মা, শক্তিং দেহি গো জননি।"

ইত্যাদি ইত্যাদি।

সে দেশে যে সকল বৃদ্ধ ও বৃদ্ধারা সেই অরণ্য-মধ্যে পাগলিনীকে দেখিয়াছিল, তাহারা প্রায়ই পরস্পর বলাবলি করিত,"রাজবাড়ীর ঐ জঙ্গলে যে পাগ্‌লীটাকে মধ্যে মধ্যে দেখিতে পাওয়া যায়, উহার চেহারা কিন্তু অনেকটা আমাদের সেই "মেঝরাণীর মত।" তাহা শুনিয়া কেহ কেহ বলিত, "অনেকটা কি রে—? ঠিক্ যেন কুন্তী রাণীর চেহারার মত চেহারা!"

সকলেরই একটা না একটা গতি হইল, কিন্তু কুন্তীর অনন্ত পাপের কি কোনই প্রায়শ্চিত্ত নাই?

ভৈরবীর বোধ হয়, মৃত্যু হইয়াছিল। কিন্তু সে কখন্ কোথায় কিরূপে মরিয়াছিল কিছুই বলিতে পারিলাম না।

কুমুদের মা তুলসীগ্রামে ফিরিয়া কুন্তলার শেষ বৃত্তান্ত সকলকেই বলিয়াছিলেন। কুমুদবালা, গোপাল বাবু, প্রফুল্লমুখী ও দেবেন্দ্রবাবু প্রভৃতির উদ্যোগে অল্প-সময়-মধ্যেই কুন্তলাদেবীর একটী স্বর্ণমূর্ত্তি নির্ম্মিত হইয়া তাঁহার সেই পুষ্পোদ্যান-বেষ্টিত কুটীরের সম্মুখে একটী শ্বেত-প্রস্তর-গঠিত মন্দির-মধ্যে মহাসমারোহে প্রতিষ্ঠিত হইল। কালে লোক-মুখে কুন্তলাদেবীর অপূর্ব্ব ইতিহাস শুনিয়া তুলসীগ্রামের লোকেরা ঐ স্বর্ণমূর্ত্তিকে দেবী-জ্ঞানে পূজা করিতে লাগিল।

সমাপ্ত।

IMPERIAL LIBRARY